

**KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA**  
**18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009**

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ১০৮/১, (বঙ্গবন্ধু স্মৃতি, গুরু-১৮)
Collection : KLMLGK	Publisher : সত্য নাথ
Title : বসন্ত (BIVAV)	Size : ৫.৫" x ৪.৫"
Vol. & Number : <div style="margin-left: 100px;">21/2</div> <div style="margin-left: 100px;">21/3</div> <div style="margin-left: 100px;">22/1</div> <div style="margin-left: 100px;">23/1</div>	<div>Year of Publication :  <div style="margin-left: 20px;">Oct - Dec 1999</div> <div style="margin-left: 20px;">Jan - March 2000</div> <div style="margin-left: 20px;">July - Sep - 2000</div> <div style="margin-left: 20px;">Oct - 2001</div> </div> <div>Condition : Brittle / Good ✓</div>
Editor : সত্য নাথ	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিশেষ শতকালীন সংখ্যা

# বিদ্যাব

---

সম্পাদক

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

---



১৪০৬





অধুনা প্রাপ্তিযোগ্য  
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল্যবান প্রকাশনা

● Rasvihary Das Philosophical Essay : Ramaprasad Das	150.00
● Economic Theory, Trade and Quantitative Economics : Asis Banerjee, Biswajit Chatterjee	200.00
● পূর্ববঙ্গের কবিগণ সংগ্রহ ও পর্য্যালোচনা : ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ	৩০০.০০
● বাংলার বাউল : পণ্ডিত জিতমোহন সেনগুপ্ত	৩০.০০
● ঊনবিংশ শতাব্দীর হরদেবচিন্তা ও বহিঃমাত্র : সুপ্রিয়া সেন ভট্টাচার্য	৯০.০০
● কবিকল্পন-চক্ৰী : শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী বিশ্বপতি চৌধুরি	১২৫.০০
● বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা : শ্রী সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়	৬০.০০
● শাক্ত পদাবলী (চয়ন) : শ্রী অমরেন্দ্রনাথ রায়	৭০.০০
● বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন) : অধ্যাপক শ্রী খগেন্দ্র নাথ মিত্র, শ্রী সুকুমার সেন, শ্রী বিশ্বপতি চৌধুরি, শ্রী শ্যামাপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত	৬০.০০
● একালের ছোটগল্প সংগ্রহ	২৫.০০
● একালের কবিতা সংগ্রহ	২৫.০০
● একালের প্রবন্ধ সংগ্রহ	৩৫.০০
● আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান : ডঃ অনিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১০০.০০
● বামা বৈদ্যিনী পত্রিকা : ডঃ ভারতী রায়	১৫০.০০
● আন্তঃভাষা মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষা চিন্তা : ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ	৭৫.০০
● পূর্ববঙ্গের কবিগণ : ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ	৯০.০০
● ময়মনসিংহ গীতিকার : রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন	১২৫.০০
● প্রাচীন কবিগোঁড়ালার গান : ডঃ শ্রী প্রমুদচন্দ্র পাল	২৫.০০
● বাংলা কাব্যে নারীদের রূপায়ণ : কলক মুখোপাধ্যায়	২৫.০০
● A Dictionary of Indian History : Sachchidananda Bhattacharyya	250.00
● Elements of the Science of Language : Irach Jehangir Sorabji Taraporewala	60.00
● A History of Sanskrit Literature : S. N. Dasgupta	60.00
● Agrarian System of Ancient India : U. N. Ghoshal	15.00
● The Science of Sulba : B. B. Dutta	40.00
● Studies in Indian Antiques : H. C. Roychoudhuri	55.00
● Studies of Accounting Thought : G. Sinha	100.00
● Reading Keats Today : Prof. Surabhi Banerjee	60.00
● Dynamics of the Lower Troposphere : D. K. Sinha, G. K. Sen, M. Chatterjee	150.00
● Political History of Ancient India : Hemchandra Roy Choudhury	70.00
● The History of Bengal : Narendra Krishna Sinha	200.00
● An Enquiry into the Nature & Function of Art : S. K. Nandi	80.00
● Romance of Indian Journalism : Jitendranath Basu	75.00

আরো বিশদ বিবরণের জন্য :

**Pradip Kumar Ghosh**  
Superintendent

Calcutta University Press, 48, Hazra Road, Calcutta 700 019

বিক্রয়কেন্দ্র : আন্তঃভাষা ভবনের একতলা, কলেজস্ট্রীট চত্বর



বঙ্গ

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক  
বিভাগ : বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা

১৪০৬

সৃষ্টি

সম্পাদকীয়

প্রবন্ধ

মূল কথা	১	আরজ আলী মাতৃকর
রাবণের প্রতিভা	৯	আরজ আলী মাতৃকর
নিজের সম্পর্কে	১৬	আরজ আলী মাতৃকর
তৃতীয় বিশ্বের ভাষা পরিস্থিতি	১৯	রফিকুল ইসলাম
প্রগতি সাহিত্যে দলিত-সাহিত্য	৩২	গিরীন্দ্রনাথ দাস

বিশেষ সাহিত্য

ফ্রান্সিস পজের কবিতা	২২	চন্দ্র গুহ
----------------------	----	------------

অনুবাদ

ভারতীয় ভাষার কবিতা	২৭	শক্তি চট্টোপাধ্যায় (অপ্রকাশিত)
---------------------	----	---------------------------------

গল্প

কোন একদিন	৩৯	প্রফুল্ল রায়
রেলিং	৫৫	শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
ভালোবাসার আমত্ব চর	৬১	সেলিনা হোসেন
সুরতর চিঠি	৭১	মানব চক্রবর্তী
পুতুলের মুখ	৭৮	কল্যাণ মজুমদার
আত্মজীবনীর কয়েক পৃষ্ঠা	৯১	তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
সবাই গেছে বনে	৯৭	এ্যা দে
ওয়ানছা	১১৫	গোপালকৃষ্ণ রায়

অবনীবাণু হারিয়ে গেলেন	১২৭	অসীম সেনগুপ্ত
পাহারাদার, আমরাও আছি	১৩৫	আদিনাথ ভট্টাচার্য
জীবনের জন্য	১৪২	জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য
ঘুম	১৪৭	বিজ্ঞান কুমার ঘোষ
হারানো সময়	১৫৩	দীপঙ্কর দাস
সেই চিঠিটা	১৬২	অরুণ মুখোপাধ্যায়
সাপ	১৭১	মৃত্যঞ্জয় সেন
ভোকাট্টা	১৮২	সুনীল দাশ
এর সঙ্গে মিল, ওর সঙ্গে মিল	১৯১	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
কাঠের পা	১৯৭	উদয় ভাদুড়ী

### অধ্যায়িকা

ধনপতির সিংহলযাত্রা ২১১ রামকুমার মুখোপাধ্যায়

### বনফুল জন্মশতবর্ষ স্মরণে

অপ্রকাশিত বনফুল ২৩৭ ড: সরোজ মোহন মিত্র

ব্রহ্মদেশীয় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে

বনফুলের ভাষণ ২৬৩ অপ্রকাশিত

যে বনফুল বনস্পতি হয়ে ওঠে ২৮০ ঝরা বসু

### জীবনানন্দ দাসের অপ্রকাশিত দিনলিপি

২৯৩

দিনলিপির নামপঞ্জী রচনা ৩১২ ভূমেন্দ্র গুহ

### সম্পাদকীয়

বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা বিভাব প্রকাশিত হলো। এ সংখ্যায় নানা আকর্ষণীয় রচনা আছে। জীবনানন্দের অপ্রকাশিত দিনলিপির কিছু অংশ আবার প্রকাশিত হলো। জীবনানন্দের অপ্রকাশিত দিনলিপি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় বিভাবের জীবনানন্দ জন্মশতবর্ষ স্মরণসংখ্যায়। এই সংখ্যাটি প্রকাশের পর বাঙালী পাঠকের জীবনানন্দমনন্বত খানিকটা যে বৃদ্ধি পেয়েছে তা এখন সকলেই স্বীকার করছেন। পাঠকের অবগতির জন্য জানাই পুনর্মুদ্রিত বিভাবের জীবনানন্দ জন্মশতবর্ষ স্মরণসংখ্যাটি আবার পাওয়া যাচ্ছে। যারা আগে তা সংগ্রহ করার সুযোগ পাননি, তারা এবার সংগ্রহ করতে পারবেন। এ সংখ্যায় জীবনানন্দের দিনলিপির পাঠোদ্ধারও যত্নব্রীতি করে দিয়েছেন কবি ভূমেন্দ্র গুহ। তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

নির্ধারিত প্রকাশসময়ের অনিবার্যতার জন্য জীবনানন্দের দিনলিপির উল্লেখিত সমস্ত ব্যক্তিমুণ্ডের পরিচয় এ সংখ্যায় পুরোপুরি দেওয়া গেলনা। এর জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। বিভাবের আগামী সংখ্যায় যতটা সম্ভব তা দেওয়া হবে।

এ সংখ্যায় 'বনফুল' অর্থাৎ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়কেও তাঁর জন্মশতবর্ষে বিশেষভাবে স্মরণ করেছি। এখানে তাঁর অপ্রকাশিত দিনলিপিটিও নানা কারণে মূল্যবান যার ভূমিকাসহ আলোচনা করেছেন খ্যাত প্রাবন্ধিক সরোজমোহন মিত্র। বনফুলপত্র চিরন্তন মুখোপাধ্যায় ও সরোজমোহন মিত্রের কাছে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা। শ্রীমতী ঝরা বসুও বনফুলের রচনা নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন।

এ বছর শরদিব্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী। বিভাবের আগামী সংখ্যায় আমরা তাকে স্মরণ করবো।

এই বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞানী ও ধর্মবিশ্লেষণপ্রাজ্ঞ অসামান্য লেখক প্রয়াত আরজ আলী মাতুব্বরের রচনার প্রকাশ। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম — এমন কোনো বিষয় নেই যেখানে তাঁর মৌলিক চিন্তাধারার চিহ্ন পড়েনি। তাঁর রচনা আমাদের বিশ্বয়ে অভিভূত করে। বস্তুত দীর্ঘকাল এমন সর্বদাসম্পূর্ণ বিশ্বয়জাগানো লেখকের সন্ধান আমরা পাইনি। শুধু বাংলাদেশ নয়, পশ্চিমবঙ্গেও তাঁর লেখার বহুল প্রচার হোক এই কামনা নিয়েই আরজ আলী মাতুব্বরের রচনার অল্প কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম প্রকাশিত হলো।

এই সংখ্যায় আমরা অসংখ্য গল্প প্রকাশ করলাম। উপন্যাসের চাপে গল্প এখন অনেকটাই অবহেলিত, তাই এই প্রচেষ্টা।

বাংলাদেশের রফিকুল ইসলাম ও গিরীন্দ্রনাথ দাসের প্রবন্ধদুটিও উল্লেখের দাবী রাখে। মাত্র মাসাধিককাল আগে প্রকাশিত বিভাবের আন্তর্জাতিক কবিতা সংখ্যাটি প্রায় নিঃশেষিত। অল্প কিছু কপি কার্যালয়ে এখনো প্রথম আসার ভিত্তিতে পাওয়া যাবে।

পরিশেষে সকলকে জানাই শরৎকালীন অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

বিভাব সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে  
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত



সম্পাদকমণ্ডলী :

পবিত্র সরকার । প্রবজ্যোতি মণ্ডল । প্রদীপ দাশগুপ্ত ।

শান্তিনিকেতন

অরুণ মুখোপাধ্যায় । অনাথনাথ দাশ

সম্পাদক

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রধান যোগাযোগকেন্দ্র ও লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সম্পাদকীয় দপ্তর

'বিভাব'

৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক (দ্বিতল) । কলকাতা - ৬৮ । দূরভাষ : ৪৭৩-৩৬০০

শান্তিনিকেতনে যোগাযোগ কেন্দ্র

অরুণ মুখোপাধ্যায়

এ্যানড্রুজপল্লী (পশ্চিম) পো: শান্তিনিকেতন । পিন: ৭৩১২৩৫

প্রচ্ছদ : রনেনআয়ন দত্ত ।

বাঁধাই : গৌরাদ বাইভার্স, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ ।

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০৬৮ থেকে প্রকাশিত  
'বর্ণনা', ৬/৭ বিজয়গড়, কলকাতা - ৭০০ ০৩২ ফোন : ৪১২ ১১৩৩ থেকে অক্ষরবিন্যস্ত  
এবং সময় পাবলিকেশন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৭০০ ০৪৭ থেকে মুদ্রিত।

প্রবন্ধ

## মূলকথা

আরজ আলী মাতুবর

অজানাকে জানার স্পৃহা মানুষের চিরন্তন। বাক্যস্বরূপ আরজ হইলেই শিশু প্রশ্ন করিতে থাকে, এটি কি? ওটি কি? বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কূলে, কলেজে ও কাজ-কর্মে অনুরূপ প্রশ্ন চলিতে থাকে, এটি কি, ওটি কি, এরূপ কেন হইল, ওরূপ কেন হইল না ইত্যাদি। এই রকম 'কি' ও 'কেন'র অনুসন্ধান করিতে করিতেই মানুষ আজ গড়িয়া তুলিয়াছে বিজ্ঞানের অটল সৌধ।

প্রশ্নকর্তা সকল সময়ই জানিতে চায়—সত্য কি? তাই সত্যকে জানিতে পারিলে তাহার আর কোন প্রশ্ন থাকে না। কিন্তু কোন সময় কোন কারণে কোন বিষয়ের সত্যতায় সন্দেহ জাগিলে উহা সম্পর্কে পুনরায় প্রশ্ন উঠিতে থাকে।

কোন বিষয় বা কোন ঘটনা একাধিকরূপে সত্য হইতে পারে না। একটি ঘটনা যখন দুই রকম বর্ণিত হয়, তখন হয়ত উহার কোন একটি সত্য, অপরটি মিথ্যা অথবা উভয়ই সমরূপ মিথ্যা; উভয়ই যুগপৎ সত্য হইতে পারে না—হয়ত সত্য অজ্ঞাতই থাকিয়া যায়। এক ব্যক্তি যাহাকে 'সোনা' বলিল, অপর ব্যক্তি তাহাকে বলিল 'পিতল'। এ ক্ষেত্রে বস্তুটি কি দুই রূপেই সত্য হইবে? কেহ বলিল যে, অমুক ঘটনা ১৫ই বৈশাখ ১২টায় ঘটয়াছে; আবার কেহ বলিল যে, উহা ১৬ই চৈত্র ৩টায়। এখানে উভয় বক্তাই কি সত্যবাদী? এমতাবস্থায় উহাদের কোন ব্যক্তির কথায়ই শ্রোতার বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। হয়ত কোন একজন ব্যক্তি উহাদের একজনের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিল, অনুরূপ অন্য এক ব্যক্তি অপরজনের কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিল, অপরজন তাহা মিথ্যা বলিয়া ভাবিল। এইরূপে উহার সত্যাসত্য নিরূপণে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে ঘটিল মতানৈক্য। আর এইরূপ মতানৈক্য হেতু ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে ঘটিয়া থাকে নানারূপ ঝগড়া-কলহ, বিবাদ-বিসম্বাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা। এই রকম বিষয়বিশেষে ব্যক্তিগত মতানৈক্যের ন্যায় সমাজ বা রাষ্ট্রগত মতানৈক্যও আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; যাহার পরিণতি সাম্প্রদায়িক কলহ ও যুদ্ধবিগ্রহরূপে আজ আমরা চোখের উপরই দেখিতে পাইতেছি।

জগতে এমন অনেক বিষয় আছে, যে সব বিষয়ে দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম এক কথা বলে না। আবার ধর্মজগতেও মতানৈক্যের অন্ত নাই। যেখানে একই কালে দুইটি মত সত্য হইতে পারে না, সেখানে শতাধিক ধর্মে প্রচলিত শতাধিক মত সত্য হইবে কিরূপে? যদি বলা হয় যে, সত্য হইবে একটি; তখন প্রশ্ন হইবে কোনটি এবং কেন? অর্থাৎ সত্যতা বিচারের মাপকাঠি (Criterion of truth) কি? সত্যতা প্রমাণের উপায় (Test of truth) কি এবং সত্যের রূপ (Nature of truth) কি?

আমরা এই সকল দুর্ভাষ দার্শনিক তত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃষ্ট হইব না, শুধু ধর্মজগতের মতানৈক্যের বিষয় সামান্য কিছু আলোচনা করিব।

আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা জানিতে পাইতেছি যে, বিশ্বমানবের সহজাত বৃত্তি বা 'স্বভাবধর্ম' একটি। এ সংসারে সকলেই চায় সুখে বাঁচিয়া থাকিতে, আহার-বিহার ও বংশরক্ষা করিতে, সন্তান-সন্ততির ভিতর দিয়া অমর হইতে। মানুষের এই স্বভাবধর্মরূপ মহারত পালনের

উদেশ্যে সংসারে সৃষ্টি হইল কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, সমাজ, নীতি এবং রাষ্ট্র; গড়িয়া উঠিল জ্ঞান-বিজ্ঞানময় এই দুনিয়া। মানুষ যেখানে যে কাজেই লিপ্ত থাকুক না কেন, একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, সে তাহার 'স্বভাবধর্ম' তথা 'স্বধর্ম' পালনে ব্রতী। এই মহাব্রত উদ্‌যাপনে কাহারো কোন প্ররোচনা নাই এবং এই ধর্ম পালনে মানুষের মধ্যে কোন মতানৈক্য নাই।

এই স্বভাবধর্মই মানুষের ধর্মের সবটুকু নয়। এমনকি 'ধর্ম' বলিতে প্রচলিত কথায় এই স্বভাবধর্মকে বুঝায় না। যদিও এককথা স্বীকৃত হয়ই থাকে যে পশু, পায়ী, কীট, পতঙ্গ এমনকি জল, বায়ু, অগ্নি ইত্যাদিরও এক-একটি ধর্ম আছে, তত্বেই বিশ্বমানবের ধর্ম বা 'মানবধর্ম' বলিয়া একটি আন্তর্জাতিক ধর্মকে স্বীকার করা হয় না। সাধারণত আমরা যাহাকে 'ধর্ম' বলি তাহা হইল মানুষের কল্পিত ধর্ম। যুগে যুগে মহাজ্ঞানীগণ এই বিশ্বসংসারের স্রষ্টা ঈশ্বরের প্রতি মানুষের কর্তব্য কি তাহা নির্ধারণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। "ঈশ্বর প্রতি মানুষের কি কর্তব্য নাই? নিশ্চয়ই আছে।" — এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহার ঈশ্বরের প্রতি মানুষের কর্তব্য কি তাহা নির্ধারণ করিয়া দিলেন। অধিকন্তু মানুষের সমাজ ও কর্মজীবনের গতিপথও দেখাইয়া দিলেন সেই মহাজ্ঞানীগণ। এইরূপে হইল কল্পিত ধর্মের আবির্ভাব। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মনোবী বা ধর্মগুরুদের মতবাদ হইল ভিন্ন ভিন্ন।

এই কল্পিত ধর্মের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিল উহাতে মতভেদ। ফলে পিতা-পুত্র, ভাইয়ে-ভাইয়ে, এমনকি স্বামী-স্ত্রীতেও এই কল্পিত ধর্ম নিয়ে মতভেদের কথা শোনা যায়। এই মতানৈক্য যুগচিহ্নের জন্য প্রথমত আলাপ-আলোচনা, পরে বাক-বিতণ্ডা, শেষ পর্যন্ত যে কত রক্তপাত হইয়া গিয়াছে, ইতিহাসই তাহার সাক্ষী। কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে বিশ্বমানব একমত হইতে পারিয়াছে কি?

কেবল যে বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন মত এমন নহে। একই ধর্মের ভিতরেও মতভেদের অন্ত নাই। হিন্দু ধর্মের বেদ বাহ্য বলে, উপনিষদ সকল ক্ষেত্রে তাহার সহিত একমত নহে। আবার পুরাণের শিক্ষাও অনেক স্থলে অন্যরূপ। 'বাইবেল'—এর পুরাতন নিয়ম (Old Testament) ও নূতন নিয়ম (New Testament) অনেক পার্থক্য। পুন্স প্রটেস্ট্যান্ট (Protestant) ও ক্যাথলিকদের (Roman Catholic) মধ্যেও অনেক মতানৈক্য রহিয়াছে।

পবিত্র কোরানপন্থীদের মধ্যেও মতবৈধা কম নহে। শিয়া, সুন্নি, মুতাযিল্লা, ওহাবী, কাদিয়ানী, খারিজী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মতামত এক নহে। আবার একই সুন্নি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হানাফী, শাফী ইত্যাদি চারি মজহাবের মতামত সম্পূর্ণ এক নহে। এমনকি একই হানাফী মজহাব অবলম্বী বিভিন্ন পীর ছাভেবের যথা — জৌনপুরী, ফরফুরা, শরিগা ইত্যাদি বিভিন্ন খান্দানের বিভিন্ন রেহালা। মহাত্মা রামমোহন রায়ের অভিযাধুনিক ব্রাহ্মধর্মও অধুনা দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে।

এতোধিক মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও ভক্তদের নিকট আপন আপন ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ, সনাতন ও ঈশ্বর-অনুমোদিত, মুক্তি বা পরিত্রাণের একমাত্র পথ। বলা বাহুল্য যে, একদল ধারণা প্রত্যেক ধর্মেই বিদ্যমান। কোন ধর্মে একথা কখনও স্বীকার করেন না যে, অপর কোন ধর্ম সত্য অথবা অতীত ধর্মাবলম্বী লোকদের স্বর্গপ্রাপ্তি, মুক্তি বা নির্বাণ ব্যতীতে। বরং সকল সম্প্রদায়ের ধর্মযাজকেরা এই কথাই বলিয়া থাকেন যে, তাহাদের আপন আপন ধর্মই একমাত্র সত্যধর্ম, অন্য কোন ধর্মই সত্য নহে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকদের স্বর্গপ্রাপ্তি, পরিত্রাণ, নির্বাণ বা

মোক্ষলাভ ঘটিবে না। এ যেন বাজারের গোয়ালদেহের ন্যায় সকলেই আপন আপন দরি মিথিছে শ্রেষ্ঠ বলা।

বর্তমান যুগে পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মই আন্তিক। বিশেষত একেশ্বরবাদী। হিন্দুধর্মও মূলত একেশ্বরবাদী। তাহাই যদি হয়, অর্থাৎ জগতের সকল লোকই যদি একেশ্বরবাদী হয়, তবে তাহাদের মধ্যে একটি ভ্রাতৃত্ব বা থাকা উচিত। কিন্তু আছে কি? আছে যত রকম হিংসা, ঘৃণা, কলহ ও বিদ্বেষ। সম্প্রদায়বিশেষে ভুক্ত থাকিয়া মানুষ মানুষকে এত অধিক ঘৃণা করে যে, ততদূর কোন ইতর প্রাণীতেও করে না। হিন্দুদের নিকট গোমায় (গোবর) পবিত্র, অত্যা অহিন্দু মানুষ মাত্রেরই অপবিত্র। পক্ষান্তরে মুসলমানদের নিকট কবুতরের বিটাও পাক, অথচ অমুসলমান মাত্রেরই নাপাক। পুকুরে সাপ, ব্যাঙ মরিয়া পচিলেও উহার জল নষ্ট হয় না, কিন্তু বিধর্মী মানুষে ছুঁলেও উহা হয় অপবিত্র। কেহ কেহ একথাও বলেন যে, অমুসলমানী পর্ব উপলক্ষে কলা, কচু, পাঠা বিক্রিও মহাপাপ। এমনকি মুসলমানের দোকান থাকিতে হিন্দুর দোকানে কোন কিছু ক্রয় করাও পাপ। এই কি মানুষের ধর্ম? না ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা?

মানবতার মাপকাঠিতে মানুষ একে অন্যের ভাই, ভালবাসার পাত্র, দয়া-মায়ার যোগ্য, সুখ-দুঃখের ভাগী; এক কথাই আছেই আপন। কিন্তু ধর্ম বানাইল পর।

স্বভাবত মানুষ সত্যকেই কামনা করে, মিথাকে নয়। তাই আবহমানকাল হইতেই মানুষ 'সত্যের সন্ধান' করিয়া আসিতেছে। দর্শন, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, গণিত প্রভৃতি জ্ঞানানুশীলনের বিভিন্ন বিভাগ সর্বদাই চায় মিথাকে পরিহার করিতে। তাই দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক, কোন ঐতিহাসিক কিংবা নৈয়ায়িক সজ্ঞানে তাহাদের গ্রন্থে মিথ্যার সমিবেশ করেন না। বিশেষত তাহার তাহাদের গ্রন্থের ভূমিকায় এমন প্রতিজ্ঞাও করেন না যে, তাহাদের গ্রন্থের কোথাও কোন ভুলত্রুটি নাই। অথবা থাকিলেও তাহা তাহার সংশোধন করিবেন না। পক্ষান্তরে যদি কাহারো ভুলত্রুটি প্রমাণিত হয়, তবে তিনি তাহা অগ্নানবদনে স্বীকার করেন এবং উহা সংশোধনের প্রয়াস পাইয়া থাকেন। এইরূপ পরবর্তী সমাজ পূর্ববর্তী সমাজের ভুলত্রুটি সংশোধন করিয়া নিয়া থাকে। এইরকম যুগে যুগে যখনই অতীত জ্ঞানের মধ্যে কোন ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তখনই উহার সংশোধন হইয়া থাকে। এক যুগের বৈজ্ঞানিক সত্য আরেক যুগে মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া যায় এবং যখনই উহা প্রমাণিত হয়, তখনই বৈজ্ঞানিক সমাজ উহাকে জীববন্ধের ন্যায় পরিত্যাগ করেন ও প্রমাণিত নূতন সত্যকে সাদরে গ্রহণ করেন।

ধর্মজগতে কিন্তু ঐরূপ নিয়ম পরিলক্ষিত হয় না। তৌরিত, জঙ্কুর, ইজিল, কোরআন, বেদ-পুরাণ, জেন্দ-আভেস্তা ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থসমূহের প্রত্যেকটি অপৌকষ্যে বা ঐশ্বরিক পুথি কি না, তাহা জানি না, কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকটি গ্রন্থ এই কথাই বলিয়া থাকে যে, এই গ্রন্থই সত্য। যে বলিবে যে, ইহা মিথ্যা — সে নিজে মিথ্যাবাদী, অবিশ্বাসী, পাপী অর্থাৎ নারকী।

ধর্মশাস্ত্রসমূহের এইরূপ নির্দেশ হেতু কে যাইবে ধর্মশাস্ত্রসমূহের বিরুদ্ধে কথা বলিয়া নারকী হইতে? আর বলিয়াই বা লাভ কি? অবিকাংশ ধর্মগ্রন্থই গ্রন্থকারবিহীন অর্থাৎ ঐশ্বরিক বা অপৌকষ্যে, সুতরাং উহা সংশোধন করিবেন কে?

প্রাগৈতিহাসিককাল হইতে জগতেও শত শত ব্রাহ্মণ উত্থান হইয়াছে এবং পরস্পর কলহ-বিবাদে ফলে তাহাদের পতন ঘটিয়াছে। কিন্তু ধর্মে-ধর্মে যতই কলহ-বিবাদ থাকুক না কেন, জগতে যতগুলি ধর্মের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তাহার একটিও আজ পর্যন্ত বিলুপ্ত হয় নাই।



ইহার প্রথম কারণ হইল এই যে, রাষ্ট্রের ন্যায় ধর্মসমূহের আয়ত্তে ভোগ-কামান-ডিনামাইট বা এটিম বোম নাই, যাহা দ্বারা একে অনোর ধ্বংস সাধন করিতে পারে। ধর্মের হাতে আছে মাত্র দুইটি অস্ত্র — আশীর্বাদ ও অভিশাপ। এতেনে অস্ত্রসমূহ ব্যক্তিবিশেষের উপর ক্রিয়াশীল কিনা, জানি না, কিন্তু কোন সম্ভাব্য বা জাতির উপর একেবারেই আকস্মিক।

উহার দ্বিতীয় কারণ এই যে, প্রত্যেক ধর্মেই তাহার নির্দিষ্ট বিধি-বিধানসমূহের সত্যাসত্যের সমালোচনা একেবারেই বন্ধ। যেমন পাপ ও নরকের ভয়ে ভিতরের সমালোচনা বন্ধ, তেমন বাহ্যিকের (ভিন্নধর্মের লোকদের) সমালোচনা চিরকালই বাতিল। যাক্কেই ধর্ম নির্বিশেষে আপন মনে দিন কাটিইতেছে। কিন্তু এইখানেই কি শেষ? না, বোবারও কর্তব্যশক্তি আছে। মুখে কবলিতে না পারিলেও সে বিশ্বের ঘটনাবলী সম্পর্কে চিন্তা করে, সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। বোবার সেই ভাবসমূহের অভিব্যক্তি ঘটে তাহার কার্যবলীর মধ্য দিয়া।

ধর্মজগতে মানুষের স্বাধীন চিন্তা-ক্ষেত্র নিত্যই অপরিবর্তন। তাই বাঁধ-ভাঙ্গা জলস্রোতের ন্যায় সময় সময় মানুষের কল্পনা ধর্মের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বিধি-নিষেধের গণ্ডির বাহিরে চলিয়া যায়। ধর্মশাস্ত্র যে সকল বিষয় জ্ঞানিতে নিষেধ করিয়াছে, মানুষ তাহাও ভাবে এবং সম্যকর সমাধান না পাওয়ায় দুই একজন আনন্দি লোক ধর্মযাজকদের নিকট গোপনে প্রশ্ন করে, ইহা কেন? উহা কেন? সমস্যা যতই জটিল হইবে না কেন, উদার মানসমান হইত জলের মত সোজা। যাজক জবাব দেন, “ঐসকল গুপ্তত্বসমূহের ভেদ সে (আল্লাহ) ছাড়া কেহই জানে না। ধরিয়া লও ও সকল তারই মহিমা” ইত্যাদি।

ইংরাজীতে একটি কথা আছে যে, জ্ঞানই পূণ্য (Knowledge is virtue)। কিন্তু যে বিষয়ে কোন জ্ঞান জন্মিল না, সে বিষয়ে পূণ্য কোথায়? কোন বিষয় বা ঘটনা না দেখিয়াও বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু একেবারেই না বুঝিয়া বিশ্বাস করে কিরূপে? যাজক যখন দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, না দেখিয়া এমনকি না বুঝিয়াই ঐ সকল বিশ্বাস করিতে হইবে, তখন মনে বিশ্বাস না জন্মিলেও পাপের ভয়ে অথবা জাতীয়তা রক্ষার জন্য মুখে বলা হয়, “আচ্ছা”। বর্তমানকালের অধিকাংশ লোকেরই ধর্ম বিশ্বাস এই জাতীয়।

এই যে জ্ঞানের অগ্রগতিতে বাধা, মনের অদম্য স্পৃহায় আঘাত, আত্মার অতৃপ্তি, ইহারই প্রতিক্রিয়া — মানুষের ধর্ম-বর্মে শেলিল। এক কথায় — মন যাহা চায়, ধর্মের কাছে তাহা পায় না। মানুষের মনের ক্ষুধা অতৃপ্তই থাকিয়া যায়। ক্ষুধার্ত বলদ যেমন রশি ছিড়িয়া অন্যের ক্ষেতের ফসলে রোগপুত্র করে, মানুষের মনও তেমন রোগ ও ক্ষেত্রেবর সীমা অতিক্রম করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ছুটিয়া যায় দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে।

ধর্মের মূল ভিত্তি বিশ্বাস (ঈমান)। ধর্ম এই বিশ্বাসকেই আঁকড়িয়া আছে। কিন্তু এই বিশ্বাস কি বা ইহা উৎপত্তির কারণ কি, ধর্ম তাহা অনুসন্ধান করে না। এই বিশ্বাস যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, নিশ্চয়ই তাহার উত্থান বা কারণ আছে। বিশ্বাস জন্মিবার যে কারণসমূহ বর্তমান আছে, পণ্ডিতেরা তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখাইয়াছেন। বিশ্বাস উৎপত্তির কারণাবলী সূক্ষ্মরূপে আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য আছে, যেনো বিশ্বাসের যে কোন পুস্তকে উহা পাওয়া যাইবে। আমরা শুধু মোটামুটিরূপে উহার সন্ধিৎসা আভাস দিব।

জ্ঞানের সহিত বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক। বহু বলা হইয়া থাকে যে, জ্ঞানমাত্রই বিশ্বাস। তবে যে কোন বিশ্বাস জ্ঞান নহে। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর যে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত, তাহাকেই জ্ঞান বলা হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাই ঐটি বিশ্বাস। পক্ষান্তরে, যে বিশ্বাস কল্পনা, অনুভূতি,

ভাবানুভব বা কামনার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা জ্ঞান নহে। তাহাকে অভিমত (Opinion) বলা হইয়া থাকে। চলতি কথায় ইহার নাম ‘অন্ধ-বিশ্বাস’। সচরাচর লোকে এই অন্ধ-বিশ্বাসকেই ‘বিশ্বাস’ আখ্যা দিয়া থাকে। কিন্তু যাহা ঐটি বিশ্বাস, তাহা সকল সময়েই বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা (Lesson Experience) প্রসূত, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহা প্রত্যক্ষ তাহা সর্বদাই বিশ্বাস্য। মানুষ যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করে, তাহা তাহার চক্ষু, কণ, নাসিকা, জিহ্বা, দ্রব ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই করে এবং যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করে, তাহাই বিশ্বাস করে। আমি স্বচক্ষেই অবদেখিয়াছি, দরকশ্ যাহা শুনিয়াছি, সহস্রতে যাহা স্পর্শ করিয়াছি তাহাতে আমার সমূহের অস্বাভাবিকতা বা যাহা আমাদের প্রতীক্ষিত, তাহাতেই আমাদের অটল বিশ্বাস।

সংসারে এমন বস্তুও আছে, যাহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। অথচ সেই সকল বস্তুকে যে আমরা সন্দেহ করি এমনও নহে। অনেক অপপ্রতীক্ষিত জিনিস আছে, যাহা আমরা অনুমানের ভিত্তিতেই বিশ্বাস করি। এই যে মানুষের ‘প্রাণশক্তি’, যাহার বলে মানুষ উঠা, বসা, চলাফেরা ইত্যাদি সংসারের নানাপ্রকার কাজকর্ম করিতেছে, তাহা কি আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি? করি নাই। কারণ ‘প্রাণ’ মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। প্রাণকে কোনরূপে প্রত্যক্ষ না করিলেও প্রাণের দ্বিত্বকে আমরা বিশ্বাস করি। কারণ প্রাণ যদিও ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে, তবুও ইহার কার্যকলাপ দৈহিক ঘটনারূপে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। ‘কার্য থাকিলে তাহার কারণ থাকিতে বাধা’ — এই দৃঢ়সিদ্ধ যুক্তির বলে আমরা দৈহিক ঘটনাবলীর কারণরূপে প্রাণের অস্তিত্বকে অনুমান করিতেছি এবং বিশ্বাস করিতেছি যে, প্রাণ আছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই দুইটির উপর ঐটি বিশ্বাস বা জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। যে বিশ্বাসের মূলে প্রত্যক্ষ বা অনুমান নাই, অর্থাৎ যে বিশ্বাসের মূলে জ্ঞানের অভাব, তাহা ঐটি বিশ্বাস নহে, অন্ধ বিশ্বাস। বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই কোন বৈজ্ঞানিক ভাবে আমাদের সন্দেহ নাই। বিজ্ঞান যাহা বলে, তাহা আমরা অকুণ্ঠিত চিন্তে বিশ্বাস করি। কিন্তু অধিকাংশ ধর্ম এবং ধর্মের অধিকাংশ তথ্য অন্ধবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। অধিকাংশ ধর্মীয় বিধি-বিধান প্রত্যক্ষ বা অনুমানসমূহ নাই। এই জন্য ধর্মের অনেক কথায় বা ব্যাখ্যায় সন্দেহ থাকিয়া যায়। দ্বিধাহীন চিন্তে ধর্মীয় সকল অনুশাসনের আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। তাই বিজ্ঞানের ন্যায় ধর্মের উপর সকল লোকের অটল বিশ্বাস হয় না। ধর্মকে সন্দেহাতীতরূপে পণ্ডিত ইহলে উহাকে অন্ধবিশ্বাসের উপর রাখিলে চলিবে না, উহা ঐটি বিশ্বাস অর্থাৎ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

আজকাল যেখানে-সেখানে শোনা যাইতেছে যে, সংসারের নানা প্রকার জিনিসপত্র ইহতে ‘বরকত’ উঠিয়া গিয়াছে। কারণ লোকের আর পূর্বের মত ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাস নাই। পূর্বে লোকের ঈমান ছিল, ফলে তাহারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিত। আর আজকাল মানুষের ঈমান নাই, তাই তাহাদের অভাব ঘটেছে। ঈমান নাই বলিয়াই ক্ষেতে আর সারকে ফসল জন্মে না, ফলের গাছে ফল ধরে না, পুকুরে-নদীতে মাছ পড়ে না। ঈমান নাই বলিয়াই মানুষের উপর খোপার গজবরূপে কলেরা, বসন্ত, বন্যা-বাদল, আনাবৃষ্টি ইত্যাদি নানা প্রকার বাল্যমুহিত নাজেল হয়। অথচ মানুষের ঈশ হয় না। এইজন্য যে নানা প্রকার অভাব-অভিযোগের জন্য ঈমানের অভাবকেই দায়ী করা হয়, তাহা কতটুকু সত্য?

শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই জ্ঞান, আর যাহারা জ্ঞানে না তাহারা অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিলেন যে, আমাদের এই সোনার বাংলার চাষীগণ বিধাপ্রতি বার্ষিক যে পরিমাণ ধান্য



জন্মাইতেছে, তাহার প্রায় সাত-আটগুণ পরিমাণ ধান্য জাপানের চাষীরা জন্মাইতেছে। হয়ত অনুসন্ধান করিলে ইহাও জানা যাইতে পারে যে, জাপানের এই চাষীরা অ-মুসলমান, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, কাচের, যাহাদের ধর্মে স্ত্রিম্বরের নামগন্ধও নাই। আমাদের মতে উহারা বে-ঈমান বা অ-বিশ্বাসী। তবুও উহারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগে পূর্বের চেয়ে বেশী ফসল জন্মাইতেছে। আমাদের মতে উহারা বে-ঈমান হইলেও তাহাদের ক্ষেতের ফসল বাড়িয়াছে বৈ কৈম নাই।

কিছদিন পূর্বে রাশিয়া-প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশের জনৈক নামাজামা ডাক্তার সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন যে, পূর্ব বালায় প্রতি বৎসর হাজার হাজার লোক কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি মহামারীর প্রকোপে প্রাণ হারায় — একথা সেদেশের ডাক্তারেরা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। কারণ তাহারা একথা ভাবিতেও পারিতেছিলেন না যে, বর্তমান যুগেও কোন দেশে কলেরা বা বসন্ত ভূগিয়া অগণিত মানুষ প্রাণ হারায়। তবে কি একমাত্র বালায় অধিবাসীদেরই ঈমান নাই? আর একমাত্র ইহাদের উপরই কি খোদার গজব বর্ষিত হয়? রাশিয়ানরা অধিকাংশই সাম্যবাদী (Socialist)। তাঁহারা দেব-দেবী বা আল্লাহ-নবীর ধার ধারেন না। তবু যাবতীয় কাজে তাঁহারা বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রয়োগ করিয়াই সুখে-স্বাস্থ্যশ্লে জীবন যাপন করিতেছেন।

যাহারা ঈমানের অভাবকে নানাবিধ অভাব-অনটনের জন্য দায়ী করেন, তাঁহারা একটু ভাবিলেই দেখিতে পাইতেন যে, ধনী ও গরীবের আয়-ব্যয়ের ধাপগুলি কোন কালেই এক নহে। গরীব চায় শুধু ভাত ও কাপড়। কিন্তু ধনী চায় তৎসঙ্গে বিলাস-বাসন। মানুষ সাধারণত অনুকরণপ্রিয়। তাই ধনীর বিলাসিতা বহুল পরিমাণে টুকিয়াছে গরীবের ঘরে। যাহার পিতার সম্পত্তি ছিল পাঁচ বিঘা জমি এবং পরিবারে ছিল তিনজন লোক, তাহার সংসারের নানা প্রকার খরচ নির্বাহ করিয়া হাতে কিছু উদ্ধৃত থাকিত। আজও সে ঐ জমির আয় দ্বারা তিনজন লোকই প্রতিপালন করে, কিন্তু উদ্ধৃত যাহা থাকিত, তাহা ব্যয় করিতেছে সাবান, সুবাসিতেল, সিঙ্কর চাদর, ছাতা ও জুতা। বিলাস-বাসনে যে অতিরিক্ত খরচ সে করিতেছে, তাহার হিসাব রাখে না, ভাবে ‘বরকত’ গেল কোথায়? একথা সে ভাবিয়া দেখে না যে, অমিতব্যয়িতা এবং বিলাসিতাই তাহার অভাব-অনটনের কারণ। অযথা ঈমানের অভাবকে কারণ বলিয়া দায়ী করে।

প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে যেখানে (অথও ভারতে) জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২৯ কোটি, বৃদ্ধি পাইয়া আজ সেখানে জনসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৬৮ কোটি। এই যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ৩৯ কোটি মানুষ, ইহারা খায় কি? লোকবৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্যবৃদ্ধি না হইলে খাদ্য-খাদকের সমতা থাকিবে কিরূপে? লোকবৃদ্ধি যতই হোক, জমিবৃদ্ধির উপায় নাই। কাজেই অনাবাদী জমি বর্তমানে খাদ্যবৃদ্ধির উপায় নাই। অথচ আমাদের দেশে কয়জন চাষী এ বিষয়ে সচেতন? আজও সরকারী বীজ ভাণ্ডারে ভাল বীজ বিকায় না। এমনিয়া সালফেট ও বোনামিল বস্তা তিড়িয়া পড়িয়া থাকে গুদামের মেঝেয়, রেডির খেল পচিয়া থাকে গুদামে। পল্লী অঞ্চলে ইতস্তত ধোপ-জন্মলের অভাব নাই। বসন্ত বাড়ীর আনাচে-কানাচে জন্মিয়া থাকে ভাইট গাছ আর গুড়ি কচু। বেড়পুকুরে কচুরিপানা ঠাসা। বৃদ্ধি পাইয়াছে শুধু মশা, মাছি, ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত আর ডাক্তার খরচ। এই তো আমাদের অর্শকিত দেশের অবস্থা। বর্তমানে খাদ্যের অভাব ঘটিয়াছে তাহা সত্য। কিন্তু ইহা খাদ্য-খাদকের সমতার অভাবেই ঘটিয়াছে,

‘বে-ঈমান’ বা অবিশ্বাসের জন্য নয়।

ম্যালথুস (Malthus) তাঁহার ‘পপুলেশন’ নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি অনুপাত আছে, যে অনুপাত জাতিগতিক হারে বৃদ্ধি পায়। তবে দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও জনসাধারণের আহার-বিহার এবং রীতি-নীতির তারতম্যে সামান্য ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে।

আমাদের দেশের জন্মহার অত্যধিক। জনসংখ্যা অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে — শিশু, বিধবা ও বৃদ্ধবিশিষ্ট। যে ছেলের ২০ বৎসর বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত, সে ছেলের এ বয়সে ছেলে-মেয়ে জন্মে দুই-তিনটি। আবার তিন বৎসর বয়সে যে মেয়ের বিবাহ হয়, বারো-তেরো বৎসর বয়সে সে হয় মেয়ের মা। কথায় বলে — ‘কচি ফলের বীজ ভাল না’। অপ্রাপ্তবয়স্ক পিতা-মাতার সন্তান উৎপাদনে পিতা-মাতা ও শিশু উভয়ই হয় কুজো, হীপানি ও প্রবাহিকার বশত ক্রিষ্ট হইলে চুল পাকে, পয়ত্রিশ দাঁত নড়ে, চল্লিশে হয় কুজো, হীপানি ও প্রবাহিকার বশতশেই ভবলীলা সাদ করে। এমতাবস্থায় বিধবা স্ত্রীর উপায় কি? কোন ছেলের ব্যথার ব্যায়াম, কোন ছেলের জীর্ণকৃত্র, ছোট মেয়েটি কোলে লয়ে ধারে ধারে ভিক্ষা। এইরূপ স্বাস্থ্যহীন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দেশের অভাব সৈনন্দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। আর ইহার সাথে অশিক্ষা, কুমিক্ষা, অলসতা ও কুসংস্কার প্রভৃতি তো আছেই। সুখের বিষয় এই যে, সরকারী নির্দেশে শিশু-বিবাহ বর্তমানে কমিয়াছে।

বহুবিবাহের প্রতিক্রিয়াও সমাজজীবনে কম নহে। ইহা শুধু বংশবিস্তার করিয়াই ফলপ্রসূত থাকে না। ইহার ফলে নানা প্রকার পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি হয়। বৈমায়েয় সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধির ফলে উহারে মধ্যে কয়েকজের অংশ লইয়া মনোমালিন্য, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, অবশেষে মারামারি-মোকদ্দমা ও উকিল-মোক্তার, আমলা-পেশকার ইত্যাদির হয় আয় বৃদ্ধি।

জন্মবৃদ্ধির সাথে সাথে মৃত্যু অধারিত। মৃত্যুতেও নিস্তার নাই, ইহাতেও খরচ আছে। প্রথমত জনাজা, কাফন ইত্যাদির খরচ তো আছেই, তদুপরি মেরাগে গোর-আজাব হইতে রক্ষা করিতে, পোলছিতাতে পার করিতে, বেহেস্ত সহজলভ্য করিতে — প্রতি বৎসর রমজান মাসে মৌলদ শরীফ, কোরান শরীফ খতম ইত্যাদি না-ই হোক, অন্তত পক্ষে কয়েকজন মোল্লা-মৌলবী ডাকিয়া তশবিহ পড়িয়া কিছুটা ডাল-চাল খরচ না করিলেই চলে না। মানুষের অভাববৃদ্ধির কারণবলীর প্রতি চক্ষু মুদ্রিয়া থাকিয়া উগ্রবিধিগামী ঈমানের অভাবকেই অভাব-অনটনের কারণ বলিয়া সাব্যস্ত করিতেছে।

‘এখন আর মানুষের মনে পূর্বের ন্যায় ঈমান নাই’ — একথা বলিয়া যাহারা রোদন করেন, তাঁহারা একটু ভাবিয়া দেখিতে পারেন যে, বিশ্বাস গেল কোথায়? বিজ্ঞানমতে — পদার্থের ধ্বংস নাই, আছে শুধু পরিবর্তন। দেখা যায়, তদুপ মানবমনের বিশ্বাসেরও লয় নাই, আছে শুধু পরিবর্তন। পূর্বে লোকে নানা প্রকার উপকথা, রূপকথায় বিশ্বাস করিত। কিন্তু এখন আর তাহা করে না। নানা প্রকার ভূতের গল্প, জীন-পীরি কাহিনী, নানা প্রকার তন্ত্র-মন্ত্রে অধিকাংশ শিক্ষিত লোকেই আজকাল আর বিশ্বাস করেন না। তবে যে উহা সমাজে একেবারেই অচল, তাহা নহে। ‘রূপকথা’ লোকে রূপকথা বলিয়াই গ্রহণ করিতেছে, ‘সত্য’ বলিয়া মনে করিতেছে না। এক সময়ে উপন্যাসকে লোকে ইতিহাস মনে করিত। কিন্তু এখন আর তাহা করে না, ম্যাজিকে আর অশ্রব্ধ খেলাগুলি সকলেই আগ্রহের সহিত দেখে, কিন্তু তাহা সত্য বলিয়া কেহ বিশ্বাস করে না। তাই বলিয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিশ্বাস মুছিয়া যায় নাই। যেমন



কতক বিষয় হইতে বিশ্বাস উঠিয়া গিয়াছে, তেমন কতক বিষয়ে বিশ্বাস জন্মাইয়াছে, বিশ্বাসযোগ্য 'বস্তু' বা 'বিষয়'-এর পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র।

বলা হয় যে, আল্লাহতা'লা'র অসাধ্য কোন কাজ নাই। বিশেষ বিশ্বাসী ভক্তদের অনুরোধে তিনি অসম্ভবকেও সম্ভব করেন। হযরত সোলায়মান নবী নাকি সিংহাসনে বসিয়া সপরিষদ শুনেন ভ্রমণ করিতেন। তাই বলিয়া — "আল্লাহতা'লা' ইচ্ছা করিলে জায়নামাজগুদ্ধ আমাকেও নিমেষের মধ্যে মক্কায় পৌছাইতে পারেন — এইরূপ বিশ্বাস কোন কোন পীর ছাহেবের আছে কি? থাকিলে একবারও তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন কি? না দেখিয়াই বা উড়োজাহাজে চড়িবার কারণ কি? উড়োজাহাজে চড়িবার বিপদ আছে, ভাড়া আছে, আর সময়ও লাগে যথেষ্ট। তবুও উহার উপর জন্মিয়াছে বিশ্বাস।

অতীতে কোন কোন বোজগর্জন হাট্টিয়াই নদী পার হইতে পারিতেন। যাহেত তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, নদী পার করাইবেন আল্লাহতা'লা, নৌকা বা জলযানের প্রয়োজন নাই। আর বর্তমানে খোদার উপর বিশ্বাস নাই, নদী পার হইতে সাহায্য লইতে হয় নৌকার।

সূর্যগণ নাকি ধানমগ্ন অবস্থায় পৃথিবীর কোথায় কি ঘটিতেছে, তাহা জানিতে ও দেখিতে পাইতেন। এখন কয়টি লোকে উহা বিশ্বাস করে? বর্তমানে বিশ্বাস জন্মিয়াছে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও এবং টেলিভিশনে।

শাহ ছাহেবদের 'কালাম'-এর তাবিজে কুমি পড়ে না, কুমি পড়ে স্যাটোনাইন সেবানে। মানত-শিমিতে জুর ফেরে না, জুর ফেরাইতে সেবন করিতে হয় কুইনাইন। লোক বিশ্বাস করিবে কোনটি? নানাবিধ রোগারোগের জন্য পীরের দরগাহ হইতে হাসপাতালকেই লোকে বিশ্বাস করে বেশী। গর্ভিনীর সন্তান প্রসব যখন অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে, তখন পানিপড়ার চেয়ে লোকে বেশী ক্লিনিকের (Baby Clinic) উপর ভরসা রাখে বেশী।

আজ মহাসমুদ্রের বুকে লোক বাতায়ত করে কোন্ বিশ্বাস? সমুদ্রের গভীর জলের নীচে লোকে সাবমেরিন চালায় কোন্ বিশ্বাস? মহাকাশ পাড়ি দেয় লোকে কোন্ বিশ্বাস? যন্ত্রে বিশ্বাস আছে বলিয়াই মানুষ যন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করিতেছে। স্বাণ্ডে বিশ্বাস আছে বলিয়াই লোকে কলেরা বসন্তের সময় সোয়া-কালামের পরিবর্তে ইনজেকশন ও টিকা লইতেছে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, বিশ্বাস ধরাপৃষ্ঠ হইতে অবলুপ্ত হয় নাই, শুধু বিশ্বাসযোগ্য বিষয়-বস্তু পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই বুদ্ধিতে পারিবেন যে, যেখানে যে বিষয়ে মানুষের জ্ঞান জমিতেছে, সেইখানেই বিশ্বাস (বিশ্বাস) দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে; আর যেখানে যে বিষয়ে জ্ঞান জন্মে নাই, জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে বিষয় হইতে ভ্রমশ বিশ্বাস লোপ পাইতেছে। অর্থাৎ সন্দেহ জাগিতেছে যে কোথার বা যে বিষয়ের প্রত্যক বা পরোক্ষ কোন প্রমাণ নাই, যে বিষয়ের কার্য-কারণ সম্পর্ক নাই বা যাহা বিবেকবিরোধী, বর্তমানে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই সে সকল ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না।

ধর্মজগতে এমন কতগুলি বিধি-নিষেধ, আচার-অনুষ্ঠান ও ঘটাবলীর বিবরণ পাওয়া যায়, যাহার যুক্তিযুক্ত কোন ব্যাখ্যা সাধারণের বোধগম্য নহে। তাই সত্যই মনে কতগুলি প্রশ্ন উদয় হয় এবং সেই প্রশ্নগুলির সমাধানের অভাবে ধর্মের বিধি-বিধানের উপর লোকের 'শেখিয়া ঘটা' ধর্মযাজকদের অধিকাংশের নিকটই সেই সকল প্রশ্নাবলীর সদুত্তর পাওয়া যায় না। অনেক সময় উত্তর দেওয়া দূরে থাক, শুধু প্রশ্ন করার জন্য উল্টা কাফেরী ফতুয়া দিতেও তাহাদের দেরী হয়।

না। অথচ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি তাহাদের মতামতানুযায়ী পালন না করিলে তাহার উপর তাহারা সাধামত দল বাধিয়া অত্যাচার করিতেও ইতস্তত করেন না। ধর্মের নাম করিয়া ধর্মবিরোধীকাজ করিতেও উহাদের বাধে না। পবিত্র কোরান যে বলটিতেছে — "লা ইকরাহা ফীদ্দিন" অর্থাৎ ধর্মে জবরদস্তি নাই — সেদিকে উহারা নুকেপ করেন না। অধিকন্তু সরকারী আইন বাচিয়া যতদূর ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায়, তাহা করিতেও ক্রটি করেন না। উপরন্তু রাজশক্তিকে হস্তগত করিয়া ধর্মের নামে অধর্মকে চালাইবার আকাশ-কুসুমও উহারা রচনা করিতেছে।

## রাবণের প্রতিভা

রামায়ণ মহাকাব্যের নায়ক রামচন্দ্র রাজপুত্র, ধর্মপরায়ণ, দীর্ঘ, দীর্ঘ, সুসভা, দুঃখ, জ্ঞানী, গুণী ইত্যাদি শত শত গুণাবলি বিশেষণে ভূষিত। পক্ষান্তরে রাবণ — বিকলাঙ্গ (দশমুণ্ড), বৈরাচারী, অসভা, রাক্ষস, কানুক ইত্যাদি শত শত দোষাবলি বিশেষণে দুষ্ট। কিন্তু বাস্তবিকি কি তাই? হয়তো আর্থ-ঋষি বাসীকি — আর্থপ্রীতি ও অন্যায়বিরোধবশত শ্রীরামকে প্রীণ্ড ও রাবণকে হীনপ্রভ করার মানস একের প্রোত্খল ও অন্যের মিসময় চিত্র অংকিত করেছেন নিপুণ হস্তে রামায়ণের পাতায়। কিন্তু তাঁর তুলির আঁচড়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রকাশ পাচ্ছে রাবণের কৌশলিনা, শৌর্য-বীর্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আসল কান্ডির ছিটোফাঁটা; যার উজ্জ্বল রামচন্দ্রের উজ্জলতার চেয়ে বহুগুণ বেশী।

রামচন্দ্র ছিলেন ক্ষত্রকুলোদ্ভব, চার বর্ষের দ্বিতীয় বর্ষের মানুষ। সেকালের ক্ষত্রিয়রা ছিলো বংশগত যোদ্ধা, অর্থাৎ নরযাতক। আর রাবণ ছিলেন ব্রাহ্মণ বংশীয়। একথাটা শুনে রামভক্ত হিন্দু ভাইয়েরা হয়তো আঁতকে উঠতে পারেন। "ব্রাহ্মণ"-এর সাধারণ সংজ্ঞা হলো — ব্রহ্মাংশে জন্ম যার, অথবা বেদ জানে যে, কিংবা বেদ অধ্যয়ন করে যে, নতুবা ব্রহ্মের উপাসনা করে যে — সেই ব্রাহ্মণ। ঋষিগণ সর্বত্রই উক্ত গুণের অধিকারী। তাই ঋষি মাইয়ে ব্রাহ্মণ। রাবণের দাদা পুষ্পতা ছিলেন ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং স্বনামধন্য ঋষি। কাজেই তিনি ছিলেন বংশে ও গুণে উন্নত ব্রাহ্মণ। পুষ্পতা ঋষির পুত্র অর্থাৎ রাবণের পিতা বিশ্রবাও ছিলেন একজন বিশিষ্ট ঋষি। কাজেই তিনিও ছিলেন বংশগত ও গুণগত ব্রাহ্মণ। তাই ব্রাহ্মণ ঋষি বিশ্রবার পুত্র রাবণ গুণগত না হলেও কুলগত ব্রাহ্মণ ছিলেন নিশ্চয়ই। এতদ্বিধি নিম্নলিখিত আলোচনাসমূহে রাম ও রাবণের বাস্তবিক ও প্রতিভার তুলনামূলক কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাবে।

১. রাবণের রাজমহলকে (কখনো লঙ্কাকেও) বলা হয়েছে 'স্বর্ণপুত্রী'। এতে রাবণের প্রশ্রয়, শিল্প-নিপুণতা, সৌন্দর্যপ্রাপ্ততা, রুচিবোধ ইত্যাদি বহু গুণের পরিচয় মেলে। কিন্তু রামচন্দ্রের বাড়িতে এমন কিছুই উল্লেখ দেখা যায় না, যার দ্বারা তাঁর গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।



২. লক্ষ্যায় সীতাদেবী রক্ষিতা হয়েছিলেন রাবণের তৈরী অশোক কাননে। তা ছিলো রাবণের প্রামোদ উদ্যান, যেমন আধুনিক কালের ইডেন গার্ডেন। সে বাগানটিতে প্রবেশ করলে কারো শোক তাপ থাকতো না। তাই তার নাম ছিলো অশোক কানন। সে বাগানটির দ্বারা রাবণের সুকৃতি ও সৌন্দর্যপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকন্তু তিনি যে একজন উদ্ভিদবিদ্যা বিশারদ ছিলেন তা-ও জানা যায়। আর তার প্রমাণ মেলে একালের সুপ্রসিদ্ধ বন্যার বচনে। খনা বলেছেন —

“ডেকে কয় রাবণ,

কলা-কটু না লাগাও শ্রাবণ।”

শত শত জাতের ফল-ফুল ও লতাগুল্মের বৃক্ষরাজির একস্থানে সমাবেশ ঘটিয়ে তা লালন-পালন ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে রাখা চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু জানা যায় না রামচন্দ্রের বাড়িতে কোনো ফল-ফলের গাছ আসে ছিলো কি-না।

৩. রামচন্দ্র লক্ষ্যায় গিয়েছিলেন কপিগুলের (বানরের ) সাহায্যে মাটি-পাথর কেটে বাঁধ নির্মাণ করে, দীর্ঘ সময়ের চেষ্টায়। কিন্তু লক্ষ্য থেকে ভারতের দণ্ডকারণ্য তথা পঞ্চবতী বনে রাবণ যাতায়াত করেছিলেন ‘পুষ্পক’ নামক বিমানে আরোহণ করে অতি অল্প সময়ে। রাবণ যে একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বা বৈমানিক এবং কারিগরিবিদ্যা-বিশারদ ছিলেন, তা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। এ ক্ষেত্রে রাবণের সঙ্গে শ্রীহামসে তুলনাই হয় না।

৪. রামচন্দ্র যুদ্ধ করেছেন সেই মাক্তাতার আমলের তীর-ধনুক নিয়ে। আর রাবণ আবিষ্কার করেছিলেন এক অভিনব যুদ্ধাস্ত্র, যার নাম ‘শক্তিশেল’। তা শক্তিতে ছিলো যেমন বন্দুকের যুগের ডিনামাইট। নিঃসন্দেহে এতে রাবণের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় মেলে।

৫. রামচন্দ্রের নিকিপু শরযাঘাতে রাবণের মূর্খ্য সময়ে তার কাছে গিয়ে রামচন্দ্র রাজনীতি সম্বন্ধে তার উপদেশপ্রার্থী হয়েছিলেন এবং মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও তিনি রামচন্দ্রের সে প্রার্থনা পূর্ণ করেছিলেন ধীর ও শান্তভাবে, সরল মনে। এতে প্রমাণিত হয় যে, রাবণ সে যুগের একজন রাজনীতি-বিশারদ ছিলেন। অধিকন্তু ছিলেন ধৈর্য, সহন ও ক্ষমাশীল এবং প্রতিহিংসাবিমুখ এক মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

৬. রামায়ণ মহাকাব্যে রাবণকে বলা হয়েছে ‘দশানন’। কিন্তু বাস্তবে রাবণের দশটি মুণ্ড নিশ্চয়ই ছিলো না। তবে তার মাথার মজ্জা ভাঙেই জ্ঞান ছিলো দশটা মুণ্ডের সমান। তা-ই রূপকে বিদ্রুপে অংকিত হয়েছে ‘রাবণ দশমুণ্ড’ রূপে।

৭. রাক্ষস বানরখান্দক বলা হয়েছে রাবণকে। উপরোক্ত আলোচনাসমূহের পরে এ বীভৎস বিশেষণটি সম্বন্ধে আর কিছু সমালোচনা আবশ্যক আছে বলে মনে হয় না। তবুও প্রিয় পাঠকবৃন্দের কাছে একটি প্রশ্ন না রেখে পারছি না। রাবণের দশা হচ্ছেন পলস্তা, পিতা বিশ্রবা, ভাতা কুন্তকর্ণ ও বিভীষণ, বৈমায়েয় ভাতা কুবের এবং পুত্র ইন্দ্রজিৎ ( প্রসিদ্ধ বৈমানিক); এঁরা সকলেই ছিলেন সভ্য, ভব্য, সুশিক্ষিত, গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি। এঁরা কেউই ‘রাক্ষস’ বা কাঁচামাংসভোজী মানুষ ছিলেন না। রাবণও তাঁর শৈশবকালাবধি মাতা-পিতার রাক্ষস কল্যাণার্থেই খেয়েছেন নিশ্চয়। অতঃপর যৌবনে হঠাৎ করে একদিন তিনি খেতে শুক করলেন জীবের কাঁচা-মাংস। বিমান বিহার, শক্তিশেল নির্মাণ ও অশোক কানন তৈরী করতে জানলেও তিনি রান্নার পাকপাত্র গড়তে বা রান্না করতে জানেন নি। বেশ ভাল। কিন্তু তিনি

কোথায় বসে, কোন দিন, কাকে খেয়েছেন — তার একটিরও নামোল্লেখ নাই কেন?

৮. রাবণের সন্তানাদি সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে —

“একলক পুত্র আর সোয়ালক নাতি,  
একজন না থাকিল বংশে দিতে বাতি।”

আর অপর একটি প্রবাদ আছে —

“যাহা কিছু রটে  
তার কিছু বাটে।”

প্রবাদবাক্যের লক্ষ পুত্র না হোক তার শতাংশ সত্য হলেও রাবণের পুত্র সংখ্যা হয় এক হাজার এবং তার অর্ধাংশ সত্য হলেও সে সংখ্যাটিও হয় পাঁচশ’। আর তা-তো বিমানের কিছু নয়। জন্মাক্ত ধৃতরাষ্ট্রও ছিলেন একশ’ এক পুত্রের জন্মক। আর রাম? তার পুত্রের সংখ্যা কথিত হয় মাত্র দুটি, বলা চলে একটি। কেননা তারা ছিল সীতার এক গর্ভজাত, যমজ সন্তান। তদুপরিসে সে পুত্রদ্বয় জন্মেছিলো নাকি রামচন্দ্রের বিবাহের ত্রেদশ বছর পর, বাস্তব ১২ + ১৪ = ২৬ বছর পর। ছহরের এ হিসেবটা প্রিয় পাঠকদের কাছে একটু বৈমানিক বোধ হতে পারে। তাই বহরঙলার একটা হিসাব দিচ্ছি। বিবাহান্তে রামচন্দ্র গৃহবাসী ছিলেন ১২ বছর, বনবাসী ১৪ বছর এবং গৃহে প্রত্যাবর্তন করে রাজ্যসনে কাটান নাকি ২৭ বছর (এ ২৭ বছর উদ্দেশ্যমূলক, প্রাথমিক)। এর পর ‘কল্যাণিক’ বলে প্রাথমিক অন্তঃসত্তা সীতাদেবীকে নিবাসিত করা হয় বাম্মীকির তপোবনে, সেখানে জন্মে সীতার যুগল সন্তান কুশ ও লব।

সীতাদেবী বহু ছিলেন না এবং উক্ত ত্রেদশ বছরের মধ্যে বনবাসকালে দশ মাস (অশোক কাননে রাবণের হাতে সীতা বন্দিরাই ছিলেন ১০ মাস) ছাড়া বাহ্যম বছর দু’মাস সীতা ছিলেন রামচন্দ্রের সখ্যায়িনি। তথাপি এ দীর্ঘকাল রতিবিরতি রামচন্দ্রের বীর্ঘহীনতারই পরিচয়, নয় কি?

৯. রামচন্দ্রের কাহিনীকারের মতে চোদ্দ বছর বনবাসান্তে রামচন্দ্র দেশে প্রত্যাবর্তন করে নির্বিঘ্নে সংসারধর্ম তথা রাজ্যাশাসন করেছিলেন দীর্ঘ ২৭ বছর। অতঃপর প্রজাবিশ্লেষ দেখা দিয়েছিলো। কেননা লক্ষ্যর অশোক কাননে বন্দিরাই থাকাকালে রাবণ সীতাদেবীর সতীত্ব নষ্ট করেছিলেন এবং অসতী সীতাকে গৃহে স্থান দেওয়ায় প্রজাগণ ছিলো অসন্তুষ্ট।

উপরোক্ত বিবরণটি শুনে হতঃহীনে প্রশ্নের উদয় হয় যে, মরার দু’যুগের পরে কামা কেন? বনবাসান্তে রামচন্দ্র স্ববাসে প্রত্যাবর্তন করলে তার বনবাসের বিবরণ তথা লক্ষ্যগণ্ডা দেবায়ন ছড়িয়ে পড়েছিলো তার দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই এবং সীতাকলঙ্কের কানাকানিও চলছিলো দেশময় তখন থেকেই। আর ওজবের ভিত্তিতে সীতাদেবীকে নিবাসিত করতে হলে তা করা তখনই ছিলো সম্ভব। দীর্ঘ ২৭ বছর পর কেন?

রামচন্দ্র সীতাদেবীকে গৃহত্যাগী করিয়েছিলেন শুধু জনগণের মনোরঞ্জনই জন্য, স্বয়ং তাঁকে নাকি ‘নিদ্রলক্ষ্য’ বলেই জানতেন। এইরূপ পরের কথায় নিদ্রলক্ষ্য স্ত্রী ত্যাগ করার নজির জগতে আছে কি? এই তো সেদিন (১৯৩৬) গ্রেট ব্রিটেনের সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ড মিসেস সিম্পসনকে স্বেচ্ছামণি করতে চাইলে তাকে বাধ সাধলো দেশের জগদগণ তথা প্যারামেন্ট মিসেস সিম্পসন ইনবংশজাতী বলে। প্যারামেন্ট এডোয়ার্ডকে জানালো যে, হয় মিসেস সিম্পসনকে ত্যাগ করতে হবে, নাহে তাকে ত্যাগ করতে হবে সিংহাসন।



সিংহাসন ত্যাগ করলেন, কিন্তু তাঁর প্রেসীকে ত্যাগ করলেন না। শুধু তা-ই নয়, তাঁর মেঞ্চ ভাই ডিউক-অব-ইয়র্ককে সিংহাসন দিয়ে তিনি সক্রীক রাজা ছেড়ে চলে গেলেন বিদেশে। রামচন্দ্রেরও তো মেঞ্চ ভাই ছিলে!

সীতাদেবীর সতীত্ব রক্ষার জন্য রামায়ণের কাহিনীকার চেষ্টার কোনো ক্রটি করেননি। যেখানে তিনি লৌকিক অবলম্বন খুঁজে পাননি, সেখানে অলৌকিকের আশ্রয় নিয়েছেন। দু' একটি উদাহরণ দিচ্ছি —

ক. রাবণের অশোক বনে সীতার সতীত্ব রক্ষার কোনো অবলম্বন তিনি খুঁজে পাননি। তাই সেখানে বলেছেন যে, জোরপূর্ব্বক কোনো রাণীর সতীত্ব বধ করলে রাবণের মৃত্যু হবে, এই বলে কোনো স্বয়ী তাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। কাজেই মৃত্যুভয়ে রাবণ সীতাকে স্পর্শ করেননি। সুতরাং সেখানে সীতার সতীত্ব বেঁচে আছে।

সীতাকে নিয়ে রামচন্দ্র অযোধ্যায় পৌঁছলে সেখানে যখন সীতাকলঙ্কের ঝড় বইছিলো, তখন বলেছেন যে, সীতাদেবীকে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে তাঁর সতীত্বের পরীক্ষা করা হয়েছিলো, তাতে তাঁর কেশাগ্রও দগ্ধ হয়নি। সুতরাং সীতার সতীত্ব বেঁচে আছে।

খ. বনবাসের বাণীকির তপোবনে কানিয়ে শ্রীরামের অশ্রমে যাত্রা কুশ-লবসব বাণীকির সঙ্গে সীতাদেবীর রামপুরীতে উপস্থিত হলে পুনঃ যখন তিনি লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করতে থাকেন, তখন কবি বলেছেন যে, সীতাদেবীর অনুরোধে ধরণী দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিলো এবং সীতাদেবী সে গর্তমধ্যে প্রবেশ করে স্বর্গে বা পাতালে গিয়েছেন ইত্যাদি।

উপরোক্ত ঘটনাগুলো হয়তো একপাশে ঘটে থাকতে পারে। যথা —

ক. সীতাদেবীকে নিয়ে রামচন্দ্র অযোধ্যায় পৌঁছলে লক্ষ্মাণও প্রকাশ হওয়ায় সেখানে তখন সীতাকলঙ্কের ঝড় বইছিলো নিশ্চয়ই। হয়তো সীতার কাঁরারোক্ত অদায়ের জন্য প্রথমত জেরা-জবানবন্দি, কটুটি, ধমকানি-শাসনি ও পরে মারপিট ইত্যাদি শারীরিক নির্যাতন চালানো হাছিলো তাঁর প্রতি। কিন্তু তিনি নীরবে সহ্য করেছিলেন সেসব নির্যাতন, ফাঁস করেননি কভু আসল কথা। আর সেটাই হচ্ছে সীতার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া।

খ. শ্রীরামের রাজপ্রাসাদে সীতা প্রসঙ্গে অগ্নেবর থাথমে ভাব বিরাজ করছিলো কিছুদিন (২৭-২৮ দিন বা এক রাজ্যমাস যাকে বলা হয় ২৭ বছর)। পরে সীতাদেবীর মাসিক পরিক্রমায় রামচন্দ্র যখন আসল খবর পেয়েছিলেন, তখনই তিনি অন্তঃসত্ত্বা সীতাদেবীকে নিবাসিতা করেছিলেন বাণীকির তপোবনে এবং সেখানে জমেছিলেন তাঁর যুগল সন্তান কুশ-লব।

সন্তান কামনা করে না, এমন কোনো লোক বা জীব জগতে নেই। কামো সন্তান না থাকলে তার দুঃখের অবধি থাকে না; বিশেষত ধনিক পরিবারে। আর রাজ্যেশ্বর রামচন্দ্রের দৈবাহিক জীবনের দীর্ঘ ২৬ বছর পরে আসন্ন সন্তান পরিত্যাগ করলেন শুধু কি প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য? নিশ্চয়ই তা নয়। তিনি জানতেন যে, সীতার গর্ভস্থ সন্তান তাঁর ঔরসজাত নয়, ঔরসজাত রাবণের। আর সন্তান করারেই সীতার গর্ভজাত সন্তানের প্রতি তাঁর কোনো মায়ামমতা ছিলো না, বরং ছিলো যুগ ও অবজ্ঞা। তাই তিনি সীতা-সুত্রে কোনো খোঁজবাব নেননি বনবাসের সাবত। বিশেষত স্বয়ী বাণীকির আশ্রম অযোধ্যা থেকে বেশি দূরেও ছিলো না, সে আশ্রম তিনি নিতেলেন।

অতঃপর সীতাসহ কুশ-লব বিনা নিমন্ত্রণে (বাণীকির নিমন্ত্রণ ছিলো) স্বয়ী বাণীকির

সঙ্গে শ্রীরামের অশ্রমে যাত্রা উপস্থিত হয়ে যেদিন রামায়ণ কীর্তন করে, সেদিন কুশ-লবের মনোরম কান্টি ও স্বরে-সুরে মুগ্ধ হয়ে রামচন্দ্র তাদের 'দত্তক'রূপে গ্রহণ করেন। হয়তো তখন তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, ঘটনাক্রমে ফেলনা হলেও ছেলে দুটো (কুশ-লব) রাজপুত্র তো বটে।

কুশ-লবকে গ্রহণ করলেও সীতাকে গ্রহণ করেননি রামচন্দ্র সেদিনও। সীতাদেবী হয়তো আশা করেছিলেন যে, বনবাসেরও পূর্ববত্ৰ-সহ রাজপুরীতে এসে এবার তিনি সমাদর পাবেন। কিন্তু তা তিনি পান নি, বিকল্পে নিয়েছিলেন যতো অসাদর-অবজ্ঞা। তাই তিনি ক্ষেভে-দুঃখে হয়তো আত্মহত্যা করেছিলেন। নারীহত্যা অপবাদের লুকানোর উদ্দেশ্যে এবং ঘটনাক্রমে বহির্ প্রকাশ পাবার ভয়ে শশানে দাহ করা হয়নি সীতার শবদেহটি, হয়তো লুকিয়ে প্রোথিত করা হয়েছিল মাটির গর্তে, পূর্বীর মধ্যেই। আর তা-ই প্রচারিত হয়েছে 'রেচ্ছায় সীতাদেবীর ভূগর্ভে প্রবেশ' বলে।

সে যা হোক, অযোধ্যেশ্বর রাম ও লক্ষ্মণের রাবণের সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, রাবণ ছিলেন শত শত সন্তানের জনক, আর রামের ছিলো না একটিও পুত্র। তিনি ছিলেন বদ্বা (অটিকুড়া)।

লক্ষ্মণের রাবণের যাবতীয় গুণগরিমা ও সৌরভ-গৌরব গুপ্ত রাধার হীন প্রচেষ্টার মুখা কাণে — তিনি আধ্যাত্মবাদী ছিলেন না, ছিলেন জড়বাদী বিজ্ঞানী। বিশেষত তিনি আর্ঘদলের লোক ছিলেন না, ছিলেন অনাঘদলের লোক। এরূপ 'অনুমান' করা হয়তো অসঙ্গত নয়।

আর একটি কথা। শুধুমাত্র রাম ও রাবণকে নিয়ে রামায়ণ হতে পারে না, হনুমানকে বাদ দিয়ে। তাই এখন হনুমান প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করছি।

স্বয়ী বাণীকি ছিলেন প্রসঙ্গও রামভক্ত। কৃতিবাসী রামায়ণে তার কবিগুণ আভাস পাওয়া যায়। কৃতিবাসী রামায়ণে কথিত হয়েছে যে, বাণীকি যৌবনে রত্নাকর নামে একজন দম্পা ছিলেন। পরে নারদের উপদেশে দম্পাবৃত্তি ত্যাগ করে ছাড়া ছাড়ার অধর একছানো উপবিত্ত থেকে রামনাম জপ করেন। সেই সময় তাঁর সর্বশরীর বশীক্রে সমাচ্ছন্ন হয়। পরে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে বশীক থেকে উদ্ধৃত হওয়ায় তিনি বাণীকি নামে খ্যাত হন।

মিনি আহার-নিদ্রা ও চলাফেরা পরিত্যাগ করে ছয় হাজার বছর বা ছয় বছরও রামনাম জপ করতে পারেন, রামের শৌর্য, বীর্য, গুণ-গরিমা ও উজ্জ্বল বুদ্ধির জন্য তিনি কি না করতে পারেন? শ্রীরামের প্রাধান্য রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি গুণী, জ্ঞানী ও সুভাষা রণশকে রাক্ষস বানিয়েছিলেন, ভাগ্যস পণ্ড মাননি না। রামায়ণ মহাকাব্যের ব্যাপকরে এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে হনুমান, জাম্ববান, সুগ্রীব ও তার ভ্রাতা বালীরাজ। রামায়ণের কাহিনীকার তাদের সঙ্গে অঙ্কিত করেছেন পণ্ডরূপে। বিশেষত হনুমান, সুগ্রীব ও বালীরাজকে সঙ্গে বানর বানিয়েছেন এবং জাম্ববানকে বানিয়েছেন ভালুক। কিন্তু তারা কি আসলেই পণ্ড ছিলো?

সে যুগে স্বর্ণগণত দেবতাদের কেউ কেউ মর্ত্যবাসী কোনো কোনো মানবীর সাথে যৌনফলে লিপ্ত হতেন এবং তৎফলে কোনো সন্তানের জন্ম হলে সে 'দেবতা' হতো না বটে, কিন্তু সাধারণ মানুষও হতো না, হতো অসাধারণ মানুষ। যেমন — সূর্যদেবের ঔরসে কুমারী কুন্তির গর্ভে জন্ম নেন কর্ণ। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত যোদ্ধা ও দাতা। দেবতা যমের ঔরসে পাণ্ডুপুত্রী কুন্তির গর্ভে জন্মলাভ করেন যুধিষ্ঠির। তিনি ছিলেন ধার্মিক চূড়ামনি, যার ফলে তাঁর নাম হয়েছিল ধর্মরাজ। ইন্দ্রদেবের ঔরসে কুন্তির ক্ষেত্রে জন্ম নেন অর্জুন। তিনি ছিলেন

সে যুগের ভারতবিখ্যাত যোদ্ধা ইত্যাদি। কিন্তু কোনো দেবতা কখনো কোনো পশুর সাথে যৌনানুরাগে লিপ্ত হইছেন এবং তাতে কোনো পশুরাণী সন্তান জন্ম দিয়াছেন, এমন কাহিনী কোথাও কোনো পুঁথিগ্রন্থে দেখা যায় না। পৌরাণিক মতে এখানে হনুমানের কিষ্কিৎ পরিচয় দিচ্ছি। এতে দেখা যাবে যে, হনুমানরা সবাই ছিলো মানুষ। এবং ওদের আভিজাত্যও রামের চোরে বহুগুণ বেশি।

প্রথমত হনুমান — পবনদেবের ওরসে মানবী অঞ্জনার গর্ভে এর জন্ম। কাজেই হনুমান দেব-মানবের বংশজাত একজন বীর্যবন্ত মানব।

দ্বিতীয়ত জাম্ববান — এ হচ্ছে দেবতা ব্রহ্মার পুত্র। জাম্ববানের কন্যার নাম জাম্ববতী এবং তাকে বিয়ে করেন হিন্দুদের পরম পূজনীয় শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং জাম্ববান হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের শ্বশুর। কাজেই সে ভালুক বা পশু হতে পারে না, সে ব্রহ্ম বংশের মানুষ; সুতরাং ব্রাহ্মণ।

তৃতীয়ত বালী ও সূগ্রীব — দেবরাজ হিম্মের (মতান্তরে সূর্যের) ওরসে ও ব্রহ্মার মানসকন্যা রম্বরজার গর্ভে/ বালী ও সূগ্রীবের জন্ম হয়। সুতরাং বালী ও সূগ্রীব হচ্ছে হিম্মের বা সূর্যের পুত্র এবং ব্রহ্মার দৌহিত্র (নাতি)। বিশেষত ব্রহ্মার বংশজাত বলে তারা ব্রাহ্মণদের দাঁড়ান।

উপরোক্ত আলোচনাসমূহের দ্বারা অনুমান হয় যে, রামায়ণে বানররা পশু ছিলো না, তারা ছিলো ভারতের 'কিস্কিন্দা' নামক অঞ্চলের আদিম অধিবাসী এবং আলোচা ব্যক্তিরা ছিলো সেকালের বিশিষ্ট ব্যক্তি। কেননা রামায়ণ মহাকাব্যে অজন্ত বানরের আভাস থাকলেও প্রাধান্য পেয়েছে এরাই।

এ প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী মর্গানের মতবাদ অনুধাবনযোগ্য। মর্গানের মতে — বেঁচে থাকার তাগিদেই মানুষকে জোট বাঁধতে হয়েছে। জোট মানে দল। কিন্তু কোন্ সম্পর্কের ভিত্তিতে দল বাঁধবে? মর্গানের গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে যে, সে সময় মানুষ দল বেঁধেছিলো জ্ঞাতি সম্পর্কের ভিত্তিতে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জাতি, একই পূর্বপুরুষ থেকে তাদের জন্ম। মর্গান এমন এক একটি দলের নাম দিয়েছিলেন (গেন্স) (Gens)। মর্গানের পরের যুগের নৃবিদরা গেন্স শব্দের বদলে ক্ল্যান (Clan) শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং ক্ল্যান শব্দটিই চলছে।

কয়েকটি ক্ল্যান একসঙ্গে জোট বাঁধলে যে বড়ো দলটি গড়ে ওঠে, তার নাম দেয়া হয়েছে ট্রাইব (Tribe)। আবার অনেকগুলো ট্রাইব মিলে আরো বড়ো একটি সংগঠন, তার নাম কনফেডারেশন অব ট্রাইবস্।

সধারণত জন্তু-জানোয়ারের নাম থেকেই ক্ল্যানের নাম হ'তো। যেমন — ভালুক, নেকড়ে বাঘ, হরিণ, কাছিম ইত্যাদি। আবার ফুল, ফল লতাপাতার নাম থেকেও ক্ল্যানের নামকরণ হতো। এধরনের নামকরণের মূলে যে বিশ্বাসটি রয়েছে, তাকে বলা হয় টোটেম বিশ্বাস।

পাক-ভারত উপমহাদেশের সাঁওতাল উপজাতির শতাব্দিক গোত্র বা টোটেম আছে, হো উপজাতির আছে ৫০টিরও বেশি। এরূপ মুণ্ডা উপজাতির প্রায় ৬৪টি, ভীল উপজাতির ২৪টি, ছোটো নাগপুরের খারিয়া উপজাতির ৮টি এবং পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার 'দৌড়ি' উপজাতির মধ্যে ৪টি গোত্র বা টোটেম রয়েছে। এদের প্রত্যেক গোত্রই — পশু, পাখী গাছপালা অথবা কোনো বস্তুর নামে পরিচিত। আমাদের দেশেও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ বহু গোত্রের নাম দৃষ্ট হয়, যদিও এগুলোকে ঠিক টোটেম বলা যায় না। যেমন — সেন (শোন

বাজপাখী), নাগ (সর্প), সিংহ (পশুরাজ) ইত্যাদি। গোত্রের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে তার গোত্রের টোটেমের নামে পরিচয় দিয়ে থাকে। যেমন — সিংহ গোত্রের সবাই সিংহ, বাঘ গোত্রের সবাই বাঘ, হরিণ গোত্রের সবাই হরিণ ইত্যাদি।

মর্গানের মতে বিশেষত আধুনিক বহু নৃতত্ত্ববিদের মতে — রামায়ণে জাম্ববান ও হনুমানদি ভালুক ও বানররা পশু ছিলো না, তারা ছিলো সেকালের কিস্কিন্দার (ভারতের দণ্ডকারণ্যের অংশবিশেষ, আধুনিক নাম নাসিক) অনার্য অধিবাসী (মানুষ)। বানরাদি ছিলো তাদের টোটেম বা বংশগত উপাধি মাত্র। অধিকন্তু এ-ও অনুমান হয় যে, হয়তো হনুমান ও সূগ্রীব ছিলো কোনো 'ক্ল্যান' ও 'ট্রাইব'-এর অধিকর্তা এবং বালী ছিলো কোনো 'কনফেডারেশন' অব ট্রাইবস্'-এর অধিপতি, অর্থাৎ রাজ।

পরিশেষে — রামভক্ত ভাইদের সবিনয়ে বলছি যে, মানুষ ও পশু-পাখীর চেহারা, চরিত্র ও ভাষা — এ তিনে প্রকাশ পেয়ে থাকে তাদের স্বকীয়তা বা ব্যক্তিত্ব। কিন্তু 'ভাষা' ক্ষেত্রে মানুষের সমকক্ষ অপর কোনো জীব নেই। কেননা মানুষের মতো অন্য কোনো জীবের — দন্ত, ওষ্ঠ, তালু, জিহ্বা ইত্যাদি স্বরযন্ত্র নেই। তাই রামায়ণে কবি কিস্কিন্দাবাসীদের চেহারা বদলিয়ে বানরাদি বানিয়েছেন বটে, কিন্তু তাদের ভাষা ও চরিত্র বদলাতে পারেননি, তা রেখেছেন সর্বত্রই মানুষের মতো। রামায়ণ গ্রন্থই তার সাক্ষী।



## নিজের সম্পর্কে

আরজ আলী মাতুবর

বর্তমানে আমার বয়স প্রায় ৮৩ বছর। কাজেই আজ আমি যে 'সমাপ্তি' নিবন্ধটি লিখছি, তা বাহ্যত সমাপ্তি হলেও মূলত আমার জীবনেরও সমাপ্তি। তাই আমার জীবননাট্য সন্মুখে কল্পিত আলোচনা করছি।

বরিশাল শহরের অদূরে লামচরি গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্ম আমার, পৌষ, ১৩০৭ সালে। চার বছর বয়সে আমার বাবা মারা যান (১৩১১)। অতঃপর বাকি করে জমি ও কর্জ-দেনার দায়ে বসতঘরখানা নিলাম করিয়ে নেন সদাশয় জমিদার ও মহাজনরা ১৩১৭ ও ১৮ সালে। তখন হাম্মীহা, বিত্‌হারা ও গুহহারা হয়ে মা আমাকে নিয়ে ভাসতে থাকেন অকূল দুঃখের সাগরে। সে সময় বেঁচে থাকতে হয়েছে আমাকে দশ দুয়ারের সাহায্যে।

তখন আমাদের গ্রামে কোনোরূপ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিলো না। শরীয়তী শিক্ষাদানের জন্য এক মুন্সী সাহেব একখানা মন্ডব খোলেন তাঁর বাড়িতে ১৩২০ সালে। এতিম ছেলে বলে আমি তাঁর মন্ডবে ভর্তি হলাম অর্থনৈতিকভাবে। সেখানে প্রথম বছর শিক্ষা করলাম ধর ও ব্যঞ্জনবর্ণ তালপাতায় এবং বানান-ফলা কলাপাতায়। কেননা বই-শ্রেণি কেনার সঙ্গতি আমার ছিলো না। অতঃপর এক আত্মীয়ের প্রদত্ত রামসুন্দর বসাকের 'বালাশিক্ষা' নামক বইখানা পড়ার সময় ছাত্র-বেতন অনাদায়হেতু মুন্সী সাহেব তাঁর মন্ডবটি বন্ধ করে দিলেন ১৩২১ সালে। আর এখানেই হলো আমার আনুষ্ঠানিক বিদ্যাশিক্ষার সমাপ্তি বা সমাপি। এরপর কিছুদিন ঘোরাফেরা করে কৃষিকাজ শুরু করি ১৩২৬ সালে।

আমার মা ছিলেন নামাজী-কালমী একজন ধার্মিক রমণী। তাঁর নামাজ-রোজা বাদ পড়া তো দুরের কথা, 'কাজা' হতেও দেখিনি কোনোনাদিন আমার জীবনে। মাঘ মাসের দশগ শীতের রাতেও তাঁর তাহাজ্জু নামাজ কখনও মাদ পড়েনি এবং তারই ছোঁয়াচ লেগেছিলো আমার গায়েও কিছুটা। কিন্তু আমার জীবনের গতিপথ বৈকি যায় মায়ের মৃত্যুর কেন্দ্রে করে একটি দুঃখজনক ঘটনায়।

বিগত ইং ২৭, ১০, ৭৮ তারিখের 'বিচিত্রা' পত্রিকা, ১০.৬.৮১ তারিখের 'সংবাদ' পত্রিকা, ১৯.৭.৮১ তারিখের 'বিপ্লবী বাংলাদেশ' পত্রিকা, ৪.৯.৮১ তারিখের 'বাংলার বাণী' পত্রিকা, ১২, ১২, ৮২ তারিখের 'সন্ধানী' পত্রিকা ও আমার সম্পাদিত 'স্মরণিকা' পুস্তিকাখানা যীরা পাঠ করেছেন এবং যীরা ১৭, ৪-৮-৩ তারিখে বাংলাদেশ টেলিভিশনের 'প্রচ্ছদ' অনুষ্ঠানে আমার সাক্ষাৎকারের বাণী শ্রবণ করেছেন — তাঁরা হয়তো জানেন আমার দুঃখজনক ঘটনাটি। তবুও সেই অবিস্মরণীয় বিয়াদময় ঘটনাটি সংক্ষেপে এখানে বলছি। সে ঘটনাটি আমাকে করেছে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রেরী।

১৩৩৯ সালে আমার মা মারা গেলে আমি আমার মৃত মায়ের ফটো তুলেছিলাম। আমার মাকে দায়ন করার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত মুদ্রা, মৌলভী ও মুছল্লিরা এসেছিলেন, 'ফটো তোলা হারাম' বলে তাঁরা আমার মা'র নামাজে জানাজা ও দায়ন করা ত্যাগ করে লাশ ফেলে চলে যান। অগত্যা কতিপয় অনুষ্ঠান নিয়ে জানাজা ছাড়াই আমার মা'কে সস্তিকর্তর হাতে সোপর্দ করতে হয় করবে। ধর্মীয় দৃষ্টিতে ছবি তোলা দুর্ঘাণ্য হলেও সে সোপে সোয়ী হয়ং আমিই,

বিভাব : বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা

১৭

আমার মা নন। তথাপি কেন যে আমার মায়ের অবমাননা করা হলো, তা ভেবে না পেয়ে আমি বিমূঢ় হয়ে মার শিয়রে দাঁড়িয়ে তাঁর বিদেহী আত্মাকে উদ্দেশ্য করে এই বলে সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, "মা! আজীবন ছিলে তুমি ধর্মের একনিষ্ঠ সাধিকা। আর আজ সেই ধর্মের নামেই হ'লে তুমি শোলা-কুকুরের ভক্ষা। সমাজে বিরাজ করছে এখন ধর্মের নামে অসংখ্য অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার। তুমি আমায় আশীর্বাদ করো — আমার জীবনের ব্রত হয় যেন কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূরীকরণ অভিযান। আর সে অভিযান সার্থক করে আমি যেনো তোমার কাছে আসতে পারি।

"তুমি আশীর্বাদ করো মোরে মা,

আমি যেন বাজাতে পারি

সে অভিযানের দামামা।"

আমি জানতাম যে, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দূরীকরণ অভিযানে সৈনিকরূপে লড়াই করার যোগ্যতা আমার নেই। কেননা আমি একজন পদ্ম (মূর্খ)। তাই সে অভিযানে অংশ নিতে হবে আমাকে 'বাজনদার'রূপে। মাড়শেকের তারুণ্যের উদ্যমান কিছুটা লাঘব হলে আজি ভাবতে লাগলাম, শোকোন্মত্ত হয়ে প্রতিজ্ঞা তো করেছি যে, সে অভিযানে আমি দামামা বাজাবো। কিন্তু তা পাবে কোথায়? দামামা তৈরী উপকরণ তো আমার আরতে নেই। তাই কৃষিকাজের ফাঁকে ফাঁকে আমাকে আত্মনিয়োগ করতে হলো উপকরণ সংগ্রহের কাজে। অর্থাৎ পড়াশুনার কাজে।

আমার মায়ের মৃত্যুর পর থেকে দীর্ঘ আঠারো বছর কঠোর সাধনা করে ধর্মীয় কতিপয় অন্ধবিশ্বাসকে দর্শনের উত্তাপে গলিয়ে তা বিজ্ঞানের ছাঁচে ঢেলে তার একটি তালিকা তৈরী করছিলাম প্রগের আকারে ১৩৫৭ সালে। এ সময় স্থানীয় গোড়া বন্ধুরা আমাকে 'ধর্মবিরোধী' ও 'নাখোদা' (নাস্তিক) বলে প্রচার করতে থাকে এবং আমার সে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম ছেড়ে শহর পর্যন্ত। লোক পরপন্যায় আমার নামটি শুনেতে পেয়ে তৎকালীন বরিশালের লে-ইয়া ম্যাজিস্ট্রেট ও তালিগ জামাতের আমীর জনাব এফ. করিম সাহেব সদলে আমার সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন ১৩৫৮ সালের ১২ জ্যৈষ্ঠ তারিখে আমার বাড়িতে এসে, এবং যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বরিশালে গিয়ে তিনি আমাকে এক ফৌজদারী মামলায় সোপর্দ করেন 'কমান্ডি' আখ্যা দিয়ে। সে মামলায় আমার জবানবন্দি তলব করা হলে পূর্বেই তালিকার প্রশ্নগুলোর কিছু কিছু ব্যাখ্যা লিখে 'সত্যের সন্ধান' নাম দিয়ে তা আমার জবানবন্দিরূপে কোর্টে দাখিল করি তৎকালীন বরিশালের পুলিশ সুপার জনাব মহিউদ্দিন সাহেবের মাধ্যমে, ২৭ আষাঢ় ১৩৫৮ সালে (ইং তাং ১২.৭.৫১)।

'সত্যের সন্ধান'—এর পাণ্ডুলিপিখানার বর্ডোলেতে সে মামলায় আমি সৈনিক নিম্নত পেলাম বটে, কিন্তু মানসিক শাস্তি ভোগ করতে হলো বহু বছর। কেননা তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, 'সত্যের সন্ধান' বইখানা আমি প্রকাশ করতে পারবো না ও ধর্মীয় সনাতন মতবাদের সমালোচনামূলক অন্য কোনো বই লিখতে পারবো না এবং পারবো না কোনো সভা-সমিতিতে বক্তৃতাতে দাঁড়িয়ে স্বমত প্রচার করতে। যদি এর একটি কাজও করি, তবে যে কোনো অজুহাতে আমাকে পুনঃ ফৌজদারীতে সোপর্দ করা হবে। অগত্যা কলম-

কালাম বন্ধ করে আমাকে বসে থাকতে হলো ঘরে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত। এভাবে নয়  
হয়ে গেলো আমার কর্মজীবনের অমূল্য ২০টি বছর।

বাংলাদেশে কুখ্যাত পাকিস্তান সরকারের সমাধি হলে পর 'সত্যের সন্ধান' বইখানা প্রকাশ  
করা হয় ১৩৮০ সালে, রচনার ২২ বছর পর। এর পরে লিখিত আমার পুস্তক হচ্ছে —  
সৃষ্টি-রহস্য, মুক্তমন, স্বরাগিকা ও অনুমান। আমার প্রণীত বা সম্পাদিত আলোচ্য যাবতীয়  
পুস্তক-পুস্তিকাই হচ্ছে আমার মায়ের মৃত্যুদিনের বাঞ্ছিত 'দামামা'র অংশবিশেষ। এছাড়া  
আমার অন্যান্য কৃতকর্মও রয়েছে এ একই প্রেরণা। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে 'মানবকল্যাণ'।

১৩৫৮ সালে 'সত্যের সন্ধান'-এ আমার যে বাজনা শুরু হয়েছিলো, ১৩৯০ সালে  
'অনুমান'-এ তার সন্ধ্যা-বিরতি, হয়তো বা সমাপ্তি। কিন্তু —

এসে জীবনের সন্ধ্যাবেলা,  
দেখি এ জেহাদ নয়, খেলা।  
যদি আবহাওয়া থাকে ভালো,  
তবে নিশীথেও চলবে খেলা,  
থাকবে যতোক্ষণ আলাে।

[ আরজ আলী মাতুব্বরের জন্ম ৩ পৌষ ১৩০৭, প্রয়াণ ১ চৈত্র ১৩৯২। এই অসামান্য  
লেখকের রচনাগুলি মুদ্রণের অনুমতির জন্য আমরা আরজ মুঞ্জিল ট্রাস্ট, বরিশাল এবং  
প্রকাশক পাঠক সমাবেশের সাহিদুল ইসলাম বিজুর কাছে কৃতজ্ঞ। — সম্পাদক ]

## তৃতীয় বিশ্বের ভাষা পরিস্থিতি

( দ্বিতীয় ভাষার প্রশ্ন )

রফিকুল ইসলাম

তৃতীয় বিশ্বের অর্থাৎ এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার যে সব দেশ পাশ্চাত্যের কোন  
না কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশের উপনিবেশ ছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে কালে স্বাধীনতা লাভের  
পর সে সব দেশে বিভিন্ন সময়ের মধ্যে ভাষা সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। এই  
সমস্যা এশিয়া ও আফ্রিকার নব্য স্বাধীন বিভিন্ন উপনিবেশিক দেশে খুবই প্রকট। দূরপ্রাচ্যে  
ইন্দোনেশিয়া ছিল ডাচ আর ব্রুনাই ও মালয়েশিয়া ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার  
সিঙ্গাপুর ও বর্মা বা মায়ানমারও ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল। উপমহাদেশে ভারত, সিংহল ছিল।  
ব্রিটিশ উপনিবেশ। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানী ও তুরস্কের পরাজয়ের পর মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন  
দেশ ব্রিটিশ, ফরাসী, বেলজিয়ম, পর্তুগীজ ও ইতালির উপনিবেশে পরিণত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের  
আগে প্রায় সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য তুরস্ক সাম্রাজ্যের অঙ্গগত ছিল, যুদ্ধের পর সাউদি আরব, ইরাক,  
মিশর-ব্রিটিশ, মরক্কো, তিউনিশিয়া, আলজেরিয়া, লেবানন, সিরিয়া, ফরাসী, লিবিয়া ইতালীর  
উপনিবেশ হয়ে যায়। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশেও একই অবস্থা ঘটে, বানা, নাইজেরিয়া, কেনিয়া  
-ব্রিটিশ, কঙ্গো-ফরাসী ও বেলজিয়াম গ্যাব্রো, মোজাম্বিক-পর্তুগীজ উপনিবেশে পরিণত  
হয়। স্বাভাবিক ভাবেই এই সব উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদী ভাষাসমূহ সরকারী ভাষার মর্যাদা  
লাভ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে যখন এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি একে একে স্বাধীনতা  
লাভ করে তখন সদা স্বাধীন সাবেক উপনিবেশগুলির মাতৃভাষার মর্যাদা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।  
গুরু হয় উপনিবেশিক ভাষার সঙ্গে দেশীয় ভাষার সংঘাত। ল্যাটিন আমেরিকার ব্রাজিল  
উপনিবেশিক পর্তুগীজ আর বাকি সব দেশে আগে থেকেই স্প্যানিশ ভাষার প্রচলন ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ইন্দোনেশিয়া জাপানের অধিকারমুক্ত হয়, প্রাক্তন উপনিবেশিক  
ভাচুরা আর ফিরে যেতে পারেনা, ডঃ শোকরানার নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়া এ অঞ্চলের 'বাজার  
ভাষার' মালয়নাকে 'ভাষা ইন্দোনেশিয়া' নামে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করে, মালয়েশিয়া  
স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে মালয় ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করেনি, ভাষা মালয়েশিয়া রাষ্ট্রভাষা হয়  
স্বাধীনতার দশ বছর পরে। বর্মা স্বাধীনতার পর বার্মিজ ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে চালু করে।  
ফিলিপাইনের প্রধান ভাষা 'তাগালগ', কিন্তু মার্কিন অধিকারের সূত্রে ফিলিপাইনে 'আমেরিকান  
ইংরেজি' সরকারী ভাষা থেকে যায়। স্বাধীনতার পর ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া তাদের  
ভাষার হরফ আরবি থেকে রোমানের পরিবর্তিত করে। সিঙ্গাপুর চীনা অধ্যুষিত কিন্তু 'ব্রিটিশ  
ইংরেজি' সে দেশের সরকারী ভাষারূপে ব্যবহৃত হতে থাকে। ফরাসী ইন্দোনীস অর্থাৎ  
ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও লাওস ছিল ফরাসী উপনিবেশ এবং দেশ তিনটির উপনিবেশিক  
রাষ্ট্রভাষা ছিল ফরাসী।

এ দেশগুলি প্রথমে ফ্রাংক, পরে জাপান এবং শেষে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দীর্ঘকাল  
লড়াই করে স্বাধীন হয়েছে কিন্তু ফরাসী ভাষার প্রভাব কাটিয়ে এখনও মাতৃভাষাকে পুরো



রাষ্ট্রভাষা করতে পারেনি। আফ্রিকা সোয়াহেলি কেনিয়া ও তানজানিয়ার রাষ্ট্রভাষা হলেও এখন পর্যন্ত ইংরেজির প্রভাব বর্তমান।

উপমহাদেশের কয়েকটি রাষ্ট্রের প্রধান মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করা হলেও হিন্দী ভারতের, উর্দু পাকিস্তানের, বাংলা বাংলাদেশের এবং সিংহলী শ্রীলঙ্কার পুরো রাষ্ট্রভাষা পঞ্চাশ বছরেও হতে পারেনি, ইংরেজির প্রাধান্য এখনও চলছে। মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলি প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন সময়ে প্রধানত বৃটিশ বা ফরাসী ঔনিবেশ থাকলেও আরবী ভাষার প্রাধান্য কমেনি। কারণ দীর্ঘকাল মধ্যপ্রাচ্য তুর্কী সাম্রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত ছিল এবং তুরকের সুলতান প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত ইসলামের শেষ খলিফা ছিলেন। তবে নব্য তুরকে কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে তুর্কী ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পায়, তুর্কী ভাষার লিপি আরবী থেকে রোমানের পরিবর্তিত হয়। ইরান, আফগানিস্তান, নেপাল ও থাইল্যান্ড রাজতন্ত্রের অধীনে কখনও পূর্ণ কখনও বা অর্ধ স্বাধীন থাকলেও যথাক্রমে ফার্সী, পশতু, নেপালী ও থাইভাষা, এই সব দেশের রাষ্ট্রভাষা থেকে যায়। সুতরাং এই সব দেশের ভাষা পরিহিত সাবেক উপনিবেশ দেশগুলির মতো জটিল নয়।

সোভিয়েট ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর ইসমার্কিন পরাশক্তির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি ভাষা বর্তমানে বিশ্বভাষায় উন্নীত। ফলে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইংরেজিকে দ্বিতীয় ভাষা করার যিচ্ছ পড়ে গেছে। উপমহাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রে ইংরেজিকে দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা প্রদানের জন্যে ক্ষমতাসালীনদের মাথা ব্যথার সীমা নেই। বহুভাষী ভারত ও পাকিস্তানে যেমন, একভাষী বাংলাদেশেও তেমন প্রধান মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার চেয়ে ইংরেজি ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষারূপে প্রচলনের প্রয়াস অধিক পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের ভাষা অভিন্ন নয়, সে জন্যে সেখানে হিন্দী রাজ্যভাষা ইংরেজি নীতি স্বাভাবিকভাবেই গৃহীত হয়েছিল। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু কিন্তু এ ভাষা পাকিস্তানের কোন প্রদেশের মাতৃভাষা নয়, পাকিস্তানের প্রধান ভাষা পাঞ্জাবী, সিন্ধী, পশতু ও বালুচ, তবে মোহাজির অধ্যুষিত করাচীর ভাষা উর্দু। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে পাকিস্তান ভেঙে রক্তাক্ত মৃত্যু যুদ্ধের মাধ্যম স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভব প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয়।

উপমহাদেশের দুটি বহুভাষিক রাষ্ট্রের ভাষা পরিহিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ভাষা পরিহিতির জটিলতা কম কারণ শতকরা নিরানব্বই শতাংশ বাংলাদেশীর ভাষা বাংলা। ভারতে বা পাকিস্তানে হিন্দী বা উর্দু ছাড়াও বিভিন্ন রাজ্য বা প্রদেশের নিজস্ব ভাষা থাকায় ইংরেজিকে কোন অবস্থাতেই দ্বিতীয় ভাষা বলা চলে না বরং বাস্তব ভাষা পরিহিতির প্রেক্ষাপটে বড়জোর তৃতীয় ভাষা বলা চলে। বাংলাদেশে বাংলা একমাত্র বা প্রধান ভাষা কিন্তু বাংলাদেশেও ইংরেজিকে দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া কঠিন। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উপভাষা অত্যন্ত জীবন্ত। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মাতৃভাষা এ অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা, বাংলাদেশের বাঙালীদের দ্বিতীয় ভাষা হল 'স্ট্যান্ডার্ড বা মান বাংলা ভাষা' যেটা তাদের কল্প করে শিখতে বা রপ্ত করতে হয়। স্ট্যান্ডার্ড বা মান ভাষাও উপভাষা, তবে চরটগ্রাম, নোয়াখালি, সিলেটের আঞ্চলিক ভাষার মতো ভৌগোলিক উপভাষা নয়, তা হল সামাজিক উপভাষা। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় 'কলকাতা মান ভাষাকে' তদানীন্তন পূর্ব বাংলা বা পূর্বপাকিস্তানের মানভাষা রূপে গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু গত পঞ্চাশ বছরের রাজনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের জন্যে এখন 'ঢাকা স্ট্যান্ডার্ড' 'কালকাতা

স্ট্যান্ডার্ড' থেকে কিছুটা আলাদা। কলকাতা মান ভাষায় বর্তমানে যেমন পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিকতার প্রভাব, ঢাকার মান ভাষায় তেমন বাংলাদেশের আঞ্চলিকতার প্রভাব ক্রমবর্ধমান। সুতরাং ভবিষ্যতে বাংলা ভাষার দুটি স্ট্যান্ডার্ড রূপ গড়ে ওঠা বিচিত্র নয়। ইংরেজি ভাষার স্ট্যান্ডার্ড বর্তমানে বৃটিশ, আমেরিকান, কানাডিয়ান, অস্ট্রেলিয়ান ও নিউজিল্যান্ড অন্তর্গত পাঁচটি।

মোট কথা ইংরেজি ভাষাকে কোন অবস্থাতেই বাংলাদেশের দ্বিতীয় ভাষা বলা চলে না, বাংলাদেশের প্রথম ভাষা বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা, দ্বিতীয় ভাষা 'মান বাংলাভাষা', তৃতীয় ভাষা ইংরেজি ভাষা। দেখা যাচ্ছে উপমহাদেশের কোন দেশেই 'ইংলিশ' প্রকৃত প্রস্তাবে 'সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ' নয়। বরং 'আন্তর্জাতিক ভাষা' রূপে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পথে অগ্রসরমান।

## ফ্রান্সিস পঁজের কবিতা : অদ্ভুত এক পাঠ-যন্ত্র

চিন্ময় গুহ

বিংশ শতাব্দীর ফরাসি কবিতার দুই দুঃসাহসিক অভিযাত্রীর বয়স একশ হল: আঁরি মিশো (১৮৯৯-১৯৮৪) ও ফ্রান্সিস পঁজ (১৮৯৯ - ১৯৮৮)। একই বছরে জন্মানো জীবনানন্দের মতো, কবিতার ভেতরে-মানচিত্র আমূল বদলে দিয়েছেন এঁরা।

মিশোর অনিশ্চিত ও নিষ্ঠুর স্বপ্নধীন স্বপ্নের জগতের সঙ্গে পঁজের বস্তুভিত্তিক রচনার কোনো মিল নেই। ক্রোদেল বা স্যাঁ-জন-পেরের মহাকাব্যিক বিস্তার, ব্রতী ও স্মারেরয়ালিস্তদের বিক্ষুব্ধ স্বয়ংক্রিয়তা, রনে শারের স্ফূর্ন ও সংক্ষিপ্ত পারম্পর্যহীন জটিল রেখা... কোনোটিই তাঁর পথ নয়। নীতিহীন গদ্যে এক নিবিশিষ্ট অনুবিক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা একটুকরো মৃদু, কম্পমান, অনিয়তাকার, নাক্কারজনক জীবন প্রণালীকে তিনি পরীক্ষা করে চলেছেন।

ফ্রান্সিস পঁজের প্রধান কাব্যগ্রন্থ *Le parti pris des choses* ('বস্তুর পক্ষ-সমর্থন') প্রকাশিত হওয়ার পর সার্বভৌমিক খ্যাতি অস্তিত্ববাদী বলে অভিহিত করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রতিরোধের সময় কামু তাঁর কবিতাকে চিহ্নিত করেন 'আ্যবসারিটি'র উদাহরণ হিসেবে।

পরে 'নুভো রমী' বা নতুন উপন্যাসের প্রজন্ম তাঁর রচনা-পদ্ধতির দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। ১৯৬০ সাল নাগাদ তাঁকে নিয়ে মেতে ওঠেন ফিলিপ সোলোব্‌স্‌-এর পোস্ট-স্ট্রাকচারালিস্ট *Tei Quel* গোষ্ঠী। অতঃপর তিনি দেরিদা ও তাঁর অনুগামীদের অধ্যয়নের বিষয় হয়ে ওঠেন। তাঁর কবিতায় একটি পরিত্যক্ত খোলসের ভেতর গৃহনির্মাণের কাকড়াটির মতো, সাহিত্যিক ও দার্শনিক তত্ত্বের অনুপস্থিতি এঁদের সকলকে আকৃষ্ট করেছিল বলে মনে হয়।

অবশ্য বাইরে থেকে আরোপিত নানা ধরনের তত্ত্বকে তিনি বারবার অস্বীকার করেছেন। কখনো আবার তত্ত্বের মোকাবিলা করেছেন প্রতি-তত্ত্ব দিয়ে, যাকে তিনি বলেছেন 'পদ্ধতি' (méthodes)। তবু শেষ পর্যন্ত তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি তত্ত্বের অনিশ্চয়তাকেই প্রতিপন্ন করে।

ফ্রান্সিস পঁজ জন্মেছিলেন দক্ষিণ ফ্রান্সের মঁপেলিয়ে-তে। ছেলেবেলায় ঠাকুরদার লাইব্রেরিতে লিটারে-র অভিধান তাঁকে আকৃষ্ট করে রেখেছিল। অনেকের মতে, এই অভিধান-মুদ্রতায় নির্মিত রয়েছে তাঁর কাব্যভাবনার চাবিকাঠি। মেধাবী ছাত্র ছিলেন, কিন্তু মৌখিক পরীক্ষার ভয় কাটিয়ে উঠতে না পারায় অধ্যাপনা-বৃত্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। বিশেষ দশকে সদা প্যারিসে আসা রাগী যুবকটি তথাকথিত মানবিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঘূণা করতে শুরু করেন। কিছুদিনের জন্য স্মারেরয়ালিস্ট আন্দোলনে যোগ দেন। কমিউনিস্ট পার্টিরও সদস্য হয়েছিলেন, পরে সদস্য-পদ ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর ভাষায়, 'গোয়াল পরিষ্কার করা নয়, প্রশ্নটা হল বিষ্ঠা দিয়ে দেওয়াল রঙ করার।' আগেও দুটি বই বেরিয়েছিল, কিন্তু ১৯৪২ সালে 'বস্তুর পক্ষ সমর্থন' গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যান।

বস্তুনিষ্ঠ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন এই কবি বেশির ভাগ সময়ই নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন পর্ব ও পর্বক্ষে বিভক্ত এমন এক ঠাসবুনোটি গদ্যে যা ঠিক কবিতার ভাষা নয়,

## বিভাব : বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা

২৩

বরঞ্চ বলা যেতে পারে বিশ্লেষণ বা বর্ণনার ভাষা। এর একটা দার্শনিক ভিত্তি নিশ্চয়ই আছে; পঁজের ভাষায় তা হল 'বস্তুকে কথার মধ্য দিয়ে জীবন্ত করে তোলা।' আজকের যান্ত্রিকতা বা আণবিক অবক্ষয়ের যুগে তাঁর কবিতা যেন তাদের উদ্দেশ্যে লেখা, 'যারা বস্তুর গুঢ় সত্যকে চেনে না, তাকে প্রকাশ করার মতো সাহস বা অভিব্যক্তি যাদের নেই।' রুটি, কমলালেবু, সাবান, সিগারেট, ঝিনুক, প্রজাপতি অথবা 'বসন্তের গোড়ায় গাছের সবুজ রমি'... সবই তাঁর অনুধ্যানের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। সেগুলিকে নিরাসক্ত সহমর্মিতায় কাটাছেঁড়া করতে গিয়ে এক স্বশাসিত বিশ্বকে তিনি আবিষ্কার করেন।

'কঠিনভাবে আবদ্ধ' একটি ঝিনুকের ভেতর তিনি খুঁজে পান 'মুক্তোর আকাশের নীচে... খাদ্য-পানীয়ের এক জগৎ', যেখানে 'ওপরের আকাশ নীচের আকাশে ডুবে গিয়ে সৃষ্টি করে তুচ্ছ এক ডোবা, কালচে লেস-লাগানো এক আঠালো সবুজ খলে যা ফুলে, উপচে তোমার চোখ ও নাসারন্ধ্রে ঢুকে যায়।'।

এককালে তাঁর বেশির ভাগ সময় কেটেছে না লেখার কারণ অনুসন্ধানে। পরে অবশ্য একথাও তার মনে হয়েছে: 'যখন নিবিশিষ্ট চিন্তা বা ধ্যানের মধ্যে এক ঝাঁক শব্দের হাউই হঠাৎ আমার শরীর থেকে প্রবলভাবে উৎক্ষিপ্ত হয়, আমার ক্রান্তি দূর হয় ও আরো কয়েকটা দিন বেঁচে থাকার প্রেরণা জোগায়।'।

এখানে ফরাসি থেকে ফ্রান্সিস পঁজের আটটি কবিতার অনুবাদের খসড়া প্রস্তুত করা হল।

## মোমবাতি

রাতে মাঝে মাঝে প্রজ্বলিত হয় এক একটি গাছ যার আলো আসবাবপত্র সমেত ঘরগুলোকে বড় বড় ছায়ায় ভেঙে ফেলে।

ফটিকের থামের ওপর মিশকালো টাটায় উদাসীন একটি সোনার পাতা।

জীর্ণ প্রজাপতিরা তাকে আক্রমণ করে, কারণ চাঁদ অনেক উঁচুতে ও অরণ্য বাপময়।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে যাওয়া বা লড়াইয়ে ক্রান্ত, তারা কেঁপে ওঠে এক উম্মত বিহ্বলতায়।

আর সেই মোমবাতি তার নিজস্ব ধোঁয়া ছড়াতো ছড়াতো টলমলে আলোয় পাঠকে উৎসাহিত করে— তারপর নিজের রেকাবের ঝুঁকে পড়ে, নিজস্ব খাদ্যে ডুবে যায়।

## মাংসের টুকরো

মাংসের প্রতিটি টুকরো যেন এক একটি কারখানা, জীতাকল আর রক্তের পেষণযন্ত্র।

বড় বড় উনুন, নল, মদের ভাঁটির সঙ্গে গলাগলি করে থাকা বৈদ্যুতিক মুণ্ডের আর চর্বির গদি।

সেখান থেকে বেরিয়ে আসে ফুটন্ত বাষ্প, নিস্ত্রাভ কিংবা উজ্জ্বল আগুনের রক্তিম।

খোলা নর্দমার ভেতর বয়ে যায় ধাতুমল ও পিণ্ডি।

আর সবকিছুই আপ্তে আপ্তে ঠাণ্ডা হয়ে আসে রাতে, মৃত্যুর সমীপে। মুহূর্তের মধ্যে মরচে না পড়লেও অন্তত পক্ষে খটতে থাকে নানান সব রাসায়নিক ক্রিয়া আর বেরিয়ে আসতে থাকে এক উৎকট দুর্গন্ধ।



## স্টুকেস

ভানোয়াজ পাহাড় পর্যন্ত স্টুকেসটা আমার সঙ্গে যায়, তার নিকেল বলমল করে আর মোটা চামড়াটা গন্ধ ছাড়তে থাকে। আমি সেটাকে হাতের চেটেয় ছুই, আদর করে দিই তার পিঠ, গলা আর মসৃণ শরীর। এই বাস্কাটা যেন একটা বই : সাদা ভাঁজের ঐশ্বর্যে ভরা। আমার একমাত্র কাপড়, প্রিয় পাঠ্য আর টুকটাকি। সত্যি, বইয়ের মতো। এই বাস্কাটা যেন একটা ঘোড়া, আমার পায়ের প্রতি বিশ্বস্ত, সেটাকে আমি জিন পরাই, বর্ম দিয়ে ঢাকি, শুইয়ে দিই একটা ছোট বেঞ্চির ওপর, জিন পরাই আর লাগামো বাঁধি, ফেটি বাঁধি আর খুলি, জনশ্রুত এক হোটেলের ঘরে।

সত্যি, একালের ভ্রমণকারীর কাছে তার স্টুকেসটা যেন এক ঘোড়ার ভগ্নাবশেষ।

## কুয়াশা-পল্লীর গাছগুলি ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে যাচ্ছে

কুয়াশা-অধুষিত গাছগুলির পাতা খুলে ফেলা হচ্ছে। অগ্নিজেনের স্রাব প্রবাহে ইতিমধ্যেই তার নিরুৎসাহ, ফল ও ফলদলের জন্য সমস্ত রস খরচ হয়ে পড়ায় পাতারা বিষণ্ণ, আগস্টের বিহীন গরমের সময় থেকে তারা অলগ হয়ে এসেছে।

গুঁড়ির ঝাঁজ বেয়ে মাটিতে নেমে আসছে জল, যা আর গুঁড়ির সজীবতা নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

ফলগুলি ছড়ানো, ফলগুলি মাটিতে গড়াচ্ছে। প্রথম যৌবন থেকেই গাছগুলি যাবতীয় সজীবতা ও শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে পরিহার করতে শিখে গেছে।

## জল-বিষয়ক

আমার চেয়ে নীচে, সর্বদাই আমার চেয়ে নীচে এই জল। সবসময়ই চোখ নীচু করে আমি তাকে দেখি। মাটির মতো, মাটির একটা টুকরোর মতো, বদলে যাওয়া মাটির মতো।

সাদা ও উজ্জ্বল, অবয়বহীন ও শীতল, নির্বিকার ও নিজের একমাত্র অভিধারের পাপে নিবদ্ধ। যাকে চিত্তার্থ করার জন্য অসামান্য সব উপায় রয়েছে : ঘুরে আসা, ভেদ করা, ক্ষয় করা, টুয়ে পড়া।

তার বুকের মধ্যে সেই পাপ ও বারবার সে ভেঙে পড়ে, প্রতি মুহূর্তে সব আকার সে ভেঙে ফেলতে চায়, সর্বদা মাথা নত, মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে, সেনা শব্দে, বিশেষ বর্ণের সাধুদের মতো। যেন তার নীতিই হল 'আরো নীচে', অর্থাৎ একসেলসিয়াসের ঠিক উলটো। বলা যায় সে উন্মাদ। যে-অভিকর্ষ তাকে ধরে রেখেছে তার কাছে মাথা নোয়ানোর নিপুণ বাসনা।

সে আমার কাছ থেকে পালায়, আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে যায়। তার ওপর, আবার সে যথেষ্ট পরিদ্রাব ও নয় (সৈদিক থেকে সে টিকটিকি বা ব্যাঙের থেকে আলাদা) ; সে দাগ ও চিহ্ন রেখে যায় আমার হাতদুটোতে, যা শুকোতে বেশ সময় লাগে, অথবা মুছে ফেলতে হয়। আমার কাছ থেকে পালিয়েও সে বেশে বেশে যায়, অথচ বিশেষ কিছুই আমি করতে পারিনা।

মতাদর্শের দিক থেকেও এক : সে আমার হাত থেকে পালায়, সমস্ত সংজ্ঞার থেকে পালায়। কিন্তু পেছনে ফেলে যায় দাগ, আকারহীন পদচিহ্ন, আমার মনে এবং এই কাগজের টুকরোয়।

জলের উৎস্কা : সামান্য উৎস্কা-ইয়ের প্রতিও অনুভূতিশীল। সিঁড়ি দিয়ে দুপায়ে লাফিয়ে নামে। খুনসুটিময়, শিশুর মতো অনুগত, গতিপথ বদলে এদিকে ডাকামাত্র চোখের পলকে ফিরে আসে।

## দরজার সুখ

রাজারাজড়ারা কখনো দরজা স্পর্শ করে না।

এ সুখ তাদের অচেনা : সামনের দিকে চেলা, আশ্বে অথবা জোরে, একেদিকি বিরতি সৌহার্দ্যময় তক্তা, সেটির দিকে পাক খেয়ে ঘুরে যাওয়া ও বহনানো ফেরানো— বাস্তব দিয়ে তাকে ধরা।

এ বাড়ি প্রতিরোধগুলির একটির পেটের কাছে পোসেলিনের হাতলটিকে তালু দিয়ে ধরার কী সুখ। চকিতে শরীরের সামনে শরীর, এক মুহূর্তের জন্য গতি কমে আসে, চোখ খুলে যায়, এবং গোটা শরীরটা নিজেকে নতুন কামরায় থাপ খাইয়ে নেয়।

বন্ধুর মতো হাতে তুমি আরো একটুক্ষণ ওকে ধরে রাখো, বলিষ্ঠভাবে ফের ধাক্কা দিয়ে ভেতরে সঁধিয়ে যাওয়ার আগে— যা সুনিশ্চিতভাবে বোঝা যায় শক্তিশালী কিন্তু ভীষণভাবে তৈলাক্ত একটিনা-তালো বন্ধ হওয়ার শব্দে।

## কমলালেবু

স্পঞ্জের মতো এই কমলালেবুটিও অভিব্যক্তির যন্ত্রণা পায় হয়ে তার স্বৈর্য ফিরে পেতে ব্যাকুল। কিন্তু স্পঞ্জ যা পারে কমলালেবু তা পারে না। কারণ তার কোষগুলি ফেটে পড়ে, এবং সুতোগুলি ছিঁড়ে যায়। শুধু তার স্থিতিস্থাপক খোসাটি কিছুটা তার আকৃতি ফিরে পায়। ইতিমধ্যে একটি পীতভূত লেবু ছড়িয়ে পড়ে, এবং যতই ক্লান্তিহর ও সুগন্ধময় হোক তাতে থাকে বীজ হারানোর ভিত্ততা।

অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য কি আমাদের কোনো একটি দলে ভিড়তেই হবে? স্পঞ্জ, যা একটি পেশী ছাড়া কিছু নয়, পরিস্থিতি অনুযায়ী হাওয়ায় অথবা পরিষ্কার বা ময়লা জলে ভরে যেতে পারে : খুব যাচ্ছেতাই হীন প্রদর্শন বলতে হবে। অন্যদিকে, কমলালেবুটি সুস্বাদু হলেও নিষ্ক্রিয়। এবং তার সুগন্ধময় আশ্রয়বলিদান অভ্যাসচারীকে খুব সহজে অব্যাহতি দেয়।

একথা বলটি যথেষ্ট নয় যে কমলালেবুটি একেবারে নিজস্ব পদ্ধতিতে বাতাসকে সুগন্ধময় করে তোলে ও জলদ্রবকে শুষি করে। আমাদের লক্ষ করা দরকার নির্গত তরলটির অপরূপ রঙ, এবং — লেবুর রসের ক্ষেত্রে যা ঘটে না— বাগ্যন্ত্র উন্মুক্ত করে তার নামটি উচ্চারণ করতে হয়, ও পাকস্থলীতে গ্রহণ করতে হয়, সন্দিক্ভাবে স্বাদ-মুকুলকে কৃষ্ণিত না করেই।

কোনো শব্দই এ ডিম্বাকৃতি, কোমল, ভঙ্গুর, গোলাপি বেলুনের ঢাকনাটির প্রতি আমাদের প্রশংসাকে ফুটিয়ে তুলতে পারে না। এই পুরু, তেজা রুটি কাগজটি চামড়া অতিশয় পাতলা

কিন্তু অতিমাত্রায় রঞ্জক ও কাঁকালো, সূর্যরশ্মিকে টেনে ধরে ফলটির নিখুঁত আকারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার পক্ষে যথেষ্ট খসখসে।

এই বৃক্ষ ও যথাসম্ভব পুরোদস্তুর গবেষণার শেষে বীজটির মোকাবিলা করা উচিত। ক্ষুদ্র পাতিলেবুর মতো দেখতে এই বীজ লেবুগাছের সাপা কাঠের রঙের, যার মাধ্যখানে থাকে একটি মটর বান নরম উপমঞ্জরী। ফল-বেলনটির হাদ, রঙ ও সৃগন্ধের চীনে লঠনের রোমহর্ষক একোটি মটর বান নরম উপমঞ্জরী। ফল-বেলনটির হাদ, রঙ ও সৃগন্ধের চীনে লঠনের রোমহর্ষক একোটি মটর বান নরম উপমঞ্জরী। ফল-বেলনটির হাদ, রঙ ও সৃগন্ধের চীনে লঠনের রোমহর্ষক একোটি মটর বান নরম উপমঞ্জরী। ফল-বেলনটির হাদ, রঙ ও সৃগন্ধের চীনে লঠনের রোমহর্ষক একোটি মটর বান নরম উপমঞ্জরী।

### যৌবনবতী

কুশনচাকা গাড়ির মতো তোমার মসৃণ হাঁটু আর সৰু কোমর, কোচাচানোর মতো পেছনে হেলে থাকা স্তন।

তুমি নিজেকে বয়ে বেড়াও, চালিত কর। তোমার মনকে তোমার শরীর থেকে একেবারেই আলাদা করা যায় না।

হঠাৎ হঠাৎ কেন তুমি থমকে যাও?

— বালিঘড়ির দুটি দিক ধীরে ধীরে পরস্পরকে বোঝবার চেষ্টা করে।

তোমার বুক ফলের সুডৌল দৃঢ়তা আমরা উপভোগ করি, আর আরো নীচে ফলের সুস্বাদ ও রস।

## শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত লেখা

[১৯৮১ সাল নাগাদ ভূপালে 'ভারতভবনের' উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এবং পরেও এর বিভিন্ন সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায় বেশ কিছু ভারতীয় ভিন্নভাষী কবিদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাদের কবিতা শোনেন। অন্য অঞ্চলের কবিরা বাংলা কবিতার সঙ্গে মোটামুটি পরিচিত কিন্তু আমরা তেমন ওয়াকিবহাল নই—এই বিষয়ে তাঁর অসোয়াস্তি হত। অনুষ্ঠানগুলিতে শোনা এবং পড়া ভাললাগা ভিন্নভাষী কবিতাগুলিকে বাঙালী পাঠকের কাছে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেন। সম্ভবত তারপরই সাহিত্য আকাদেমি কর্তৃক প্রকাশিত সর্বভারতীয় কবিতার ইংরাজী অনুবাদ সংকলন থেকে একটি বাংলা অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশের উৎসাহে তিনি কিছু কবিতার বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। পাণ্ডুলিপি দেখে বোঝা যায় কাজটি অসমাপ্ত ছিল।

এখানে তার মধ্যে দুটি কবিতা দেওয়া হল। এন. ভি. কৃষ্ণ ভারিহয়ার-এর কবিপরিচিতি তাঁর নিজেরই লেখা। কৃষ্ণ অশান্ত সম্ভবত ছয়নাম, কবিপরিচিতি লেখা হয়নি।]

মীনাফী চট্টোপাধ্যায়

## সূর্যের মৃত্যু — এন ভি কৃষ্ণ ভারিহয়ার

১.

### অনুবাদক শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আমাদের সূর্য দিগন্তে ঢালে পেড়েছিল  
কিন্তু আমাদের ধৈর্য অন্তিমিত হয়ে গিয়েছিল  
আমরা গুলি করে সূর্যকে মাটিতে ফেলে দিলাম  
সাগর হলো লাল, মুহূর্তের জন্যে  
পরমহুর্ন্ত সাগর হলো কালো  
উপকূলও কালো হলো  
কালো। গাঢ়তর হলো এবং  
তা এখনও বেড়ে চলেছে  
সূর্যের মধ্যে মরগো কী  
তা ছিলো আমাদের আলো  
আমাদের মানবতা

২.

‘আমাদের ক্ষিদে পেয়েছে’ চিৎকার করি  
ক্ষিদে? কীসের ক্ষিদে?



ফ্যানভাতের জন্যে ক্ষুধার্তা ছিলো  
তাদের সামনে ভগবান ফ্যানভাতরূপে অবতারা

২.

কাপড়ের জন্যে ক্ষুধার্তা ছিলো;  
থাকার কুঁড়েঘরের জন্যেও ক্ষুধার্তা ছিলো  
জ্ঞানের জন্যে ক্ষুধার্তাও ছিলো  
ঈশ্বর তাদের সামনে কাপড়, কুঁড়েঘর ও জ্ঞান হয়ে দেখা দিল  
সেটা ছিলো স্বাভাবিক ক্ষুধা  
কিন্তু আমাদের ক্ষিদে  
লক্ষ টাকার জন্যে, কোটি কোটি টাকার জন্যে  
পদবীর ক্ষিদে, মোড়ালের জন্যে ক্ষিদে  
এই ক্ষিদে জ্বলে কিন্তু আমাদের সামনে লক্ষ, কোটি  
পদবী বা মোড়ালি হয়ে ভগবান দেখা দেয় না।  
কী করে আসবে? ভগবান মৃত  
সূর্যের মতো যা মৃত, তা ছিলো ভগবান।

৩

সূর্যের উদয় হয়েছিলো পূর্ব দিকে,  
আলো এসেছিলো সেই পূর্ব দিক থেকে  
পূর্বের হাওয়া পশ্চিমী হাওয়াকে জয় করে বসেছিল  
কিন্তু, লক্ষ আর কোটি পশ্চিম থেকেই বহমান  
পদবী আর ক্ষমতা ফুটে ওঠে পশ্চিমেই  
তাই আমরা পশ্চিমে যাই  
যারা পশ্চিমে যেতে পারেনা, তারা যাওয়া নিয়ে স্বপ্ন দ্যাখে  
তার জন্যে দুঃসাহসিক কাজ করে।  
পাশাপাটের জন্যে ক'শ টাকা?  
এন ও সির জন্যে কত হাজার?  
ভিসার জন্যে কত অশ্বত?  
ওয়ার্ক পারমিটের জন্যে কত লাখ?  
জনসাধারণের ডানা গভিয়েছে  
যে ডানা পশ্চিম দিকে ওড়ার ডানা  
সূর্যে যা মরেছিলো, তা ছিলো পূর্ব  
পূর্বের জয়ী হাওয়া

৪

আমাদের বাগানগুলিতে ফুল আর জ্ঞান হয় না;  
প্লাসটিক ফুলগুলি জ্ঞান হবে কী করে?  
প্যারিসের সুগন্ধী এদের গন্ধ দেয়  
আমাদের কোকিল ভ্যানিগান এ্যান্ড ভ্যানিগান কোমপানির স্টাফকরা  
তাদের গান বন্ধ হয় না  
টেপের গলা কি কখনো বন্ধ হয়?  
আমাদের সব আছে  
আমরা সব কিনে রেখে দিয়েছি  
বসন্ত, আরোগ্য, প্রেম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, মোক্ষ।

কলেজ গ্র্যাডমিশন?  
দশ হাজার।  
শতকরা আটানব্বই নম্বর?  
বিশ হাজার।  
এম এল এ?  
তেত্রিশ হাজার আর দু'বোতল ক্ষুচ।  
মন্ত্রী?

পঞ্চাশ হাজার আর হোটেল ওবেরয়-এ একরাত।  
আই জি?  
সেক্রেটারি?  
কমিশনার?  
চেয়ারম্যান?  
জজ?  
দোকানে প্রত্যেক পাণ্যের প্রাইস-ট্যাগ বুলে আছে

আমাদের সব আছে  
কিন্তু একটা জিনিষ নেই  
আমাদের সূর্য;  
আমাদের সূর্য মারা গেছে।

### নকশালবাড়ি

ক্ষিদে, তোমায় আমি হাড়ে হাড়ে চিনি  
একটা বালক আতপ চালের ফোটানো জল  
নারকেল মালা দিয়ে তুলে এনামেল-টা  
ফুটো এক গামলায় কিছু শাকসবজিসহ

চুমক দিয়ে কিছু খেয়ে কিছু ফেলে ফুলে মার খাবার ভয়ে দৌড়ে যাওয়া  
ক্ষুদ্রে শয়তানকে তুমি জলন্ত রোদের অঙ্গার মাড়িয়ে  
তুমি নিয়ে যাওনি?

এক যুবক কাল-খাওয়া কালো চায়ের ঢেংকুর তুলে আজ স্বাদ পেয়ে  
কতকাল এই দেশের চাকরির বাজারে মাথা ঘুরে পা পিছলে যখন পড়ে  
তোমার ভাগ করে দেওয়া তীব্র অভিমানে পান গিলিয়ে  
বাথাকে ভাগ করে অকর্মণ্যতাকে দূরে সরিয়ে কি রাখেনি?  
কতদিন তুমি তোমার নিত্যসঙ্গীর কানে মানবমুক্তির নিষ্ঠুর গানগুলি  
ফুসফুসের মতন ঢেলেছো!

কাক, শবুন, কুকুর আর শিয়াল ঠুকের কামড়ে  
আলের উপর চেনা যায় না এমন মড়াগুলিতে ঠোকার খেয়ে যখন পড়ে যাই  
লোকেরা পীতরাফসের কথা বলে বলুক আমি তোমার ঘোর পরাক্রম স্বচক্ষে দেখি

আমার অনেকদিনের পরিচিত নয় কী?  
তোমার দংষ্ট্রা আমার গলায় যে দাগ কেটেছে  
আমি সেগুলোকে কী ভাবে ঢাকি?

[ কবি সাংবাদিক ও ভাষাবিদ। জন্ম ১৯১৬ সালে ব্রিটন জেলায়। Quit India Movement-এর সময় শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে গোপনে প্রকাশিত কাগজে কাজ করেন। পরবর্তীকালে কোরালার বিখ্যাত মাতৃভূমি-র সম্পাদনা করেন দীর্ঘকাল। পরে কোরালা ভাষা ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টর হন। এখন কুন্তুমাস সাপ্তাহিকের প্রধান সম্পাদক। ১৯৭৯ সালে সাহিত্য একাডেমির পুরস্কার পান। ]

## কৃষ্ণ অশান্ত-র কবিতা

তোমাকে ছাড়া পাস?

তোমাকে ছাড়া আমি গলা পর্যন্ত ভর্তি থাকি

এই গোটা দুনিয়া ধাক্কা-ফাক্কা দিয়ে

গৃহহীন 'পাস'-এর দরজা ভেঙে চলে আসে তোমাকে ছাড়া

তোমাকে ছাড়া আমি প্রলয় হয়ে থাকি

জোয়ার ঝাঁটা এবং ঝঞ্ঝা হয়ে থাকি

তোমাকে ছাড়া আমার সঙ্গে রোজ আইনস্টাইন

এবং সেলিনা দেখা করতে আসে

আমার সঙ্গে অনেক গল্প করে

কিন্তু গল্পের মধ্যে তোমার কথা একবারও ওঠে না

যেমন : সময় একটা এমন পাখি

যা গায়ে ও তরুণিলের মধ্যে উড়তে উড়তে হাঁফায় না

যেমন বিমূর্ষের মাথাখানে তারা লাগানো

বা তারার মধ্যে বিমূর্ষ লাগানো একই কথা

যেমন মানুষের আরেক নাম 'মানসিকি'

এবং মানুষ সবসময় মায়ের পথটাই খুঁজে নেয়

কিন্তু হয় মায়ের পথ আর পথ থাকে না

এইসব গল্পের মাথাখানে তোমার কথা কখনো হয় না

তোমাকে ছাড়া

আমার মানিবাগে সব সময় হিটলারের ছবিটা প্যারেড করে

এ ছবির বেল্টে আমাদের গ্রামের পুরো পতিত জমি মাপা হয়

আমার বানোঁতে বিয়েতে দু'বিশে বন্ধক রাখার পর

বাকি জমি খালি জর্মনদের জন্যে রয়েছে

তোমাকে ছাড়া সিদ্ধার্থ নেই — বৃদ্ধ রয়েছে

এবং আমাদের রাষ্ট্র

যে কোনোদিন জমি নেবে না

কপিলাবস্তুর উত্তরাধিকারী নেই, একটা ভিক্ষু আছে

তোমাকে ছাড়া

আমার ঘরের মেজেয় ফুলসাজ নেই

ইটের একটা সমাজ রয়েছে

তোমাকে ছাড়া

সরপঞ্চ এবং ওর পা-চাটা চামচা

আমাদের গুপ্ত সেলোমেশার জায়গার বোঁজ

এখন আর নেয় না

এখন ওরা শ্রীমান বি ডিওর কর্মচারী

হয়ে পড়ে রয়েছে

তোমাকে ছাড়া — অবতার সিং সদ্ধু আজ ওম্বই 'পাস'

এবং 'পাস'-এর সেবা বলে কিছু থাকে না

কিংবা দেহ ফুঁড়ে চলে যাওয়া ঘটনাগুলি

এখন আমার ভবিষ্যৎ

কিন্তু কি সুন্দর। এই জলন্ত জীবনটা

যখন বৃকে লাগে, তখন তুমি ছাড়া আমি কিছুই না।



## প্রগতি-সাহিত্যে দলিত সাহিত্য

গিরীন্দ্রনাথ দাস

প্রথমে সবিনয়ে নিবেদন করি যে, জাতপাতের বর্ণভেদ নিয়ে উচ্চবর্ণ বা সর্বর্ণ সাহিত্য এবং নিম্নবর্ণ বা দলিত সাহিত্য বা বলা হচ্ছে, আজ তা একেবারেই অচল। আমিও তা আদৌ সমর্থন করি না। উপরোক্ত দুটি ভাগের হলে আমি নিম্নোক্ত দুটি ভাগের কথা বলতে চাই — প্রথমত, শিল্পী, কৃষক এবং শিল্প-কৃষির সহযোগী নিম্নবিত্তের (মহেন্দ্রিত মানুষের বুদ্ধিজীবীদের ভাগ, যাদেরকে এক কথায় বলা যায় 'শ্রমিক') দ্বিতীয়ত, পুঞ্জিপতি শ্রেণীর লোকের অনাভাগ, যাদেরকে এক কথায় বলা যায় 'পরগাছা'। শ্রমিক সাহিত্য আর পরগাছা সাহিত্যকে যথাক্রমে গণতান্ত্রিক সাহিত্য ও ধনতান্ত্রিক সাহিত্য বলা চিক্ ব'লে মনে করি।

আমাদের দেশে আগে থেকে আজ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক সাহিত্যে ধনতন্ত্রের এবং ধনতান্ত্রিক সাহিত্যে গণতন্ত্রের ছায়া না পড়ে পারেনি। গণতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্বও অর্থনীতিতান্ত্রিক ঐতিহাসিক সত্য। শ্রমিকরা এখানে শোষিত এবং পরগাছা পুঞ্জিপতিরা শোষক। জাতপাতের ভিত্তিতে সর্বর্ণ সাহিত্য ও দলিত সাহিত্য সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক এমন ভাবা অবাস্তব। কারণ তথাকথিত উচ্চ ও নিচ জাতিতে শোষক ও শোষিত উভয়ই আছে। শ্রমিক (গণতান্ত্রিক) এবং পরগাছা (ধনতান্ত্রিক) সব মিলিয়ে সামগ্রিকভাবে মানুষকে নিয়েই সাহিত্য।

'দলিত সাহিত্য' কথাটিতে জাতপাতের দৃষ্টিতে অসংসলিলা নদীর ন্যায় সংকীর্ণতা সচল রয়েছে। ইংরেজ আমলে চিহ্নিত এরাই তফসিলী সম্প্রদায় (সরকারী তফসিলে নির্দিষ্ট অনুমত হিন্দু সম্প্রদায়) বা তফসিলী জাতি ও তফসিলী উপজাতি। সেসব স্বাধীন ভারতে সর্বশেষ সংযোজন 'অন্য অনগ্রসর জাতি'। এরা সবাই সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ধনতান্ত্রিক শাসন-শোষণ ব্যবস্থায় লালিত-পালিত। ইংরেজ শাসকরা বর্ণাশ্রমভিত্তিক ধর্মের বিচ্যেদ ছাড়াও ধর্মবিশ্বাসের বিচ্যেদের রূপ দিল যার ফলে সকল ধর্ম থেকেই যারা পুজি বা অর্থসম্পদ বৃদ্ধি করতে পেরেছে তারা পুঞ্জিপতি শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে।

দলিত সাহিত্য যীরা বলছেন তাদের প্রথমই বলা দরকার যে, সাহিত্য সৃষ্টি করে থেকে হ'ল, — সমাজের নীচতলার যে মানুষগুলির জন্য তাদের মধ্যকার লোক সাহিত্য সৃষ্টি করতে শুরু করল সেটা করে থেকে হ'ল তারও — একটা ইতিহাস আছে বলে জানি। বর্ণাশ্রম ধর্ম যখন এদেশে প্রভুত্ব করেছে তখন উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের ভাষা ছিল সংস্কৃত। সে-ভাষার উপর নীচতলার মানুষের অধিকার ছিল না। সেই অধিকার পেতে নীচতলার মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। এক-কথা রামায়ণে আছে। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রথম যিনি লড়াই করলেন তিনি কিন্তু ঠিক নীচ তলার লোক নন। তিনি বর্ণাশ্রম ধর্মের দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ ক্ষত্রিয় শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং এক সামন্ত নরপতির পুত্র ছিলেন। বলতে গেলে তিনিই প্রথম দলিত মানুষের পক্ষে সাম্যের বিচারধারা প্রচার করেন যার জন্য উ, আন্দোলনের মতন লোক বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে আমরা জানি সংস্কৃত সাহিত্যের বিরুদ্ধে এই পর্বের যে-সূচনা হল তাকে ফুলে-ফুলে সমুদ্র কর'লে মধ্যযুগে আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের জন্ম হয়। রামদাস, কবীর, নানক, দাদু, নাভা প্রমুখের জীবন থেকে আমরা

বিভাব : বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা

৩৩

এসব জানতে পারি। দক্ষিণ ভারতের দার্শনিক রামানুজ থেকে বাংলায় শ্রীচৈতন্যদেব উচ্চশ্রেণীর মানুষ হয়েও এই ধারাকে পুষ্ট করেছেন। রাজভাষা সংস্কৃতের বিরুদ্ধে যেমন এই আঞ্চলিক ভাষার সংগ্রামের জন্মকারণী আমরা পাচ্ছি তেমনই দেখছি মুসলিম শাসনের যুগেও পারসিক ভাষার পরিবর্তে উর্দু এবং হিন্দুস্তানী ভাষার জন্মকারণী। আমরা বাংলাভাষার ক্ষেত্রে তো জানিই যে মুসলিম শাসকদের একাংশ বাংলাভাষার শ্রীপুজিসাধনে সাহায্য করেছিলেন। অর্থাৎ শাসকশ্রেণী বা উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও কিছু কিছু মানুষ চিন্তা করেছেন যে নীচতলার মানুষকে আর অগ্রাহ্য করা যাবে না। ইংরেজ-শাসনের যুগে নীচতলার মানুষের সন্মুখা যে বুদ্ধি পেল একথা স্বীকার করতেই হবে। ইংরেজদের আসার আগে যে-সকল বহিরাগত ভারতে প্রভুত্ব করতেন তারা তাদের শাসনকর্মের সুবিধার জন্য উচ্চতলার মানুষদের সাহায্য নিয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে উচ্চতলার মানুষের সংস্কৃতির সঙ্গে আপোসও করেছে। কিন্তু ইংরেজই প্রথম বহিরাগত যারা হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতিকে হয়ে করেছে এবং আঘাত করেছে, — সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এসেছে ইউরোপের নবজাগরণের ভাবধারা, যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান-মনত্ব। একথা স্বীকার করতেই হবে যে বর্তমানকালে আমরা গণতন্ত্র বলতে বা বুকি তার সঙ্গে প্রাচীন ভারতের পঞ্চায়ততন্ত্র এক জিনিষ নয়। প্রাচীন ভারতের পঞ্চায়ততন্ত্রের উপর ছিল উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক চিন্তা ও সমাজ চিন্তার প্রভাব। বর্তমানে যে প্রান্তব্যবস্থার ভৌতাদিকার ভিত্তিতে গণতন্ত্রের কথা বলা হয় তাকে ধর্মনিরপেক্ষ থাকতে হবে, — এই নিয়েই তো এখন লড়াই চলছে। কাজেই দলিত সাহিত্য সম্পর্কে কিছু মতামত দিতে হ'লে ভারতবর্ষের ভূগোল ও ইতিহাসের কথা মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে ইংরেজ আমলে চিহ্নিত এই তফসিলীরা কারা?

প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের অনুমান : প্রায় পঁচিশ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে এদেশে মানবজাতির আবির্ভাব হয়। বংশবৃদ্ধির সঙ্গে তারা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে ভারতের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের দুটি গোষ্ঠী : নেগ্রিটো ও প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড। প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড গোষ্ঠীর সাঁওতাল, কোল প্রভৃতি এখনো আছে যাদের মধ্যে তেমন আশানুরূপ সভ্যতার সর্বাধুনিক বিকাশ ঘটেনি। প্রায় সাড়ে তিন হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে জারিড গোষ্ঠীর লোক উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। উন্নত তাঁদের সভ্যতা মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পা আবিষ্কৃত হয়েছে। তাঁরাই 'প্রাক আর্য'। তার প্রায় এক হাজার বছর পর 'পরবর্তী আর্য' ভারতে প্রবেশ করে। শোমোজুরা বিশ্বের প্রাচীনতম রচনা ঋক্বেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণবিভাগ দেখিয়েছেন। তাতে শিক্ষকতা ও পূজা-অর্চনা করার একমাত্র ব্রাহ্মণের একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হয়েছে, — আর ক্ষত্রিয়ের শুণ্ড যুদ্ধ করার, বৈশ্যের শুণ্ড ব্যবসা-বাণিজ্য করার এবং শূদ্রের শুণ্ড সর্বকলের সেবা করবার নির্দেশ আছে। অর্থাৎ সমগ্রতঃ কর্মবিভাগকে (Division of labour) প্রয়োজনীয় বলতেই হবে কিন্তু অযোগ্য হলেও শিক্ষকতা-যজ্ঞন-মানন নিয়ে একমাত্র ব্রাহ্মণই থাকবেন একচেটিয়া অধিকারপ্রাপ্ত আর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র যোগ্য হয়েও তাঁদের সেই যোগ্যকর্মই বঞ্চিত থাকবেন, — স্বার্থপর শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতাদের সেটাই ছিল নিহেণিগড় বিধান। নির্দিষ্ট কোনো অপরূহে মনুর আইনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শাস্তি আনুপাতিক হারে কয়েক 'পদ' মাত্র, আর শূদ্রের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। অর্থাৎ 'প্রাকৃতিক শক্তি' সম্পর্কে বেশী জ্ঞানীরা ব্রাহ্মণ, — অন্যরা কেউ সামন্ত প্রভু বা রাজা হলেন। বাকীরা অন্যান্য



কাজ যথা কৃষি ও শিল্প কাজে নিযুক্ত হতো। তারা সকলে নতুন জনপদ দখল করলে অধিকৃত স্থানের অধিবাসীদের উপর দাসপণ্য নিয়ে শুরুরাগে অমানবিক আচরণ করতে থাকতো।" [উনিবিংশ শতকের কয়েকটি চিত্রনায়ক : পুনর্মূল্যায়ন। — সুধী প্রধান (শারদ উদয়ন ১৯৯৫ পৃ ৭)]। পরবর্তীকালে কী ঘটনা?

বাত্তব ঘটনা এই যে, কালক্রমে অনেক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়বৃত্তি নিয়ে সামন্তপ্রভু বা রাজা হয়েছেন, অনেক ক্ষত্রিয় যুদ্ধ বা দেশসুধাকা বৃত্তি ছেড়ে বৈশ্য বা ব্যবসায় বৃত্তি ধরেছেন, অনেক বৈশ্য কৃষি-শিল্পকর্মে নিযুক্ত হয়েছেন, অনেক শূদ্র ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের বৃত্তি ধরেছেন। কোচারাজ হলেম সংশ্লিষ্ট ব্রাহ্মণের পুত্র পুণ্য অনুসারে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য তেলী, সোনারবোনে প্রমুখ অসং শূদ্র ব'লে স্বীকৃত হলেম। অর্থাৎ বেদ নির্ধারিত কর্মনিষিদ্ধ বর্ণভাণ্ড আজ আর প্রচলিত নেই, — সব মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। ড. রাধাকৃষ্ণন বলেছেন, — "ব্রাহ্মণত্ব কেমনো শ্রেণী নয়, একটা ভাব। সবাই তো আনন্দ করতে পারে, যদিও অনেকে ব্রাহ্মণঘরে জন্মেও ব্রাহ্মণহীন হয়। ব্রাহ্মণস্বের সঙ্গে বৃত্তি, শিক্ষা, জন্ম বা লিঙ্গের কোনো সম্পর্ক নেই। যে অবস্থায় আন্তরিক প্রসাদ ও বহিঃসৌন্দর্যের সম্মিলন ঘটে, সেই ব্রাহ্মণত্বে সকলের অধিকার আছে।" (ধর্ম ও সমাজ (হিন্দুধর্ম ও সংস্কার))। বিশ্রামিত্র ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হয়েছিলেন। এটি একটি উদাহরণ। বিপ্লবী ডাউদারগ একলবা ও শবুক, সে প্রসঙ্গ এখানে শেষ করা ভালো।

সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে অর্থনীতির জগতে এলো ব্যাপক পরিবর্তন। আগে যারা যত বেশী গোসম্পদ, দাস-দাসীর মালিক হতো তারা ছিল তত বেশী ধনবান। এককালে প্রাণীসম্পদ বা অন্য সামগ্রী বিনিময় হ'তো, মুদ্রার প্রচলন হয় পরে। এই মুদ্রা-মূলধন বা পুঁজি দ্বারা মুন্সিয়ে লোক অর্থনৈতিক জগতে প্রভাব বিস্তার করলো, এই জগতকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলো। ধর্ম প্রবর্তক-প্রচারকগণ চেষ্টা করেও মানুষে মানুষে হানাহানি থামাতে পারলেন না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বরং বাঁচার মতন খাদ্য সংগ্রহ, সুশিক্ষা বিস্তার, সুস্বাস্থ্য, সুস্থ চাক-করু কাটা সুরক্ষা করা কঠিনতর হলো, — চিত্তাবিদসহ প্রকৃত সাধারণ মানুষের বিবেচনার বিষয় হয়ে উঠলো, 'আগে চাই ক্ষুধা নিবুটি, নানাক্রম প্রতিকূল অস্বাস্থ্যের মধ্যে জীবন রক্ষা, তারপর অন্য কথা।' এর সমাধানসূত্র দিলেন কার্ল মার্কস তাঁর 'পুঁজি' গ্রন্থ লিখে। বোঝা গেল : সমাজে দুটি শ্রেণী আছে। শ্রমিক ও পুঁজিপতি। বোঝা গেল পুঁজিবাদ ধ্বংস করে শ্রেণীহীন সমাজ গড়া প্রয়োজন। তফসিলী জাতি, উপজাতি ও অন্য অনগ্রসর জাতির মধ্যে শ্রমিক ও পুঁজিপতি আছে, — শুধু তফসিলীদেরকে দলিত বলা পুরাপুরি ঠিক নয়।

১৯৮০ সালে গুজরাট ও মারাঠা অঞ্চলে সংরক্ষণবিধৌদী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। তারা আগে থেকে তথাকথিত দলিত শ্রেণীর সংরক্ষণের পক্ষে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল। তারও আগে সর্বণ ও দলিত যা বোঝায় তাদের নিয়ে ইংরাজ বিরোধী আন্দোলন হয়েছিল। ইসলাম-অভিমানের আগে এ প্রশ্ন ছিল না। ইসলাম-অভিমান পর্যন্ত ধর্মনিষিদ্ধিক সংঘর্ষ হয়েছে কিন্তু জাতপাত ভিত্তিত নয়। প্রায় সব দাস-দাসীস্থানীয়, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে, নিপীড়িত-নিপীড়িতরা ইসলাম ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে হাজারে হাজারে সেই ধর্ম গ্রহণ করেছে। ইংরাজ আগমনের কয়েক বছর পিছে-আগে থেকে একইভাবে ব্রিটন হয়েছে বহুলাক। ইসলাম ধর্মাবলম্বী বর্ণবিদ্বেষী লোক এসেদের অধিবাসী হয়ে গেছে। ইংরেজরা তা হতে পারে নি, হ'তে চায়ওনি। বরং তারা বর্ণশ্রমভিত্তিক ধর্মের বিবেদ ছাড়াও ধর্মবৈষম্যের বিবেচনের রূপ দিল যার ফলে

সকল স্তর থেকেই যারা পুঁজি বা অর্থসম্পদ বৃদ্ধি করতে পেরেছে তারা পুঁজিপতি শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। ইংরেজদের এটা সাংজাজবাদী ভূমিকা, কিন্তু এদেশের সর্বণ ও তথাকথিত দলিত সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে 'জাতীয়তা' বোধ জন্মিত। তাত্ত্বে উদ্ভূত হ'য়ে শানান-শোষণ থেকে মুক্ত হ'তে উভয় সম্প্রদায় ইংরাজবিরোধী আন্দোলনে সংগঠিত হয়েছিল। উনিবিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধে ওয়াহাবী বা ফরাসেজী আন্দোলনে গরীব হিন্দু-মুসলিম ইংরাজপাঁড়ন থেকে স্বাধীনতা লাভ করতে সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছিল। এই প্রসঙ্গ পৃথক বিবেচ্য, সম্রাসী বিদ্রোহ প্রভৃতির কথা স্বরবীণ। ১৯২০-২১ সালে উত্তরপ্রদেশের 'একা' আন্দোলনে রামচন্দ্র কুর্সী তাঁর আন্দোলনের মধ্যে ক্ষত্রিয়-সভাকে আনতে পেরেছিলেন। 'খৈড়া' সভ্যগ্রহের সময় গুজরাটের পাতদারদের যুব সংগঠন যথেষ্ট সক্রিয় ছিল [Stephen Cohen লিখিত প্রবন্ধে Untouchable Soldiers (Journal of the Asian Studies 1971) কিন্তু আজ বিশেষ ক'রে মনে রাখতে হবে যে একদিক গরীব ও সর্বহারা তফসিলী এবং অন্যদিকে ধনী ও মধ্যবিত্ত তফসিলীদের মধ্যে সম্পদগত-সংস্কৃতিগত পার্থক্য প্রকট হয়েছে। ধনী-বুজুয়া বুদ্ধিজীবী তফসিলীরা অর্থমঞ্চের সুবিধা গ্রহণ করতে পারছেন। অজ্ঞতা-নিরক্ষরতার জন্য সর্বহারাগণ তার প্রায় কিছুই নিতে পারছেন, যা পাচ্ছে ছিটফিটা বলা যায়। জাতপাতের শ্রোণান ভুলে দরিদ্র-সংগঠনের নিয়ে সংগঠন গ'ড়ে ধনী-বুজুয়া মধ্যবিত্ত তফসিলীরা পুঁজিবাদী সংগঠনের সঙ্গে সংযুক্ত আছে আবার গণতান্ত্রিক সংগঠনেও যুক্ত আছে। এ যেন বাড়ির তিনজনের একজন পুঁজিবাদী সংগঠনে, একজন গণতান্ত্রিক সংগঠনে এবং একজন মধ্যপন্থী (ডুডুও খাই টামাকও খাই) সংগঠনে যুক্ত আছে কিন্তু গভীর রাতে বাড়িতে ব'সে সবার খবরখবর লেনদেনের মধ্য দিয়ে সলাপারামশে জাতপাতের ধ্বজাটি রক্ষা করাটাই আসল কাজ।

পুঁজিতত্ত্ববাদী আর গণতত্ত্ববাদী দুটি মতবাদে যখন সমগ্র বিশ্ব বিভক্ত তখন জাতপাতের দৃষ্টিতে ধনী ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা দলিত সম্প্রদায়ের নামাঙ্কিত হ'য়ে যদি বলেন যে তাঁরা গণতত্ত্ববাদীদের সঙ্গে আছেন এবং সর্বহারাদেরকে তাঁদের সঙ্গে সামিল করতে পারবেন তবে তা সর্ম্বনযোগ্য কি না সমস্ত গণতত্ত্ববাদীদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। আমার নিজের সিদ্ধান্ত এই যে দলিত নামাঙ্কিত এই আন্দোলন সংকীর্ণ এবং বিভ্রান্তিকর আন্দোলন। দলিত-সাহিত্যও সংকীর্ণ ও বিভ্রান্তিকর সাহিত্য-আন্দোলন এবং তা কোনোমতেই প্রগতি সাহিত্যের সহোদর হ'তে পারে না। তাহলে 'মহেশ' গল্প রচয়িতা শরৎচন্দ্র, 'বিষাদসিন্ধু' রচয়িতা মীর মোশাররফ হোসেন কি 'সংখ্যালঘু সাহিত্য' রচনাকার? — বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকেই কি 'সর্বণ সাহিত্য' রচনাকার? — 'সদৃগতি' বা 'কফন' গল্পের জন্য প্রেমচন্দ্র, 'গণদেবতা' উপন্যাসের জন্য তারশঙ্কর, 'তৃতীয় সেক' উপন্যাসের জন্য নিমিলা আচার্যকে 'দলিত সাহিত্য' রচনাকার বলতে হবে? তা বলা যায় না। অতএব প্রগতি সাহিত্যকে বিশ্বব্যাপকতায় 'প্রতিক্রিয়াশীল' সাহিত্যের বিপরীতে একান্ত 'সাহিত্য' পদবাচ্যই বলা সমীচীন।

প্রগতি সাহিত্য কী? সংক্ষেপে হ'লেও বলতে চাই : প্রগতি সাহিত্য যুগের প্রতিফলিত সাহিত্য যা সমগ্র বিশ্বমানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে সৃষ্টি-সাহিত্যের পক্ষে এবং অসুস্থ-অবক্ষী সাহিত্যের-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে মানুষের মনে নির্মল রসায়ন দনে। সাহিত্য কোনোমতেই উদ্দেশ্যবিশীল নয়। কারো কারো ধারণা : সংস্কৃতি বা সাহিত্যে সৃষ্টি-অসুস্থ ব'লে





## কোন একদিন

প্রফুল্ল রায়

দু ধারে ধানের খেত। মাঝখান দিয়ে সরকারি পাকা সড়ক, এ অঞ্চলে যাকে বলে পাকী,—  
একে বেকে, পাক খেয়ে খেয়ে দিগন্তে গিয়ে মিশেছে।

আষাঢ় মাস শেষ হয়ে এল। ভরা বর্ষা। যদিও যতদূর চোখ যায়, গাভিন মোয়ের  
মত কালো কালো মেঘ। মেঘের ভাঙে আকাশটা যেন অনেকখানি নেমে এসেছে।

এখন দুপুর। কিন্তু সূর্যটাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। নিরেট মেঘপুঞ্জের ভেতর দিয়ে  
চুইয়ে চুইয়ে যে রূপগ, ফ্যাকাসে আলোটুকু বেরিয়ে এসেছে তাতে কোনো কিছুই স্পষ্ট নয়।  
অনেক দূরে আকাশ যেখানে পিঠ ঝুকিয়ে দিগন্তে নেমেছে সেখানে আবছা আঁচড়ের মতো  
পাহাড়ের উঁচু নিচ একটা রেখা চোখে পড়ে।

এই দুপুরবেলায় মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলা দিয়ে তিন চাকাওলা বিচিত্র একটা গাড়ি  
চালিয়ে সোজা পূর্ব দিকে চলেছে ধনৈরি। গাড়িটা একসময় ছিল সাইকেল রিক্সা। পেছনের  
সিট টিট ফেলে দিয়ে সেখানে বসানো হয়েছে চেরা বাঁশের পাটাতন। তার ওপর তেরপলের  
ছাউনি। পাটাতনে আড়াআড়ি শোয়ানো রয়েছে আড়াই হাত চওড়া, পাঁচ হাত লম্বা একটা  
তক্তা। আর আছে মোটা দড়ির খুপ, তেল-পাকানো বাঁশের লাঠি এবং ঢাউস একটা চিনের  
বাল্ল। বাল্লটার ভেতর আছে পনেরটা খাপে ঢাকা ছুরি, আট দশটা রঙিন কাঠের বল, ইত্যাদি।  
নানা ধরনের খেলা জানে ধনৈরি। এগুলো তার সরঞ্জাম।

এবার ধনৈরির দিকে তাকানো যেতে পারে। তার বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ, গায়ের রং  
পোড়া কামার মতো। গাল দুটো ভাঙা। চামড়া খসখসে। চুল উঠে উঠে চাঁদ্রির অনেকটা  
জায়গা ফাঁকা। কষ্টা ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে। একসময় সে যে টগবগে, হট্টাকটা চেহারার  
একটা জোয়ান ছিল সেটা তার হাত-পায়ের মোটা মোটা হাড়গুলোর দিকে তাকালে টের  
পাওয়া যায়। শরীরে ভাঙচুর শুরু হলেও ধনৈরি এখনও যথেষ্ট শক্তির অধিকারী।

ভোরবেলায়, তখনও কাকপক্ষির ঘুম ভাঙে নি, তাদের বারহািলি গাঁ থেকে গাড়িতে  
মালপত্রের চাপিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল ধনৈরি। সে যাবে চল্লিশ মাইল দূরের ধারাবনি টাউনে—  
এই এলাকার সব চেয়ে বড় জমি-মালিক মৈথিলি ব্রাহ্মণ রামবহাল বা'র বাড়িতে। সেখানে  
পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা হেলে যাবে।

কয়েক বছর আগে গিয়ে গঞ্জে আর ছোট ছোট টাউনে ঘুরে বাদর, সাপ, ঘোড়া আর  
ভালুকের খেলা দেখাত ধনৈরি। কিন্তু তার জন্তুগুলো একে একে মরে যাওয়ায় ওই সব  
খেলা বন্ধ করে দিতে হয়েছে। নতুন করে ফের যে বাদর টাদির কিন্নরে তেমন পয়সা তার  
নেই। তা ছাড়া জন্তু জানোয়ার নিয়ে আজকাল খেলা দেখানোর প্রচুর ঝঞ্জটি। সরকার থেকে  
অনেক রকম কড়াকড়ি করে দিয়েছে।

তাই ধনৈরিকে খেলার ধাঁচ পালটে ফেলতে হয়েছে। পেট তো চালাতে হবে। ক'বছর  
ধরে সে রপণায় চড়ে দৌড়বাজি দেখায়, দু হাতে দশটা রঙিন বল নিয়ে বিদ্রোহ গতিতে  
লোফালাফি করে কিংবা কাউকে কাঠের পাটাতনে ঠেসান দিয়ে দাঁড় করিয়ে দু'থেকে তার  
চারপাশে ধারাল ছোরা ছুঁড়তে থাকে।



কিন্তু এ সব খেলার সমঝদার প্রায় নেই বললেই হয়। লোকে আজকাল সিনেমা দেখে, চিড়ি দেখে। নেহাত রামবহাল ঝা'র মতো দু-চারজন সরঞ্জাম বলে ধনেরি কোনোরকমে টিকে আছে। রামবহাল সিনেমা টিনেমা পছন্দ করেন না, ছুরিখেলা লাঠিখেলার দিকেই তার ঝোঁক। মাঝে মাঝে তিনি ধনেরিকে ডেকে পাঠান। কালও লোক পাঠিয়ে খবর দিয়েছিলেন। তাই আজ সে ধারাবানি চলছে। রামবহাল কোন খেলাটা দেখতে চাইবেন, আগে থেকে জানান না, তাই যখনই ডাক আসে ধনেরি তার যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে ধারাবানিতে যায়।

কাল শেষ রাত থেকে এক নাগাড়ে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। থামার কোনো লক্ষণ নেই। তোড়টা মাঝে মাঝে বাড়ে, কখনও একটু কমে।

বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচানোর জন্য গাড়িটার সামনের দিকের হ্যাণ্ডলে মাস্কাতার আমলের একটা ছাতার বাঁকানো ডাণ্ডা বেঁধে রাখা হয়েছে। কিন্তু শতছিন্ন ছাতাটার অসুন্দর দরজা জনালা দিয়ে যেভাবে জলের ছটি ঢুকছে তাতে একেবারে নিয়ে গেছে ধনেরি। ধোঁকার টাটির মতো ওটা না থাকলেও চলত।

ধনেরির পরনে খাটো মাপের ফুল প্যান্ট আর তালি-মারা জামা, পায়ের টায়ার-কাটা স্যান্ডেল। সে প্রাণপণে প্যাডেল করে যাচ্ছে।

গাড়িটা তার নিজস্ব নয়, দরকার মতো দু-একদিনের জন্য সে এটা ভাড়া নিয়ে থাকে। পাকীর দু'পাশের খেতওলোতে হাঁটু সমান জল। সবুজ ধানগাছগুলো তার ওপর মাইলের পর মাইল জুড়ে মাথা তুলে আছে। মাঝে মধ্যে দু'র পাখার বাস, লরি, ভ্যান কি রয়েল গাড়ি পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কোনো দিকে লক্ষ নেই ধনেরির। কখন ধারাবানিতে পৌঁছবে সেটাই তার একমাত্র চিন্তা। আসলে হাতের পয়সাকড়ি ফুরিয়ে এসেছে। রামবহাল ঝা'র কাছ থেকে কিছু টাকা পেলে কয়েকটা দিনের জন্য সে নিশ্চিত হতে পারে।

হঠাৎ কারও গলা কানে এল, 'এই - রুথো - রুথো'। চমকে সামনের দিকে তাকাতো ধনেরির চোখে পড়ল একটা তিরিশ-বত্রিশ বছরের মেয়েমানুষ সমানে হাত নেড়ে তাকে ধামতে বলছে।

কাছাকাছি এসে গাড়ির গতি একেবারে কমিয়ে দেয় ধনেরি। মেয়েমানুষটার জামাকাপড় ভিজ জবজবে হয়ে গিয়ে লেপটে আছে। সে জিজ্ঞেস করে, 'গাড়ি রুথতে বললে কেন?'

তার কথার উত্তর না দিয়ে অবাক বিষ্ময়ে মেয়েমানুষটি বলে ওঠে, 'আরে তুমি!'

ভাল করে লক্ষ করতই ধনেরিও তিনে ফেলে। বিষ্ময়টা তারও কম নয়। মেয়ে ছাওয়া আকাশের নিচে, এই দুপুরবেলায় অবিরাম যখন বৃষ্টি ঝরে যাচ্ছে, প্রায় নির্জন পাকীতে চুনিকাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেবে, ভাবতে পারে নি সে। একই কথা বলে ধনেরি, 'তুই!'

'হী, হামনি—'

'কোথায় যাচ্ছিস?'

'ধারাবানি। তুমি?'

'অমিও।'

'অনেকটা রাস্তা হেঁটে হেঁটে থকে গেছি। গৈয়া গাড়ি, ভেসে গাড়ি, যাকেই ধামতে বলি কেউ ধামে না। শেষ পর্যন্ত তুমি গাড়ি রুথলে। আমাকে ধারাবানি পৌছে দেবে?'

ধনেরি বলে, 'ঠিক হ্যাঁ, পেছন দিক দিয়ে উঠে পড়।'

কথামতো উঠে তেরপলের ছাউনির তলা দিয়ে ধনেরির পেছন দিকে কোনোকানি বাঁশের

পাটাতনে জড়সড় হয়ে বসে পড়ে চুনিয়া।

ঘাড় হেলিয়ে তাকে দেখছিল ধনেরি। চুনিয়া কতক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজছে, কে জানে। তার হাত-পায়ের আঙুল সিঁটিয়ে গেছে। গালে কপালে ভেজা চুল লেপটে আছে। বুকের ওপর আড়াআড়ি দুটো হাত রেখে সে কাঁপছিল।

ধনেরি টিনের পেছায় বাজটা দেখিয়ে বলল, 'ওটার ওপর আরাম করে বোস। কাঠের পটার তলায় একটা গামছা আছে। সেটা বার করে মাথা মুছে নে।'

যা যা বলা হল তাই করে চুনিয়া।

ধনেরি ফের গাড়িটা চালাতে শুরু করে। বৃষ্টির জোর এখন কম। মিহি চিনির দানার মতো ঝরে যাচ্ছে।

বিষ্ময়ের যোর এখনও কাটেনি ধনেরির। সামনে চোখ রেখে সে জিজ্ঞেস করে, 'তুই আসছিস কোথেকে?'

চুনিয়া উত্তর দেয়, 'গাঁও দুমরিয়া।'

'সে তো বহোত দূর। কমসে কম সাত মিল' জরুর হোগা।'

'হী।'

'এতটা রাস্তা পায়দল এসেছিস।'

'কা করে। গাড়ি চড়ার পইসা কোথায়?'

'আমার সাথ দেখা না হলে কী হত!'

চুনিয়া অল্প হাসে, 'কী আর হত; পায়দলই ধারাবানি যেতাম।'

ধনেরি বলে, 'বহোত কষ্ট হত।'

'আমাদের মতো মানুষের কষ্ট তো জীওনভর লেগেই থাকে। তা নিয়ে ভাবলে চলে।'

'ঠিক বাত'

হঠাৎ কী খেয়াল হতে ধনেরি শুধায়, 'দুমরিয়া থেকে আসছিস — মতলব —'

চুনিয়া বলে, 'হী, ওখানেই তো আমার সসুরাল।'

কোমরে একটা ক্ষিপ্ৰ মোড় দিয়ে ঘুরে বসে ধনেরি। ধন্দ-বরা মানুষের মতো জিজ্ঞেস করে, 'মধিপুয়ায় শিউলারের সাথ তার শাদি হয়েছিল না?'

চুনিয়া মুখ নিচু করে জানায়, শিউলারের সঙ্গে তার বিয়েটা কবেই কাটান ছাড়ান হয়ে গেছে। তারপর দুমরিয়া গাঁয়ের জগনাথের সঙ্গে তার দ্বিতীয় বার বিয়ে হয়। সে দোখরিয়া, অর্থাৎ দুট পুরুষের ঘর করেছে। চুনিয়া আরো জানায়, তার দু নম্বর মরদটি জীবিত নেই। প্রথমে নেশাভাং করতে আদমীটা; বছর দেড়েক আগে গলায় রক্ত উঠে মারা যায়।

শুনতে শুনতে রীতিমত দুঃখই হয় ধনেরির। চুনিয়া তাদের গাঁ বারহৌলিরই মেয়ে। কী সুন্দরই না দেখতে ছিল সে। তার জন্য কম বয়সে একেবারে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল ধনেরি। চুনিয়াও তাকে পাপলের মতো চেয়েছে। কিন্তু ওদের যে শাদি হয় নি তার কারণ একটাই। সেটা হল জাতওয়ারি সওয়াল। ধনেরির কোয়েরি, শুদ্ধ ভাষায় যাদের বলে কুশবাহাছরি। আর চুনিয়ারা দোসাদ। আলাদা জাত হওয়ায় তাদের বিয়েটা আটকে যায়।

ধনেরি যদি আবহমান কালের জাপতের প্রথা ভেঙে কিছু একটা গোলমাল পাকিয়ে বসে, সেই ভয়ে চুনিয়ার বাপ তার চোদ্দ বছর পেরুকায় আগেই রাতারাতি শিউলারের সঙ্গে শাদি চুকিয়ে ফেলে। শাদির পর মধিপুয়ায় চলে যায় সে। তারপর একবারও বারহৌলিতে

আসে নি। আসবেই বা কার কাছে? চুনিয়ার শাদির একমাসের ভেতর তার মা-বাপ দু'জনেই পর পর মারা যায়। যদি ওর দু-চারটে ভাইবোন থাকত, বাতায়চাঁটা হরত বন্ধ হত না।

চুনিয়া মথিপুরায় চলে যাবার পর একেবারে ভেঙে পড়েছিল ধনেনি। কিছুই ভাল লাগত না তার। খেত না, ঘুমতো না, উদ্‌শাস্তের মতো ঘুরে বেড়াত। বারহৌলি তার কাছে এতই অসহ্য হয়ে উঠেছিল যে একদিন উদ্‌দেশ্যহীন মতো বেরিয়ে পড়ে। বছর দুই কখনও রান্ধি, কখনও হাজারিবাগ, কখনও ধানবাদ বা খরিয়ার থেকে যাবার পর কষ্টটা ভুড়িয়ে গেলে আবার বারহৌলিতে ফিরে আসে। একটা বিয়েও করেছিল কিন্তু আওরতটা বছর না ঘুরতেই নৌচকির দলের এক ছোকরার সঙ্গে পালিয়ে যায়। তারপর থেকে ধনেনি একেবারে বাড়া হাট-পা। আগেই, তার ছেলে বয়সে মা-বাবা মরে ফৌত হয়ে গিয়েছিল।

বাপ মাসিলা ছিল গরিবের চাইতেও মালিক। বড় জমি মালিকের খেতে আর খামারে 'গতর চুরণ' খেতে সংসারের সবার পেটের দানা যোগাড় করত। ধনেনির জন্য সোনাদানা, টাকাপয়সা কিছুই রেখে যেতে পারে নি। ধসে-পড়া একটা টিনের চালা ছাড়া এক ধুর বাড়তি জমি পর্যন্ত তাদের নেই।

অল্প বয়সে এক মাদারি খেলোয়াড়ের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে জীবজন্তু নিয়ে নানা ধরনের চমকদার খেলা শিখে নিয়েছিল ধনেনি। সেই সঙ্গে হাতের অজর কসরতো। এই খেলাগুলো না শিখলে তাকে না খেয়ে ভুখা মরতে হত।

নিজের নানা ধরনের খেলা আর পেটের চিন্তা নিয়ে দিন কেটে যাচ্ছিল ধনেনির। কিন্তু এতকাল পর আবার যে চুনিয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, কে ভাবতে পেরেছিল!

বহুদিন আগের চুনিয়ার সেই 'পরী ব্যাঙ্গসা' চেহারা আর নেই। অনেক ভেঙে গেছে। সফেদিয়া ফুলের পাপড়ির মতো গায়ের রং জ্বলে জ্বলে এখন কালো। চামড়ার তলা থেকে হাতের মোটা মোটা শিরাগুলো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। গালে, চোখের তলায় কালচে কালচে ছোপ। তার সমস্ত শরীর জুড়ে একটা রুক্ষ, কর্কশ, পুরুষালী ভাব।

ধনেনি আবার সামনের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। সে জিজ্ঞেস করে, 'তুই তো বলছি তোর দূরসার মরদ মরে গেছে।'

চুনিয়া বলল, 'হাঁ।'

'সদুরালে কে কে আছে?'

'দুই বুড়া বুড়ী—আমার সাস আউর সসুর (শাশুড়ি আর শশুর), আর আমার একটা ছোরা—উমর পাঁচ সাল।'

'ছেলেটাকে নিয়ে তুই আবার তো সাদি করতে পারতিস?'

সোসাদ, কোয়েরি, তাতমা বা গল্পদের ঘরে কোনো মেয়ের তিন, চার, কি তারও বেশি বার শাদি করে তেঘরিয়া, চৌঘরিয়া বা পাঁচঘরিয়া হওয়াটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা। এটা কেউ গর্হিত অপরাধ মনে করে না।

চুনিয়া বলে, 'অনেকই তো শাদি করে তাদের ঘরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, लेकिन শাদিটা করি কী করে?'

'কেন? অসুবিধাটা কোথায়?'

চুনিয়া জানায়, 'নতুন বিয়ে করে অন্য মরদের ঘর করতে গেলে বুড়ো শশুর শাশুড়িকে কে দেখবে? ওরা কমজোর, সারা বছরই প্রায় নানা রোগে কাবু হয়ে থাকে। চুনিয়া ছাড়া

বুড়োবুড়িকে রক্ষা করার আর কেউ নেই। সে না থাকলে ওরা ভুখা মরে যাবে।

তাদের মতো গরিব হাতভেতদের ঘরের একটি মেয়ের এমন মহানুভবতায় রীতিমত অবাকই হয় ধনেনি। চুনিয়ার প্রতি শ্রদ্ধায় তার মন ভরে যায়। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলে, 'হাঁ! ঠিকই বলেছিস।'

একটু চুপচাপ।

তারপর ধনেনি জিজ্ঞেস করে, 'তোদের জমিন উমিন আছে?'

চুনিয়া বলে, 'কঁহা জমিন। এক ধুর ভি নেই।'

ধনেনি বলে, 'তা হলে সমসার চলছে কী করে?'

চুনিয়া জানায়, 'চাঘের মরসুমে আর ধান কাটাঁইয়ের সময় সে মনচনিয়ার বড় জমি-মালিক বিদ্যাচলী মিশিরের খেতি এবং খামারে কাজ করে। বছরের বাকি সময়টা কখনও ঠিকাদারদের কাছে, কখনও বড় গল্পের আড়তদারদের কাছে গিয়ে মাটি কাটা বা মাল বওয়ার কাজ জোঁটায়। অর্থাৎ চাঘ চাঘ ছাড়াও দুটো পয়সার জন্য নানা উৎসবুত্তিও তাকে করতে হয়।

ধনেনি জিজ্ঞেস করে, 'ধারাবনিতো যে যাচ্ছিস—কোনও কামকাজের ধন্দায়?'

'তা ছাড়া আর কী?' চুনিয়া বলে, 'গতর চুরণ' পরিশ্রম করে পয়সা কামাই আর চারটে পেটের দানা যোগাড় করা, এ ছাড়া অন্য কোনও দিকে তাকানোর ফুরসত নেই তার।

'ধারাবনিতো কী কাজ পাবি?'

চুনিয়া বলে, এখন এই ঘোর বর্ষায় আড়তদার আর ঠিকাদারদের কাছে এবং বিদ্যাচলী মিশিরের খেতে খামারে কোনও কাজ নেই। তবে ধারাবনিতো রোজ যে হাট বসে সেখান থেকে বাড়ির কাজ করার জন্য অনেকে লোক নিয়ে যায়। যেমন ঘর সাফ করা, ছাউনি মেঝামত করা, ইত্যাদি। অর্থাৎ দিনমজুরের কাজও সে করে থাকে। সে রকম কিছুর আশায় সে ধারাবনি চলেছে।

ধনেনি বলে, 'তুই তো অনেক কাম কাজ শিখেছিস দেখছি।'

চুনিয়া বলে, 'কা করে? সিরিফ পেটকা লিয়ে।'

ধনেনি চুনিয়ার সঙ্গে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। সে বলে, 'হাঁ। আমাদের মতো গরিবদের বেঁচে থাকতে হলে কত কিছুই না করতে হয়।'

চুনিয়া বলে, 'আমার কথা একগো একগো করে সবই তো শুনে নিলে। লোকেন বারহৌলি থেকে চলে আসার পর তোমার সবকিছু কিছুই জানি না।'

একটু চুপ করে থেকে নিজের কথা আস্তে আস্তে সমস্ত বলে যায় ধনেনি।

শোনার পর চুনিয়া বলে, 'তোমার ওপর দিয়েও ঝড় তুফান কম যায় নি।' তার গলায় দুঃখের সুর ফুটে ওঠে।

মুখ ফিরিয়ে কপালে একটা আঙুল ঠেকিয়ে ধনেনি বলে, 'কী করব—এটাই আমার নসিলা।'

খুব আশ্রুিকণ্ডাবে চুনিয়া বলে, 'দুনিয়ায় একেবারে একেলা হয়ে গেলে। ঘরবাড়ি না হয় পালিয়ে গিয়েছিল। লেড়কীর তো অভাব নেই। আরেকটা ঘরবাড়ি জুটলে আনতে পারলে না?'

ধনেনি বলে, 'একটা পেট চালাতেই জিভ বেরিয়ে যাচ্ছে। আরেক জনকে ঘরে আনলে



তাকে কী খাওয়াব আর নিজেই বা কী খাব! এই ভাল আছি রে চুনিয়া।’

আমতে মাথা নাড়ে চুনিয়া।

পাশ দিয়ে পর পর বারো চোদ্দটা লরি জোরে জোরে হর্ন বাজিয়ে, সমস্ত চরাচর সচকিত করে বেরিয়ে গেল। তারপর আবার দু’ধারের মাঠঘাট, শস্যক্ষেত্ৰ একেবারে নিঝুম হয়ে যায়। রাস্তার পাশে দিয়ে টেলিগ্রাফের যে তার চলে গেছে, তার ওপর গুটিমুটি মেরে বসে ক’টা মাছরাঙা আর কাক সমানে ভিজছে। দূরে কিষণদের ছাড়া ছাড়া গাওলো বর্ষার এই দুপুরে ঝাপসা দেখাচ্ছে।

গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎ কী এক ব্যাকুলতা বুকের ভেতর থেকে মোচড় দিয়ে উঠে আসতে থাকে ধনেরির। পনের বছর আগে যে মেয়েটিকে পাওয়ার জন্য অহির হয়ে উঠেছিল, এত কাল বাদে সে তার পিঠের কাছে বসে আছে। গাড়ির দোলানির তালে তালে চুনিয়ার ভেজা শরীরের ছোঁয়া এসে লাগছে তার কাঁধে বা গলায়।

ধনেরি হঠাৎ বলল, ‘তোরা সেই কথাগুলো মনে আছে?’

চুনিয়া জিজ্ঞেস করে, ‘কোনগুলো বল তো?’

ধনেরি বলে, ‘আমাদের জাত আলাগ বলে তোরা আর আমার শাদিটা হল না।’

‘হো রামজি—’ বলে ঘাড় সামান্য হেলিয়ে বৃষ্টিভেজা ভারি বাতাসে ঢেউ তুলে আচমকা হেসে ওঠে চুনিয়া। সেই হাসি এমনই যে সহজে তার খামার লক্ষণ নেই।

চমকে মুখ ফেরায় ধনেরি। বলে, ‘কা রে, কা হুয়া? পাগলের মতো এত হাসছিস কেন?’

প্রথমটা উত্তর দেয় না চুনিয়া। হাসির তোড় কিছুটা কমে এলে সে বলে, ‘তুমি সে সব মনে করে রেখেছ নাকি?’

চুনিয়ার কথাগুলো মুখের ওপর চাবুকের মতো এসে পড়ে। তার জন্য এই মেয়েটারও তো একদিন চোখে ঘুম ছিল না। খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল সে। আর আজ? চুনিয়ার প্রকটর জবাব না দিয়ে ধরা গলায় ধনেরি জিজ্ঞেস করে, ‘তুই কি সচমুচ সব ভুলে গেছিস?’

‘হো রামজি, হো কিম্বুঞ্জি—’ চুনিয়া গালে হাত রেখে মজার গলায় বলে, ‘কত সাল আগে কী হয়েছিল সে কথা কেউ মনে রাখবে নাকি! চার চারগো পেটের ধান্দা করতে আমার জালা বলে চৌপট হয়ে যাচ্ছে। আর তুমি কিনা—’ ফের হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে সে।

অল্প বয়সের সেই দিনগুলোর স্মৃতির কোনও দামই নেই চুনিয়ার কাছে। কী আশ্চর্যভাবেই না বদলে গেছে মেয়েটা। সামনের দিকে ঝুঁকে ক্রান্তভাবে গাড়ি চালাতে থাকে ধনেরি।

এতক্ষণ বৃষ্টিটা ছিল ফিনফিনে, হালকা। হঠাৎ তার জোর বেড়ে গেল। সমস্ত চরাচর ঝাপসা করে দিয়ে লক্ষ কোটি সীসার ফলার মতো জল নেমে আসছে। উত্তর আর দক্ষিণ দিক থেকে পাহাড়ের মতো বিশাল বিশাল কালো মেঘ বাতাসের ধাক্কা খেতে খেতে চারদিকে এলোপাখাড়ি ছোটোছোটো করছে।

এক নাগাড়ে কিছুক্ষণ বন্ধার পর বৃষ্টির তোড় ফের কমে আসে।

পুরানো কথা নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করল না চুনিয়া। হঠাৎ কী খেয়াল হতে ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করল, ‘ধারাবিনিতে তুমি কোথায় যাচ্ছ?’

ধনেরি বলে, ‘বড়ো জমি মালিক রামবহালজির হাভেলিতে। খেলা দেখাবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছেন।’

‘ওখানে কতক্ষণ থাকবে?’

‘তা কি বলা যায়? খেলা দেখাতে দেখাতে হয়ত সাম (সন্ধ্যা) হয়ে যাবে। যদি মালিক থেকে যেতে হুকুম করেন তা হলে কবে বারহেলিতে ফিরব, ঠিক নেই। সবই রামবহালজির মর্জি।’

আকাশের ভাবগতিক ভাল করে দেখে নিয়ে চুনিয়া বলে, ‘আসামনের যা হাল বারীষ আজ পুরা থামবে না। ধারাবনির হাটিয়ায় গিয়ে কামকাজ জুটবে কিনা বুঝতে পারছি না। কিছু পাওয়া গেলে যারা কাজ দেবে তাদের সঙ্গে চলে যাব। না পেলে দুমরিয়ায় ফিরে যেতে হবে। তাই ভাবছিলাম—’

ধনেরি জিজ্ঞেস করে, ‘কী ভাবছিলি?’

‘তোমার খেলা জলদি শেষ হলে ফেরার সময় তোমার গাড়িতে করে অনেকটা রাস্তা যাওয়া যেত।’

‘এক কাজ কর না—’

‘কী?’

‘রামবহালজির হাভেলিটা চিনিস?’

‘না।’

‘যাকে পুছবি সেই বলে দেবে।’

‘রামবহালজির হাভেলির কথা বলছ কেন?’

ধনেরি বলে, ‘হাটিয়ায় গিয়ে কাজ না পেলে সিধা ওখানে চলে যাস। আমার খেলা দেখানো হলে তোকে গাড়িতে তুলে নেব।’

চুনিয়া বলে ‘ঠিক হায়।’

ধারাবনি টাউনে ঢোকার মুখে, ডান দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে হাট বসে। প্রচণ্ড বর্ষার কারণে আজ সেটা জমে নি। লোকজন খুব কম। বেশির ভাগ হাটের চালাই ফাঁকা পড়ে আছে। ব্যক্তিগতভাবে মালপত্র সাঞ্জিয়ে বসেছে দোকানদারেরা। কিন্তু কেনাকাটা করার লোক নেই বললেই হয়।

হাটের কাছে এসে চুনিয়া বলল, ‘কুখো ইঁহা।’ গাড়ি থামলে সে নেমে পড়ল, ‘আমি চলি—’ হাটের চালাগুলোর দিকে পা বাড়াতে গিয়ে কি ভেবে ঘুরে দাঁড়ায়। বলে, ‘তুমিনি ইঁহা খোড়েসে তঁহব য়াও—’

ধনেরি শুধায়, ‘কায়?’

‘মজুর নেবার জন্যে লোকজন এসেছে কিনা খবর নিয়ে আসি। যদি কেউ না এসে থাকে তোমার সঙ্গে রামবহালজির হাভেলিতে যাব। ওখানে কি কামকাজ কিছু জুটতে পারে?’

‘জানি না।’

‘রামবহালজিকে বলে দেখবে যদি উনি গরিব আওরতকে খোড়েসে কিরণা করেন—’

একটু চিন্তা করে ধনেরি বলে, ‘ঠিক হায়, বোলেগা। তুই তুরন্ত খোঁজ নিয়ে আয়।’

হাটের সারি সারি চালা যেখানে শেষ হয়েছে তারপর ফুটিফাটা টিনের একটা মস্ত ছাউনি।

সেটার তলায় চারদিকের দিনমজুরেরা রোজ এসে জড়ো হয়। পয়সাওলা গেরস্তরা তাদের ভেতর থেকে পছন্দমতো কাজের লোক বেছে নিয়ে যায়। আজ জায়গাটা সুনসান। যারা কাজ দেবে তারা তো আসেই নি, একটা মজুরকেও দেখা যাচ্ছে না।

কোনও অশাই যখন নেই তখন ফাঁকা ছাউনির তলায় বসে থেকে কী হবে? চুনিয়া রাস্তায় ফিরে আসে।

ধনেরি জিজ্ঞেস করে, 'কী হল রে?'

'কেউ আসে নি। কোই ভরোসা নেহী।'

'তা হলে আমার গাড়িতে উঠে পড়।'

পেছন দিক দিয়ে উঠে ফের সেই চাউস বাস্তার ওপর বসে চুনিয়া।

শহরের দক্ষিণ দিকের শেষ মাথায় তিন বিঘে জায়গার মাঝখানে রামবহাল কা'র বিশাল তেতলা বাড়ি। দেওয়ালগুলো চুন গুঁরিক গাঁথনি-দেওয়া কম করে চল্লিশ ইঞ্চি পুরু। বিরাট বিরাট দরজা জানালা। প্রতিটি দরজায় পেতলের ওড় বসানো। গোটা বাড়িটাকে ঘিরে দশ হাত উঁচু কম্পাউন্ড ওয়াল। রাস্তার দিকে প্রকাণ্ড লোহার গেট। সেখানে গলায় টোটার মালা খোলানো দারোয়ান হামেহাল মজুত থাকে।

ধনেরিরা সেখানে এসে দেখল, 'গেটের পাশ্বা দুটো হাট করে খোলা। দারোয়ান একধারে তটু হয়ে দাড়িয়ে আছে।

ভেতরে তখন হলুদ কাণ্ড চলছে।

গেটের পর অনেকটা ফাঁকা জমি। তারপর মূল বাড়িটা। সামনের দিকে পনের হাত চওড়া শ্বেত পাথরের টানা বারান্দা। সেখানে বিউ-মালিই খাওয়া, বাড়ি গর্দানো ঠাসা রামবহাল কা বাঘের মতো গজরাছেন, 'ভুল্লরের ছোঁয়াদের লাখ মেরে বার করে দেব। পাইসা দিয়ে আমি কতগুলো নিকম্মা পুবেছি। খেয়ে খেয়ে একেকটা হাঁধী হয়ে উঠছে। কামের বেলায় কুছ নেহী। নিকাল যা — নিকাল যা —' রাগে তার মুখ মেন ফেটে পড়বে।

বারান্দার তলায় বর্ধানো চহরে কয়েক গণ্ডা নৌকর ঝিপঝিপে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে মাথা নিচু করে দাড়িয়ে আছে।

গেটের বাইরে গাড়িটা থামিয়ে দিয়েছিল ধনেরি। ভেতরের দৃশ্যটা চোখে পড়তে ভীষণ দমে যায় সে। রামবহাল যে রকম ক্ষিপ্ত হয়ে আছেন তাতে খেলা দেখার মতো মেজাজ নিকম্মরই নষ্ট হয়ে গেছে। কটা টাকার আশায় প্রচুর লটবহর গাড়িতে তুলে সেই ভোর থেকে একটানা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এতটা রাস্তা এসেছে সে। বাটনিটিই তার বরবাদ হয়ে গেল। তা ছাড়া চুনিয়াকে না বললেও মনে মনে ভেবে রেখেছিল, রামবহালজির হাতে গায়ে ধরে কিছু পয়সা ওকেও পাইয়ে দেবে। আদমীটার দিল খুব দরাজ। মনমেজাজ ভাল থাকলে কাউকে ফেরান না।

বদকুধারী দারোয়ানটা ধনেরিকে দেখতে পেয়েছিল। সে তাকে অনেকদিন ধরেই চেনে। রামবহালজি ধনেরির খেলার একজন বড় সমদার, তিনি তাকে খুবই পছন্দ করেন, এটা দারোয়ানের ভাল করেই জানা আছে। সে বলে, 'খেলা দেখাতে এসেছো বৃদ্ধি?'

'হী—' ভয়ে ভয়ে, নিচু গলায় ধনেরির বলে, 'লেনিন বড় সরকার এত গুঁস্কা হয়ে আছেন। কী করব, বুঝতে পারছি না। লোঁট যায়েগা—কা?'

দারোয়ানও ধনেরিকে কম পছন্দ করে না। রামবহাল তো একা ওর খেলা দেখেন না, বাড়ির কাজের লোকেরা তো বটেই, ধারাবানি টাউনের লোকজনদেরও খেলার সময় ডাকিয়ে আনেন।

দারোয়ান ধনেরির একজন অত্যন্ত গুণমুগ্ধ দর্শক। সে এমন গুস্তাদ খেলোয়াড় আগে কখনও দেখে নি। বলল, 'এত কষ্ট করে এলে। ফিরে যাবে কেন? ভেতরে যাও—'

'লেনিন—'

'সরকার তোমাকে খবর দিয়ে আনিয়েছেন,—তাই না?'

'হী।'

দারোয়ান জানে, না ডাকলে ধনেরি কখনও এখানে আসে না। কিছুক্ষণ চিন্তা করে সে বলল, 'তুমি হাভেলি পর্যন্ত এসে যদি দেখা করে না যাও সরকার তোমার ওপরও গুঁস্কা হবেন।'

ধনেরি শুধোয়, 'ছে সাত সাল আমি এ বাড়িতে আসছি। আগে কখনও বড়ে সরকারের এত চড়া মেজাজ দেখিনি। কি হয়েছে?'

'ঘোড়া ভেগে গেছে।'

'কিসের ঘোড়া?'

'অন্দর গেলেই বুঝতে পারবে।'

একরকম মরিয়া হয়েই শেষ পর্যন্ত গাড়িটা চালিয়ে ভেতরের চহরে চলে এল ধনেরি। গলার শিরা ছিঁড়ে এখনও তর্জনগর্জন করে চলেছেন রামবহাল। হঠাৎ ধনেরিকে দেখে শরীরের সব রক্ত মাথায় চড়ে যায় যেন তাঁর। কষ্টপর আরো কয়েক পর্দা চড়িয়ে চিৎকার করে ওঠেন, 'কী চাই এখানে? ভাগো—ভাগো ইহাসে—'

গাড়ি থেকে নেমে রামবহালের উদ্দেশে চহরে মাথা ঠেকিয়ে হাতজোড় করে জড়সড় ভঙ্গিতে ধনেরি বলে, 'সরকার, আপনি আমাকে আসতে বলেছিলেন—' ভয়ে তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে আর দুই হাট খরখর কাঁপছে।

রামবহালের হয়ত মনে পড়ে গেল। গলার স্বর সামান্য নামিয়ে বললেন, 'হী বলেছিলাম। লেকেন আজ খেলা দেখার সময় নেই। পরে আবার খবর দেব। এখন ভাগো—'

আর কিছু বলতে সাহস হয় না ধনেরির। এদিকে বৃষ্টি থামার আদৌ কোনো লক্ষণ নেই। অবিরাম ঝরেই চলেছে। ফের মাইলের পর মাইল গাড়ি চালিয়ে ভিজে ভিজে ফিরে যেতে হবে। হতাশায় চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসার উপক্রম। ক্রান্তিতে হাত-পা ভেঙেচুরে আসছে তার, কিন্তু ফেরা ছাড়া আর উপায়ই বা কী।

গাড়ির মুখটা ঘুরিয়ে ধনেরি চালকের সিটে উঠতে যাবে, রামবহাল পেছন থেকে ডাকলেন, 'এ ধনেরি রুখ যা।'

ধনেরি বেশ অবাক হয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। রামবহাল তাকে কাছে ডেকে বলেন, 'তুই তো জবরদস্ত খিলাড়ি। আমার একটা কাজ করে দিতে পারবি?'

ধনেরি বলে, 'কী কাজ সরকার?'

রামবহাল বলেন, 'তুই তো জানিস আমার ঘোড়ার খুব শখ।'

'জানি সরকার।'

ক'বছর ধরে নিয়মিত এখানে আসার কারণে রামবহালের মর্জি মেজাজ, পছন্দ অপছন্দ সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনে ফেলেছে ধনেরি। তাঁর হাভেলির পেছন দিকে আসফেস্টের ছাউনির তলায় তিনটে পুরনো মডেলের গাড়ি আছে। কিন্তু মাটিরো তিনি জুটিং কখনও



চড়ে থাকেন। ফিটনই তাঁর বেশি পছন্দের। চার চারখানা ছড় খোলা ঘোড়ার গাড়িও আছে রামবহালের। তেজী ঘোড়াও রয়েছে পাঁচ ছটা। ফিটনে তো বটেই, মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়েও তাঁকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়।

ঘোড়াগুলোর বয়স বাড়লে যখন কমজোর হয়ে পড়ে, আগের মতো আর ছুঁতে পারে না, সেগুলো বেচে নতুন ঘোড়া কেনেন রামবহাল। এইভাবেই বছরের পর বছর চলে আসছে। রামবহাল বললেন, 'এই সাল হরিহরছত্রের (শোনপুরের) মেলা থেকে একটা ঘোড়া কিনিয়ে এনেছিলাম। লেবিন জানবরটা এমন বোহাড়া আর বেতমিজ যে কিছুতেই পোষ মানানো যাচ্ছে না।'

অনেকদিন রামবহালের হাভেলিতে আসে নি ধর্মের। তাই মেলা থেকে ঘোড়া কেনার খবরটা তার জানা ছিল না। কিছু না বলে সে তাকিয়ে থাকে।

রামবহাল বলতে লাগলেন, 'একবার ভেবেছিলাম ঘোড়াটাকে দূর করে দিই। তারপর মাথায় রাখ চেপে গেল, এত এত ঘোড়া শায়েস্তা করেছি আর এতাকে পারব না? শেষ মানাবার জন্যে তিন তিনগো আদমী ওর পেছনে লাগিয়ে দিলাম।'

ধর্মের জিজ্ঞেস করে, 'তবু কিছু হল না?'

'নেই।'

'কাল বারীষ ছিল না। আমার আদমীরা ঘোড়াটাকে টহল দিয়ে আনার জন্যে পাকীতে গিয়েছিল। আচানক ওদের চাঁট মেরে জানবরটা পশ্চিম দিকের জঙ্গলে ভেগে গেছে। কাল পুরা দিন আমার লোকেরা ওটাকে টুড়েছে, আজও বারীষ মাথায় নিয়ে জঙ্গলে গেছে, লোকের ঘোড়াটার পাক্তা নেই।'

রামবহাল ঝা নৌকরদের চতুরে দাঁড় করিয়ে কেন ধমক ধামক দিচ্ছেন এতক্ষণে তা বুঝতে পারছে ধর্মের। শুধু তাই না, এবার তিনি তাকে কী বলবেন সেটাও আন্দাজ করা যাচ্ছে। উদ্গ্রীব ধর্মের একদুষ্টে তাকিয়ে রইল।

রামবহাল নৌকরদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলতে লাগলেন, 'এই ভূচরগুলোকে দিয়ে কিছু হবে না। ঘোড়াটা আমার ফেরত চাই। ওটা যদি তুই জঙ্গল থেকে ধরে নিয়ে আসতে পারিস, পাঁচ শ রুপইয়া বকশিশ পাবি। রাজি?'

নানা ধর্মের খেলা দেখিয়ে কোনো বারই এক বেলা ভরপেট খাওয়া আর পঞ্চাশ বাট টাকার বেশি রামবহাল বা'র কাছ থেকে পায় নি ধর্মের। সেই লোক কিনা ঘোড়া ধরে এনে দেবার জন্যে পাঁচ শ টাকা দিতে চাইছে? নিজের কানে শোনার পরও যেন বিশ্বাস হতে চায় না। নগদ এতগুলো রুপইয়া হাতে পেলে তিনটে মাসের জন্যে সে নিশ্চিন্ত। হঠাৎ চুনিয়ার কথা মনে পড়ে গেল। এই সুযোগে তারও যদি দুটা পয়সা হয়ে যায়, এর চেয়ে ভাল কিছু হতে পারে না। বড় আশা নিয়ে মনেটা ধারাবন এসেছে। ধর্মের ঘোড়া ধরে আনতে পারলে পাঁচ শ টাকা পাবে আর চুনিয়া মুখ চুন করে, খালি হাতে তাদের গায়ে ফিগে যাবে, এটা হয় না। চুনিয়ার জন্যে সে চেষ্টা করে দেখবে। যদি কিছু হয় ভাল, নইলে নিজের টাকা থেকে ওকে কিছু দেবে।

ধর্মের বলল, 'কোসিস করোগা হজোর। লোকের একগো বাত—'

রামবহাল ঝা বললেন, 'কী বলবি বল—'

'আমার সাথ একজন আছে। ঘোড়া টুড়বার জন্যে তাকে সঙ্গে নিতে চাই।'

'কে সে?'

'নিয়ে আসছি।'

গাড়ি থেকে চুনিয়াকে নামিয়ে রামবহালের সামনে হাজির করে ধর্মের। বলে, 'এর নাম চুনিয়া—'

রামবহাল জিজ্ঞেস করেন, 'তোর কে হয়—ঘরবালা?'

'নেই নেই—' ধর্মের চমকে উঠে বলে, 'ও আমাদের গাঁওয়ের মেয়ে। কামকাজের খোঁজ এখানে এসেছিল।'

দু'জনের সম্পর্ক নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন করেন না রামবহাল। সংশয়ের সূরে বলেন, 'ও একটা আওরত। ও কী পারবে?'

গাছে রামবহাল চুনিয়াকে নাকচ করে দেন, তাই ভীষণ ব্যগ্রভাবে ধর্মের বলে ওঠে, 'পারবে হজোর। চুনিয়া খুব তেজী আওরত।'

কী ভেবে রামবহাল বলেন, 'ঠিক হয়। ওকে শ'ও রুপইয়া দেব। লোকের ঘোড়া ধরে আনতে না পারলে কেউ একগো পইসাও পাবি না। রাজি?'

হাতে কাজকর্ম নেই, রাজগারের অন্য কোনো ফিকিরও মাথায় আসছে না, অথচ টাকা চাই। রামবহালের কথায় রাজি না হয়ে উপায় কী? ধর্মের বলে, 'ঠিক হয়, আপনি যা বললেন তাই হবে সরকার। তবে আউর একগো বাত—'

'আবার কী হল?'

ধর্মের জানায়, সেই ভোর থেকে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে গাড়ি চালিয়ে এতদূর এসেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত পেটে একদানা খাদ্য পড়ে নি। ভূপে ভেটে জ্বলে যাচ্ছে। হজোর যদি তাদের কিছু খাবার দিতে হুকুম দেন খিসের জালা থেকে রক্ষা পায়।

রামবহাল একটা নৌকরকে দিয়ে অনেকগুলো চাপাটি আর লাড্ডু আনিয়ে ধর্মেরদের দেন।

ধর্মের চুনিয়াকে সঙ্গে করে তার গাড়ি থেকে লাঠি, মোটা দড়ি, ছুরি, দা আর খাবারগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। রাস্তায় যেতে যেতে চাপাটি চাপাটি খেয়ে নেবে।

পশ্চিম দিকের জঙ্গলটা ধর্মেরর অচেনা নয়। ওখানে একমাত্র বরা আর বিঘাত কিছু সাপ ছাড়া অন্য কোনো হিংস্র জন্তু নেই। বাদবাকি হল হরিণ, খরগোশ আর বুনা বেড়াল বা শিয়াল। তবু বন-বরা বা জংলি শুরায়দের মতিগতি আগে থেকে আন্দাজ করা মশকিল। কখন তারা যেপে উঠে তেড়ে আসবে, কে জানে। সাবধানের মার নেই, তাই ছুরি লাঠি সঙ্গে রাখা ভাল।

গাড়িটা রামবহাল বা'র বাড়ির চত্বরে রেখে দু'জনে বেরিয়ে পড়ে। যে পাক্সা সড়কটা ধরে ধর্মেরা এসেছিল সেটা ধারাবন শহরের গা ঘেঁষে পশ্চিম দিকে চলে গেছে। একসময় ওরা সেখানে চলে আসে। চাপাটি খেতে খেতে পাশাপাশি হাঁটতে থাকে।

বৃষ্টিটা হঠাৎ ধরে এল। অজ্ঞত জল ধারাবানের পর মেঘগুলো ক্রমশ ফাটাকাশে হয়ে যাচ্ছে। সুঘটিও মেঘের ফাঁক দিয়ে একটু একটু করে মুখ বাড়তে শুরু করেছে। চারদিকে এখন ফিকে, নিস্তেজ আলো। বোঝা যাচ্ছে, আর কিছুক্ষণের ভেতর আলমলে রোদ দেখা দেবে।

হাটতে হাটতে ধনেরি আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, 'রওদ (রোদ) ফুটছে। ভালই হল—কী বলিস?'

চুনিয়া তার কথায় সায দিয়ে বলে, 'হাঁ। বারীষ চললে ঘোড়াটাকে খুঁজতে মুশকিল হত।'

একসময় ধনেরিরা পশ্চিমের জঙ্গলে পৌঁছে যায়।

জঙ্গলের সামনের দিকটা ফাঁকা ফাঁকা। অল্প কিছু ঝোপঝাড়, ট্যারা বাঁকা চেহারার দু'চারটে সিসম, কৈদ আর গরান গাছ ছাড়া ছাড়া ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনে সে সবের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যায়।

ধনেরি বলে, 'আমি বাঁ দিকটা দেখছি।' তুই ডাইনে নজর রাখ।'

চুনিয়া আস্তে মাথা হেলিয়ে দেয়, 'হাঁ।'

'সামনের দিকটাও দেখবি।'

'হাঁ।'

খানিকটা এগুবার পর জঙ্গল ঘন হতে শুরু করে।

'ধনেরির কথামতো তীক্ষ্ণ চোখে বাঁয়ে এবং সামনে তাকাতে তাকাতে চুনিয়া হঠাৎ বলে ওঠে, 'একটা কথা ভাবছিলাম।'

'ধনেরিও সতর্কভাবে ডাইনে লক্ষ রাখছিল। সে জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

'এই যে আমরা জঙ্গলে এসে এত মহনত করছি। কিছু ফায়দা হবে?'

'মতলব?'

চুনিয়া তার সংশয়ের কথটা বুঝিয়ে বলে। রামবহালজির এতগুলো নৌকর দু'দিন ধরে নিশ্চয়ই জঙ্গল তোলপাড় করেছে। তারা যখন বার্ষ হয়েছেন, চুনিয়ারা কি ঘোড়াটাকে খুঁজে বের করতে পারবে? নাকি খাটনিটাই পুরোপুরি নিশ্চল হয়ে যাবে?

ধনেরি বলে, 'জঙ্গলটা তো খুব ছোট নয়। এমনও তো হতে পারে, ঘোড়াটা যেখানে আছে, রামবহালজির নৌকেরেরা সেদিকে যায় নি। তারা তো খালি হাতেই যে যার গাওয়া ফিরে যাচ্ছিল। পরসা রোজগারের একটা সুযোগ যখন হাতে এসেই গেছে, চেষ্টা করে দেখতে হবে না?'

চুনিয়া তবু খুঁত খুঁত করতে থাকে, 'ঘোড়াটা আমাদের জন্যে যে জঙ্গলে বসে থাকবে তার কি কিছু ঠিক আছে?'

ধনেরি রেগে যায়, 'বকবকানি থামাবি? ইচ্ছা না হলে ফিরে যা। আমি একলাই জঙ্গল টুঁড়ব।'

আপসের সূরে চুনিয়া বলে, 'ওসসা করো না। আচ্ছা, আমি এ নিয়ে আর কিছু বলছি না।'

এতক্ষণে রোদ বেরিয়ে গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে বনভূমিতে এসে পড়েছে। ওরা চলেছে তো চলেছেই।

হঠাৎ দুটো হুড়হুড়িয়া সাপ পাশ দিয়ে সর সর করে বেরিয়ে কোথায় অদৃশ্য হল। মানুষের পায়ের আওয়াজ পেয়ে অগ্নিনাতি পোকা উড়তে শুরু করেছে। চারদিক থেকে একটানা বিকির ডাক উঠে আসছে। সেই সঙ্গে গলা মিলিয়ে ব্যাঙেরাও ডেকে চলেছে। তার মানে বৃষ্টিটা আপাতত ধরে গেলেও পরে আবার নতুন করে শুরু হতে পারে। ব্যাঙেরা বৃষ্টির ব্যাপারটা

আগেভাগে টের পায়।

দূরে, ডান দিকে কোনোকুনি চোখে পড়ল ঝাঁকে ঝাঁকে হরিণ মোটা মোটা গাছের আড়াল দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে উধাও হয়ে যাচ্ছে।

অনেকদূর যাওয়ার পর খানিকটা জলা ভায়াগা পড়ল। তার পাড়ে প্রচুর কঁক আর মানিক পাখি পাঁচমেশালি আওয়াজ করে চলেছে। ধনেরিরের দেখে তারা তুমল হই চই বাধিয়ে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়তে লাগল।

হঠাৎ চুনিয়া চোঁচিয়ে ওঠে, 'বরা—হুই—', বলে বাঁ দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয়।

সত্যিই একটা গরান গাছের তলায় দুটো দাঁতাল গুয়ার দাঁড়িয়ে আছে। কুটিল দৃষ্টিতে তারা ধনেরিরের লক্ষ করছে।

ধনেরি এক টানে চুনিয়াকে তার পেছনে নিয়ে এসে লাঠি বাগিয়ে ধরল। কিছুক্ষণ গুয়ার দুটো কী ভাবল কে জানে। তারপর ধীরে ধীরে মুখ ঘুরিয়ে উলটো দিকে চলে গেল।

ধনেরিরাও আর দাঁড়াল না। জলার ধার দিয়ে দিয়ে ওপারে চলে এল।

হাটতে হাটতে একসময় ধনেরি লক্ষ করে, মাঝে মাঝেই পিছিয়ে পড়ছে চুনিয়া। হাজার হোক, মেয়েমানুষ তো। সারাদিনের বকলে নিশ্চয়ই কাবু হয়ে পড়েছে। সে জিজ্ঞেস করে, 'কি রে হাটতে কষ্ট হচ্ছে। বহুত থাক গেছিল?'

চুনিয়া লজ্জা পেয়ে যায়। জোরে জোরে পা চালাতে চালাতে বলল, 'নেহী। হামনি ঠিক হয়।' একটু চুপ করে থেকে বলে, 'একটা ব্যাপার আমার মাথায় আসছে না।'

ধনেরি জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

চুনিয়া জানতে চায়, উদ্দেশ্যহীন হাটাহাটি করে এত বড় জঙ্গলে ঘোড়াটাকে কিভাবে পাওয়া যাবে?

ধনেরি বলে, এলোপাথি সে হাটছে না। আপাতত তারা জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে চলেছে। এই ভাবে সোজাসৃজি শেষ মাথা পর্যন্ত যাবে। যদি ঘোড়ার দেখা পাওয়া যায় ভাল, নইলে তাদের ডান দিকে যেতে হবে। সেখানে না গেলে বাঁ ধারে।

চুনিয়া গালে হাত দিয়ে অবাক বিস্ময়ে বলে, 'হো রামজি!'

মুখ ফিরিয়ে ধনেরি বলে, 'কী হল রে?'

'পুরা জঙ্গল যদি এভাবে টহল দিয়ে বেড়াও, তাহলে দিন খতম হয়ে আমাদের নেমে যাবে।'

'এ ছাড়া আর কী করতে পারি? আজ যদি ঘোড়াটাকে খুঁজে না পাই, রাতে ধারাবানিতে কোথাও থেকে যাব। ফের সূরে সূরে এসে ফের টুঁড়তে শুরু করব।'

না, সারা জঙ্গল টহল দেবার দরকার হয় না। আরো খানিকটা চলার পর আচমকা চুনিয়ার একটা হাত ধরে ধামিয়ে দেয় ধনেরি। চলা, উত্তেজিত গলায় বলে, 'সামনে দাখ—'

পনের কুড়ি হাত দূরে আগাছার ঝোপ। সেটার ওধারে একটা তেতর গাছের তলায় একটা তেজী বাদমি রঙের ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। সেটার মুখ অন্য দিকে ফেরানো। জঙ্গটার গলায় চামড়ার সরু গলাবন্ধে অনেকগুলো পেতলের যুটি বসানো। পিঠে গদি।

ধনেরি বলল, 'এটাই বড় সেরকারের ঘোড়া।'

চুনিয়া বলে, 'রামজিকি কিরপা, আমাদের পুরা জঙ্গল টুঁড়তে হল না।'

ধনেরি বলে, 'হৌশিয়ার। এতকু আওয়াজ করবি না। আয় আমার সাথ—'



ঘোড়াটা অন্য দিকে তাকিয়ে আছে বলে ধনৈরি আর চুনিয়াকে দেখতে পাচ্ছে না। ওরা নিঃশব্দে পা টিপে টিপে জন্তুটার পেছনে তেতর গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়।  
চুনিয়া কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে ধনৈরিকে শুধায়, 'এবার কী করবে?'  
ধনৈরি তেতর গাছটা ভীক্ষ চোখে লক্ষ করছিল। গাছটার একটা মোটা ডাল হেলে ঘোড়াটার মাথার কাছাকাছি চলে গেছে।  
ধনৈরি জিজ্ঞেস করে, 'গাছে চড়তে পারিস?'  
চুনিয়া বলে, 'খুব উঁচা গাছ হলে পারব না।'  
তেতর গাছের মোটা ডালটা দেখিয়ে ধনৈরি শুধায়, 'ওখানে উঠতে পারবি।'  
ডালটা মাটি থেকে দশ বারো হাত ওপরে। ভাল করে দেখে নিয়ে চুনিয়া বলে, 'পারব।  
লোকেন ওখানে উঠে কী হবে?'

ধনৈরি তার উদ্দেশ্যটা জানিয়ে দেয়। প্রথমে সে গাছে চড়ে ডালটার ওপর দিয়ে বুক ঘষে ঘষে ঘোড়ার কাছে চলে যাবে। তার পিছু পিছু আসবে চুনিয়া। তারপর দু'জনে ঘোড়াটার পিঠে লাফিয়ে পড়ে ওটাকে রামবহালজির হাভেলিতে ছুটিয়ে নিয়ে যাবে।  
পরিকল্পনাটা তেমন মনোপূত হয় না চুনিয়ার। সে বলে, 'তুমি ঘোড়ায় চড়তে জানো?'  
'জানি। মাদারি'র খেল যখন দেখামত তখন শিখেছিলাম।'  
'লোকেন আমি কখনও ঘোড়ায় চড়ি নি।'  
'ঘাবড়ানেকা কুছ নেই। জানবরটার পিঠে লাফিয়ে পড়ার পর তুই আমার কোমর জাপটে ধরে থাকবি। তার পর শালেকে কী করে দাবড়ে নিয়ে যেতে হয় সেটা আমি দেখব। সমঝি?'  
চুনিয়া উত্তর দেয় না। অসীম দুর্ভাবনা মাথায় নিয়ে ধনৈরির পিছু পিছু গাছ বাইতে থাকে।

কাজটা যত সহজ ভাবা গিয়েছিল, আদপেই সেটা তা নয়। গাছের ডাল থেকে আচমকা দুটো মানুষ পিঠের ওপর লাফিয়ে পড়তে ঘোড়াটা প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিল। পরক্ষণে সামান্যের দিকে দু'পা তুলে গা বাড়ায় দিয়ে এক বাটকায় ধনৈরি আর চুনিয়াকে ছিটকে ফেলে দেয়। ধনৈরি প্রায় দশ হাত দূরে একটা কাটাঝোপে গিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তার গায়ের চামড়া নানা জায়গায় কেটেচুটে রক্তাক্ত হয়ে যায়। চুনিয়া পড়ে যাবার সময় জন্তুটার চাঁট লাগে ভান উরুতে। ওটার পায়ের খুরে লোহার নাল বসানো। অসহ্য যন্ত্রণায় চুনিয়ার মনে হয়, পাটা ছিড়ে যাচ্ছে।

এমন একটা ঘটনার পর ধনৈরির ভয় হয়েছিল, জানোয়ারটা এই মুহূর্তেও আর এখানে পিঁড়িয়ে থাকবে না, দৌড়ে জঙ্গলের অন্য কোনো দিকে উধাও হয়ে যাবে।  
কিন্তু ঘোড়াটা এক কদমও নড়ে না। ঘাড় বাকিয়ে একটি হঠকারী পুরষ এবং একটি আওরতকে লক্ষ করতে থাকে।

এদিকে কাটা ঝোপ থেকে নিজেকে বের করে এনেছে ধনৈরি। তার মাথায় এখন রোখ চেপে গেছে। যে জানোয়ার তাকে পিঁঠ থেকে ফেলে দিয়েছে তাকে সে ছাড়বে না। চুনিয়াকে বলে, 'আমরা ফের ঘোড়ায় উঠব। আয়.....'

মাটিতে কাত হয়ে পড়ে, উকি হাতে চেপে সামনে কাতরাচ্ছিল চুনিয়া। আতঙ্কগ্রস্তের মতো সে বলে, 'নেই। ওটা বহোত খতরনাক জানবর।'

'কেতে বড়ে খতরনাক, আমি দেখব। তুরন্ত উঠে আয়।'

'নেই। আমি ওটার ধারে কাছে যাব না।'  
'তা হলে আমিই ওটাকে নিয়ে চলে যাচ্ছি। তুই জঙ্গল থেকে একেলী বড়ে সরকারের হাভেলিতে যেতে পারবি?'  
'আ চোট লেগেছে, পারব না।'  
'এক কাজ করা। তুই এখানেই থাক। হাতের কাছে দা রাখবি। এটা জঙ্গল। হোশিয়ার রহনা—'

'ঠিক হয়।'  
এবার আর গাছে উঠে নয়, সোজাসৃজি মাটি থেকেই লাফ দিয়ে ঘোড়াটার পিঠে চড়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে ধনৈরি। কিন্তু জন্তুটা তেরী হয়েই ছিল, বিদ্রূহ গতিতে বাড়ী দিয়ে তাকে ফেলে দেয়।

রক্ত মাথায় চড়ে যায় ধনৈরির। একটা জানোয়ার তাকে নাস্তানাবুদ করছে, কিন্তু তেই তা মেনে নিতে পারে না। দশ শব্দ বার ঘোড়াটার পিঠে ওঠে সে, প্রতি বারই বাড়ী খেয়ে কখনও গিয়ে পড়ে মাটিতে, কখনও অন্য গাছের গুঁড়িতে, কখনও বা দূরের ঝোপ বাড়ে। ঘোড়াটা এক জায়গায় অনড় দাঁড়িয়ে আছে। ধনৈরির দৌড় কতখানি, তার বেরাদপি কতটা সহ্য করা যায় সেটাই বোধহয় দেখতে চাইছে।

বার বার আঁহাড় খেয়ে ধনৈরির হাতপা বুক পিঠে ধেঁতলে গিয়ে রক্ত বরছে। কিছু হাড়গোড়ে ভেঙেও গেছে বুঝি। সে ভীষণ হতাশ আর হারান হয়ে পড়েছিল। জোরে শ্বাস টানতে টানতে নিজীব গলায় বলল, 'আয়াসা ভুচ্চরের ছোঁয়া জানবর আমার সারা জীবনে আর একটাও দেখি নি। শালে আমার জান চৌপট করে দেবে।'

চুনিয়া বলে, 'ঘোড়া নিয়ে যাবার দরকার নেই। চলা আমরা ফিরেই যাই।'  
কী উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ বিজলি চমকের মতো মাথায় কিছু খেলে যায় ধনৈরির। তেতর গাছের কাছে তাদের দড়ি, লাঠি, দা এবং ছুরি পড়ে রয়েছে। সে দৌড়ে গিয়ে দড়ির ফাঁস তৈরি করে দূর থেকে ছুঁড়ে ঘোড়াটার গলায় আটকে দিয়ে, দড়ির অন্য দিকটা তেতর গাছটার গুঁড়িতে তিন চার ফেরত দিয়ে বেঁধে ফেলে।

ঘোড়াটা এটা ভাবতে পারেনি। অসহ্য রাগে টানটানি করে বাধনটা খুলে ফেলতে চেষ্টা করে সে। কিন্তু দড়িটা এতই মোটা আর শক্ত যে ছেঁড়া অসম্ভব।

ধনৈরি চুনিয়াকে বলে, 'ও শালে এখানে বাঁধা রইল। তুইও থাক। আমি বড় সরকারের হাভেলি থেকে লোকজন নিয়ে তুরন্ত চলে আসছি।'

রামবহালজির বাড়ি থেকে তাঁর দশজন নৌকরকে সঙ্গে করে জঙ্গলে এসে ধনৈরির সাহায্য মিলে আরো কয়েকটা দড়ি দিয়ে আঁটেপুটে বেঁধে ফেলে ঘোড়াটাকে। তারপর সেটাকে আর চুনিয়াকে নিয়ে ফিরে যায়।

রামবহালজি ঘোড়া ফিরে পেয়ে বেজায় খুশি। কথামতো ধনৈরিকে নগদ পাঁচশ আর চুনিয়াকে এক শ টাকা দিয়ে তারিফের সুরে বললেন, 'সাবাস।'

সেই আজব তিন চাকগালা গাড়িটার উঠে রামবহালজির হাভেলি থেকে বেরিয়ে একসময় ওরা বড় সড়কে চলে আসে। সামনে বসে গাড়ি চালাচ্ছে ধনৈরি। পেছনে পিঠের কাছে বাগের ওপর বসে আছে চুনিয়া।

সক্রে অনেক আগেই নেমে গিয়েছিল। মেঘ কেটে গিয়ে নীলাকাশের অনেকটা অংশ এখন দেখা যাচ্ছে। সেখানে চাঁদ্রির কটোরার মতো পুনমের গোলা চাঁদ উঠেছে।  
ডান উরু থেকে পা পর্যন্ত ভীষণ টাটাছিল চুনিয়ার। মাঝে মাঝে অস্ফুট, কাতর শব্দ করে উঠছিল সে।

ধনেরি জিজ্ঞেস করল, 'কি রে, খুব কষ্ট হচ্ছে?'  
চুনিয়া বলে, 'হোক। শও রূপহিয়া তো পেলাম। এখন পাঁচ সাত রোজ পেটের জন্যে ভাবতে হবে না।'

'হী, আমারও তাই। কয়েক রোজ ঘর থেকে এক কদমও বেরবু না।'  
'লোকেন তোমার জন্যে একগো আপসোস রয়ে গেল।'  
বেশ অবাক হয়ে ধনেরি পেছন দিকে মুখ ফেরায়। বলে, 'কিসের আপসোস?'  
'খেল দেখাতে এসে জঙ্গল থেকে বড়ো সরকারের ঘোড়া ধরতে হল তোমাকে।'  
'কা করে! পেটের জন্যে কত কিছুই তো করতে হয়।'  
আন্তে আন্তে মাথা নাড়ে চুনিয়া, 'হী।'

মহিল কয়েক চলার পর চুনিয়া হঠাৎ বলে ওঠে, 'কখনো, কখনো—'

ধনেরি জিজ্ঞেস করে, 'কী হল?'

'আমি এখানে নামব।'

'এখানে কেন?'

'বা রে, ঘরে লেটব না?'

এবার ধনেরির চোখে পড়ে, বাঁ দিকে যে সরু রাস্তাটা ধানখেত চিরে চলে গেছে ওটা দিয়েই দুমুরিয়া গাঁওয়ে অর্থাৎ চুনিয়ার সমুদ্রালে যেতে হয়। গাড়ি থামিয়ে দেয় সে। মনটা ভীষণ ব্যাপার হয়ে যায় তার।

চুনিয়া বলে, 'চলি—'

ধনেরি ভারী গলায় জিজ্ঞেস করে, 'তোর সাথ আর দেখা হবে না?'

চুনিয়া বলল, 'পেটের ধান্দায় তুমিও ঘুরছি আমিও ঘুরছি। ঘুরতে ঘুরতে আজকের মতো আচানক কোথাও না কোথাও ফির দেখা হয়ে যাবে।' বলে আর দাঁড়ায় না, পাকী থেকে ওধারের সরু পথটায় নেমে গেল।

যতক্ষণ না ধানখেতের শেষ মাথায় চুনিয়া অদৃশ্য হয়ে যায়, ধনেরি তার সিটে বসেই থাকে। তারপর পুনমের চাঁদ মাথায় নিয়ে বৃষ্টি ভেজা ফাঁকা সড়কের ওপর দিয়ে ক্রান্তভাবে গাড়ি চালাতে থাকে।

## রেলিং

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

আঃ! আপনি আবার উঠলেন কেন?

যে বলল— তার মুখ বা মাথা কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না অশোক দত্ত। তিনি দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে। সামনে চাঁদের আলোয় ফাঁকা ট্রাম লাইনে ঝিলিক। দূরে মোড়ে পুলিশের গাড়ি। নিশুতি রাতের বৃষ্টিতে কলকাতা চান করে উঠেছে এইমাত্র। রাস্তায় ইলেকট্রিক আলোয় ফাঁকা গুনশান। রাস্তা তাই একদম বাকবাক।

আমার ঘুম হয় না বলে বারান্দায় এসে দাঁড়িলাম। কিন্তু তুমি কে? এই নিশুতি রাতে বাসস্টপের টিন খুলে নিছ? কেন?

আঃ! কেন গোলামাল পাকাচ্ছেন? টিন খুলতে যাব কেন? পুরনো টিনের কী বাজার দর আছে। কিছুই জানেন না।

এবার অশোক রাস্তার আলোয় টিনে ঢাকা বাস স্টপের নিচের দিকে দু'খানি সরু লিকলিকে পা দেখতে পেলেন শুধু। কোন জুতো নেই।

আমি এখানে একটা জিনিস রেখে গেছি কাল ভোররাত্রে। তাই নিতে এসেছি এখন।

বাস স্টপে টিনের চাঁদোয়া কেউ কি জিনিস রাখে?

কেন লোক গো তুমি বাপু! আর এটা কি কিছু নেবার সময়?

তাড়াতাড়ি ভোর হয়ে গেল কাল রাতের শেষে। মানুষজন বেরিয়ে পড়েছিল। তাই— নয়তো বাড়িই নিয়ে যেতাম। শেষে টিনের ছাদে গুঁজে রেখে যেতে হয়েছিল। এখন নিয়ে যাচ্ছি। ভোর হতে এখনো খট্টা দুই বাকি। সবই তো বোঝেন।

ও কি? তুমি তো টিনের শেডের লোহা খুলে নিয়ে যাচ্ছ।

উঃ! পাগল করে দেবেন আমাকে। যান তো— শুয়ে পড়ুন গো। শেডের লোহা কী খোলা অত সহজ। কখনো খুলে দেখেছেন? একেবারে ওয়েল্ডিং করে জুড়ে দেওয়া।

আমি খুলতে যাব কেন?

তা জানি। আপনি খুলবেন না।— কথা বলতে বলতে লোকটি লোহার কী একটা জিনিস শেড থেকে শব্দ করে খুলছে তো খুলছেই। প্রায়ই দেখি আপনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে চাঁদ দেখেন।

চাঁদ দেখব কি? ঘুম হয় না তাই বারান্দায় এসে দাঁড়ি।

দাঁড়িয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকেন দেখেছি। রাস্তা থেকে দেখা যায় সব। কী ভাগ্যবান আপনি। খেয়ে দেয়ে শুতে পারেন। তবে ঘুম দেখা দেন না— এই যা। আমি এখন বাড়ি যাব। শোয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়ব। কিন্তু ঘুম ভাঙলেই যে পয়সার দরকার পড়ে। তাই যত পারি ঘুমেই। দুপুরে দুটি মুখে দিতে উঠি মাত্র। আবার ঘুমিয়ে পড়ি। তাই রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমেই থাকি। যেখানে সেখানে ঘুমিয়ে পড়লে ভয়ও থাকে না। কোন কষ্টও হয় না।

আঃ! ওই তো তুমি একখানা লোহা খুলেছো লম্বা মত।

কী মুশকিল! আপনাকে বোঝাবে কে? এই লোহা হল গিয়ে পার্কের রেলিং। বাস স্টপের শেডের সস্তায় ওয়েল্ডিং করা বাজো লোহা নয়— বুঝলেন। পার্কের রীতিমত ডিজাইন করা লোহা। পাতাল রেল বানাবার সময় কত লোক কত লোহা নিয়ে গিয়ে ঘরবাড়ি তুললো। তখন



কোথায় ছিলেন? নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন? তখন আটকালেন না কেন?

নিজের কাজ সারছে আর কথা বলে চলেছে লোকটি। তার মাথা বা মুখ কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না অশোক দত্ত। সব শেডের আড়ালে পড়ে গেছে। তাই বয়সও বুঝতে পারছেন না।

তখন তুমি নাওনি?

না। ছোট ছিলাম। এখন শুধু পার্কের লোহা খুলি। অন্য লোহায় হাত দিই না।

পার্কের লোহা? খুললে কী করে?

ওসব দিনের বেলাতেই খুলতে হয়।

দিনের বেলায়? সে কী? পাবলিক দেখতে পেলে—

ওসব খোলার স্টাইলই আলাদা।

কি রকম?

কেন? আপনি খুবাবেন নাকি?

এই বয়সে আমার পক্ষে কী আর সম্ভব?

রেলিংয়ে ভর দিয়ে বিকেলবেলা পার্কে বাচ্চাদের খেলা দেখতে হয়— দেখে যেতে হয় ঘন্টার পর ঘন্টা—

বেশ।

আর পাশাপাশি ছোট রেলু হাতে নিয়ে খেলা দেখতে দেখতেই একটু একটু করে নটি ঘুরিয়ে চিলে করে রাখতে হয় বশুঁতুলো। তারপর সারা কলকাতা ঘুরিয়ে পড়লে—

খেলা দেখতে দেখতে পারায়?

হ্যাঁ। আমি যে পার্কে বাচ্চাদের খেলা দেখতে ভীষণ ভালবাসি। এত ভালবাসি ওদের খেলা দেখতে— ছোট ছোট বাচ্চা হেসে দুলে হাটে— দৌড়ায়— পড়ে যায়— আবার উঠে দাঁড়ায়—

তা ওদের পার্কের যে ক্ষতি করছে।

কীরকম?

রেলিং খুলে নিয়ে এসেছে।

ওঃ! ওরা কী রেলিং দেখে ওখানে খেলতে যায়? ওরা যায় খেলতে। রেলিং আছে কিনা ঘুরেও দেখে না ওরা। রেলিং থাকলে খেলবে। না থাকলেও খেলবে।

তবু ওদের পার্কেরই তো রেলিং।

রেলিং কারও না। ও হল গিয়ে পার্কের একটা বাড়তি লোক দেখানো ভড়ং। এই যেমন যাচ্ছেন দাচ্ছেন সুখে আছেন। কোন চিন্তা নেই। ঘুম এসে যত ইচ্ছে ঘুমোতে পারেন। কিন্তু আসে না। এই না আসাটাই একটা ভড়ং আপনার। ভাবখানা যত সুখী দেখাচ্ছে আমাকে— আসলে আমি তত সুখী নই। যান যান— শুয়ে পড়ুনো। গুলেই ঘুমিয়ে পড়বেন আপনি। শুধু শুধু চাঁদের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে চোখ খারাপ করবেন না।

একটা আলো হলে তোমার সুবিধে হত। টিনতো। সেখান থেকে রেলিং বার করা। হয়ত কেটে যেতে পারে—

কেন? টর্চ ধরবেন নাকি! দিবা রাত্তার আলো রয়েছে। তার ওপর চাঁদের বাড়তি আলো। সারাদিন ঘুমিয়ে চোখ এখন বেড়ালের মত পরিষ্কার। যান যান শুয়ে পড়ুন গে। এখনো ঘন্টা দেড়েক রাত্তার আছে। ঘুমিয়ে উঠে চা খাবেন। রেডিওর গান শুনবেন। সাফায় বসে কাগজ

পড়বেন। দেখবেন শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগবে।

তুমি কাগজ পড়?

সকালের কাগজ সন্ধ্যাবেলা পড়ি। সারাদিন ঘুম দিয়ে উঠে। চায়ের দোকানের কাগজ তো। তখন মিয়ে ভাজা হয়ে যায়। চা খেতে খেতে উন্টে পাস্টে দেখি। মেলা বকালেন। একটু কাজ করতে দিবি।

আর কতটা বাকি।

এই হয়ে এল। শেডের বাজে লোহায় পার্কের যানদানি রেলিং আটকে গেছে কোনায়। তাই একটু দেরি হচ্ছে।

আর দেরি হলে তো তোমার অসুবিধে হবে। ফুটপাথের চাকা লাগানো চায়ের দোকান এখন খুলে যাবে। মোড়ে ট্যাকসি এসে দাঁড়াবে। হাওড়া যাবার ফাস্ট মিনিবাস এল বলে— বাঃ! আপনার তো বেশ চাইমিং জ্ঞান আছে। আগে খুলতেন নাকি!

না। রোজ এই সময়টা ঘুম ভেঙে গিয়ে বারন্দায় দাঁড়িয়ে থাকি তো। দোতলা থেকে সব পরিদ্বার দেখা যায়।

ভাল কথা। তোমার ছেলেমেয়ে কত বড়? তারাও তো পার্কে খেলতে যায়। যায় না?

ক্ষেপেছেন। তারা যাবে পার্কে? তারা খেলবে? তাহলেই হয়েছে। আপনার যেমন বুদ্ধি।

সবাইকে আপনারা নিজেরদের মত করে দেখেন। ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েরা শুধু পার্কে যায়। সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে পড়তে বসে। যায় না আমাদের বাচ্চারা। তারা ভাগরটি হলেই সংসারে কী কাজে লাগতে পারে— তাতেই লাগিয়ে দেওয়া হয় তাদের। যেমন কিনা খুব বড়লোক যারা— কলকারখানা আছে— তাদের ছেলেমেয়েরা আপনার বাচ্চাদের মত পড়তে বসবে নাকি সন্ধ্যাবেলা? তারা ধান্দায় লেগে যাবে।

ধান্দা?

হ্যাঁ। এই ধরন একটা স্কুল চালানো যায় কিনা— ইংলিশ মিডিয়ামে। কিংবা নারকেলের ছোঁবাড় থেকে পাপোশ বানিয়ে নিউ ইয়র্কে এক্সপোর্ট করা যায় কিনা। যাতে কিনা দুটো পয়সা আসবে। ঠিক আমাদের ফেমিলির মত। ইউনিস্ট্র্যালিস্ট — ধনকুবেরদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমাদের এখানেই মিল। আমরা ঠিক আপনারদের মত নয়।

এক্সপোর্ট মানে জানো?

ও রকম দু'চারটে কথা শুনে শুনে এখন অনেক শিখে গেছি। এবার আপনি ভেতরে যান। অনেক ইন্সট্রাক্ট হল। এবার ঘুরে ফেরে ফেরে ফেরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

ক্লাব? ক্লাব কোথায় পেলো?

আমার বউ ছেলেমেয়ে নিয়েই তো আমার একেবারে নিজস্ব ক্লাব। খুঁজে দেখুন আপনারও একটা ক্লাব আছে। একেবারে আপনার। যেমন কিনা ইউনিস্ট্র্যালিস্টদের বাড়িতেই সুইমিং পুল, জিমখানা থাকে— আমার বাড়িতে আছে— একেবারে ঘুরে ফেরে বিছানা— নিজস্ব।

ওঃ! সেটা তোমার ক্লাব? বাঃ! বেশ ক্লাব বানিয়ে ফেলেছো তো! কিন্তু বাবা! মানুষ তো ক্লাব করে ঘুরে যায় না। ঘুরে যায় একা একা— নিজের মত করে। বলতে বলতে থেমে গেলেন অশোক দত্ত। নিজের বিছানায় ফিরে এলেন।

ফিরে এসেও কিন্তু ঘুম এল না। এই শেষ রাতে আবার একটা বড়ি খেলে সকালটাই মাটি। ঘুম আসবে না। অথচ চান্স হওয়াও যাবে না। কেমন একটা আচ্ছন্নভাবে সারা শরীর ঢিলে

কারে রাখবে। তাই শুয়ে পড়েও উঠে দাঁড়ালেন অশোক দত্ত। সারাটা বাড়ি এখন ভাঙাচুরা ফঁকা আসর।

আয়নায মুখ দেখার মানুষটি পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে। ছেলেমেয়েরা ছবি থেকে তাকিয়ে। আলো জ্বাললে দেখা যাবে তাদের আর বসন্ত বাড়েনি। অথচ তারা নিজের মত করে এক একটা সাকসেস বানিয়ে নিয়ে তাদের নিজস্বদের সংসারে বিভোর হয়ে সেই সাকসেস চাইছে। চাকরির সাকসেস — টাকার সাকসেস — বাড়িঘরদোর বানানোর সাকসেস।

অশোক দত্তের জীবনের সাকসেসগুলোও সারা ঘরে ছড়ানো। মান পত্রগুলো বাঁধানো ফটোর ভেতর মেঝেতে কাঁচ করে দাঁড় করানো। সেগুলো চমৎকার পার্ক জ্বালান আরসোলারা কাচের ওপর বেড়াচ্ছে।

হিতর সঙ্গে বিয়ের পর বানানো জোড়া খাটে পাতা বিছানা। সব সময়ই রেডি থাকে। যদি মেয়েরা কেউ বেড়াতে এসে রাতে থেকে যায় — তাহলে ঘুমোতে কোন অসুবিধে হবে না? যে যার বাড়িতে গুতে ভালবাসে বলে দুই ঘরে হিতর পাতা বিছানায় বেড়াল ঘুমায়।

পাশের ঘরে টুকলেন অশোক দত্ত। ঘুমন্ত খাঁ বড় অসহায় ছবি। অথচ কী কাণ্ড — ঝংকার ওয়ালা মানুষ ছিল ইতি একসময়। কেউ যেন পার্কের খানদানী রেলিংয়ের মত ওকে এখানে রেখে গেছে। সময় মত তুলে নিয়ে যাবে। ঘুমের ভেতর স্ট্রোক আসে পাকা চোরের মতই। জাগন দশায় রেলিং নিতে হার্ট অ্যাটাক, জড়িস বি আসে নিচের ঠিক ওই লোকটার মত — প্রায় নিরীহ চেহারা। ভগবানও এখন হাতের তালুতে পুথিবীর মত মানুষ দেখতে নেমে আসেন বিকেলের দিকে। এই পাঁচটা সওয়া পাঁচটায়। তাহি তো মনে হয় অশোক দত্তর। কেননা। সারাদিনের ওই সময়টাকেই সারা জীবন ধরে চেনা জায়গাগুলো কেমন ফঁকা ফঁকা লাগে তার। চেনা জানা লোক কমে গেছে। পুথিবী নতুন নতুন লোকে ভরে যচ্ছে। শুধু ফুটপাথের বড় গাছগুলো কোন নতুন গাছকে জায়গা ছেড়ে দেয়নি। সিনেমা হলগুলোও ফ্ল্যাটবাড়ির জন্যে আব্বাঘাতী হয়নি এখনো। নয়তো দিনের এই সময়টাকেই মন কেন খাঁ খাঁ করে। বন্ধু নেই। খিদে হয় না। হাঁটুর সেই জ্বোব কোথায়। আত্মদ করে অনেক বাজার করে আনার মত বাড়িতে লোকই নেই। কোলেক্টরাল নামে ক'বছর হল একটা গালগল্প বাজারে এসেছে। তার ডিউটি হল — বারান পাকা — এটা খেয়াল — ওটা খেয়াল মেরে যাবে — তার সঙ্গে জুটিছে রক্তে অদৃশ্য কিছু চিনি — সেই চিনি নাকি চোরের মতই বড়ির ভেতরে ভেতরে সব কলকলয়া সিঁদ কাটে। এই সব দেখে শুনে অশোকের ইচ্ছে করে লোটর দলের মেয়েদের মত পায়ে ঘুড়ুর বৈধে নেচে নেচে যায় —

ভাল শিশুবেলা

কী দেখিলে মোর অঙ্গে —

অথচ ভাতারবাবু যোনে বলেই চলেছেন — প্রফুল্ল থাকবেন — সব সময় আনন্দ করবেন — আর মনে রাখবেন ঘুমের চেয়ে বড় কোন ওষুধ নেই।

বেল্লিককে বোকাই কী করে — এই যে বৈধে অশোক — এই বাঁচাই তো দুই মহাঘুমের মাঝের জেগে থাকো ৬০/৭০/৮০ বছর। প্রথম ঘুমটা মায়ের পেটের ভেতর। সেখানকার কথা কিছু মনে নেই। পরের ঘুমটা হল — এই সেদিন বাকরমে পেছাব করতে গিয়ে মোজার য়া হল। মেজদা শেষ য়া জানেন — বা জেনে গেলেন — তিনি পেছাব করছেন। মাসিভ সেঁরিবাল অ্যাটাক। এগারো দিনে নার্সিং হোমে আটগুর হাজার টাকায় সিলিগুর থেকে আগ্রিছেন

টানতে টানতে টানা ২৬৪ ঘন্টা মহাঘুম দিয়ে ইলেকট্রিক চুলোয় চান করতে গেলেন। ওখানকার ভেতরকার ট্রেডগুলো হলসেটে লালচে। আর ভাষণ জাস্ত। ঘুমিয়ে আসা লোকদের খুব আদর করে জড়িয়ে ধরে।

দেখি তো লোকটা এখনো আছে কিনা? — বলতে বলতে অশোক ফের দোতালার বারান্দায় এসে নিচের দিকে ঝুঁকে তাকালেন। একি এখনো পারেনি?

আর বলেন কেন? — আমারই মত অন্য কেউ এই বাসসরুপে এসেছিল নিশ্চয়। নয়তো রেলিংটাকে এমন জাদা করে তার পেঁচিয়ে বৈধে রেখে যাবে কেন? আজ রাতে হয়ত ঘুমিয়ে পড়ছে বউয়ের আদর সোহাগে। নয়ত আজই রাতে হয়ত নিতে আসত। দেখা হলে বুকিয়ে দিতাম — পরের এনে রাখা জিনিস না বলিয়া টিক দিয়ে রাখা — নিগুতি রাত দেখে নিতে আসাকে বলে চুরি।

ভূমি সিওর? অন্য কেউ নিয়ে যাবে বলে তার দিয়ে বাঁধা ছাদা করে রেখে গেছে?

আলবৎ! আমি সিওর? এ তো পাকা হাতের কাজ।

মাঝখান থেকে তোমার ঘাটুনি বেড়ে গেল।

তা বাড়লো। তবে প্রায় সেরে এনছি। গোড়ায় ভেবেছিলাম রেলিংটা বুকি বোয়াদা জায়গায় আটকে গেছে। এখন দেখছি প্রান মালিক সব করে রেখে গেছে সেই লোকটা।

সেই লোকটাকে ভূমি চেনো?

আচ্ছা লোক তো আপনি। এ কাজ কেউ কাউকে চেনে নাকি? কিংবা কেউ কাউকে চেনা দেয় নাকি? চেনা দেওয়া মানেই তো বিপদ ডেকে আনা। এই যে আপনি আমার সঙ্গে কথার পর কথা চালাচ্ছেন — আপনি কী আমাকে চিনতে পারছেন? আমার মুখই তো আপনি এখনো দেখেননি। চাঁদের আলোয় যদি দেখেনও — এই বয়সে আপনার চোখে আমার চাঁদ মুখখানা ঝাপসা জামবাটি মনে হবে। কাল দিনের বেলা আমায় দেখলেও চিনতে পারবেন না।

দিনের আর বাকি কোথায়! হাওড়া, শেয়ালাদা, মঙ্গলা হাটের প্যাসেজারদের ধরতে এবারে রাতচরা ট্যাক্সিগুলো একটা একটা করে এসে দাঁড়াবে। আকোণেও পাখি বেরিয়ে পড়বে।

আর কুড়াক ডাকবেন না তো। ভয়ঙ্কর বাকতাল্লা দিচ্ছেন সেই থেকে। আপনাদের মত ভয়ঙ্কর লোকদের ভগবান কে কেন লম্বা ঘুম পাড়িয়ে রাখেন না বুধি না। আর কথা বাড়ানেন না। — এই বলে সুরু লক লিকে এক জোড়া পায়ের মালিক তার কাজে ডুবে গেল।

একটু আমতা আমতা করে অশোক দত্ত জাহতে চাইলেন, তোমার বউয়ের ঘুম হয়।

বা:। আমি জেগে থাকি বলে আমার ওয়াইফও তার নিজের বাড়িতে জেগে বসে থাকবে নাকি? পতির পূণ্যে সতীর পূণ্য খুঁজছেন। বাঃ! আপনার বউ জেগে আছেন আপনার জন্যে? হাতের কাজ তাড়াতড়াি করতে করতেই লোকটা কথা ঝুঁড়ছে একেবারে বুলেটের মতই। না। তিনি বাতের বাখার ওষুধ খেয়ে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছন।

আপনারও তো বাত আছে নিশ্চয়!

না। ওই পুরস্কারটা পাইনি। সারা জীবনই খুব হাঁটাইটি করতে হয়েছে —

কেন? পোস্ট অফিসে পিওন ছিলেন নাকি!

না বাবা। অফিসে আমার আদাল ঘর ছিল। আদালি ছিল। যোন ছিল আদাল। ছেলেমেয়ে মানুষ করতে অনেক হাঁটাইটি করেছি এক সময়। একটা চাকরিতে হোত না। সন্ধ্যার পর আরেকটা করতাম।



## ভালোবাসার আমতুত চর

সেলিনা হোসেন

খাতা লেখা তো।

হু।

বাবসাদারদের দু নন্দরী খাতা বানিয়ে দিতে তো। আমার শশুরমশাইও তাই করতেন। আপনার মতই তিনিও একজন ভদ্ররসিক ছিলেন। তা ছেলেমেয়েরা দেখে এখন?

তাদের সময় তো কম।

তাহলেই দেখুন। আপনার সঙ্গে আমাদের ফেমিলির — বড় বড় কলকারণনাওয়ালা লোকদের ফেমিলির সঙ্গে তফাৎটা কোথায়। এই যে আমি খাচ্ছি — আমি বাড়ি ফিরলে বড় ছেলে সঙ্গে সঙ্গে রেলিংটা কেরোসিন তেলে ভিজিয়ে দেবে। রং ঢোকলা উঠে গেলে ওতে প্রাইমার লাগাবে। তারপর শুকোলে পাকা রং লাগবে। তিনদিন পরে কোন সৌখিন — মানে যার নজর আছে — এমন পয়সাওয়ালা বাড়িওলা খুঁজে বের করবে ঘুরে ঘুরে। যেমন কিনা কাপড়কল বসানো কোন শেট। তার ছেলে — নাতিরা খুললো। শোরাম। সেখান থেকে তৈরি ড্রেস হয়ে সেসব কাপ বিক্রি হতে থাকে।

বাড়িওয়ালা কিনবে কেন?

কিনবেই। সে খানদানি রেলিংগুলো তার কোন বারান্দায় কিংবা সিঁড়ি দিয়ে নামবার মুখে এস্টাইল করে বসিয়ে দেবে। একটা ডিজাইন হয়ে গেল। তার পয়সা লাগলো কম। আমিও দুটো পয়সা বেশি পেলাম। লোহাওয়ালা তো অত দেখে না। সে পাল্পায় তুলে ওজন দেখে কম দরে পয়সা দিয়ে দেবে। কিংবা বলবে — কাল আসিস। বিক্রি হলে পয়সা পাবি।

তোমার বউ কি বলে?

সে তো আপনার মতই ভদ্ররসিকের লেডুকি ছিল। গুণের আছে। তিনবাড়ি কি গিরি করে হাডুকালি করে পয়সা আনে। মাঝে বাই উঠেছিল — ফ্রেট হোস্টো আর মেয়েটাকে ইচ্ছুক দেবে। দিয়েওছিল। ওর ইনকামে কি বাচ্চাদের জন্যে মাস্টার রাখা যায়? বাচ্চা দুটো খুব ভালরকম ফেল করে বাড়ি ফিরে এসেছে। ওসব ভাওতায়লা বাড়ির সব। এখন বুঝতে পেরেছে। তাই সারাদিন গুম হয়ে থাকে। আমার কাজের সুবিধের জন্যে একটা টর্চ কিনে দিতে চেয়েছিল। আমি কিনতে দিইনি।

কেন?

ওভাবে পয়সা নষ্ট করা কেন? আর টর্চের আলো দেখলে তো নাইটগার্ডরা ছুটে আসবে। তাদের আবার পয়সা দিতে হবে। ওসব নছল্লা কী আমাদের মানায়। কোনদিন আবার আপনার ভদ্ররসিকদের বউদের মত কাজে বেবেয়ার সময় আমাকে সোহাগ করে টিফিন করে দিতে চাইবে সঙ্গে। যাত বামেলা! ওকি? ওটা মিনিবাসের হেডলাইট না? হ্যাঁ। যা ভেবেছি তাই। তাইতো — আজকের রাতটাও শূন্য গেল। যাকগে। দিনে দিনে একটু নজরে রাখবেন তো। এখানটায় কেউ অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকলে বানিক গলা থাকারি দিয়ে ভড়কে দেবেন। তাহলেই হবে। আপনার বাড়ির নিচেই তো।

ছোট্ট একটা 'চলি' বসেই লোকটা পলকে মিলিয়ে গেল। ওকে দিনের বেলায় দেখলে আশোক দত্ত চিনতেও পারবেন না।

সন্ধ্যায় মোহগুলো গোয়ালে ঝাঁপতে এলে মেজাজ খারাপ হয় জলিলের। এই ঘরে ফেরাটা বড় বিচ্ছিন্ন ব্যাপার। যার ঘর নেই তার সবটাই ঘর। শুধু মোহগুলোর জন্যে ওকে ফিরতে হয়। তার চাইতে এই বাসভূজা ভূমিটা অনেক ভালো। অনাবাদি জমির কটকটে ঘাস ওর শরীরের লোমের মতো। হাঁদা দিয়ে বাতাস ঢোকায়। ফুটিফুটি করে ঝাঁঝিয়ে রাখে জলিলের কর্ণে। তখন সারা শরীরের আঙুরের আঁচ টের পায় ও। শীতের সকালের নাড়া জ্বালানো আশু নয়। একদম কড়কড়ে। ভাজা ভাজা আশু। তখন এই উটকো — মুখো পতিত জমি জলিলের জীবনে ভরা জোরায়। হুড়হুড় করে যোলা জল ঢুকতে দেয় ও। আর মোহগুলো যতো লোভ মৈশন ক্ষেতের দিকে। জলিল সেইতে পারে না। ক্ষেত মানে ফলন। ফলন সম্ভাবনার। ক্ষেত মানে ফলন। ফলন ভরপেট মানুষের মতো। সুখী। আদুরে। চুলুচুলু। তাই শস্য ভরা ক্ষেত জলিলের দৃঢ়চোখের বিষ। ইচ্ছে করে মাড়িয়ে দেয়। সুযোগ পেলে মোহ ছেড়ে এক অংশ সাফ করে ফেলে। গায়ের ঝাল মেটায়। কার ওপর মেটায় তা নিজেও বুঝতে পারে না। তখন কালাচরণের মারমুখি বোটার মতো অবিশ্রান্ত গালাগাল ওর দু-কান ভরে বাজে।

সন্ধ্যায় গোয়ালে ধোঁয়া দেবার সময়ে যেমন চোখ জ্বলে, সেরকম একটা জ্বালা বুকেও। মশা তাড়াতে তাড়াতে আশ্রয় মানে গজগজ করে জলিল। সে সুযোগে জ্বালাটা আনরি হয়। থকাথকে আঁধারের ভূশমালা। জ্বালায় নাম মামাবাড়ি। সে কারণে মামাবাড়ির ফকফক দাঁত বের-করা ভাতের খালা লাগি দিয়ে ফেলে একদিকে লেলে যেতে ইচ্ছে করে। মামার সঙ্গে সম্পর্কটা মোষের কালো পিঠের মতো রোয়া ওঠা খাবড়া খাবড়া দাগে ভরা। সমান কিছুতেই হয় না। তেমন হারামি মামাভোতা ভাইওগুলোও। ওদের দশটা মোষের মতোই দেখে জলিলকে। আগছা বাছার কার্যায় উপড়ে ফেলতে পারলে বাঁচে। লোকলজ্জা, সমাজ, বোনের মুখ ইত্যাদি কারণে পারে না। তাই জলিলকে দিয়ে যতো রাজার উটকো কাজ করিয়ে নেয়। কাজ করতে আপত্তি নেই ওর। সারা দিন খাটতে পারে। হাসিমুখেই পারে। তার বদলে চাই একটু আদর-সোহাগের কথা, একটু ভালোবাসার ঠাণ্ডা মিছির পানি। শালা, সেটা দিতেও ওদের বুক বেচান হয়। যেন এক কনি জমি গেলো আর কি! ঘরে ফিরলেই গালমন্দ, ছোটোখাটো ক্রটিতে প্রহার। কতো আর সহ্য হয়।

মোহে মোহে মামার ওপর রাগ হয় জলিলের।

আপন মামা তাও একটু দরদর নাই। নসিব মদই লেলে এমনই হয়। কিন্তু পরক্ষণে সে রাগ নিজের ওপর এসে গড়ায়।

যার বাপ থাখি নাহি, মা থাখি নাহি, তার জামার মামা কে? তিন বেলা ভাত দায় এইতো বেশি।

খাবড়া হাত ধড়াস করে উরুর ওপর মারে। ডাঁশা মশা একটা রক্ত খেয়ে শেষ করলো। গোয়ালে মোহগুলো নড়া চড়া করে। শুয়ে শুয়ে সে শব্দ শোনো জলিল। ভাবে, উঠে গিয়ে ওদের গা চুলকে দেবে। একটু হাত বুলালে জলিলের মুখের কাছে নাক নিয়ে আসে। একদম শান্ত হয়ে থাকে। তখন কী যে ভালো লাগে। জীবনটাকে আর জলের নীচের পতিত ময়লা



মানে হয় না। গভীর নিশ্বাস ইয়ল বাতাস হয়ে বয়ে যায়। গোয়ালটা হয় উজান গাও। ওদের অস্থিরতা বাড়তেই উঠে পড়ে জলিল। শূত, মোষের গা চুলকানাই ভালো। ঘুম না আসা বড়ো বিস্ত্রি। মোষগুলোর কথা চিন্তা করে জলিল বিভ্রিবিড়িয়ে মশার গুটির নিপাত করে। আঁই তোরো সবুর কর, মূই আহিয়া পড়ছি।

বাপ উঠিয়ে নিশ্বাসে ঢোকে জলিল। ওর সাদা পেয়ে ওদের মুখে চপচপ শব্দ হয়। জলিল সকলের গায়ে হাত বুলায়। কালো শরীরগুলো অন্ধকারে মিলেমিশে গেছে। তবুও চিনতে কষ্ট হয় না। শরীরে হাত দিলেই ঠিক টের পায় কোনটা কে। পারুল, ভূতান, জেবান, জবা। সব জলিলের দেখা যায়। তোপো বোবাক লোম চেনা। জলিল ঘন করে শ্বাস নেয়। দুর্গন্ধভরা গোয়ালটা মাথায় ঝিম ধরায়। মশার ওগুন এখন কম। তবু কামড়েই শেষ নেই। জলিলকে ও অস্থির করে। একমুঠি বিচালি বিছিয়ে পারুলের গলা জড়িয়ে ঘাড়ের উপর মাথা রাখে ও। মনে মনে ডাকে, আয়, ঘুম আয়। সকালে মামা উঠে ওকে বারান্দায় না দেখলে হৈ টেক করে। মুয়াজ্জিনের আজানের মতো সুরেলা গালাগালি ছড়িয়ে দেবে চারদিকে। তারপর যখন ওকে গোয়ালে দেখবে তখন মনে মনে খুশি হলেও প্রকাশ্যে শব্দ দেবে।

মোইষ একটা। যেমন মোইষের মত চেহারা তেমন আচার-আচরণ। কেউ মোইষের লগে রাইত কাড়ায়, জন্মেও দেখি নেই। বাপ-দাদা চোন্দগুটির বাইরে অইছে ইইডা।

জলিল উত্তর দেবে না। গামছা কাঁধে পুকুরঘাটে গিয়ে। তারপর এক পাড়া পাশ্চা খেয়ে মোষ চরানোর দায়িত্ব পালন। এহঁতো ওর রুটিন। জলিল অন্ধকারে মশা ভালোতে-তাড়াতে অককত শব্দ করে হেসে ওঠে, মামা আপনি ঠিকই কন। মূই মোইষ ছাড়া আর কী। মোইষ ইইতেই মোর ভালো লাগে। তাও যদি আপনাগো আদর-সোহাগ এটু পাইতাম।

রাতের কতো সময় জানে না ও। দূর, জেনেই বা কী হবে। আজ বুঝি ঘুমটা জলিলের আর আসবে না। মশার কামড় গা-সওয়া হয়ে গেছে। পারুল জড়িয়ে একবার ওর গালাটা চেটে দিয়েছে। তুই মোর বৌ। পিঠে মাথা ঘষতে ঘষতে জলিল বিভ্রিবিড়ি করে কথাটা বলে। তুই মোর আমতুতু বৌ। কপালে একটা আঁচলি ঠেকে। এই পোকাগুলো মোষের রক্ত চুষে খায়। জলিল হাতের আঙ্গুলে আঁচলিটা উঠিয়ে ছুঁড়ে মারে। পারুল ওর প্রিয় মোষ। আর প্রিয় মোইষই আমতুতু। জলিলের সোহাগ। পারুলের শরীরে চমৎকার কান্দি আছে। মোর মামা একটা আঁকাড়া চাষা। কেবল মেজাজ। কেবল গরগরানি। তুই তেমন না। জলিল পারুলের সারা শরীরে হাত বুলায়। পারুল কান দেলায়। জানান দেয়, আমিও জেগে আছি। তোর জন্যে আমারও ভালোবাসা। তুইও আমার আমতুতু। মোর মামা মালা জমির মালিক। মোর মামা অইল আইলা-রাজা। বুজ্জো পারু, ঐ জমিতে মোরও ভাগ আছে। মোরে দায় না। মূইতো হিসাব বুজি না। যখন হিসাব পামু তখনে নিয়া হেইখানে যামু গিয়া। মূই ঘাস লাগামু, তুই খাষি। ক্যাবল খাষি আর বকনা বাছুর দিবি। বকনা বাছুর। তোর দিয়া হাল বাওয়াইতে মোর ভালো লাগে না। এই জন্যে তো কই মোর নামাডা মানুষ না। এই যে কিনা কয় একদম ভেউডা শিয়াল।

জলিলের চোখ বুঁজে আসে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ও স্বপ্ন দেখে, ভাগে জমি পেয়ে গেছে। সেটা ও দখল নিয়েছে। সবুজ ঘাসে অদরকদর সে জমি। পারুল নিশ্চিন্তে ঘাস চিবুচ্ছে। জলিল আরের ওপর শুয়ে আছে। পারুলের খাওয়া দেখছে। বুকটা উটানি। গর্বে, আনন্দে। পারুলের চকচকে মোটা শিঙে দিলেও বসে আছে। জলিলের কানের কাছ দিয়ে উতরাবি বয়। উত্তর দিকে

থেকে ধাঁধ করে এসে কানে ঢুকে যায় ঠাণ্ডা, হিম। জলিলের কলজে কামড়ে ধরে। তখন মনে হয় জমির জন্যে মামা ওকে ছাড়বে না। জমিটুকু নিজের নামে লিখিয়ে নিতে পারলেই ওকে তাড়িয়ে দেবে। করপ.... করপ.... করপ.... কিসেব, যেন শব্দ। থামতেই চায় না। মাথা ঝিম ধরে থাকে। করপ.... করপ.... করপ.... করপ.... আঃ কিসের শব্দ। শাতাল আলের ওপর শুয়ে থেকে জলিল থুপো থুপো ঘাসের গুচ্ছ আঁকড়ে ধরে। পরফগে ও আবাক হয়ে দেশে শব্দটা পারুলের ঘাস চিবানোর। ও কিছুতেই ঠিকমতো চিবুতে পারছে না। তাই বিচিচি শব্দ। করপ.... করপ.... করপ.... করপ.... জমিটা আর রাখতে পারলাম না রে পারুল, মামা ঐডা নিয়েই নিবে। যামানেই হোক নিবে। ছাড়বে না।

ঘুম ভেঙে যায় ওর। বুকটা খোঁচাখোঁচা হয়ে থাকে। কেমন যেন কষ্ট। কপা কপা ব্যথা। থেকে থেকে গাঁক করে ওঠে। কখনো মোষের লোমের মতো কুকড়িয়ে যায়। উত্তমকুত্তম ধরির আবহাওয়া। চনা-নাদিতে থাকে। নাকে কাঁঝালো গন্ধ ঢোকে। জলিল তবুও ওঠে না। তেমনি ভাবেই বসে থাকে। হিসেব করে কার্তিকে।

কার্তিকের এখানে দু-মাস বাকি। ঘাস খাওয়াবার জন্যে মোষ নিয়ে চরে যেতে হয় কার্তিকে। চার মাস থেকে আবার চরে ফেরা। এ সময়ে এদিকে একদম ঘাস থাকে না। মোষগুলো শুকিয়ে কাঠ কাঠ হয়। তখন চরে নিয়ে ওদের নান্দসুন্দর বনানো হয়। গত বছর অশুখ ছিলো বলে যেতে পারেনি। এ বছর যাবে। মনে মনে ঠিক করে ফেলে আর আসবে না। ওখানে থেকে যাবে। ভীষণ জন্ম হবে মামা। বুঝবে তার সংসারে জলিলের প্রয়োজন আছে কিনা। বুকে প্রচণ্ড অভিমান। এতোক্ষণে টের পায় ব্যাখাটা অভিমানের। ব্যাঙের মতো লাফায়। তারপর উঁবু হয়ে বসে। তখনই একটা চাপ লাগে। ভাণ্ডালি এ এলাকায় ঘাস হয় না। জলিল মনে মনে যুক্তি পেলে। নইলে এমন একদল মোষ নিয়ে কিছুতেই বের হতে পারতো না। বের হতে পারলেই শান্তি। তখন সমগ্র চর অঞ্চলে নিজেদের রাজার মতো লাগে। মোষগুলো ওর প্রজা। রাজত্বে অনাবিল শান্তি। অযথা হৈ টৈ নেই।

সবচেয়ে বয়সী মোষটা অস্থির হয়ে উঠেছে। এমনিতে ওটা বড়ো বেশি একগুঁয়ে। সামলাতে কষ্ট হয়। পেছনের পা দিয়ে শূন্য লাথি ছুঁড়েছে। অর্ধাং দরজা খোলো। বাইরে যাবো। বাইরে এখন উজলা প্রহর। রোদ না উঠলেও চকমকে আলো চারদিকে অগত্যা জলিলকে উঠতে হয়। ওদের বের করতে হয়। বাইরে এনে ভুসির গামলা মুখের কাছে রাখতে হয়।

মামী পাশ্চা টের করে রেখেছে। পাশ্চা আর মরিচ পোড়া। মামী ওকে খাওয়াটা ঠিকমতো দেয়। এই ব্যাপারে গাফিলতি করে না। জলিল পগপগ খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে যায়। গরু-মোষ হাঁটার সুরু রাস্তায় এসে বিড়ি বের করে একটা। পুকুরঘাটে মনাকো দেখে এসেছে। উঁবু হয়ে মুখ ধুচ্ছে। বয়সে জলিলের বড়ো। ভাগে একটু থুঁত আছে। বেশি টাকা-পসয়া খাচ কবলে বিয়ে হয়ে যায়। অথচ ঐ খরচের ভয়ে মাথা মাথা এগুচ্ছে না। ওকে খুঁটির বুড়ি বানানছে। জলিলের মেজাজটা চন করে ওঠে। সামেই বলে মামাটা মানুষ না। থু: করে একদলা খুঁত ফেলে ও। কাউয়াকিবি লতার ওপর থক করে পড়ে দলাটা। আঃ লতাতার গায়ে কী সুন্দর লাল লাল ফুল ধরে আছে। কেন মিছেমিছি ওখানে থুঁত ফেললো? জলিলের মন খারাপ হয়ে গেলে। ফুলগুলো ময়না বু-র মতো। অযত্নে ফুটে আছে। কেউ ওদিকে চায় না। মামা মামী বলে, ময়না ফুল কপালি। বর জুটবে না। বিয়ে কথা। ইচ্ছে থাকলেই জুটবে। সে ইচ্ছে ওদের নেই। ঘরে বসে মুখে ঠুপি দিয়ে রাখলে কি মেয়ের বিয়ে হবে? জলিল রাগের চোটে খড়াম করে কাঁটাঝোপে



লাথি বসিয়ে দেয়। ময়না বু, মুই তোমার বিয়া দিমু। ঠিক কইলাম। দেইখে এটুও মিছা না। হাওলাদারের পোয়াভা তো কয়, দুই কানি জমি লেইখা দিলে তোমারে বিয়া করবে। মুই দিমু ময়না বু। কেবল তুমি মোরে একটু ভালোবাসা দি। তুমি তো সগির-দবিরের মতো না। ওরা তো লুচা হারামি। কেবল মোরে মারতে চায়। ওরা মোর ভাই না। জলিল ইটাতে ইটাতে বিড়ি টানার কথা ভুলে যায়। মোখগুলো এদিক-ওদিক চলে গেছে। আবার ওদের জড়ো করে ইকিয়ে নিয়ে যায়। কাল থেকে বয়সী মোখটাকে হালে জুড়বে ওরা। তাহলে কয়দিন অন্তত একটু আরাম পাওয়া যাবে। ওটা পারুলটাকে বড্ড জালায়। বাসুড়ের দিকে এগোয় ও। পরিতাপ জমিতে ঘাসের এক রকম মূল হয়। সেগুলোর জন্যে মোখগুলো বড়ো লোভা ও জায়গাটা জলিলেরও ভালো লাগে। শুকনো। ঘন পাতায় ছায়া ছায়া। মোখ ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিতে চোখ বুঁজে গুয়ে থাকায়। বর্ষার মাবামাকে হালে হবে ওরা। কদিন থেকে একদম বৃষ্টি নেই। বরা বাড়াটা দিন। ভ্যাপসা গরম শরীর পোড়ায়। কাদা এখনো শুকোয়নি। পা ডেবে যায়। কোথাও থকথকে ঘটিঘটিলা। মোখগুলো দুধারের কালিকদম ঘাস মুখে নিয়ে চিবতে চিবতে চলেছে। গগলডিং গগলডিং। পাখি ডাকে একটা। জলিল থমকে দাঁড়ায়। না, পাখিটা দেখা যাচ্ছে না। কেবল ডাক শোনা যায়। পাখি ওর থ্রি। মোখ চরাবার সময়টাকে ঐ ডাকটা শোনা চাই। নইলে ভালো লাগে না। দূরের কাপিলা গাছের মাথায় হয়তো থাকতে পারে। ডাকটা আস্তে আস্তে সরে যায়।

জলিল আর দাঁড়ায় না। মাথার মধ্যে শব্দটা বাজতে থাকে। গগলডিং গগলডিং গগলডিং। ময়না বু, তুমি ভাইবো না। মুই ঠিক তোমার বিয়া দিমু। গগলডিং। ময়না বু এবার তোমার শব্দও-বাড়ি অইবো। গগলডিং। ময়না বু তোমার চাঁদ উজালা পোয়া অইবো। তুই মোর মা-র মতো অইয়ো না ময়না বু। পোয়া থুইয়া আর কারো সংসারে যাইয়ো না। তহিলে পোয়ার বড়ো কষ্ট অয়। দুনিয়ায় তার আর কেউ থাকে না। বাতাসে ভাসা কুটার মতো অইয়া যায়।

আজ আর দুপুরে খেতে যাবার কথা মনে থাকে না জলিলের। পেট ভরে বুতিজাম চিড়ায়। এবড়োখেবড়ো মাটিয়ায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। অল্প শাওয়ার অভাব হয়ে গেছে ওর। বাছুরার প্রতি কোনো টান অনুভব করে না। ঘুরতে গেলোনে জোবানের কাছে এসে দাঁড়ায়। জলিলের বুকটা অর্ধ হয়ে যায়। মোখটা একটু বিলসী। আইয়াশ করতে ভালোবাসে। একদম অলস। আড়ে আড়ে শুধু জবার দিকে চায়। জবটার বদল বেশি না। সে ভুলনায় বেশ নান্দনন্দুদস হয়ে বাড়ছে। জলিলের হাসি পায় বাটা মরদ হচ্ছে। ভুটানের শরীরা ভালো না। কিছুতেই গতর ফেরে না। হাড়গোড় বেরিয়ে থাকে। তেমনে জোবানের রাজ। যাকে-তাকে গুঁতোতে চায়। কেবল জলিলের সামনে একদম সুবোধ। যেন নাটে গাছটি মুড়োতে জানে না। কখন পারুল এসে পাশে দাঁড়িয়েছে টের পায় না। পারুল আছে বেশি খি খি ঘবে জলিলের পিঠে। জলিল গলা জড়িয়ে ধরে। গন্ধ নেয়। তুই মোর আমতৃত্ব বো। আটালি বেছে দেয়। চকচকে শিং কামাড়ায়। পারুল আসরে নিশ্চপ থাকে। দুই ভুটানের পিঠে কালো ফিঙে লেজ নাড়ায়। ও কিছু বলে না। বিরক্তও হয় না। হেলেন্দুলে এপাশ ওপাশ চলে। বাসুড়ের গোটা পরিবেশটা জলিলের মগজে ছিন্নর বইয়ের মতো উন্মেষ্ট যায়। আঝ-কী আন্দন। এটাই ওর শোবার ঘর, কাছারি, রান্নাঘর, টেকিঘর, পুকুরঘাট, পাছ-দুয়ার। ওর গোটা বসবাস। চারদিকে শানের পালা। রাতদিন ধান মাড়িয়ে উৎসব। এর মাঝে পারুল কেবল বনসী বাছুর বিয়ায়

এখন থেকে ও আর কোথাও যাবে না।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। মোখগুলো এক জায়গায় জড় হয়েছে। বিকাম নিচ্ছে। ওদেরও যাবার তাড়া নেই। বয়সী মোখটা একদম শান্ত। যেন সারা দিন মাঠের কাজ করে এসে হাত-পা ছড়িয়ে দিয়েছে। জলিল মিলিয়ে দেখলো ঐ মোখটা ওর বাপের মতো। গোয়ায়ুর্দি আর জেদ ছাড়া জীবনের আর কোনো সন্দ্বন্দ নেই। গড়া জিনিস ভেঙে দিতে ভালোবাসে। এ পর্যন্ত সাতটা বিয়ে করেছে। একটাও রাখতে পারেনি। মেজনের বাপের সঙ্গে ওর থাকা হলো না। বাপের সংবার বিছুরি মতো। জালা ছাড়া আনন্দ নেই। অথচ বাবা মানে জলিল বুঝতে চায় যে সম্পর্ক উত্তাপ ছড়ায়, যা ঠাণ্ডা জল। কেবল কথায় নয়। দৃষ্টির। দৃষ্টি বুঝিয়ে দেবে গভীরতা কতটুকু। কিন্তু আদুরে উত্তাপের বদলে জলিল পেয়েছে গনগনা তাপ। বয়সী মোখটা আজ ওর দিকে কেমন করে যেন তাকাচ্ছে। বোবা ভাষা প্রকাশের বেদনায় অসাড়। জলিলের শরীর কেমন করে। প্রবল আবেগে কেঁপে যায়। বাবা আমার বাবা। ওর গলা জড়িয়ে ধরে। গরম শ্বাস মুখের ওপর পায়। কোনো কিছুই আর ভালো লাগে না। বৃকের ভিতর গগলডিং বয়সী মোখের শ্বাসে ঘাসুয়া গন্ধ। আটশ বছরের ফেলে আশা চরাচর সে গন্ধে ম মনে। মনে হয় বাপের প্রত্যেকটা বছর যেন ছোট মোখের বাচ্চা হয়ে কাঁপা কাঁপা পায় ওর দিকে ছুটে আসছে।

সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। কারো যাবার কোনো তাড়া নেই। ভুটান শূন্যে পা ছোঁয়ে না। অন্যদিনে ওকে ব্যস্তিব্যস্ত করে তোলে। আজ নিশুম। জাবর কাটে আর মাঝে মাঝে মশা তাড়ায়। জলিলের শরীরের আমেজি আবহও। মুদুমদ। এভাবে শুয়ে থাকটাই জীবনের লক্ষ্য। মাঝে মাঝে ঘুণুরি পোকর ডাক সরব হয়। আবার কমে যায়। জলিল ঠিক করে ফেলে আজ ও আর বাড়িতে ফিরবে না। ঐ ঝি ঝি শব্দ বৃকে নিয়ে সারা রাত এই মাঠে শুয়ে থাকবে। পেটের ভেতর চিনাচিনা। বুতিজামের রেশ অনেক আগে শেষ হয়ে গেছে। ও আমল দেয় না। চোখ বুঁজে জামে। মনে মনে হাওলাদারের ছেলের পাশে যোমটা মাথায় ময়নাকে বসিয়ে দুশাটা কল্পনা করে। চমৎকার মানাবে। মনে মনে পুলকিত হয়। অনেকগুলো বছর মনো বড়ো নিঃসঙ্গ কাটিয়েছে। এবার ও ময়নার শরীরের মালিকানা আরেকজনের হাতে তুলে দেবে। তাতে ওর কোনো সুখ নেই। ময়নার সুখ। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে জলিল।

মামাতো ভাই সগিরের একটা লাথি কোমরের কাছাকাছি পড়তেই ঘুমটা ছুটে যায়। ঘুম জড়ানো চোখটা টানটান করার আগেই আরোখটা। গাঁক করে ওঠে। সেই সঙ্গে দু-কান ভরে বাজ্ঞে মামার অশ্রাব্য গালাগাল। ওরা ওকে বুঁজতে বেরিয়েছে। একটা কথায় বলে না। মামার গালাগাল ওর কানে ঢোকে না। শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে গেছে। পুরো সংসারটা তখনই কণে দিয়ে ওরা চার-পাঁচজন মোখের দঙ্গলটা ভাড়িয়ে নিয়ে যায়। অগত্যা জলিলকেও পিছু পিছু ইটতে হয়। পারুল মাঝে মাঝে থাকলে ওকেই খোঁজে। আঁধার তেমন নিবিড় নয়। আবার চলতে শুরু করে। জলিল বোঝে পারুল ওকেই খোঁজে। আঁধার তেমন নিবিড় নয়। তবুও ইটতে কষ্ট হয়। রাত হহাতো খুব বেশি হয়নি। মামা একটানা বকে চলেছে। এই সংসারে ওকে দিয়ে যে কিছু হয় না বারবার সেটা বলে। বরং ও যাড়ের বোঝা। নামাতে পারলেই বাঁচে। জলিল কথা বলবে না বলে ঠিক করেছে। পেটের ভেতর থেকে কেবল ঢুকা



ঢেকুর ওঠে। বুকে জালা, গলার কাছে জালা।

দুদিন পর ময়নাকে কারা যেন দেখে গেলো। তাদেরও অনেক দাবি। মামা গোমড়া মুখে চুপ করে থাকে। মামী ওনওনিয়ে কাঁদে। জলিলের ইচ্ছে করে চিংকার করে মামাকে গালাগাল করতে। সে-রাতের ঘটনার পর ওরা একে মেঘ ছাড়া আর কিছু ভাবে না। জলিলের মনে হয় ওর নিজের ভেতরে একটা মোষের রাগ অনবরত টগবগায়। দুই শিং-এ সব কিছু তছনছ করে দেবার আকাঙ্ক্ষা। দুপুরে ময়না পুকুরঘাটে বসে থাকে। জলের বুকে নিজের ছবি দেখে। দাগলদাগল চুলের গোছা পিঠের ওপর।

ময়না বু?

কিরে?

ময়না ওর দিকে না তাকিয়ে উত্তর দেয়।

একটা কতা—

ক'না?

মোর দিকে চাও।

কী?

ময়না একটু অবাক হয়। এ সংসারে জলিলের কোনো দাম নেই। ওর সঙ্গে ভালো করে কেউ কথা বলে না। ও নিজের প্রায় চুপচাপই থাকে। আজ যেন জলিলের কণ্ঠ অন্য রকম। কর্তৃপক্ষের দূর আছে।

কী? কিছু কছ না যে?

তোমার কারে পছন্দ অয় ময়না বু? হাওলাদারের পোলা, না পরও যে অহিলে?

জলিল?

তোমার পায়ে ধরি, রাইগো না ময়না বু। মুই তোমার বিয়া দিমু।

জলিল?

হ একদম হাচ্ছা কতা। মোর যে তিনকানি জমি আছে মুই হেইডা তোমার নামে লেইখা দিমু। কতা কও ময়না বু।

ময়না চুপ। শ্বাস নিতেও কষ্ট। জলিল আজ ওর পিতার ভূমিকায়। যার এক পয়সার মূল্য নেই এ সংসারে। ময়নার চোখ দিয়ে টিপটপ করে পানি পড়ে।

ক'হিসো না ময়না বু। খালি তোমার মতটা কও। আর বেবাক কাম মোর।

মুই জানি না। মোর কাছে বেবাক সমান।

জলিল থমকে যায়। তাই তো, ময়নার তো কোনো পছন্দ-অপছন্দ নেই। বরই জোটে না, তার আবার বাছ-বিচার কী? জলিলের মোষের রাগ পানি হয়ে যায়। বুকাটা তেলপাউড করে। এ সংসারে ওর চাইতে ময়নার অবস্থা আরো খারাপ। ময়নার সমস্ত আবেগ ফুলে ফেঁপে ওঠে। কিছুতেই কামা থামতে চায় না। অপদার, অরহেলিত ফুফাতো ভাইটিকে আজ পিতার চেয়েও সম্মানিত মনে হচ্ছে। এক মুহুর্তে নিজ পিতাকে বড়ো বেশি স্নান, বিবর্ধ মনে হয়। যে ভূমিকা তাঁর ছিলো, যেখান থেকে তিনি অনেক দূরে সরে গেছেন— সে ভূমিকা নিয়ে জলিল আজ সপক্ষে দাঁড়িয়ে।

তবু তোমার একটা মত দাও ময়না বু।

মুই কিছু জানি না। তুই যা করি মুই তাতে রাজি।

ময়না জলিলের সামনে থেকে পালিয়ে যায়।

পর্বে আনন্দে জলিলের কলজোটা প্রসারিত হয়ে যায়। আঃ কী শান্তি। আজ ও ময়নার পিতার ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত। সব মতামত গ্রহণ করার ক্ষমতা ওর। মামা একটি শব্দও করতে পারে না। তিনকানি জমি এ সংসারের মুখের ওপর প্রচণ্ড থাপ্পড়। বহুর বহুর মামার গোলায় ধান ওঠার চাইতে, ঐ জমির বদলে ময়নার সংসার। জলিলের ধৈর্য ধৈর্য করে নাচতে ইচ্ছে করে।

শেষ পর্যন্ত হাওলাদারের ছেলেকেই পছন্দ হয় জলিলের। জমিজমা একটু কম থাকলেও বাবরের দিক থেকে চমৎকার। আদবকায়দা জানে। ময়নার সঙ্গে মানাবে। কথটা যেমণা করার সঙ্গে সঙ্গে পুরো সংসারের চেহারাটা পাটে যায় ওর সামনে। মামা গুম হয়ে থাকে। বিকল কোনো প্রস্তাবও নেই। মামাতো ভায়েরা সমীহ করে। মামী পান্ডাভাতে মরিচ-পোড়া না দিয়ে ডিম ভেজে দেয়। জলিল খেতে পারে না। পাতের পাশে ডিম ফেলে রেখে মরিচ দিয়ে খেয়েই চলে যায়। ময়না ওর সামনে আসতে পারে না। সকলের বুকে যন্ত্রণা টেঁচে করে। কেবল জলিল নির্লিপ্ত, উদাসীন। ভয়ানক হালকা লাগে নিজেকে। মোষের গলা জড়িয়ে ধরে গান গাইতে গাইতে বাসুড়ে যায়। আশেপাশের লোকজন অবাক হয়ে ওর গলা-ছাড়া গান শোনে। কোনো দিন গানের কথা ভাবতে পারেনি জলিল।

একদিন মামা ডেকে বলে, জমি রেজিস্ট্রি করার আগে ভালো কইরা ভাইবা দ্যাখ জলিল মুই আপনের মতো ভালোমনে বুজি না।

তিনকানি জমি কম না।

আর ময়না বু? হের কথা ভাবেন না।

কপালে থকিলে একদিন বিয়া অইবো।

ঐ কপাল লইয়া বইয়া থকিলে ময়না বু-র জীবন আদ্বার।

মামা কথা বলে না। জলিলের ইচ্ছে করে মুখের ওপর একদলা পুতু দেয়। তিনকানি জমি নিজের দখলে রাখার কী আকাঙ্ক্ষা। ময়নার চাইতে জমির দরদই তার কাছে বেশি। ও আর কথা না বলে বেরিয়ে আসে। মামার কাছে থাকলে একদিন ঐ জমি হয়তো ওর দখলে আসতে পারে। কিন্তু সে ইচ্ছে নেই। ও চরেই চলে যাবে। জমিটা লিখে দেবার সময় একটুও খারাপ লাগেনি জলিলের। বরং টিপসইয়ের সময়ে আঙুলটা দাবিয়ে রেখেছিলো অনেককণ। তারমুখ মনে হয়েছিলো নিজেকে। জীবনের কোথাও কোন বন্ধন নেই। ঐ তিনকানি জমি ছিলো শেষ আকর্ষণ। এবার ও নিরিবাসে চলে যাবে। বিয়ের দিন ও ইচ্ছে করে সবাইকে এড়িয়ে ছিলো। হঠাৎ করে সমস্ত অনুভূতি বোদা হয়ে যায়। যে ভূমিকা সে পালন করেছে তার জন্য এখন আর মনে কোনো গর্ব নেই। সব পানসে। লাল শাড়িতে ময়নাকে কেমন লাগছে তাও দেখতে ইচ্ছে করে না। মোষের গলা জড়িয়ে শুয়ে ছিলো। বরং সে রাতে বয়সী মোষটা কেবলই ওর গা চেটেছে। গরম নিশ্বাসের হালকা বইয়ে দিয়েছিলো। কতো ভালবাসা সে উভাপে। এ সংসারে এখন ওর সম্মানজনক স্থান কায়াম হয়েছে। সেই সূত্রে মামা একদিন বলে ফেললেন, চরে যাওনের লাগি একজন কামলা ঠিক করি। তোর যাওনের কাম নাই।

জলিল বিস্মিত হয়, ক্যান?

না চরে তো মালা। কষ্ট। খাওনদাওনের ঠিক নাই।

মুই যামু। মাইনখের হাতে ছাইডা দিলে মোইখঙলানের কষ্ট অইবো। মামা আর কথা বলে



না। জলিল জানে মামা চায় ও-ই যাক। শুধু মুখে মুখে আলগা দরদ। তবু জমি লিয়ে না দিলে এটুকুও বলতো না। যাকগে, এসব ভাবে লাভ নেই। চরে যাবার জন্য এখন ওর মনের টাটা অবস্থা। পারলে উড়েই চলে যায়।

কার্তিকের মাঝামাঝি এক উজানি পহরে জলিল রওনা হয়ে যায়। সূর্য ওঠেনি। দশটা মোষ আজ বেশ চঞ্চল। ঢালয় ফুটি ভাব। ভূটানের গলায় ও একটা ছোটো খুঁধুর বেঁধেছে। ওটা টুটাং বাজে। মামা পিছু পিছু অনেক দূর এসেছিলো। অনেক উপদেশ দিচ্ছিলো। কিভাবে মোষের যত্ন নিতে হবে বুঝিয়ে দেসব কথাই বলছিল। জলিল মাঝে মাঝে মোষের গতি নিয়ন্ত্রণের অভ্যাসে সেসব কথা উপেক্ষা করছিল। বাপের কাপুর ছাতিম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে মামা যখন বিদায় নিলো, তখন ও ফুল করে একটা নিশ্বাস উড়িয়ে দিল বাতাসে। ভূটানের ঘুঁধুরটাকে মনে হলো ছোট্ট টুটনি। কেবলই টিয়ারকণিকর শব্দে ওঁদের সঙ্গ দিচ্ছে। রোদ ওঠার আগে অনেক দূর পৌঁছে যাবে জলিল। তালতলী সৌছাতে পৌঁছতে সেই সন্ধ্যা। আজ কোনোক্রমেই পথের চিন্তা ওকে কাবু করে না। বয়সী মোষটা সবসারি আগে গিয়ে। ওটার দিকে তাকিয়ে জলিল নিজের মধ্যে শক্তি পায়। মাঝে মাঝে পারুল এসে পাশে পাশে হাঁটে। আবার সামনে চলে যায়। পাশ থেকে ঘাস মুখে ওয়ান। চিরতে চিরতে চলে। জলিল আরেগে কেঁপে যায়। ওরা কেমন করে বোঝে জলিলের মনের কথা। যে কথা মামা-মামী, ময়না, সগির, দবির কেউ কখনো বোঝেনি। আসলে এটাই ভালোবাসা। ভালোবাসার আমতুড় চর। স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যায় সেই আলৌকিক অনুভূতিতে। যার জন্যে বুকটা দশহাত বেড়ে ওঠে। নদীতে জাগা চরের মতো। তখন সেখানে টুপটাপ করে জীবনের রোদ-বালি। বয়সী মোষটা কখনো থমকে দাঁড়ায়। জলিল হাতের লাঠি উঠিয়ে জানান দেয়, মুই পিছে পিছে আছি। ডর নাই। ইদানীং বয়সী মোষটা আচরণে বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। জলিলের প্রতি তার ব্যবহার পিতার মতো। আগলে রাখতে চায়। অবোধ চোখের ভাষায় গভীর চাউনি। জলিলের ভবঘুরে মনটা সে চাউনিতে আটকে থাকে। জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা কমে যায়।

সামনে বিশ্বখালী নদী ছড়পছ বয়। নদীর কানটায় চলে ওরা। বর্ষা শেষ। নদীর যৌবন টাপটেপো ভরা। জবাটা ঠিক এমনি হচ্ছে। নদীর মতো ফুলছে। ও নিজেও বুঝতে পারছে যে ও-ই কী হচ্ছে। আকাশে মেঘের ছিটোফিটা নেই। যিমান্নি গরম। ভাগ শরীরের ভেতর থেকে ঢেলে বেরিয়ে আসতে চায়। ওদের হাঁটার গতি মস্তর হয়ে গেছে। এবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম দরকার। ছায়াছন্ন জায়গা দেখে থামে জলিল। হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ে। মোষগুলো কুঁড়িতে গিয়ে নামে। অল্প পানি। তবু ওতেই ওদের আনন্দ। জলিল টিড়েমুড়ির পোতালা খুলে বসে। চুড়িতে আসতে চায়। দূরের লাগে না। দূরের মাথা ফুটকলি ওড়ে। ওর চোখে তালতলীর স্বপ্ন ঘনিয়ে ওঠে। ওখানে গিয়ে এলি পাতা দিয়ে ঘর বাঁধবে ও। তারপর নিরুদ্বিগ্ন জীবনযাপন। সে জীবন ওর সামনে রূপরেখাও ডাক করে। বুড়কো পারুল মোর আর ভাবনা কী। অহন পারুল ভড় বঁহীচা থাকা। মামার কলিজার উপর ডড গুলি মারা। তোপগরে লইয়া মুই আর ফিরকন। তালতলীর চরে ডড ঘর বাঁধুন। বৌ এটো যোগাড় করুন। একেবারে ডড বৌ। সন্ধ্যার কিছু আগে তালতলীতে পৌঁছে যায় ওরা। ছোটখাটো বাহিনী। জলিলের বৃকের মধ্যে ভিলিক ভিলিক। কোনো দ্রাবুতি নেই। চোশা চোশা ধানের দামে মুখ ডুবিয়ে একদম বৃদ হয়ে যায় মোষগুলো। বর্ধনি এমন কটি ঘাস ওরা চোখে দেখেনি। চারদিকে নীরব নিথর। দূরে দূরে চাষিদের ভাল ঘর। শৌশো বাতাস বয়। মৃদু কাঁপা যায়। যদিও শীত এখনো পড়েনি

আসেনি। রাতে মোষগুলো বাইরে বেঁধে চাষিদের একজনের সঙ্গে ওয়ে পড়ে জলিল। নির্বিড় ঘুম ভরপেট ভাত খাওয়া মানুষের মতো পরিতৃপ্ত করে দেয় ওকে। চারদিকে ঘুরেফিরে মন ভরে যায় জলিলের। সবুজের প্রান্তর যেন মাটি ফুড়ে চড়চড়িয়ে বেড়ে উঠেছে, কোথাও তিরতিরাজা জলের নাল। পার হচ্ছে গেলে ইচাদলায় পা আটকে যায়। যেন বলে, একটু দাঁড়াও। দুটো কথা বলে। ছোট্ট তলাপটুপটি পাখিটি মাথার উপর দিয়ে বোরে। ছায়া পড়ে গায়ে, মাথায়, পায়ে। যেন ভাব জমাতো চুটি। জরমনি লতা কেবলই পথের দিকে চেয়ে অপেক্ষায় থাকে। কার সঙ্গে কথা বলবে জলিল? এতো ভালোবাসা সহিবে না। সহিবে না। চোখে পানি এসে যায়। মা ভালোবাসেনি, বাবা ফিরে চাননি। মামা-মামীর অবজ্ঞা আর উপেক্ষা গলায় মাল। অথচ এরা কারা ওকে ভালোবাসতে আসে। কেন এতো সোহাগ জানায়। এই নিম্নমূর্খ পরিশ্রম জলিলের বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে তোলে। শৌ শৌ বাতাসের দিকে মাথা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ও। নদীর ছলাং ছলাং থমথমা যৌবনের মতো। শরীরের কিনারে আকর্ষণ করে। ভূটান এখানে এসে সবচেয়ে খুশি। দৌড়ে দৌড়ে জলিলের কাছে আসে। টাং টাং শব্দসহ জিভটা বের করে দেয়। শিং-এর ওতো মাঝে আলাতো করে। পারুল একটু গভীর হয়েছে। শরীর ভার। ওর বিরোনের এখানে মাশ তিলেক বাকি। মাঝে মাঝে ঘাস খাওয়া ভুলে গিয়ে যেমন উদাস চোখে চেয়ে থাকে। পারুল প্রথম না হবে। যেন দূরের দিকে তাকিয়ে সে গৌরবময় বেদনা অনুভব করে। জলিল পেটের ওপর হাত রাখলে বাচ্চাটার নড়াচড়া টের পায়। এতো আনন্দ ও কোথায় রাখবে?

দুপুরে কটকট্টা কালে রাঁধা কাঁটাপাতাশি মাছ দিয়ে ভাত খেয়ে বাইরে এসে টানটান ওয়ে থাকে। এখন আর কোথাও কোনো বাখাটাখা নেই। কটকট্টা কালে বুক জ্বলে না। সব সাফসুফ। মনটা উদ্বেগ চর। এলোপাড়াই বাতাসের দাপাদপি কেবল। পা ভাসিয়ে আয়েশ করা।

দুদিন ধরে আকারের অবস্থা ভালো না। বুপো বুপো মেঘ কখনো লম্বা রৌয়া-সেলা শূন্যোপাকার মতো হয়ে যায়। তখন ঝিরঝির বৃষ্টি নামে। লক্ষণটা ভালো মনে হয় না জলিলের। আবহাওয়াটা কিসের টানে চঞ্চল, জলিল বোঝে। কড়াৎ করে গর্জে যাক আকাশের এপাশ থেকে ওপাশ। মোষগুলো মুখ উচিয়ে ডাক ছাড়ে। বাতাসে গন্ধ শোকে। রাতে ওয়ে ওয়ে গুমফুলির ডাক শোনে। মনটা খটখট করে। কটকট্টা শব্দটা জলিলের বৃকে চাবুকের মতো লাগে। ভালো লাগে না। সমুদ্র ফুলছে। এলিপাতার ঘর দুলে ওঠে।

রিমঝিম বৃষ্টি কাল থেকে একটানা। মোষের ভায়ে আকাশ কুঁজে হয়ে গেছে। সারাদিন ভিজে ভিজে ঘাস কেটে মোষগুলোকে দিয়েছে ও। বাধান থেকে আর বের করেনি। খুঁটিগুলো শক্ত করে বেঁধে দিয়েছে। বয়সী মোষটা চুপচাপ। ঘাসই মুখে তোলে না। পারুলেরও একই অবস্থা। জলিল ওর পিঠে হাত বুলায়, খা মনু, খা। নিজের লাইগা না খাইলে প্যাডেরটার লাইগা খা। কিন্তু পারুল নির্বিকার। ওর দিকে একবারও ফিরে চায় না। যেন অভিমান, কে বললেই ভিজে ভিজে ঘাস আনতে। আমি খাবো না। ভূটান গরগরিয়ে যায়। জলিলের দিকে কৃতজ্ঞ চোখে তাকায়। মাথা নাড়ে।

নিজের আস্তানায় ফিরে শুকনো গামছা দিয়ে মাথা মোছে। মাথা ভার। সর্দি বারছে। ঘুরে ফিরে একটি কথাই মনে হয় সমুদ্র ফুলছে। পারুলের পেটের কথা মাসের হিসেবে নয়, মিনিটের হিসেবে ফুলছে। খাবার খাচ্চা কিছু ঘরে নেই। অগত্যা মাথা মুড়ি দিয়ে ওয়ে পড়ে। ঘুম আসে না। ভীষণ অসুস্থ। বর্ধনি পর জলিল যেন সেই শব্দটা শুনতে পায়। কপর কপর



কপর কপর কারা আসছে? কাদের পায়ের শব্দ? একবার উঠে বসে। কান পেতে শোনার চেষ্টা করে। কৈ না। কোনো শব্দ নেই। জ্বর এসেছে। মাথা ভীষণ গরম। আবার শুয়ে পড়ে। শুনেই সে শকটা হয়। কপর কপর কপর কপর।

মাঝরাতে সমুদ্রের ডাকটা ঠিক গুনতে পায় ও। কলকলিয়ে ছুটে আসছে। চরে ছিপিছপানি পানির নালয় এখন স্রোত। ভরে উঠছে। বাতাসে এলিপাতার চালের অবস্থা কাহিল। আর দু এক ধাক্কা উড়ে যাবে। মোষগুলো ডাকছে। জলিল কাথা খুঁড়ে ফেলে লাফিয়ে ওঠে। হাঁটু পানি হয়ে গেছে। আর সময় নেই। অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে সবগুলো মোষের খুঁটি খুলে দেয়। পারুলের পেটের সঙ্গে ওর মুখটা লাগে। জলিলের কান্না পায়। বয়সী মোষটা পরিচিত ডাক ছাড়ে। এই ভঙ্গিতে ও জলিলকে খোঁজে। কিন্তু আজ আর জলিল ওর কাছে যেতে পারে না। আস্তে আস্তে ডাকটা দূরে চলে যায়। জলিল বোঝে স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। টিকতে পারছে না। জলিলের বুকটা ভেঙে ওড়িয়ে যায়। জলোচ্ছ্বাসের চাইতে ও দ্বিগুণ বেগে ওর চোখ দিয়ে জল গড়ায়। দশটা মোষের খুঁটি খুলতে হাঁপিয়ে যায় ও। খুঁজে পেতেই কষ্ট। সমস্ত চরাচরে কবকবা অন্ধকার। থৈ থৈ পানি ছাড়া আর কিছু নেই। একদিকে গরম স্রোত। অন্যদিকে বড়ো বড়ো বৃষ্টির ফাঁটা। জলিল দিশেহারা হয়ে যায়। হাতের কাছে কিছু নেই। কিছুতেই নিজেকে ধরে রাখা যায় না। ভাসতে ভাসতে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ চোখের সামনে একাকার হয়ে যায়। কিছুই মনে রাখতে পারে না ও।

পরদিন যখন জ্ঞান ফেরে জায়গাটা চিনতে পারে না জলিল। মগজকে নেশা নেশা ভাব। যতদূর চোখ যায় সব ঝোঁকাতো জনশূন্য নিধুয়া পাথার। সব অপরিচিত। নতুন। কেমন নোনাক্ষে জ্বা। বুক ভরে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। বুকের মধ্যে টে টে শব্দ। এ শব্দ ও আর কোনোদিন শোনেনি। জলিল অবাক হয়ে উঠে বসে। প্রাণপথে পাখি খোঁজে। না কোথাও নেই। নানাবিনিনি ভাবনা ও আক্রান্ত হয়। অথচ কোনো কিছুই ঠিকমতো ভাবা হয় না। প্রত্যেকটা ভাবনা পাড় ভেঙে যায়। জলিলের বুকটা ফোঁসে। উলঙ্গ শরীরে শিরশিরে অনুভূতি। কোনো মোষের কথা ওর মনে হয় না। এই নিঃসীম প্রান্তর ওকে ব্যাকুল করে তোলে। জলিল নতুন চরের বুক থেকে খাবলে মাটি ওঠায়। সোঁদালো গন্ধ পাগল করে দেয়। মাথার ওপর কিসের ছায়া? গ্যাটিটিরি। এতোক্ষণে একটা পাখি দেখছে ও। তখনই জলিলের মগজে হলুধরনি হয়। ও উঠে দাঁড়ায়।

চারদিক থেকে কারা মেনে উল্ল দিচ্ছে। হাজার হাজার পাখি। হাজার হাজার মোষ চড়াচড়িয়ে বেড়ে ওঠা ঘাসের প্রান্তর মাড়িয়ে ছুটে আসছে। উরুগরু গরুগরু উরুগরু।

সেই হলুধরনি সম্বল করে চরের ফটফটা মাটির বুকে দৌড়তে থাকে জলিল।

## সূরতর চিঠি

মানব চক্রবর্তী

চিঠিটা পড়লেই রমলা উচ্ছ্বসিত। 'কী মজা... সূরতর আসছে, ইস... সেই প্রায় চারবছর হল, তাইনা?'

রতন সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেল। সিগারেটে লম্বা টান মেরে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে জবাব দিল 'তা এতে বাচ্চা মেয়ের মত লাফানোর কী আছে!'

'লাফাছি? তাই মানে?' রমলা মুখচোখ তীব্র করে একপা এগোতেই রতন বলল 'মানে অনেকটা এরকমই—'

রমলার মুখে এখন অভিমানের কাতর ছায়া, সে যেন নিজেরই সঙ্গে কথা বলছিল— 'আমরা তো কোথাও ঘুরতে-টুরতে যাওয়া ভুলেই গেছি, বহিরের কেউ এলে আনন্দ হবেনা?'

রতন আলতো করে রমলাকে একনজর দেখে মনে মনে ভাবল, সত্যি, বিয়ের পর থেকে বেকবো বেকবো করেও কোথাও যাওয়া হলনা। একটা না একটা কামেলা লেগেই আছে। কিন্তু পরক্ষণেই রমলার উচ্ছ্বসিত মুখভঙ্গি মনে পড়তেই সে ফের গম্ভীর। অথচ কিছু একটা না বললে ব্যাপারটা ভাল দেখায় না বলেই সে ফের বলল 'তা চিঠিতে আর কি লিখেছে ওনি?'

রমলার স্বর সঙ্গে সঙ্গে ভরা কোটাল— 'লিখেছে ও ভাল আছে। মেয়েটার বয়স দু' বছর। খুব দুষ্টু। সেজন্যই ওর ডাক নাম দুষ্টু। ভাল নাম দেবারতি।' একটু থেমে রমলা ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস হুকিয়ে ফের বলল 'কী সুন্দর নাম তাইনা? নামটা গুনলেই কেমন যেন একটা সিদ্ধ অনুভূতি হয়—'

পরপর দুটো টান দিয়ে রতন সিগারেটটা হাতের টুকরিতে বাহিরে ছুঁড়ে ফেলল। 'ওটা মোস্ট কমন নাম—' দেবারতি, দেবার্চনা, দেবাঞ্জলি এসব এখন ঘরে ঘরে। না, নাম নির্বাচনের ব্যাপারে দেখছি সূরতরা সেই পিউরিটান ব্যাপারটাই ধরে রেখেছে।'

'সব ব্যাপারে খুঁত ধরাতো তোমার একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে—'

রতন বোধহয় একটু রেগে উঠল— 'তার মানে? আমার ভাল না লাগলেও তা মুখে বলতে পারব না? আমি তোমার মত ইয়েস-ম্যান নই।'

ইয়েস-ম্যান। 'কথটা রমলাকে সামান্য আহত করল। সে খুব স্পর্শকাতর, রতন জানে এক্ষণি হয়ত ও কেন্দ্রে ফেলবে, তাই খোঁচাটাকে তড়িঘড়ি রিফু করার চেষ্টায় অঙ্গ হেসে বলল, 'ইয়েস-ম্যান মানে আসলে তোমার কামের নিজস্ব মতবাদ নেই, যা দেখছ যা শুনছ যা ঘটছে সবই যদি ছোট্ট একটা "ভালো" দিয়ে শেষ করা হয় তবে "ভালো" শব্দটারও আর কোনো বিশেষত্ব থাকেনা—'

রিফু-টা সত্যিই ভালো হয়েছে। রমলার মুখচোখের ছেঁড়াফটা আর বোকা যাচ্ছেনা। অন্যদিকে রমলাও ভাবছিল এই সামান্য একটা কথা নিয়ে নিজের মধ্যে স্বগড় করা অর্থহীন। কত সুন্দর একটা দিন। শরতের আকাশ। রোদ্দুরের মিঠে আমেজ। পূজোর গন্ধ আকাশে-বাতাসে। এর মাঝে সামান্য একটা নাম নিয়ে তর্কাতর্কি মানায়!

রিফু করার পর তা ধূয়ে হিল্লি করলে ছেঁড়া আর বোকাই যায় না, সূরতর রতন এবারে বলল 'সরি— তোমার ভাল লেগেছে সেটাও ঠিক, আমার লাগেনি সেটাও ঠিক—'

রতনের 'সরি' শব্দটা রমলাকে স্পষ্টত শূন্য করল, সে আবার চিঠিটা খুলে বলে যেতে



লাগল 'দুই নাকি দেখাতে খুব সুন্দর হয়েছে, ঠিক পূর্বা-র মত, ওরই মত দুশে-আলতা রং—  
'ধ্যাত্, খালি মেয়ের গল্প, মেয়ে যেন আর কারো হয়না—'

বাধাপ্রাপ্ত রমলা একটু কীষোর সঙ্গে বলে উঠল, 'তুমি অত বিরক্ত হচ্ছে কেন? অত সুন্দর ফটফুটে মেয়েটার কথাই যদি চিঠিতে না থাকল, তবে চিঠি কিসের! আমার বাপু বুড়ো খাড়িলের খবরের চেয়ে বাচ্চাদের খবর শুনতেই বেশি ভাল লাগে—'

রতন মনে বনে বলল সেটাই স্বাভাবিক। তারও লাগে। তবে কিনা বিয়ের পাঁচবছর পরও যার নিজের বাচ্চা হয়নি তার ভেতরটা যে কেমন করে সেটা অন্য কেউ বুঝবে না। সুত্রতর মেয়ে যত সুন্দরই হোক ফর্সা হোক মিষ্টি হোক এসব রতনের কাছে অর্থহীন।

কিন্তু মুশকিলটা অন্য জায়গায়। এই যে সামান্য আগে সে হঠাৎ বলে উঠল 'ধ্যাত্... খালি মেয়ের গল্প...' অর্থাৎ রতন যে তার সহিষ্ণুতাকে ধরে রাখতে পারল না, এটাও এক ধরনের সামাজিক চ্যুতি। রমলা নিশ্চয়ই ব্যাপারটাকে একটা দীর্ঘার গন্ধ পাচ্ছে। সুতরাং রিফু-র খেলা শেষ হয়েও হয়না। ওটা চলতেই থাকে।

রতন একটু দার্শনিকসুলভ ভূষিতে বলে উঠল 'মাঝে-মাঝে কিছুই ভাল লাগেনা আমার, বুঝলে। সবকিছু কেমন যেন অসহ্য লাগে— ছাড়াও এসব, তারপর কি লিখছে শুনি—'

রমলার চোখ এখন আবার চিঠিতে। 'গতবার পূজোয় ডালহৌসি-খাজিয়ার হয়ে বৈষ্ণোদেবী সেরে এসেছি, এবারে ইচ্ছে ছিল সাউথে যাব, কিন্তু দুই'র ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হওয়ায় পূজোতে যাওয়া হবে না। ইচ্ছে আছে বড়দিনের সময় কোদাইকানাল পেরিয়ার ঘুরে কন্যাকুমারী যাব। একটা দামি ক্যামেরা কিনেছি। কত সুন্দর সুন্দর ছবি। ছবিগুলো নিয়ে আসব, তোমাদের দেখাব—'

অনেক চেষ্টা করেও রতন নিজের অসহ্যতা দমন করতে পারল না, তেতো-গেলা মুখে বলে উঠল—'হুঁ... নিজের কুতিভ্র-দেখাচ্ছে, আরে বাবা তোর ক্ষমতা আছে যত ইচ্ছে যোর, তা অত সাতকাহন করে লোককে শোনানোর কী আছে শুনি।' কথাটা বলেই রতন নিজেকে সংবর্ত করল। রমলার হিমচোরে রতনের দীর্ঘ ধরা পড়ে গেল নাকি! এবারে রতন বড় করে হাসল। তারপর হাসি থামিয়ে নাটকীয় স্বরে বলল 'আমরা এই ধুলোর মাঝেই দর্প রচনা করেছি বুঝলে রমলা — কোদাইকানাল আর ডালহৌসি সব আমাদের পায়ের কাছে—'

'তোমার খালি বড় বড় কথা, এই পাঁচবছরেই হেঁজে গেলাম, সেই একঘেয়ে খোড়-বড়ি-খাড়া জীবন। আমার একটুও ভাঙ্গাগে না—'

রতন তড়িৎঘড়ি জ্বাব দিল 'আঃ অত অধৈর্য হলে চলে? গোটা জীবনটাই তো বাকী, ঘুরতে যখন শুরু করব তখন আর থামব না। তুমিই তখন বলবে আর পারছিনা এবারে থামা দাও... হেঁ... হেঁ...'

এতেও রমলার মুখচোখে আগের উজ্জ্বলতা ফুটে উঠল না দেখে রতন সামান্য চিন্তিত হল। তারপর শিক্ষক যেমন ছাত্রকে বোঝায় তেমন ভাবে বলে উঠল— 'শোনো, এই যে সুত্রত চিঠিতে লিখেছে এখানে ওখানে নানান জায়গায় গেছি, এদেশ দেখলাম ঐ পাহাড় সেই সমুদ্র—আরে বাবা আমরা কি আর জানতে পারছি তার কতটা সত্যি কতটা মিথ্যে। মানুষ ঐ রকমই, একটা জায়গায় যায় তো দর্শটা জায়গার গল্প করে—ওসবে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হতে নেই—'

'তা ওদের ছবিগুলোও কি মিথ্যে?'

রতনের জ্বাব ঠোঁটের উগায়। 'ছবি। কত ছবি তুমি চাও? যের বসে বৈষ্ণোদেবী

কন্যাকুমারীর ঢের ছবি পাওয়া যায়। যারা একবার বেড়িয়ে এসেছে, ছবি তুলেছে, তাদের কাছ থেকে দু'এক কপি চেয়ে নিয়েও অনেকে ফটুনি দেখায়—'

এতে ফল হল বিপরীত। রমলা স্বংকার দিয়ে বলে উঠল 'অসম্ভব, সুত্রতকে আমি তোমার চেয়ে ভাল চিনি, সে এসব ব্যাপারে মিথ্যা বলতে পারে না। ওর বিয়ের অনেক আগে থেকেই আমি জানি, ঘুরতে ও বরাবরই ভালবাসত। এসব তোমার মনগড়া কথা। মানুষের নেগেটিভ দিকটাই তুমি শুধু চিন্তা করো, এটা তোমার একটা রোগ—ডিজিজ—'

বাস্য, গরম তেলে জল পড়লে যা হয় আর কী। রতন চীৎকার করে উঠল 'কী! কী বললে?'

রমলা এতে সামান্য নরম হলনা বরং দৃঢ়স্বরে বলল, 'সুত্রতকে আমি নতুন দেখছি না— এসব ব্যাপারে ও মিথ্যা বলতেই পারেনা— ওকে আমি তোমার চেয়ে ভাল চিনি—'

রতন, এইমুহুর্তে হাতে অস্ত্র পেয়ে যাওয়ার নিষ্ঠুরআনন্দে কর্কশ বরে বলে উঠল 'তা আমি জানি রমলা, সুত্রত যে তোমার অনেক দিনের বন্ধু, বিয়ের অনেক আগে থেকে তোমাদের মেলোমেশা সে সবই আমি জানি, নতুন করে আর নিই বা বললে—'

বাকদ, ঘর্ষণ, এবং বাতাস। সুত্রাং আশ্রয় জুড়ে উঠল নিমেষে।

রমলা তীক্ষ্ণস্বরে চীৎকার করে উঠল 'নিজে তুমি মিন-মাইভেড বলেই এসব নোংরা ইঙ্গিত করতে পারছ। ছিঃ, তোমাকে আমি চিনি না? হাড় হাড়ি চিনি। তুমি সবসময় ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্সে ভোগো, মানুষের ভাল দেখবে কোন চোখে?'

'খবদার, ভাল হচ্ছেনা বলে দিলাম, তুমি কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ রমলা—এরপর কিন্তু—'

'কী! এরপর কী! গায়ে হাত তুলবে? সেও পার তুমি। তবে তুলেই দেখ একবার—'

এটটা অবধি রমলা ঝড়ের গতিতে বলেই ফুঁপিয়ে কঁদে উঠল— 'তুমি... তুমি আমার জীবনটা হেল করে দিয়েছ— আমার একটা সাধ একটা স্বপ্নও মিটল না শুধু তোমার জন্য, তুমি আমাকে শেষ করে দিয়েছ—'

নীল আকাশ, স্বকবাকরোদুদর। এত সুন্দর দিনটা বিষম হয়ে গেল। রমলার কাঁদা যেন কোনো দুর্ঘা প্রজাবির হবিরণী রক্সা, বুনা খোপ, লাগাতার কঠিন গেরোতে আটকে পড়েছে। স্তম্ভিত রতনের দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করার ছিলনা। না, শুধু দাঁড়িয়ে নয়, দারুণ তোলপাড় চলছিল বৃকের ভেতরে। ঝোঁপানির স্বরে রমলার বলা 'আমার একটা সাধ একটা স্বপ্নও মিটল না শুধু তোমার জন্য—' কথাটার মধো কি সেই অদৃশ্য ইঙ্গিতটাই ফুটে উঠছিল না! ভাঙার বাসু রায় রমলা ও রতনকে নানা রকম পরীক্ষা করে যে রিপোর্টটা দিয়েছিলেন যাতে রতনের-ই সামান্য গোলমাল আছে বলে ফারদার ট্রিটমেন্টের জন্য সার্জেট করেছেন।

রতন নিজেকে দারুণ নিঃস্ব মনে করছিল। খুব দুঃখ হিচ্ছিল এইভাবে অর্থকর রমলাকে আভার দ্যা বেস্ট আঘাত করার। ছিঃ, ইদানীং কী যে হচ্ছে তার! না... না... সুত্রতকে নিয়ে রমলাকে ওসব বলা ভারি অনায়া হয়েছে। দারুণ অনায়া। কিন্তু রতন বুঝলেই তো আর হবে না। বোঝাতে হবে রমলাকে ওর মনের মতো জমে থাকা মেঘ দূর করতে হবে। এটা তো এই মুহুর্তে হতে পারেনা। এর জন্য সময় চাই। অবশ্যই একটা রাসী। হাঁ, দর্জিরা যা-ই বলুক, সংসারের যাবতীয় ফুটোখাঁদার রিফু রাব্রিতেই ভাল হয়—

বিকলে গো-বোঁয়া রমলার চিরকালের অভ্যাস। শীত গ্রীষ্ম এর ব্যত্যয় হয়না। আজ সে



গা ধুলোনা। চুল বাঁধল না। সেই যে উপড় হয়ে বিছানায় পড়েছিল, সেভাবেই আছে। মাঝে-মাঝে ওর কোঁপে ওঠা পিঠি দেখে বোঝা যায় কোঁপানিটা হঠাৎ হঠাৎ জেগে উঠছে।

রতনের দুঃখ হল। ছিঃ, সে একজন ভদ্রসভা মানুষ হয়ে এমন কথা বলল কী করে? সূরত-র সঙ্গে ওর বিয়ের আগের চেনাজানা—সেটা কি খুব একটা দোষের। তাছাড়া সূরত তো রতনেরও বন্ধু। দুজনই এখন বিবাহিত, ঘরসংসার নিয়ে ব্যস্ত মানুষ। তবু তো মাঝেমধ্যে সূরত চিঠিপত্র লিখে খোঁজ খবর নেয়। রতনের সেটুকু সৌজন্যবোধও নেই। চিঠির উত্তরও লেখেনা।

সূরত ও রমলার মধ্যে আজ থেকে দশ বছর আগে যা-ই থাক, আজ, এতদিন পর, এই প্রসঙ্গে ফোঁচা দিয়ে রতন যে খুব অনায়াস করেছে তা বেশ বৃথতে পাচ্ছে।

রাস্তা দিয়ে এসময় একটা ফুচকাওলা যায়। আজও গেল। ফুচকা আবার রমলার খুব প্রিয়। রতনের ইচ্ছে হল ফুচকাওলাকে দাঁড় করিয়ে আজ সে বৌকে পেট ভরে ফুচকা খাওয়ায়। কিন্তু উপড় হয়ে বিছানায় সেই দুপুর থেকে পড়ে থাকা রমলাকে কোন্ ভাষায় ফুচকা খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো যায় তা ভাবতে ভাবতেই ফুচকাওলা অনেকদূর চলে গেল।

রতন ঘর-বার করল ক'বার। বিকলের আলো নিভে আসছে। পাঁচদিকের ঘরে ফেরার তাড়া। একটু পরেই স্ট্রিট লাইট জ্বলে উঠল। হাতমুঠ ধুয়ে রতন আজ নিজেই সন্ধ্যা দিল। ধূপ জ্বলে ঠাকুরের সামনে ধূপদান রাখল। তারপর শীথে ফুঁ দিতে গিয়েই বিপত্তি। একটা বাচ্চা আরশোলা মুখে ঢুকে যাওয়া মাত্র শাক রেখে রতন জোরে থুঃ থুঃ করতে করতে বাথরুম দৌড়োল। একটু বমি-বমি লাগছিল, কিন্তু তা এমন নয় যে বমি হবে। রতন কিন্তু সেটাকেই ফাঁপিয়ে জোরে বমির উদগার ওঠার মত বার দুই করতেই দেখল সে সফল—এতক্ষণে উঠে বসেছে রমলা। তার চোখ ফোলা। তবু সে উৎকণ্ঠিত স্বরে বলল “কী হয়েছে?”

রতন যেন প্রাণ ফিরে পেল। উরু নানাবাদ জানাল আরশোলার বাচ্চাটিকে। সত্যি সমঝোতার রাস্তা কে যে কখন খুলে দেয় কে জানে।

চোখেমুখে জলের কাপটা দিয়ে রতন বলল “একটা আরশোলা ঢুকে গেছিল শীথে ফুঁ দিতে গিয়ে—

রমলা আরশোলাকে ভয় পায় খুব। সে অঁতকে ওঠার ভঙ্গি করল—“তাই নাকি?”  
“হ্যাঁ... এত বড় —”

এবারে রতন জোরে জোরে তিনবার শীথে ফুঁ দিয়ে গ্যাসে চা বসাল। তারপর গলা-কে মাঝনের মত নরম করে বলল, “যাও মুখ হাত ধুয়ে এসে, চা বসিয়েছি—”

রমলা জবাব দিলনা। তেমনই বসে রইল দেখে রতনের মন বলল আজ তার কিছু গাচ্চা যাবেনি যারে। সে এবারে আরও আন্তরিক স্বরে বলল শ্রীমতি সিনেমায় একটা ভাল বই চলছে। সিনেমা দেখে হোটেলের খোঁজে তাকে ফিরব। নাও, মুখ হাত ধুয়ে নাও, দেরি কোরনা—

রমলা উঠল। মুখ হাত ধুতে সেই বাথরুমে ঢুকল অমনি রতন দাঁত চেপে অনুচ্চ গলায় বলল “সব জানি, সিনেমা আর হোটেলের কথায় সব সময় কেটে গেলে হুঃ —”

রগরগে হিন্দি সিনেমা দেখে ও হোটেলের মোগলাই পরেটা কথা মাংস মেয়ে রমলা ও রতন তখন অন্য মানুষ। কী ফুরফুরে লাগছিল চারপাশ। রতন বলল “পান খাবো?”

“হ্যাঁ... মিস্টি পান”

দু খিলি পান খেয়ে দুজনের মুখ রাসা।

রতন বলল “হাঁটব না, রিকশায় যাব—”

রিকশার দুর্ভাগ্যে অন্ধকার পথে রতনের বুকে মাথা রাখল রমলা। একটা হাত রমলার কপালে বুলিয়ে দিতে দিতে রতন খুঁজছিল রিক্শা জায়গাটা খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। না গেল না। দক্ষ হাতের কাজ তো। সন্ধ্যা থেকে একশ পঁচিশ টাকা গচ্চা গেছে। তা হোক, সংসার এখন সংসারের মতই। এখনও রাত্রিটুকু বাকী। তখন তো সংসার হবে স্বর্গের মত।

রাত্রিটুকু আজ কাটল যাকে বলে বিয়ের প্রথম দিক্কার মত। রমলা অনন্য। রতন কিছু কম যায় না। এই ভাবে রাত যখন গভীর দুজন দুজনকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পর্দারিন সকালে উঠেই হাসিমুখে দুজন দুজনকে সন্তুষ্ট করল। তারপর একপ্রহু চা পান, বাজার, সকালের টিফিন, রান্নার ব্যস্ততা। দুপুরে ইলিশ ভাপা আর ঝোল। খাওয়া দাওয়ার পর রতনের সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস। কোলের নিচে বালিশ রেখে সে সিগারেট ধরাল। তখনই মনে পড়ল গতকাল সূরত’র চিঠিটা পুরোটা শোনা হয়নি। সে বলল ‘রমলা, সূরত আর যেন কী লিখেছে? কাল তো পুরোটা শোনাই হলনা।’

সূরত’র নাম শুনেই রমলা বলল “হুঁ ভুলেই গেছিলাম, এক মিনিট, পড়ছি—”

রতন দেখল রমলা তার ভানিটি ব্যাগের মধ্যে থেকে অতি যত্নে বার করছে ভাঁজ করা চিঠিটা। দেবেই ওর মেজাজ গরম হয়ে গেল। ওটা কী এমন দুর্দুল্য চিঠি যে অত যত্ন করে ভানিটি ব্যাগের মধ্যে রেখেছে!

রমলা পড়তে শুরু করল—“পূর্ব-র দাদা একটা নতুন মার্কিট গাড়ি কিনেছে। আমার সবাই একদিন তাতে চড়ে গাড়িয়ারা থেকে ঘুরে এলাম। দারুণ আনন্দ হল সারাদিন। গাড়িয়ারায় গেট হাউসে পূর্ব-র বরীন্দ্রসদীত গেয়ে একেবারে মাত করে দিয়েছিল।”

রতন ফোঁস করে উঠল ‘পূর্ব-র দাদা গাড়ি কিনেছে তো তোর কী! কী হামবাগ দেখ, এটাও আবার লিখে জানিয়েছে—’

রমলা প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলল ‘বাঃ তাতে দোষের কী! আত্মীয়-স্বজনের সুখবর না থাকলে চিঠি আবার কিসের চিঠি! কেন সেই যে গতবছর তোমার দাদার ছেলে জয়েন্টে পাশ করার পর আমি দেড়পাতা চিঠি লিখেছিলাম ওদের।’

রতন চুপ করে গেল। না, মিথ্যা বলেনি রমলা। একটু থেমে থেকে রতন ফের বলল ‘তারপর?’

রমলা পড়তে শুরু করল—“খুব তাড়াতাড়ি আমার একটা প্রমোশন হতে চলেছে। তিনজন ক্যান্ডিডেটের মধ্যে আমি যদিও সিনিয়র নই তবুও ম্যানেজমেন্টের কাছে আমিই হট ফেবারি। এই প্রমোশনটা হলে আমার আলাদা চেম্বার হবে, আলাদা ফোন, বাড়ি থেকে কোম্পানীর গাড়ি রোজ অফিসে নিয়ে যাবো—” রমলা অল্প থেমে রতনের দিকে চেয়ে বলল ‘আমি জানতাম, সূরত অনেক ওপরে উঠবে ওর যা ট্যালেন্ট—’

রতন মুখ বাকিয়ে “ট্যালেন্ট” শব্দটাকে ভাঙচুর করল একচোটে, তারপর বলল “ও যা তেলু, ও ঠিক প্রমোশন পাবে, জুনিয়ার হয়েও। আর এর জন্য যে দেবতা যে ফুলে তুষ্ট তা দিত ও সামান্য সবচেয়ে করবে না তাও জানি। তেল দিয়ে প্রমোশন আমি চাইনা—”

রমলা রাগাল না। রতনের কথাগুলি উপভোগ করছিল। কিভাবে? চমৎকার ছন্দে ক্র্যাপ্ বাজিয়ে। তারপর একসময় কাতাকাটা স্বরে বলল ‘গ্রেপস আর খাওয়ার—’

রতন চাঁৎকার করে উঠল ‘মোটোও না, প্রমোশনের জন্য আমি নীতি আদর্শ জলাঞ্জলি



দিতে পারি না, ইমপশিবল, সুত্রত একটা যা-তা, নিজের স্বার্থের জন্য ও যে কতটা নিজে নামতে পারে তা আমি জানি—'

'বা, ভায়লগগুলো কিন্তু দারুণ শোনাচ্ছে। কিন্তু শুধুমাত্র পেন-বিল থেকে একাউন্টস-এ ট্রান্সফার হয়ে আসার জন্য তুমি মিসেস চ্যাড্ডার জন্য দামি শাল উপহার দাওনি? বাজারের বড় বড় বেগুন কিনে ঘরের পাছে ফলেছে বলে বাগ ভরে তোমার চাড্ডা সাহেবের খরে নিয়ে যাওনি? বলনি, স্যার আপনি খুব বেগুন ভর্তা খেতে ভালবাসেন জেনে ঘরের পাছের সামান্য কটা—?'

রতন লাক্ষিয়ে নামল খাঁট থেকে। ওর মুখটা খুলে পড়েছিল, কিন্তু দ্রুত স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টায় সেটা আরও কুৎসিত দেখাল। 'ট্রান্সফার আর প্রমোশনে অনেক তফাৎ রমলা, আর তাছাড়া আমি মোটেও সুত্রত-র মত নই। সিনিয়রকে উপাকে প্রমোশনের কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনা—নেভার—' কথা শেষ করেও রতনের ফৈশানি কমল না।

রমলা দাঁতে কট করে এলাচ ভাঙ্গল— 'তারপর বাকিটা, পড়ি তাহলে—'

'হ্যাঁ পড়ে।' বৃষি প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া গেল ভেবে রতন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল। 'সেন্সিট্‌ব্লেস টেবিলের সামনে পোশাক পরতে গিয়ে দেখি জুলপিতে রূপোলি রেখা, মাঝে মাঝে পেটে একটা ব্যাথাও হচ্ছে আজকাল, ডাক্তার বলেছেন খাওয়াদাওয়া সময়মত করত—' রমলা একটু থামল, ওর মুখে চিন্তার ছায়া।

এতক্ষণে রতনের মুখে হাসি ফুটল। সে অনেকটা রিল্যাগাড ভঙ্গিতে বলল 'হবেনা, যা ড্রিক করে সুত্রত। পয়সার পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতেই ব্যাটার চুল পেকে গেল—হুঁ—'

'চুলে তো তোমারও পাক ধরেছে' বলেই রমলা রতনের কাছে এসে একটা লম্বা চুল টুক করে ছিড়ে আনল। তারপর ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার মধ্যেই বৃষি কিছুটা অবস্ফা মিশে ছিল। অন্তত রতনের তাই মনে হয়েছিল।

'আজকাল দেখছি তুমি আমাকে কোণঠাসা করতে পারলেই বেশি আনন্দ পাব। এটা কিন্তু ঠিক নয় রমলা—' রতন আরেকটা সিগারেট ধরাল।

রমলা খুব সুন্দর করে হেসে বলল 'জানাল দরজার পর্দাগুলো কিন্তু চেপ্ত করতে হবে, পুরো এগারো মিনিটার কাপড়—'

'কেন?'

'কেন আবার! পূজো আসছে না!'

রতন, এগারো মিনিটার কাপড়ের আবছা একটা হিসাব মনে মনে কয়েই বলল 'না, সুত্রত আসছে, তাই—'

রমলা কথটা এখন গায়েই মাগল না, হেসে বলল 'সেটাও ঠিক, লক্ষ্য পর্দা—উপলক্ষ্য পূজো বা সুত্রত যে কেউ হতে পারে—'

পর্দার খরচের চিন্তাটা ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠছিল দেখে তার হাত থেকে বাঁচতে অবশেষে রতন বলে উঠল 'ওঃ চিঠি যে আর শেষই হবেনা—' যাদের কোনো কাজকর্ম নেই তারাই এত লম্বা লম্বা চিঠি লেখে, নাও শেষটা পড়ে।

শেষটুকু মনে মনে পড়ল রমলা তারপর হঠাৎ প্রবল উল্লাসে এক হাত তুলে দারুণ আনন্দ বলে উঠল 'দারুণ খবর, আঃ, রিয়েলি ফ্যানটাস্টিক— ও লিখেছে আমার জন্যে পূজোয় একটা জামদানি শাড়ি নিয়ে আসছে, ওহ কতদিনের শখ একটা জামদানি শাড়ির, কতদিনের ইচ্ছা—'

রতনের ঠোঁটমুখ বিস্ময়, সে টোক গিলল। 'তা জামদানির তো অনেক দাম—'

রমলা চিঠিটা বুকে চেপে বলল, 'দাম তো আর কী করা যাবে। শপের কাছে মুখের কাছে অর্থ কোনো বড় ব্যাপার নয়। তুমি কিন্তু পূর্বীর-র জন্যেও একটা ভাল পিওর সিদ্ধ কিনে রেখো, না হলে বড় খারাপ দেখায়—'

রাত্রির শুয়ে ঘুম আসছিল না রতনের। অন্ধকারে এক হাত তফাতে রমলা। ঘুমে কাদা। অনেকগুলো ভাবনা তার মাথায় জড়ি পরিয়ে আছে। সব ভাবনার কেন্দ্রস্থল এ চিঠিটা। হঠাৎ তার মনে প্রশ্ন জাগল সুত্রতটা আবার কে? সংশয় ক্রমশ তীব্র হচ্ছিল, সেই তালে রতন তার এ-জীবনের স্নোজানা সবাব নাম হাতড়াতে হাতড়াতে ক্রান্ত হয়েও সুত্রত নামের কাউকে খুঁজে পাচ্ছিল না। শুধু তাই নয়, এমনও মনে হচ্ছিল সুত্রত-র চিঠিতে লেখা প্রত্যেকটা কথা যেন তারই অন্তরের অভিলষ। সেগুলোই যেন ভাষা হয়ে এ অজানা অচেনা বন্ধুর কলমে ফুটে উঠেছে। একটা সন্তান, মিসি একটা মেয়ে, বহর বহর উত্তর বা দক্ষিণে ভ্রমণের বাদ, চাকরিতে প্রমোশন—সব মিলে গোটা একটা রতন শিকড় সমেত মাটি থেকে উঠে এল। না, সুত্রত নামের কাউকে সে চেনেনা। অমন বন্ধু কোনকালে তার ছিল না আজও নেই।

দ্রুত মশারি টপকে বিছানা থেকে নামল রতন। বাতি জ্বাল। কী অপূরণ ভঙ্গিতে ঘুমোচ্ছে রমলা। ও কি কোনো স্বপ্ন দেখছে? নইলে ঠোঁটের কোণে চিলতে হাসির আভাষ কেন? রতন এবারে ওকে ঠেলা মেরে বলে উঠল 'এাই... এাই রমলা, সুত্রত কে? কে সুত্রত?'

রমলা ঘুমঘোরের কেমন করে যেন চাইল, তারপর আধেক জড়ানে সরে 'সুত্রত... সুত্রত' বলতে বলতে ফের ঘুমিয়ে পড়ল।

রতন তড়িৎঘটি করে ফিজের ওপর পড়ে থাকা রমলার ড্যানিটি ব্যাগটার কাছে ছুটে এল। একটানে চেনে খুলে ভাঙে ভাঙে ছোট্ট একটা কাগজ, আবছা নীল তার রং, খামের মাঝে রাখা, বার করল। একী, নির্মেষ আকাশের মত এ চিঠি। একটিও অক্ষর নেই। অসীম নীল, খামটা উল্টে পাশ্চটে দেখল সে। তারই ঠিকানা লেখা নির্ভুল অক্ষরে। রতন বসু। ১বি, রাস্তা ১৭, হসপিটাল কলোনী, পো: চিত্রগঞ্জ, জেলা বর্ধমান, পিন ৭১৩৩৩১। আশ্চর্য...

রতন ফের মশারি তুলে রমলার কাছে এসে ডাকল 'এাই... এাই রমলা—'

সীসার মত ভারি চোখের পাতা সামান্য একটু খুলেই সে ফের বন্ধ করার আগে শুধুমাত্র 'খ্যাত' বলে মৃদু একটা শব্দ করেই আবার ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমোলেও মানুষ যে এত সুন্দর করে হাসতে পারে তা এই প্রথম বুঝল রতন। না, রতন নয়, সুত্রত, কারণ ইতিমধ্যে এ আশ্চর্য চিঠির ভাষা হয়ে রমলার বলা প্রতিটি কথা দারুণভাবে গ্রাস করে ফেলছিল রতনকে, ফলে দুটো মানুষের আলাদা অস্তিত্ব মুছে গিয়ে তারা এক ও অভিন্ন। বেড-সুইচ অফ করে রতন ঘুমন্ত রমলার বুকে মাথা রেখে শুনল সেখানে লাব-ডুব এর বদলে, সুব-রত, অনন্ত প্রবাহের মত বেজে চলা এ শব্দের মাঝে কান পেতে রাখা রতন-এর আর কোনো সন্দেহ নেই দুটি মানুষের অভিন্নতা সম্পর্কে— আরোগ্য বলতে এটুকুই—ঘুম বা জীবনও—

## পুতুলের মুখ

কলাণ মজুমদার

হাজিরা খাতায় সই করার আগেই শুনল আজই। বেলা সাড়ে এগারোটায়। সাড়ে এগারোটায়—কেননা তার আগে সবাই অফিস এসে হাজির হবে না। ঘন্টা দেড়েক হৈ-হল্লা তো হবেই—আর তারপরই টিফিন। অর্থাৎ আন্দেক দিন প্রবল উত্তেজক ছুটি। উত্তেজনার উজ্জল শীতল হবার আগেই বেলা গড়িয়ে যাবে দিন শেষ। কদিন ধরেই অফিসের শীত তাপনিয়ন্ত্রিত বাতাসে গরম হস্তা পাক খাচ্ছিল। ডি.এম-কে আর ছাড়া নেই। শালা, নিজেকে বড় বেশি লম্বা দেখছে। ওকে সাইজ করতে হবেই। এবং সাইজ করার জন্য ঘেরাওয়ের চাইতে অব্যর্থ দাওয়াই আর কি আছে।

নিজের চেয়ারে বসতে পারার আগেই অন্তত চারজন বলল, শুনেছ তো—আজই। এবং, ইউনিয়নের নির্দেশ সকলকেই উপস্থিত থাকতে হবে। কোন ওজর চলবে না। নির্দেশ না হকুম? এ প্রশ্ন করার সাহস কার হবে? কে হবে শ্রেণীশত্রু? অফিসের পর বাড়ি ফিরতে হবে না?

এই অফিসে প্রায় দশ বছর হয়ে গেল, তবু আজো কিছু কিছু সহকর্মীকে বোঝা হলেনা। এরা নিজেরা কাজ করবে না, অন্যকে শাস্তিতে কাজ করতে দেবে না। সারাদিন ছুতো খোঁজে কি ভাবে কোন একটা গোলমাল ঘটানো যায়। অথচ চাকরি পাবার আগে কত না ধরাধরি, কত খোশামোদ, অঙ্গীকার। এখনো ছোটভাই-বোন বা ছেলেময়েরা চাকরির জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে হাত কচলানো এবং না-হলেই কুৎসিত গালাগালি। এমন বিরেকজন বিবেচনামূল্য মানুষরাই নেতা হয়, কিংবা নেতার চামচে। বিনা কাজে মাসের শেষে মাইনে নিতে এদের কোন প্রলিবেধ হয় না। অতসী দেখেছে বাড়ির কাজের লোক বা রাস্তার ভিখারীরও মর্যাদাবোধ এইসব মেকি বিপ্লবীদের থেকে ঢের বেশি।

সুপারভাইজার অনিমেঘ সাহা ওর টেবিলের উষ্টোদিকে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় বলল, শুনেছ—অতসী মাথা নাড়ে।

—এমাদের সেলসের হিসেবটা আজই তৈরি করে দিল্লি পাঠাবার কথা—কী যে হবে—  
—আপনি ভাববেন না। আমি ঠিক করে দেব।  
—পারবে কি, ওরা যেভাবে শাসাচ্ছে—  
—অনিমেঘদা, আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবেন কি নিয়ে এত হৈ চৈ—গোলমাল—  
চেঁচামেচি—

—কি আশ্চর্য! এসব আবার খামোকা আমাকে কেন। রত্নাকরকে জিজ্ঞেস করলেই তো—  
রত্নাকর অতসীর দাদা। ইউনিয়নের জঙ্গী সম্পাদক। এই দাদার জন্যই অতসীর চাকরি।  
নাইলে এই চাকরি পাওয়া অতসী এখনও দ্বিধাহীন স্বীকার করে, ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না।  
এমন অস্বাভাব্য ভাবে কেউ চাকরি পায় কিনা তাও জানা নেই। সত্যিকথা কোনদিন কারকে বলতে পারবে না। পারবে না, পারেনা বলেই এক অসুখীনা কৃতজ্ঞতারোধ ও অপরাধের প্রলি ওর অনুভবে যুগপৎ কাটাকুটি খেলে।

রত্নাকর সারাজীবনে একটাই দাদা-সুলভ কাজ করেছিল—অতসীকে চাকরিটা পাইয়ে

দিয়েছিল। সবটাই যদিও নিজেরই স্বার্থে। কেননা তারপরই বিধবা মা ও আরো দুটি ছোট ভাই-বোনের দায়িত্ব অবলীলায় অতসীর ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিজে সপুত্রকন্যাস্বীকৃত আলদা হয়ে বেহালায় বাড়ি করতে গেলেই। অনিমেঘ সাহার মতন অন্য কেউও জানে না যে দাদার সঙ্গে বছরে দশটি বাক্য বয় হয় না অতসীর। কথা বলে লাভও হয়না কিছু। কেননা ওদের মতে কর্তৃপক্ষের লোকমাত্রই খারাপ—দুর্নীতিগ্রস্ত, প্রতিহিংসাপারায়ণ, অবিবেচক, স্বজনপোষক ইত্যাদি, যার আসল অর্থ, অতসী জেনেছে কর্তৃপক্ষের কশেক অনমনীয়। এবং ইউনিয়নের সাজানো ঘৃণি দিয়ে খেলতে অনিচ্ছুক।

কিন্তু এ ব্যারে এই ডি.এম-এর বিরুদ্ধে জেহাদ কেন সোটা টিক জানা নেই। তবে একটু পরেই হেল্লাবাজদের গলার শিরা-ছেঁড়া চিংকার সেসব বিশদ করবে নিশ্চয়। সঙ্গে সঙ্গে অতসীর মাথায় একটা দুর্ভাবনাও এলো। ডি.এম-বিক্রম গুপ্তকে খালাগাল করবে না তো। কিংবা শারীরিক লাঞ্ছনা? অতটা হয়ত হবে না। তবে অতসী দেখেছে এইসব বিকোভের সময় সাগরদেবের ওপর নেতাদের নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অবশ্য কখনো কখনো ইচ্ছাকৃত তত্বিয়ে দেবার ব্যাপারও থাকে—যাকে বলে ঠাণ্ডা-গরম খেলা। শুনেছ প্রয়োজনে প্রলেপ লাগানার জন্য ঘটা করে ক্ষমা চাওয়ার ভানও করা হয়।

সোয়া এগারোটায় আগেই ছোট-মাঝারি নেতারা এসে ভেড়া-তাড়ানো শুরু করলো—

চলুন, চলুন—সবাই, ডি.এমের চেয়ারের সামনে—

—ব্যাপারটা কি?—কে যেন জিজ্ঞেস করে।

—ওখানে গেলেই জানতে পারবেন। কোনরকম জলুমবাজি বরাদ্দ করা হবে না।

—জলুমটা কি হলো—

—সব বলা হবে—চলুন—

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিশাল হল প্রায় খালি। যুথবদ্ধ বোবা মেয়ের মত সবাই নেতাদের পিছে পিছে চলে। অতসী আর অনিমেঘ শুধু নিজদের চেয়ারে।

—কি হলো অনিমেঘদা—

—এই বুড়োটিকে রেহাই দাও, শিবেন। আমার শরীরটাও ভালো না। তোমরা যাও—  
আমি তো আছি।

—মিস্ পাল?

অতসী ফাইল থেকে চোখ তুলে বলে আমার হাতে কাজ রয়েছে—আর্জেন্ট—

—কাজের পিসী একবারে!

নেহাং রত্নাকরের বোন বলেই কেউ আর বেশি কিছু বলল না। নইলে, অতসী জানে, নানা রকম আওয়াজ শুভতে হত। সেসব শব্দ যে শালীনতার সীমা অতিক্রম করবে না তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। তবে অতসীকে সেসব বড়-একটা শুভতে হয় না। মেয়েদের প্রতি যে শব্দ-লাঞ্ছনা ঘটা তা থেকে ও রেহাই পেয়ে যায় সম্ভবত এই কারণে যে ও দেখতে মোটেই আকর্ষণীয়। মিশকলা ছোট্ট চেহারা। উচ্চতা পাঁচ ফুটেরও কম। পোষাকে আচরণেও এমন বিভা থাকে না যা কোন পুরুষের চোখে কামানার ঝিলিক আনবে।

মনে আছে, প্রথম দিন ওকেদেখে অফিসের সকলের চোখে ভেঙেছিল অস্বাস্থ্যের ঢেউ। সৈনিকি প্রথম তালনির গ্রাম থেকে দাদার হাত ধরে এই বিশাল দশতলা অফিসে ঢোকা। যথেষ্ট কোন প্রসাদন নেই। শাড়ীটা পরিচ্ছন্ন, তবে সাধারণ তীব্রতা। ভীক চোখে উদ্বেগ মনে



তিরতির করে শঙ্কা। তিন-চারটে অফিস ঘুরে (এখন জানে সেগুলো ছিল পার্সোনাল ডেসপ্যাচ, সেকশনাল হেড ইত্যাদি) রত্নাকর ওকে পৌঁছে দিয়েছিল উদ্দেশ্যে।

— উমাদি, অতসী— আমার বোন— আজই জয়েন করল। আপনার আগুরে। একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নেবেন।

অতসী মুগ্ধ চোখে দেখেছিল উমাদিকে। বয়েস নিশ্চয় পঞ্চাশের কাছাকাছি, কিন্তু চোখমুখে এমন দাঁষ্ট যি নিজে থেকেই একটা স্ত্রীমত বৈশিষ্ট্য হয়। শব্দের উচ্চারণে ব্যক্তিত্ব ধরা পড়ে। এমন মহিলা অতসী কেবল সিনেমাতেই দেখেছে।

ওর দিকে খানিক তাকিয়ে উমাদি বলেন, বোসো, অতসী!... থাকো কোথায়?

— দাদার কাছেই থাকবো। বেলেঘাটায়।

— মনে হচ্ছে রত্নাকর তোমাকে কিছু বলেনি। শোন, এই অফিসে পোষাক-পরিচ্ছদের কিছু নিয়ম আছে যা সবাইকে মেনে চলাতে হয়। তোমার এই আটপোরে শাটী, তেল জ্যাকেরে চুল চলবে না। ভয় পেওনা। ঘাবড়াবারও কিছু নেই। আমি বুঝিয়ে দেব। কিন্তু যা বলব তা শুনকো। অবাধ্যতা আমি একদম পছন্দ করি না।

প্রথম দিনেই আরো কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে আলাপ হলো, সবাইই পোষাকে, চলনে একধরণের পারিপাট্য, সপ্রতিভতা আছে, যা অতসীরও ভালো লাগে। কিন্তু সেদিন যে হীনমত্যাতা সারাদিন ওকে আড়ষ্ট করে রেখেছিল সে স্মৃতি আজো ভুলতে পারেনি। যেমন ভুলতে পারবে না ওর ভুল ইংরেজিতে লেখা চিঠির ড্রাফট দেখে উমাদির তিরস্কার— এই জ্ঞান নিয়ে ডুঁমি রিটিন টেস্টে পাস করলে কি করে!

সঙ্গে সঙ্গে পাশের টেবিল থেকে বর্ণা শুর বলেছিল, পাস কি বলছেন উমাদি, ওতো ফাস্ট হয়েছিল। সেজন্যই — তো বলে দিইতবই হাসিতে কলকল করে বর্ণা।

— নিজের কাজ কর, বর্ণা— উমাদি প্রায় ধমককে সুরে বলেন।

হাতের কাজ সেয়ে অতসী চারতলা থেকে তিনতলায় নেমে আসে। এই ফ্লোরেই বিক্রম গুপ্তর অফিস। বন্ধ দরজার বাইরে জনা পঞ্চাশ মানুষের সমাবেশ। চিংকার, স্লোগান নেই দেখে আবাক লাগল একটু। সামনে শিবনে হাজারকে দেখে বলল — কি হলো, বিপ্লব শেষ?

— না, না। লিডাররা ভেতরে— সাহেবের সঙ্গে কথা বলছে।

— ইস্টা কি?

— আপনি শোনেনি সুধীর পাড়ইকে বদলি করেছে বর্ধমান, শ্রীধর চৌপোকে মালদায়।

— বদলি তো রুটিন ব্যাপার। এগ্রিমেন্টেও আছে। তাহলে?

— ইউনিয়নের মতে এটা অবৈধ। কোন রকম আলোচনা না করে দেখুচ্যারী ডি. এম একতরফা ভাবে—

অতসী আর দাঁড়ায় না। ব্যাপারটা বোকা হয়ে গেছে। প্রতিবারই বদলির অর্ডার বেরলে বাদ, প্রতিবাদ চলে। সবাই পছন্দমত ব্রাঞ্চে যেতে চায়। যাকেই অপছন্দের ব্রাঞ্চে বদলি করা হবে সেই কোন না-কোন বাহানায় ইউনিয়নের নেতাদের ধরে অর্ডার বাতিল করার চেষ্টা করে। সব কেস ইউনিয়ন নেয়না। অনেকক্ষেত্রে ইউনিয়ন তাদের অপছন্দের লোককে খারাপ ব্রাঞ্চে পাঠাবার চেষ্টাও করে। শোনা যায় এই সব পোস্টিংও নেতাদের কারো কারো ভালো রোজগার হয়। ভালো ব্রাঞ্চে পোস্টিং পাওয়ার জন্য নেতাদের খুশী করতে অনেক কর্মীই উদার।

বিক্রম গুপ্তর আগে যিনি ডি.এম ছিলেন, হরিশ সাকসেনো তো ইউনিয়নের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন কাজই করতেন না। ইউনিয়নই ট্রান্সফার লিস্ট তৈরি করে দিত। রত্নাকরের কী দাপট তখন! মনে হতো ও-ই যেন কোম্পানীর মালিক। বিক্রম গুপ্ত এসে সব কিছু নিয়ম-মাফিক করার চেষ্টা করেছেন। ভুল বা অন্যায্য হলে সঙ্গে সঙ্গে শোধরাবার চেষ্টা করেন। তাঁর দৃষ্টিতে কাজের পদ্ধতি ইউনিয়নের অনেকের পছন্দ নয়।

টিফিনের পর নিজের সিটে ফিরে এসে অতসী দেখে হল প্রায় ভর্তি। মৃদু গুঞ্জন চলছে। কিন্তু সেটা খুব আত্মপ্রসাদের নয়। মাথার মধ্যে একটা কৌতূহল নাড়াচাড়া করছে— কি হলো আজ? বিক্রম গুপ্ত মনে নিয়েছেন ইউনিয়নের দাবী? আত্মসমর্পন করেছেন রত্নাকরদের যুগবন্ধ মাসুল-শক্তির কাছে?

টেলিফোনের শব্দে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে অনিমেষ সাহার টেবিলে টেলিফোন বাজছে।

অনিমেষ নেই। অতসী উঠে গিয়ে ধরে।

— হ্যালো

— বিক্রম গুপ্ত বলছি, অনিমেষবাবু আছেন?

— না, উনি এখনো—

— এলেই আমাকে ফোন করতে বলবেন। আপনি কে বলছেন?

— মিস পাল— অতসী—

— থান্ডু, মিস পাল।

মানুষটার কণ্ঠস্বরে কি আছে? মার্জিত, ভরাট গলা। স্নিগ্ধ উচ্চারণ। তবু বুকের মধ্যে যেন আঘাতের মত ধাক্কা লাগে। কেন এমন হয় জানে না অতসী। অথচ যতবারই বিক্রম গুপ্তর সঙ্গে কথা বলেছে, অনুভবে লেগেছে ছলাং। আর তার অনুরণন যেন সারা শরীরে বঙ্কায় তোলে। তখন খুব কষ্ট হয়। ভীষণ কষ্ট একটা। যার স্বরূপ ও আজো চিনতে পারেনি।

নিজের চেয়ারে ফিরতে ফিরতে উমাদির কথা মনে পড়ল। এই অনিমেষদার চেয়ারেই বসতেন। কত বকাবকি করেছেন। কিন্তু হাতে ধরে কাজও শিখিয়েছেন। বলতেন, গরীব ঘরের মেয়ে তুই। স্লপও নেই, ডিগ্রিও নেই। স্বর্ণাঙ্গদের মত চলানি হলে তোর কলবে না। কাজ করে খেতে খেতে হবে, মনে রাখিস। যে কাজ জানে, তাকে কেউ ঘাঁটায় না। আমাকে দেখছিস তো—

উমাদিকে ঘাঁটবে কি, সবাই, রীতিমত ভয় পেত। অফিসাররাও তাঁকে সম্মি করে কথা বলতেন। কাজের ব্যাপারে বেশেবারে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। অনিমেষদাও ওরই কাছে শিখেছেন।

অনিমেষ সাহা তিন-চারটে ফাইল নিয়ে সেকশনাল অফিসারের ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের টেবিলে আসতেই অতসী ডি. এমের টেলিফোন সামাচার জানাব।

— ডি. এম আমাকে চেয়েছেন? কেন?

— আপনাকে ফোন করতে বলেছেন।

— কি ব্যাপার অতসী? আমিতো কিছুই বুঝতে পারছি না। উনি হঠাৎ আমাকে—

অতসী মনে মনে হাসে। অনিমেষনা মানুষটা ভাল, কিন্তু বজ্র ভীত। উমাদির ব্যক্তিত্বের ছায়াও ওর মধ্যে নেই। উমাদি হলে একুনি ফোন করে বলতেন— আপনি আমাকে খুঁজছিলেন? অনিমেষ বলে, অতসী আজকের ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কি হলো শুনুন কিছু?

— না। আপনি।

— আমি যা শুনলাম তা যদি সত্যি হয়—

— কি শুনেছেন অনিমেষদা?— অতসী আন্তরিকভাবে উদগ্রীব বোধ করে।

— শুনলাম উনি ইউনিয়নের কোন কথাই শোনে ননি। যাদের ট্রান্সফার করা হয়েছে সবাইকে সাত দিনের মধ্যে রিপোর্ট করতে হবে।

গলা নামিয়ে আবার বলে, রত্নাকর নাকি খুব হস্তিভি করার চেষ্টা করছিল, কি সব গালাগালিও নাকি দিয়েছিল। ডি. এম নাকি ক্ষেপে ফায়ার হয়ে যান। শেষে চেয়ারম্যান আলাদা করে কথা বলে ক্ষমা-টমা চেয়ে একটা রফা করেন।

— রফা?

— অতসী হু কঁচকায়।

— আমাকে শিবেন বলল, চেয়ারম্যান ডি এম কে বলেন ‘আমাদের মুখ রাখার জন্য কিছু একটা আপনাকে করতেই হবে। শ্রীধরের ট্রান্সফারটা যদি ক্যাসেল করেন। ডি. এম মানেন নি। শেষে অনেক ধরা-করার পর ক্রুথা দিয়েছেন, ছ’মাসের পর শ্রীধরের বিষয়ে উনি পুনর্বিবেচনা করবেন।

— তার মানে শ্রীধর যাবে না?

— যাবে বৈকি। যেতে তো হবেই। যাবার পরেই কেবল বিবেচনার কথা আসবে।

এবার এক ভালক হেসে ওঠে অতসী— এ জনৈকি সবার গলার স্বর এত মিহি। নইলে তো বিজয়-উল্লাসের ভৈরব-নৃত্য চলত।

টেবিলের রাখা জলের গ্লাসে চুমুক দিয়ে অতসী আবার বলে, অনিমেষদা-ফোনটা করুন—

— ও হ্যাঁ-করছি। ইয়ে অতসী এ সেলস-স্টেটমেন্টটা—

— নিশ্চিত থাকুন। রেডি আছে। আশুত অনিমেষ হাত মুছে টেলিফোন ডায়াল করে।

— স্যার, আমি অনিমেষ সাহা—

— .....

— হ্যাঁ স্যার— না স্যার— আমি আর মিস পাল— এখনই! ঠিক আছে স্যার— ঘন্টা খানেকের মধ্যেই? আচ্ছা স্যার— নমস্কার স্যার।

ঘামে ভেজা ফ্যাকাসে মুখে রিভিভার নামিয়ে অনিমেষ এক চোকে পুরো জলের গ্লাস খালি করে ক্রমালে মুখ মুছে কপালে হাত দিয়ে ঝিম বসে থাকে। আড়চোখে তাকায় কেউ লক্ষ্য করছে কিনা। একটু দম নিয়ে খুব নিচু গলায়, প্রায় মিনতির সুরে, ডাকে— অতসী শোন।

অতসী উঠে এসে তার উল্টোদিকে চেয়ার টেনে বসে।— বলুন কি হয়েছে— স্টেটমেন্টটা—

মাথা ঝাঁকিয়ে অনিমেষ বলে— এ ব্যাপারই নয়। সাহেব লিস্ট চেয়েছেন— কারা কারা কাজ ছেড়ে ওকে মেরাও করতে গিয়েছিল, কতক্ষণ কাজ বন্ধ ছিল, কে কখন ফিরেছে। এখনই— একঘণ্টার মধ্যে দিতে হবে।

সাদামাটা চাঙে অতসী বলে— এতো সোজা কাজ। কে কে যায়নি আপনি জানেন। সবাই সোয়া এগারোটায় গেছে, লাক্সের পর ফিরেছে। এই নিয়ে আপনি এত ভাবছেন কেন। আমি তো ভাবলাম গুপ্ত সাহেব কি জানি কি বলেছেন আপনাকে।

— অতসী, তুমি আমার অপস্থিতি বুঝতে পারছ না। লিস্ট দিলে রত্নাকররা আমার কি হাল করবে জান? আর না-দিলে সাহেব যে কী করবেন— আর ক’মাস পরেই আমার এগ্রনেশন শুরু হবে। আমি যে কী করব—

একটু ভাবে অতসী। ডি. এম, অনিমেষদার কি করবে না-জানলেও ইউনিয়নের নেতারা কি করতে পারে তা অতসীর জানা আছে। ওরা যে কত অবিবেচক ও নিষ্ঠুর হতে পারে তার একাধিক পরিচয় পাওয়া হয়ে গেছে। আর কিছু না-পারক এই বরেন্দ্রে বাকুড়া বা পুরুলিয়ার বদলি করিয়ে দিতে পারে। দলবৈধে ধমকানো বা গালাগালি করা তো নিতান্তই মামুলি ব্যাপার।

অতসী বলল— একটা কথা বলুন তো, অনিমেষদা, আপনি কার চাকরি করেন?

— কোম্পানীর।

— কে আপনার মাইনে দেয়?

— কোম্পানী।

— কার ছকুম আপনি মানতে বাধ্য?

— ডি. এমের।

— তাহলে আপনার সংশয় কি জন্যে?

— আহা তুমি বুঝতে পারছ না-এসব যুক্তির কথা ওরা শুনত, তাহলে দেশে এত শ্রমিক-অশান্তি লেগে থাকত না।

— কিন্তু, রিপোর্ট তো আপনাকে দিতেই হবে

— তা হবে।

— এক ঘণ্টার মধ্যেই।

— হ্যাঁ

— অলরেডি দশ মিনিট চলে গেছে। আর দেরি না-করে ওটা রেডি করুন

— তারপর?

— তারপর একটা শিখতী ধরতে হবে।

— শিখতী?

— হ্যাঁ, আপনি সরাসরি যদি ডি. এমকে না দেন, ইউনিয়ন আপনাকে কিছু বলতে পারবে না।

এতক্ষণে অনিমেষের গাল-ভাজা মুখে পেসিলের রেখার মত হাসি ভাসে। — তোমার আইডিয়ালটা ভালোই। কিন্তু শিখতী—

মুচকি হাসে অতসী। চোখের কোণে কৌতুক-এতক্ষণ সেকশনাল অফিসারের ঘরে কি করছিলেন? তাঁর হাতেই রিপোর্টটা ধরিয়ে দিল। বলবেন, ডি. এম চাইতে পারেন, তাই আগে থেকেই দিয়ে রাখা ভাল। দেখবেন উনি নিজের এলেম দেখাতে তড়িঘড়ি ডি. এমের ঘরে ছুটবেন।

মুগ্ধ অনিমেষ বিশ্বযত্নরা চোখে অতসীর কালো মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। রূপ-লালিত্যহীন এই অতি অটপোরে গ্রামীণ মেয়েটির মতো এক অপরাধী ধীমতির উদ্ভাস দেখে।

কৃতজ্ঞ স্বরে বলেন-চমৎকার। সত্যি চমৎকার। দাঁড়াও তোমার জন্যে চা বালি।

উঠে দাঁড়িয়ে অতসী বলে— চা পরে হবে। আগে রিপোর্টটা রেডি করুন।

নিজের সিটে ফিরে সেলসের অফিসগুলো আবার একবার খুঁটিয়ে দেখে। উমদার কথা মনে পড়ে। তাঁর কাছেই শোনা— চালের সংস্থান না-করে তরোয়াল ধরাটা বোকামি। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় আর একটা চিন্তা এলো। ডি. এম বিক্রম গুপ্ত আজ যে ইউনিয়নের সামনে তরোয়াল ঝাঁকালেন, তার তাকার সংস্থান আছে কি? রত্নাকরকে কেউউ-সভাওয়াওর চাইতে



বেশি আর কে জানে। ও সদলে সুযোগ খুঁজবেই কী ভাবে আক্রমণ করে বশ করা যায় বিক্রম গুপ্তকে। তা যদি না করতে পারেন নানা অবৈধ রোজগারে ভাটা তো পড়বেই, নেতাগিরিও রহিত হতে পারে।

এক অচেনা উদ্দেশ্য অকারণেই অতসীর বুকে ঘুলিয়ে ওঠে।

বিক্রম গুপ্তকে একে সময় অতসীর যেন 'রক্তকরবীর রাজা বলে মনে হয়। যদিও এই রাজা—বিক্রম গুপ্তকে—মাঝে মাঝেই দেখা যায়। কখনো সখনো কথাও হয়। তবু বড় রহস্যময় লাগে। কেন 'রাজা' মনে হয় জিজ্ঞাসা করলে অতসী কেবল রহস্যময়তা ছাড়া আর কোন কারণ বলতে পারবে না। রহস্যও তাকে ঘিরে নানা গুজবের জন্যে।

নিতা নূতন গুজবের ছড়াছড়ি। উনি নাকি একাধিকবার বিয়ে করেছেন। কিন্তু অফিসের কেউই নিমন্ত্রণ পায়নি কখনো। তার স্ত্রীকেও দেখেনি। উনি নাকি খুবই অতিথিবৎসল অথচ কেউই ওর বাড়ি যায়নি। উনি নাকি প্রতিদিন প্রচুর মদ্যপান করেন। কিন্তু কেউ ওকে মাতাল দেখেনি।

অতসীর নিজস্ব ধারণা, বিক্রম গুপ্ত নিশ্চিত জানেন যে ও, অতসী, রক্তাক্তের বোন। যাকে উনি দশ বছর আগে না-চিনে, না দেখেই প্রবল উপকার করেছিলেন। কিন্তু কোনদিন জ্যোতের ভাষায় বা মনের কথায় তার মানসনাতম আভাসও করেনি। অনেকবারই ভেবেছে নিজেই বলে। বলে দেখতে চেয়েছিল কি প্রতিক্রিয়া হয়। বিস্মিত হন না তাচ্ছিল্য করেন। বলতে পারেনি কখনো। অথচ সুযোগ তো পেয়েছিল।

মাস খানেক আগে অফিস ছুটির পরও নিজের টেবিলে বসে কাজ করছিল। অনিমেঘ একটা কারচুপির ফাইল ধরিয়ে দিয়েছিল। সেটা পড়ে, পের্যেন্ট নোট করে, শো-কাজের চিঠি করতে হবে। তাছাড়া সাড়ার সময় ছোট ভাইকে অফিসের কাছেই ডাক্তারের চেষ্টার নিয়ে যাওয়ার ছিল। মাসের ঘটনাক্রমে সমস্ত কোথায় আর কীটা?

আচমকা, একেবারেই অবাধিতভাবে বিক্রম গুপ্ত, যেন অরণ্যদেব, সেকশনে হাজির হন। অতসীকে দেখে অবাক হয়ে বলেন—একি আপনি এখানে? বসে আছেন?

—একটা জরুরী ফাইল দিয়ে গেছেন অনিমেঘদা। আপনি কি কিছু খুঁজছেন?

—হ্যাঁ, মাহলি রিটর্নের ফাইলটা দরকার। হেডকোয়ার্টার থেকে ফোন করে কিন্তু ডেটা চাইল। এক্ষণি পাঠাতে হবে। আপনি জানেন ফাইলটা কোথায়?

—আপনি বসুন। আমি দেখছি।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফাইলটা উদ্ধার করে অতসী। বিক্রম ফাইলটা উল্টে-পাল্টে দেখে কিছুক্ষণ। দরকারি পাতায় টিক দেন। হাতের পাত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য নোট করেন। অতসী টেবিলের উপরদিকে দিক থেকে ওর ক্ষিপ্রতা লক্ষ্য করে। নির্বিশ্রাম মনস্তাত্ত্ব্য। যেন-ওখানে আর কোন প্রাণী নেই। ওর কাজের সুবিধের জন্য আর সব কিছুই নিশ্চল, নিশ্চুপ। ঘরের নিরেট স্তব্ধতা অতসীর বুকে বিষম ভার লাগে। ভারমুক্তির জন্যে কথা বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কী বলবে?

—আমি সাহায্য করতে পারি?—খুব, বাজে।

—চা যাবেন? বা জল?—একদম বোকা ব্যাপার। কোথায় পাবে চা?

—আমাকে চেনেন—আমি অতসী-রক্তাক্তের পালের ছোট বোন। আপনি আমার জন্য—না। ভীষণই পায়-পড়া নির্লজ্জ আচরণ হবে। আর যদি ধমকে উঠেন তবে লজ্জায় মুখ

লুকাবার নিভৃতিও পাবে না।

—আপনি নাকি খুব মদ খান? কেন খান? মিসেস শাসন করেন না বুঝি-নাকি তাঁকে পাত্তাই দেন না।

নিজের ভেতরেই যেমনি ওঠে অতসী। অতসীর মনের ভাবনার কোন উচ্চারণ নেই তাহলে এতক্ষণে ওর এই কৈভেলির কারণেই চাকরি নট হতে পারত। শুনেছে, মুখে একটাও অতিরিক্ত রেখা না-ফুটিয়ে গলারদ্বারে কোন ঢেউ না তুলেও অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও কঠিন কথা বলতে পারেন বিক্রম গুপ্ত। অবশ্য এও আরো একটা গুজব কিনা জানে না অতসী।

ওর দিশাশী ভাবনা-ধারা ভেঙে বিক্রম বলেন, হয়ে গেছে। ফাইলটা তুলে রাখুন। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

বলে এক মুহূর্ত না-দাঁড়িয়ে ঠিক অরণ্যদেবেরই মত শব্দহীন প্রস্থান করেন বিক্রম গুপ্ত।

বিলায়তমান পুরুষ-পিঠের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অতসীর মুখের রং অনুভবের কটি গুপ্ততাকে আচ্ছন্ন করে। বুকের মধ্যে ঘুলিয়ে ওঠে ফোড়। নাকি রোষ? সুন্দরী সে নার, কুরুপই বলা চলে। তা বলে এমন উপেক্ষা! উপেক্ষা না তাচ্ছিল্য! ও একজন যৌবনবতী নারী তো বটেই। ওর মত নিষ্ঠাবতী কর্মীও কর্তন আছে অফিসে? গুপ্ত সেজনাই কি ও দুটো শব্দ আশা করতে পারেন না ওর জায়গায় যদি ধারণা বা বলার কী রূপ দেমাকী পারমিতা হত তাহলে কি এমন তাচ্ছিল্য করতে পারতেন বিক্রম গুপ্ত, নিশ্চয় পারতেন না। ঠিক মিস্ত্রি মিস্ত্রি শব্দ জোগাত মুখে। দ্রোণ খবর নিত ওদের দেখ দেখ শরীরের চড়াই-উৎরাইয়ের। পুরুষ মানুষ লেখা-পড়ায়, কর্ম-নেপুণ্যে যতই কৃতি মানুষ হোক জানোয়ার-স্বভাবের ক্রীড়ক থেকেই যায়। জানোয়ার। একেবারে জানোয়ারী!

অথচ এই মানুষ ওকে না-দেখ না-চিনে শুধু ওরই দাদার কথায় কী বিশাল ঝুঁকি নিয়ে অতসীর চাকরির নিশ্চিত ব্যবস্থা করেছিলেন। রক্তাক্তের মূলে প্রথম গুনে তো বিশ্বাস হয়নি যে অতসী রিটর্ন টেস্ট খুবই ভালো ভাবে পাশ করেছে। ফার্স্ট যে হয়েছে সে খবর রক্তাক্ত তখনও পায়নি।

—কিন্তু দাদা, আমি পরীক্ষা দিলাম করে? আমি তো এখনো কলকাতা দেখিনি।

—পরীক্ষা দিসনি, তবু পাশ করে গেলি। এই হচ্ছে রক্তাক্তের পালের মায়িক। তুই পরীক্ষা দিলে পাশ করতে পারতি নাকি?

পারত না যে সে বিষয়ে নিজের কাছেও কোন সন্দেহ নেই অতসীর। গ্রামের স্কুল থেকে কোনরকমে মাধ্যমিক পাশ করেছে। সেখান ভাগ্যের জোরে। মুখ্য করা ইংরেজি রচনাটা প্রশ্নে না-থাকলে যে কি হতো তা ভাবতেও চায় না। চাকরির পরীক্ষা তো আরো কঠিন। পাশের নম্বরও ঢের বেশি।

রক্তাক্তের জন্মায় ওদের অফিসের ছ'মাসের অস্থায়ী চাকরিতে ঢুকেছে সদা এম, এ পাশ করা বিক্রম গুপ্ত। ওর ধারণা রক্তাক্তের ইচ্ছে করলে ওকে স্থায়ী করে দিতে পারবে। কেননা অল্পদিনের মধ্যেই বিক্রম দেখেছে ইউনিয়ন সেক্রেটারি রক্তাক্তের পালের প্রভাপ। গুপ্ত কি ইউনিয়ন—কো অপারেটিভ, ক্যান্টিন, স্পোর্টস ক্লাব—সব কিছুই রক্তাক্তের কৃষ্ণিগত। তবু রক্তাক্তের বোনের চাকরির জন্য চিন্তিত ছিল। পরীক্ষায় তো পাশ করতে হবে। প্রথম দিনটি না-পেরেছে তো ওদেরও ওদের কথাই উঠবে না। অতসীর সন্দেহতা বা যোগ্যতা সম্পর্কে রক্তাক্তের মনে কোন খোঁষায় ছিল না। সেসব বিবেচনা করলে অতসীর কোনদিনই



চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। চোরচালান করতে হবেই। কিন্তু কিভাবে? বুদ্ধিটা দিল পার্সোনেল অফিসার, রত্নাকরের দীর্ঘদিনের বন্ধু— আক্ষরিক অর্থেই এক গোলারসের ইয়ার গোপেশ পাইন।

গোপেশ বলল— বিক্রমকে কাজে লাগাও। বলা যে তুমি ওকে পার্মানেন্ট করার চেষ্টা করবে। আমার নাম করে বলা, হেডকোয়ার্টারের নেট পাঠাবার জন্যে চাপ দিচ্ছ।

— ও কি করবে? ওতো আর অতসীর হয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে না।

— না। ও শুধু প্রশ্নের উত্তরগুলো লিখে দেবে। বাকিই থাকবে। সে সব হলে পাচার করার ব্যবস্থা আমি করে দেব।

— কিন্তু পরীক্ষাটা দেবে কে? কাউকে বাসে তো লিখতে হবে উত্তরগুলো।

— অতসী কি তাও পারবে না?

— হয়ত পারবে। কিন্তু ইন্টারভিউতে ধরা পড়ে যাবে। আর, নিজের বোন—তবু বলছি, ওকে দেখালে কেউ চাকরি দেবে না।

— কি বলতে চাইছ, রত্নাকর। বিক্রম গড়াশানায় খুঁই ভালো। ইংরেজি লেখতে চমৎকার। ও লিখে দিলে পরীক্ষায় উত্তরানো সহজ হয়ে যাবে বলেই বলছি।

— সে তো ঠিকই বলেছে। বিক্রম নিশ্চয় রাজী হবে। তবে একটা মেয়ে চাই—যে হলে বাসে পরীক্ষা দেবে এবং ইন্টারভিউ দেবে অতসী সঙ্গে।

— বলছ কি রত্নাকর!

— ঠিকই বলছি। মেয়েটিকে কোথায় পাওয়া যায়!

কিছুক্ষণ ভেবে হঠাৎ রত্নাকর জানতে চায়—আচ্ছা বিলপা সিংয়ের নরেশ লাহার চার্জসিট হয়েছে না?

— হ্যাঁ। তোমাকে ধরেনি?

— এসেছিল। কথা বলতে পারিনি। চার্জটা কি?

— যা হয়। পাটির কাছ থেকে খোঁজেছি কিছু

— ওর শালীর চাকরির জন্যে তোমাকে খুব ধরেছিল না? ও রকম তো রোজই কত আসে।

— মেয়েটি কে আমি দেখেছি। স্মার্ট আছে।

— ওদিকে নজর দিও না, বাদার। শুনেছি, নরেশ নিজেই ওকে নিয়ে— সেজন্যেই চাকরির গোজার্থি—

— তুমি নরেশকে খবর দাও। আমি ওর কেসের ব্যবস্থা করে দেব। ওর শালী অতসীর হয়ে পরীক্ষা দেবে। ইন্টারভিউ দেবে।

— ইন্টারভিউ কি করে দেবে? দরখাস্তে অতসীর ফটো আছে না!

— তাহলে তুমি আছ কেন? ফটো বদলাতে বা ড্রপস্কেট দরখাস্ত ফাইলে গুঁজতে কি জেমস বন্ড লাগে?

রত্নাকরের প্রশ্নের শুনে গোপেশের মাথা ঝিমঝিম করে। ও অবাক হতে ও পারে না। কোন শব্দই জোগায় না হী-মুখে।

পরে গোপেশ বলেছিল, রত্নাকর তুমি একটা ক্রিমিনাল— পুরোদস্তুর ক্রিমিনাল।

রত্নাকর হেসেছিল— স্পষ্ট ও স্বাভাবিক অপরাধ কুশলতা না থাকলে নেতা হওয়া যায়

না। মনে রেখো এভরি লিভার হাজ আন এলিমেন্ট অব ক্রিমিনালিটি।

পুরো পরিকল্পনাটা ছকে নিতে কোন অসুবিধে হলোনা। নরেশের শালী অতসী সঙ্গে পরীক্ষার হলে বাসে বিক্রমের দেওয়া উত্তর খাতায় কপি করল। ইন্টারভিউ ও দিল। যে-মেয়ে পরীক্ষায় ফাস্ট হয়েছে তাকে বেশ প্রশ্ন করার কিছু ছিল না।

কেননা গোপেশ নিজেই ছিল বোর্ডের সদস্য।

অবশ্য বিক্রমের চাকরিটা স্থায়ী হয়নি। অতসী কাজে যোগ দেবার আগেই বিক্রম ট্রেনী-অফিসার হয়ে ব্যাসালোর চলে যায়। আট বছর পরে, আহমেদাবাদ, কানপুর, ইন্দোর, উদয়পুর ইত্যাদি শহরে কাজ করে, ধাপে ধাপে পদোন্নতি পেয়ে কলকাতায় এসেছে ডিভিশনাল ম্যানেজার হয়ে।

কলকাতায় পোস্টিংয়ে আসার আগে বিক্রম গুপ্তর কোন অস্তিত্বই ছিল না অতসীর জীবনে। অফিসের পরিমণ্ডলেরও। কারকুই দায় ছিল না একজন ক্যাড্রিয়াল, সহস্রাধী করণিকের কথা মনে রাখার। যেদিন হেড কোয়ার্টার থেকে অর্ডার এলো যে বিক্রম গুপ্ত ডি. এম হয়ে আসছেন, সেদিনও গুরুত্বই কোন লক্ষ্যগতী প্রতিক্রিয়া ছিল না।

ইউনিয়ন অফিসে রত্নাকর মতব্য করে-ভালেই হয়েছে। একজন চেনা-জানা লোক আসছেন। মানুষটা যতদূর জানি ভালো। সহ। কর্মদক্ষ।

— আপনি চেনেন?

— চিনি-মানে চিনতাম। আমাদের এখানে কিছুদিন ক্যাড্রিয়াল কাজ করে গেছে।

তারপরই স্মৃতির সূত্রে নিয়ে টানাটানি। কে কতদিন চেনে, পাশাপাশি বাসে কতদিন কাজ করেছে, কি রকম মতব্য ছিল তা নিয়ে প্রায় প্রত্নতাত্ত্বিক চর্চা আরম্ভ হয়।

অনিমেয় সাহা বলে অতসীকে, নতুন ডি. এম নাকি তোমার দাদার পুরনো বন্ধু।

অতসী জবাব দেয়—আমি জানি না।

কিন্তু বিক্রম গুপ্ত নামটা স্মৃতির গভীরে কোথাও গাঁথা ছিল। যেদিন প্রথমদিন সকলের সঙ্গে পরিচয় করতে এসেছিলেন সেদিন, সেই প্রথম দেখাতেই, অতসীর মনে হয়েছিল, বিক্রম গুপ্ত মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখেন না; তিনি শুধু ডেজিগনেশন দেখেন। কর্ম দেখেন কার কবে দেখেন না। তবু নিজের খুব গভীরে একটা মুগ্ধ কৃতজ্ঞতার আবেগের ছলাৎও টের পেরেছিল।

অথচ দু'বছরে একবারও এমন হয়নি যাতে মনে করা যেতে পারে অতসী পাল নামক কোন মানুষী অস্তিত্ব বিক্রমের স্মৃতিতে আছে। এমন পরিচয় কখনো মেলেনি যাতে বোঝা যায় বিক্রম গুপ্ত অতসীকে চেনেন— অতসী রত্নাকর পালের বোন— যার চাকরির পরীক্ষায় উত্তর লিখে দিয়েছিলেন তিনি।

নিজের ভেতরে উথলে-ওঠা নানা আবেগের তাড়না সত্ত্বেও অতসী কখনো বলতে পারেনি আপনি যা করেছিলেন তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। আমার পরিবারও আপনার কাছে ঋণী।

হারানো ইতিহাস মনে করলে বিক্রম গুপ্ত লজ্জিত হবে না এখন? অপরাধী মনে হবে না নিজেকে? উনি তো জানতেইই অনায়াস করছেন-তার জন্যে গ্রানিবোধ নেই ওর? অনুগ্রহ কাজের জন্যে কেউ ধরা পড়লে আজ বিক্রম গুপ্ত তাকে কি শাস্তি দেবেন? দিতে পারবেন? বিবেকের প্রতিবাদ বাহ্যিক উদাসীনতায় অবজ্ঞা করবেন?



গত দু বছরে অতসী কাজ দিয়ে, শুধুই বেশি বেশি কাজ করে, নিজের কৃতজ্ঞতা জানাতে চেয়েছিল। যেহেতু আর কিছুই ওর ছিল না যা দিয়ে বিক্রমের আগ্রহ সৃষ্টি করা যায়। সেদিন সন্ধ্যায় একা হলঘরে তার উদাসীন উপেক্ষা নিত্যও অসহনীয় লাগে। অতসী বোঝে ছেলেনান্দী, অযৌক্তিক ভাবনা ওকে ব্যাকুল করছে। ও জানে, বিক্রম ওপ্তর জীবনের প্রাতিসীমায় তার কোন ছায়াও পড়বে না। তবু দুটো অনর্থক প্রিয় শব্দ প্রার্থনা করাও কি খুব বেশি চাওয়া হতো!

সপ্তাহ দুয়েক পরে একদিন অফিসে এসে শুনল অতসী, ডি. এম ট্রান্সফার হয়ে গেছেন। আসলে তার আবার পদোন্নতি হয়েছে। হায়দ্রাবাদ যাবেন ওখানকার রিজিওনাল ম্যানেজার হয়ে।

অনিমেয় বললে, ভালো লোকের স্থান নেই এখানে। অফিসে একটি শৃঙ্খলা এসেছিল—কারো সহ্য হচ্ছিল না। দেখা এবার কে আসে!

—কবে যাবেন কিছু ঠিক হয়েছে? অতসী জানতে চায়।

—গুনিছ তুমি সপ্তাহখানেকের মধ্যে। আমাকে বললেন সব পেডিং ফাইল দু'তিন দিনের মধ্যেই ওকে দিতে। উনি যাবার আগে সব আপ-টু ডেট করে দিয়ে যেতে চান। তুমি গত পক্ষে সেলস্ স্টেটমেন্টটা রেডি করে ফেলা। আর লিস্ট অব ডিসপ্লিনারি কেসেস। সবগুলোর এককোয়ারি রিপোর্ট চেয়েছেন।

—এক সঙ্গে এত সব কি করে পারব।

—পারতে হবে, অতসী। এখন ক'দিন একটু বেশি খাটতে হবে।

—খাটব আমরা, প্রমোশন পাবেন উনি। আমাদের কি লাভ?

অবাক অনিমেয় বলে, তুমি বলছ একথা, অতসী? তুমি? বলতে পারলে!

—কেন ভুল বলেছি কিছু?

—কি জানি! মাঝে মাঝে তোমাকে আমি বুঝতে পারি না।

—ভাববেন না অনিমেয়দা। আপনার কাজ আমি তুলে দেব।

—না, না। কাজ নিয়ে আমি মোটেই ভাবছি না। তোমাকে তো আমি জানি।

কিন্তু ক্ষণ পর শিবেন এসে বলল, দেখছেন তো অনিমেয়দা, ইউনিয়নের সঙ্গে টক্কর দেবার কি ফল!

—তার মানে?

—সেদিন ডি. এম আমাদের কোন কথা শুনলেন না। শ্রীধরকে ট্রান্সফার করলেন। সবার দু'খন্টার মাইনে কাটার ছকুম দিলেন। এখন বোঝ। রত্নাকর পাল ছেড়ে দেবে? যাও এখন হায়দ্রাবাদে।

অতসী গলা বাড়িয়ে বলে, ওর প্রমোশনও আপনারা পাইয়ে দিয়েছেন নাকি?

—রাখুন আপনার প্রমোশন। এসব তো রাষ্ট্রী মাফিক হতেই থাকে। কিন্তু কলকাতা তো ছাড়তে হলো।

—আট বছর তো কলকাতার বাইরের ছিলেন।

—আমাদের সঙ্গে মিলেছলে চললে এখানে থাকতে পারতেন।

—ওঃ ওকে আপনার রবার স্ট্যাম্প করতে পারেননি বলে আপশোষ হচ্ছে বুঝি।

মিস্ পাল—গলা চড়িয়ে শিবেন বলে, নেহাৎ আপনি রত্নাকরদার বোন নইলে—চোয়

ছেড়ে উঠে অতসী শিবেনের সামনে গিয়ে বলে, কি করবেন—বলুন কি করবেন? ও সব মেকি ধমক আমাকে দেখাবেন না। আমি আপনার বা আপনাদের ইউনিয়নের চাকরি করি না। আপনারা আমার মাইনেও দেন না। আমরা যেটো যেতে এসেছি, সেটো খাব, নিজে কাজ না করুন আমাদের কাজ করতে দিন।

অনিমেয় ওকে সামলাবার চেষ্টা করে বলে, হঠাৎ ফ্রেপে গেলে কেন অতসী? তুমি নিজের জায়গায় গিয়ে বসো।

হঠাৎ যে মাথায় কি হয়েছিল, কেন অত সব বলল, অতসী সচেতনভাবে নিজেও জানে না।

আগামীকাল ডি. এম বিক্রম ওপ্তর এই অফিসে শেষ দিন। আজ লাঞ্চার অগ্নি আগে অতসী ডি. এমের চেম্বারে ফোন করে দেখা করতে চায়। বিক্রম বলেন, বুঝতেই পারছেন, কালই লাস্ট। হাতে এখনো অনেক কাজ। আপনার দরকারটা যদি বলেন—

অতসী বলে, দরকারটা ব্যক্তিগত। আমার দু'মিনিটের বেশি সময় লাগবে না।

—ঠিক আছে। আপনি তাহলে সাড়ে পাঁচটায় আসুন, পৌনে ছটায় এজেন্টদের সঙ্গে মিটিং আছে। তার আগেই আসুন।

ডি. এমের চেম্বারে আগে আরো দু'চারবার গেছে অতসী। সে সব ছিল কাজের জন্যে তলব পেয়ে যাওয়া। আজ নিজের জন্যে যেতে গিয়ে পা ভারি লাগছিল। মনে হচ্ছিল শাউরি যেন শূণ্য শরীর না, তার গতিমত্যাকেও আঁকড়ে ধরে রেখেছে।

ওকে দেখেই উঠে দাঁড়ান বিক্রম ওপ্তর।

—আসুন, আসুন। বসুন।

হাতের ঝোলানো প্রাস্টিক ব্যাগ থেকে একটা কাচ-ঢাকা বাস্প বের করে অতসী। বাস্পের মধ্যে একটা পুতুল। জাপানী মেয়ে। নৃত্যরত। হাতে জাপানীপাখা। সঙ্গে অপরাধ বর্ণিলা ছাতা। বাস্পটা টেবিলে রেখে অতসী বলল, আপনি এটা নিলে আমি খুব কৃতজ্ঞ বোধ করব।

—এটা—এই পুতুল!

—আমি নিজের হাতে তৈরি করেছি। আমার শখ। কেমন হয়েছে?

আন্তরিক উচ্ছ্বসেই বিক্রম বলে—দারুণ! দারুণ হয়েছে। চমৎকার দেখতে। আমি তো ভাবতেই পারছি না আপনি এমন অসামান্য শিল্প সৃষ্টি করতে পারেন।

—আমি অতি সাধারণ। নেহাৎ শখ করে করা। আপনি চলে যাচ্ছেন তাই আমার তরফ থেকে এই সামান্য—

—সামান্য নয়—অসামান্য! আপনাকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা জানা নেই আমার। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এটা আমার সারা জীবনের সঙ্গী হয়ে থাকবে।

দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে অতসী। ছুটে গিয়ে বাথরুম ঢুকে বরষার করে কাদতে থাকে। ওর বুকে যে এত কামা জমেছিল ও কোনদিন জানতেই পারেনি।

বিক্রম ওপ্তর কাচের বাস্পটি দু'হাতে টেনে নিয়ে ভেতরের পুতলটিকে খুঁটিয়ে দেখেন। পুতলটাকে আলাদা করে হাতে নেবার উপায় নেই। ওটা বের করতে হলে কাচ ভেঙে বা খুলে বের করতে হবে। সত্যিই চমৎকার পুতলটা। এক প্রাণোচ্ছল হাসি ছড়িয়ে জীবননৃত্যের মহড়া দিচ্ছে। পুতলের পোষাক, আভরণ, নকশের বিন্যাস সবই নিখুঁত মনে হয়। শিল্পবোদ্ধা না

হয়েও বিক্রমের বুঝতে অসুবিধে হয় না, এটা তৈরির পিছনে দীর্ঘ-চিন্তা, পরিশ্রম, অনুসন্ধিৎসা ও উৎসর্গের ইতিহাস আছে।

অমন ছোটখাট, প্রায়-কুশী মেয়েটির মধ্যেও এমন অপরূপ সৃজন-প্রতিভা নিহিত রয়েছে— যা মানুষকে দেয় চির প্রার্থিত ঐশী মহিমা, দূর কল্পনাতেও ভাবতে পারতেন না বিক্রম। একলা ঘরে ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে, কোনদিন সঠিক লক্ষ্যও করেনি মেয়েটিকে। সেকি ও কুরাপা বলে? হয়ত। ওর রূপচারি দৃষ্টি আহত হত। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে অতীত পালের চেয়ে অপরাধ কোন নারী আগে দেখেননি বিক্রম গুপ্ত।

চোখের সামনে বাস্তবী রেখে কাচের আড়াল থেকে পুতুলটিকে দেখতে থাকেন-যা আজ থেকে ওর সারাজীবনের সঙ্গী।

কোনদিন কি বিক্রমের চোখ বুঝতে পারবে এ জাপানী পুতুলের শ্যামলিম মুখটির অন্তর্ভুক্তি?

## আত্মজীবনীর কয়েক পৃষ্ঠা

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

হালকা নীলরঙের বাইশতলা এই বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালে প্রায়শ হুমত্বম করে ওঠে আমার গা। প্রতিটি তলায় শুধু অফিস আর অফিস। প্রতিটি অফিসই বাকমকে ছিমছাম, অভিজাতময়। প্রতিটি তলায় নানা বয়সের সুবেশ মানুষেরা মুগ গম্বীর করে ততোধিক গম্বীর কাগজ কিংবা ফাইলে মনোনিবেশ করে বসে থাকে। সবাই শুধু ব্যস্ত আর ব্যস্ত। তাদের প্রায় কারকেই আমি চিনি না তারা কেউই আমার সঙ্গে কথা বলবে না। আসলে কারও কথা বলার অবকাশই নেই। তবে এত হাজার লোকের মধ্যে মাত্র একজনই আমার চেনা জানা। সে আমার আবাবা বন্ধু কৌশিক। হয়তো শিগগিরই আমাদের বন্ধুত্বের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব পালিত হবে, সে এখন এই অফিসের নান্দার খ্রি।

কৌশিকের সঙ্গে দেখা করার জন্যই মাঝে মাঝে আমাকে আসতে হয় এই বাড়িটায়। তাও কৌশিক বলেছে, আসবি সঙ্গে ছ'টার পর। ছ'টা পর্যন্ত নিঃশ্বাস ফেলার সময় থাকে না আমাদের। তা ছাড়া আমার বস ভারী কড়া। কেউ এসে গল্প করলে রাগ করে।

আজও অতঃপর ছ'টা বাজার পর এসে দাঁড়িয়েছি লিফটের সামনে। চারটে লিফট, প্রতিটি থেকেই হুড় হুড় করে অফিসের লোকজন বেরচ্ছে, তারই একটা থালি হতেই চট করে ঢুকে পড়ি। ওগুলো সবই স্বয়ংক্রিয় লিফট। ভেতরে গিয়ে বোতাম টিপলেই নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে দরজা। তারপর হু হু করে উঠতে থাকবে ওপরে। আমার গন্তব্য ইলেন্ডেই ফোর। ফাঁকা লিফটে উঠে এগারোয় আঙুল ছুঁয়ে অপেক্ষা করবো দরজা বন্ধ হওয়ার। হঠাৎই খুব দ্রুত এসে কোনওক্রমে শরীর গলিয়ে দিল একজন অজুত চেহারার মানুষ।

লোকটার চুলদাড়ি, গায়ের রং সবই সাদা ধবধবে, চোখে ঘবা কাচের চশমা, তাতে তার চোখদুটো দেখাই যাচ্ছে না ভাল করে। পরনের জামা-প্যান্ট তাও দুধ সাদা রঙের। হাতে একটা নতুন ডিজাইনের রিস্টওয়াচ। চকচক করছে ঘড়িটা। বগলে একটা কালো মালটি দেওয়া বাঁধানো বই।

লিফটের দরজা ততক্ষণে বন্ধ হয়ে ও পরে উঠছে দ্রুত, এসব লিফট বেশ জোরেই ওঠে, আজ যেন আরও একটু দ্রুত। কিন্তু এতটাই দ্রুত যে নয়, দশ পেরবার পর লাল আলোয় এবারও জ্বলে উঠল লিফটের দরজার ওপরে, কিন্তু লিফটটা থামল না। এগারয় আঙুলটা ঠিক ছুঁয়েছিলাম কি না, না কি লোকটা দরজা ঠেলে ছড়মুড় করে ঢুকে পড়ায় কোনও গোলমাল হল কি না ভেবে ব্যারোয় আঙুল হোঁয়াই তফনি। কিন্তু না ব্যারোও পেরিয়ে গেল অনায়াসে। তাহলে তেরোতেই নেমে দটো তলা হেঁটে নামব ভেবে তেরোয় আঙুল। তাতেও থামল না লিফট। আমার আঙুলের আদেশ না মেনে উঠতেই থাকে নিজের খোয়ালে কী আশ্চর্য, লিফটের বোতামগুলো খারাপ হয়ে গেল নাকি! লিফট তখনও তার ইচ্ছেমতো চ্যাক পনরো ইত্যাদি পার হয়ে সোজা গিয়ে থামল একুশে। দরজা না খুলে আবার নামে। ডাবলাম এবার এগারোয় গিয়ে নিশ্চয়ই থামবে, তখনই ঢুকবে কৌশিকের অফিসে। ভেবে আবারও এগারয় আঙুল। নামতে নামতে কী আশ্চর্য, আবার এগার পেরিয়ে গেল লিফটটা, থামল না। দশ নয় আট টিপে টিপে লিফটটা থামবার চেষ্টা করি, কিন্তু কে শোনে কার কথা, লিফট গিয়ে থামল একেবারে একতলায়, কিন্তু লিফটের দরজাটা খুলল না এবারও।



এতক্ষণে নার্সাস হয়ে পড়ি। লিফটটা খারাপ হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। আমার সঙ্গী সাদা চুলদাড়িওলা লোকটা কিন্তু নির্বিকার, শুধু কজি উঠেখড়ি দেখাচ্ছে ঘনঘন।

আমি পুনর্বার এগারয় আঙুল ছোঁয়াই। কিন্তু এগারয় পৌছে আগের মতোই লিফটটা নির্বিকার। বাধ্য হয়ে সব ক'টা বোতামই টিপতে থাকি একে-একে। কিন্তু কোনও কিছুতেই কাজ হয় না। লিফটটা আবার গিয়ে খামে একুশে, দরজা খোলে না। আবার নেমে আসে নীচে, দরজা খোলে না। তারপর আবার ওপরে।

তখন আমার সারা শরীর জুড়ে ঘাম। ভয়ে, উৎকণ্ঠায় নীল। পাশে দাঁড়ানো ঘনঘন ঘড়ি দেখতে থাকি লোকটার দিকে তাকাই। লোকটা নির্বিকার শুইই নয়, হঠাৎ আমাকে তার, জড়ানো হান্সি গলায় বলল, অত বোতাম টিপছেন কেন! কন্ঠস্বরটা সত্যিই অদ্ভুত। যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে তার অস্পষ্ট গলা। একটু বিরক্ত হয়ে, চোখমুখ কুঁচকে বলে উঠি, খামছে না যে লিফট! ?

— সময় হলেই খামবে।

'সময় হলেই' শব্দ দুটির অর্থ বোধগম্য হল না ঠিক। লিফটটা তখন ঘড়ির পেড়লামের মতো খুব দ্রুত একবার ছুঁয়ে যাচ্ছে একুশতলা, পরক্ষণেই নেমে একে। এরকম আর কিছুক্ষণ থাকলে নির্ঘাত দমবন্ধ হয়ে মারা যাব। অর্ধেক হয়ে দরজায় যা দিই বার কয়েক, যেন যা দিলে তাইই খুলবে লিফটের দরজা। কিন্তু তাতে হিতে বিপরীতই। হঠাৎ দম করে নিবে গেল লিফটের ভেতরকার আলো। ইস্, কী সাংঘাতিক অন্ধকার!

একেই তো খামছে না লিফটটা, তার ওপর এরকম ঘূর্ণঘূর্ণি অন্ধকার হয়ে যেতে আরও কাঁপ ধরে বুকে। নিশ্চয়ই বিকল হয়ে গেল ভেতরকার বিদ্যুৎ-সংযোগের ব্যবস্থা। কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না অন্ধকারে। লিফটের দরজার ওপর যে সাংঘাতিক অন্ধকার! এতক্ষণ লাল অক্ষরে জ্বলছিল নিবন্ধিত তাও সহসা অদৃশ্য। কিন্তু একটু পরেই এটুকু উপলব্ধি করা গেল যে লিফটটা থেমে নেই। ঘড়ির পেড়লামের মতো একবার ওপরে একবার নীচে, যেন মস্ত একটা পেঁওয়াল ঘড়িকে কোনও এক অদৃশ্য শক্তি কাণ্ড করে রেখেছে যাচ্ছে করেই। তার পেড়লামটা শুধু দুলছে আর দুলছে।

খুবই উদ্ভিগ্ন হয়ে দুলতে থাকি এভাবে, আর ভয়ে, উৎকণ্ঠায় গলা ওকিয়ে আসতে থাকে দ্রুত। কীভাবে এখনে বন্দিশ্রম থেকে উদ্ধার পাব তার কোনও দিশই পাচ্ছি না। প্রতিটা লিফটাই একটা আলাদা বেল থাকে, সেটা সমঝ মতো টিপা হয়নি। এখন আর দেখাও যাচ্ছে না অন্ধকারে। তাহলে এখন এই লিফটের মধ্যেই কি আমাকে কাঠতে হবো অনির্দিষ্ট সময়কাল!

একটু পরেই অবশ্য চোখে খিঁট হয়ে আসে অন্ধকার। কী একটা আলো চিক চিক করছে সোশে ভাল করে চোখ পাতি, সামনেই একটা গোলা ডায়াল, তাতে একটা ছোট আর একটা বড় কীটা। দুটো কীটাত্তেই রেডিয়াম লাগানো। রেডিয়ামের কীল আলোতেই কিছুটা ফিকে হয়ে এসেছে অন্ধকার। যেন সপ্তমীর জ্যোৎস্নায় ভূবে আছে লিফটের ভেতরটা। আসলে ওটা সাদা চুলদাড়ি অলা লোকটার হাত ঘড়ির আলো। সেই অস্পষ্ট, ফিকে আলোয় কিছুটা পরিদ্বার হল সেই অদ্ভুত দর্শন লোকটার অবয়ব। তার ধবধবে সাদা পোশাক, চুল, দাড়ি, গায়ের রং এখন কিছুটা দুশ্যমান। আর কী আশ্চর্য, এত যে কাণ্ড ঘটছে তাতে লোকটার যেন বিদ্যুৎময় হেলসোল নেই।

এত সোলাচলহীন লোককে ঠিক যেন সহ্যও হচ্ছে না তখন। এভাবে বাকি রা ত, নাকি

অবশিষ্ট জীবন লিফটের ভেতর আটকা থেকেই কেটে যাবে। কিছু ভাবনা চিন্তা করতে হবে না! বহুক্ষণ রাগে উত্তিবিষি করার পর হঠাৎ অচেনা, অদ্ভুত লোকটাকে বলেই ফেলি, কী হল বলুন তো? লিফটের খামাবার মতো কোনও উপায়ই তো দেখছি নে!

লোকটা আগের মতোই জড়ানো, হান্সি স্বরে বলল, জোর করে খামাবার দরকার কী! সময় হলেই থেমে যাবে।

— কিন্তু তা কখন! বহুক্ষণ তো হয়ে গেল আমার দুলে চলেছি পেড়লামের মতো!

— এভাবে আরও বহুক্ষণ দুলতে হবে। জীর্নটাই তো একটা পেড়লাম। যদি আপনার খুব অবশিষ্ট লাগে, তাহলে বরং এই বইটা পড়তে থাকুন ততক্ষণ।

বলে তার বগলের কালো মলাট দেওয়া বইটা পট করে ধরিয়ে দিল আমার হাতে। বইটা হাতে ঠেকতেই মনে হল লোকটা নির্ঘাত পাগল। এই ফিকে অন্ধকারে লোকটা আমাকে কিনা বই পড়তে বলছে। তাই আবার পড়া যায় নাকি!

কী ভোরে বইটার প্রথম পাতটা খুলতেই সাত আশ্চর্যের এক আশ্চর্য। ভেতরের অক্ষরগুলো সবই যেন রেডিয়াম-মাথানো। অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে প্রতিটি অক্ষর, প্রত্যেক অক্ষরেই যেন রূপোলি রং মাথানো, আর তা পড়াও যাচ্ছে স্পষ্ট ভাবে। আরও অবাক করার ঘটনা বইটির নাম? আত্মজীবনী কয়েক পৃষ্ঠা।

কিন্তু তার চেয়েও আরও গভীরতর বিষয় তখন অপেক্ষা করছিল আমার সামনে, তা বইটির লেখকের নাম। কী অদ্ভুত আর কী চমকদেওয়া ঘটনা! সেখানে আমার নামটাই কিনা জ্বলজ্বল করছে রেডিয়াম-মাথানো অক্ষরে।

স্বরে উঠা মিশেল দিয়ে বলি, আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন! আমি কখনও কোনও বই লিখিনি।

লোকটা নির্বিকার করে বলল, অন্য কোনও বই না লিখতে পারেন, কিন্তু এই আত্মজীবনীটা আপনারই লেখা।

— অসম্ভব। আমি বই লিখলে আমি জানব না?

লোকটা জড়ানো গলায় হেসে বলল, প্রত্যেক মানুষই তার অগোচরে তার আত্মজীবনী লিখে চলে প্রতিদিন। আপনিই লিখছেন রোজ একটু একটু করে। আপনার আত্মজীবনী অন্য কেউ লিখবেই বা কী করে!

লোকটার কথা প্রথম মুহূর্তে ভারী অস্বাভাবিক আর অবাস্তব মনে হলেও ঠিক যেন ফেলতেও পারি না। কথাগুলো যেন সত্যিই সত্যি। কিছু বলার আগেই লোকটি আবার বলল, পড়তেই দেখুন না কয়েক পৃষ্ঠা তাহলেই বুঝবেন।

হতভম্বের মতো টাইটেল পেজ পার হয়ে পৌছে যাই বইয়ের আরম্ভ পৃষ্ঠায়। ক্রমে ক্রমে অক্ষরে লেখা, কিন্তু প্রতিটি অক্ষরে রেডিয়াম লাগানো থাকায় পড়তে অসুবিধে হয় না তেমন। কয়েক পৃষ্ঠা পড়তেই বুঝতে পারি লোকটা ঠিক কথ্য বলেনি। এটা মোটেই আমার আত্মজীবনী নয়, বরং লেখাটা আসলে এক আশ্চর্য রূপকথা।

গল্প শুরুই হয়েছে এক রাজপুত্রের জন্মবৃত্তান্ত দিয়ে। খুব ভোরে, ব্রাহ্মমুহূর্তে তার জন্ম হয়েছিল বলে নামকরণ হয়েছিল সূর্যের নামে। চোখ মেলেই নাকি সে দেখতে পেয়েছিল লাল লালটির মতো প্রবল বেগে ঘুরতে ঘুরতে দিগন্ত রেখার ওপর উঠে আসছে সূর্য। অন্ধকার কেটে গিয়ে তাহলে তারপর আলো হয়ে উঠেছে চারদিক। তাহার প্রাসাদটা ছিল একটা বিশাল নদীর ধারে, মাটির প্রাসাদ যদিও। জন্মের পরই সেই নদীর জল হয়ে উঠল রক্তাভ। তাতে



সূর্যের রং ফেটেফুটে ছড়িয়ে যাচ্ছিল লাল আবিরের আশ্চর্য আভা ছড়িয়ে।

সেই রাজপুত্রের শৈশব ছিল ভারী মৃগ, সুন্দর আর স্বপ্নের মতো। যা সে চাইত, তার চেয়ে পাওয়ার ভাগ ছিল অনেক বেশি। যেন সমস্ত পৃথিবীর যাবতীয় সুখ বরাদ্দ ছিল তারই জন্য। বিশাল নদী, আকাশ, ঘাস, গাছগাছালি সব একান্তভাবেই তার। সে হাতছানি দিয়ে ডাকলে পাতা নেড়ে উত্তর দিক কাঠাল, জাম, শিরীষ, পাকুড় আর অশ্বথের পাতারা। সেই কথা বললে ছিলল শব্দে হেসে উঠত নই। নীল আকাশকে খুব করে বাকি দিলে। সে আকাশ অভিমান করে জমিয়ে তুলত কালো থমথমে মেঘ। আরও বেশি বকলে কীদন্ত বরষার করে। হাওয়ায় সঙ্গে ঘুনসুটি করলে হাওয়া ননশন শব্দে হেসে উঠে পালিয়ে যেত কোথায়। হয়তো একেটা দূরে গিয়ে বীকড়া বটাগাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াত, মজা করে বলে উঠত, টু—কি।

বইটা পড়তে পড়তে কীরকম চেনা লাগে দৃশ্যগুলো, তবু সবটা ঠিক চেনা তাও নয়। ফিকে আলোয় সেই সাদা অবয়বের উদ্দেশ্যে বলে উঠি, ধূর, এ তো একটা নিছক রূপকথা। আমি কখনও রাজপুত্র ছিলাম না, নিতান্তই গরীব ঘরের ছেলে, কোনওক্রমে দু'বেলা গেয়ে পরে বৈচ্ছেতি।

ধূসর কণ্ঠস্বর থুক থুক করে হেসে বলে উঠল, সব মানুষেরই জীবন শৈশবে এরকম রূপকথার মতোই। পেছন ফিরে একবার দেখুন, দেখতে পাবেন। প্রশ্ন না করে আরও পড়ে যান।

ঘড়ির পেভুলামের তলার দাঁড়িয়ে তখনও দু'লে যাচ্ছি ক্রমাগত। যেন অন্তকাল এভাবেই দুলতে থাকবে পেভুলামটা। লোকটির গলার স্বরে কী ছিল কে জানে, আমি আবার চোখ পেঁটে ফেলি রূপোলি অক্ষরগুলোর চকচকে শরীরে।

অতঃপর একটা দীর্ঘ স্বপ্নদৃশ্য আছে পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ জুড়ে। রাজপুত্রের বেড়ে ওঠার দিনগুলিতে শুধু স্বপ্ন আর স্বপ্ন। তাকে হঠাৎ কেউ পরিলক্ষি রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজত্বের গল্প। স্বপ্নের দৃশ্যগুলো সেরকমই একটা দীর্ঘ, বন্ধুর পথ যা যেতে হয় কখনও তেপান্তরের মতো একটা মন্ত, অত্থীন মা পেরিয়ে, কখনও ধু ধু মরুভূমির বালি মাড়িয়ে, কখনও আবার জঙ্গল পার হয়ে, কখনও খুব উঁচু একটা পাহাড় ভাঙতে ভাঙতে চুড়ায়। পথে বহু বাধা-বিষ, বহু প্রলোভন, হাতছানি, কিংবা রাজপুত্র যে মুহূর্তে জেনেছে এহেন পথ ও পাহাড় ভেঙে গাছের পৌছলেই তার জন্য অপেক্ষা করে আছে শুধু রাজকন্যাই নয়, তার সঙ্গে অর্ধেক রাজত্বও, সেই রাজপুত্র অতএব তার স্বপ্নের থেকে একটুলও বেরিয়ে আসেন না। স্বপ্নের ভেতর সে ছুটতে থাকে একটা সাদা ঘোড়ায়, তার পিছনে উদ্ভাত থাকে একটা শানিত তরোয়াল। ছুটে যাওয়ার পথে সে দেখতে পায় দু'পাশে অজস্র রাক্ষস ও খোঙ্গস তাক করে আছে তাকে বাধা দেবে বলে, কিন্তু তার হাতের চকচকে খোলা তরোয়াল দেখে তারা এগিয়ে আসতে সাহসই পায় না।

ক্রমে সেই রাজপুত্র তেপান্তর পার হয়ে, জঙ্গল পেরিয়ে মরুভূমি মাড়িয়ে, পাহাড় ভেঙে ভেঙে উঠতে থাকে সুউচ্চ চুড়ায়। আর হ্যাঁ, অবশেষে বহু পাথর ভেঙে, অনেক পাকদণ্ডি বেয়ে, বহু পিচ্ছিল বরফ পার হয়ে সে ওপরে উঠলও। কিন্তু কী আফসোস! সেই পাহাড় চুড়ায় রাক্ষস-খোঙ্গস বেষ্টিত হয়ে, মর্গি-নাগা অজগরের পাহায়া বাস করতে থাকা সুন্দরী রাজকন্যার দেখা পেল বটে, কিন্তু তাকে নিয়ে যেইমাত্র রওনা দিতে যাবে, তখনই চমককার ঘুমটা ভেঙে গেল রাজপুত্রের।

এই পর্যন্ত পাঠ শেষ করে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হয় শরীরে। বিরক্ত হয়ে সেই সাদা অবয়বের

দিকে তাকাই, বলি, ধূর, ধূর, এটা আমার কোনও আত্মজীবনী হতে পারে না। এরকম কোনও স্বপ্নই দেখিনি কোনও দিন।

ফিকে অন্ধকারে কিংবা ফিকে আলোয় আবার হাল্কা কণ্ঠস্বরের অদ্ভুত ঘুলঘুলি হানি। লোকটাকে পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছি না, আবার সে একেবারে অদৃশ্য তাও নয়। তার ঘুলঘুলানোর হাসির মধ্যেই শুনতে পাওয়া গেল, মানুষ কৈশোরে এরকমই সব স্বপ্ন দেখে। আপনিও দেখেছিলেন। প্রশ্ন না করে বইয়ের বাকি অংশটা পড়ে যান—

খুবই আশ্চর্য লাগছিল লোকটির কথাবার্তা। ক্রমশ এক অদ্ভুত রহস্যের মধ্যে আমাকে ডুবিয়ে দিয়ে যেন ভারী কৌতুক অনুভব করছে। আবহা আলোর মধ্যে নিজেকে আড়াল করে তার এই জটিল কথনভঙ্গি আরও কৌতুকলী করে তুলছে আমাকে। আবারও ডুব দিই রেডিয়াম-বিচ্ছুরিত ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরগুলোর মধ্যে।

রাজপুত্র ততদিনে দীক্ষা নিয়েছেন যুবরাজ হওয়ার। অথবা ঘুরিয়ে বলা যায় তাঁকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করা হয়েছে, খুবই অনাড়ম্বরভাবে। অর্ধেক রাজত্ব তার হাতে তুলে দিয়ে বলা হয়েছে বাকি অর্ধেক উপার্জন করে নিতে হবে নিজস্ব মেধা ও কৃতিত্বে। তবেই রাজা হয়ে উঠবে যুবরাজ। হঠাৎই বহু হয়ে হাতে হাতে লেগে পাতোয়ায় যুবরাজ তখন বিভ্রান্ত। স্বপ্নের চটকাটা ভেসে যাওয়ায় এমনিতেই কিছুটা বিরক্ত। রাজকন্যাকে নিয়ে সবে রওনা হতে যাবেন চুড়া থেকে, পাহাড়ের পার্শ্বাংশি বয়ে নীচে নামবেন প্রাসাদে পৌঁছবেন বলে, সেসময় এমন বেরসিকভাবে কেউ তাঁর স্বপ্ন ভাঙানোয় রুষ্ট হয়ে ভারলেন, এই অপরাধের জন্য কার গর্দন নেনেব! স্বপ্ন দেখা অপপরায সুন্দরী রাজকন্যার মুখছবি তখনও সমোহিত রেখেছে তাঁর ভাবনার পৃথিবী। পথে বাটে এত-এত সুন্দরী লালনার দেখা পান, তবু কেউ যেন তাঁর স্বপ্নে দেখা রাজকন্যার মতো রূপসী নয়।

স্বপ্নভঙ্গের এই থির, বিষম দিনগুলিতে যুবরাজ তখন কী পেয়েছেন আর কী চাই—এর তালিকা তৈরিতে নিমগ্ন। চাওয়ার তালিকা সবসময়েই দীর্ঘায়িত হয়। না-পাতোয়ার তালিকাও সমতুল। যুবরাজের এ হেন রাজা হয়ে ওঠার পরিক্রমায় তার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দেওয়া হ'ল সাতসমুদ্রের তেরোনদী টুড়ে পাওয়া এক রাজকন্যার। যুবরাজ কিছুটা শান্ত হলেন বটে, কিন্তু দিন ম দিনে ঘরকানা করলেন, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে তাঁর মনে যে-এ রাজকন্যা সেই রাজকন্যা নয় যাকে তিনি স্বপ্নে জয় করেছিলেন, যাকে পেয়েছিলেন বহু বন্ধুর পথ ও পাকদণ্ডি পেরিয়ে পাহাড় চুড়ায় পৌঁছে। তা ছাড়া যে-অর্ধেক রাজত্ব তাঁর তখনও অন্যায়, তাও তো পাওয়া যারকার। এখনিই না পেলে আর কার পাবেন। সেই অর্ধেক রাজত্বের শোজ যুবরাজ তখন ঘোড়া ছুটিয়ে জয় করতে চাইলেন তাঁর উচ্চাশার শেষ শিখার। ছুটছেন তো ছুটেই যাচ্ছেন। কখনও কোথাও একটুকরো রাজত্ব পেলেন তো হারালেন তাঁর নিজের অংশের রাজত্বের একটুকরো। এভাবেই বহু আস্রসে, বহুতর পরিশ্রমে একটা একটা করে পায় হয়ে যায় দিন, দিন পেরিয়ে ক্রমে মাস, মাস পেরিয়ে বছরও। তবুও পুরোটা রাজত্ব টিকঠাক হাতের তেলোয় উঠে আসে না যুবরাজের। যুবরাজ হতাশ, বিষয়।

এদিকে রাজপ্রাসাদের ভেতর রাজকন্যাও তখন অভিমন্যু টইটস্বর। সে-অভিমন্যু ক্রমে রূপান্তরিত হয় ফোভে, ক্রোধে, বাদনুবাদে। কখনও বিশ্বদারণ হয়। বিশ্বদারণের টুকরো ছড়িয়ে পড়ে মনের এ-কোণে ও-কোণে। সেই লাভা জমতে জমাতে একসময় পাহাড়।

এই রাজা হয়ে ওঠার দিনগুলিতে এভাবেই প্রতিদিন ক্ষতবিক্ষত হতে থাকেন যুবরাজ।



কিন্তু রাজা তো তাঁকে হতেই হবে। পরিপূর্ণ রাজা হয়ে ওঠা ছাড়া একজন যুবরাজের আর কী ভবিষ্যৎ!

অবশেষে পূর্ণ রাজত্ব না হোক, পৌনে রাজত্ব যখন হাতের মুঠোয় উঠে এল যুবরাজের, সবিয়ে আবিষ্কার করলেন, তাঁর চুলের এখানে ওখানে রূপোলি বলক।

বইটির এই পর্যন্ত পাঠ সেরে আমি আবার প্রতিবাদে মুখ হতে চাই, বলি, বইয়ের এই অংশটাও কী সব আগভূত বাগভূত লেখায় ভর্তি। এ-সব যুবরাজের গল্প আমার বলে চালাতে চাচ্ছেন কেন!

সাদা অবয়ব তখন কী কারণে যেন, তাঁর হাতের কব্জির রেডিয়াম-টিকরানো ঘড়ির ওপর ঝুঁক পড়েছেন। উনি কি সময় দেখছেন। কী হবে সময় হিসেব করে। এই অনন্ত যাত্রায় সময় দেখে কী-ই বা লাভ এখন। রেডিয়ামের আলোর ছটায় তাঁর মুখেও কি এমন এক বিচিত্র বিজ্ঞরাগের আভা। কব্জি থেকে মুখ তুলে বললেন, যৌবনকালে প্রতিটি মানুষই যুবরাজ ভাবে নিজেকে। আর কালক্রমে রাজা হয়ে ওঠার তাগিদে তার প্রতিমুহুর্তে দেড়া আবার যৌবনকালই হল প্রতিটি মানুষের স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস।

সাদা চুলদাড়িআলা লোকটির কথাগুলো সবসময়েই কেমন দ্বার্ক আর দুঃখ। হঠাৎ এরকম একটা দমবন্ধ পরিবেশে কেনই বা একটা জটিল, উপপাদ্য প্রতীম বই আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন, কেনই বা তার ভেতরকার বিষয়বস্তু চাপিয়ে দিতে চাইছেন আমার ঘাড়ে। সবটাই আমার কাছে প্রহেলিকা। একটা আশ্চর্য হৈয়ালি। রূপকথার আড়ালে লেখা বইটির বিষয়বস্তু কিছুটা যেন আমার, কিছুটা আবার যেন নয়ও। যেটুকু নয় সেটুকু নিয়েই আমার যত মাথাব্যথা।

বিশাল পেভুলামের উগায় দাঁড়িয়ে দুলতে দুলতে সেই দিবা আধারে কিংবা দিবা আলোয় ক্রমশ পেরিয়ে যাচ্ছি মহাকালের এক-একটি দণ্ড, পল-অনুপল, আর ভেবে উতলা হচ্ছি সত্যিই কি ওই বইটির রাজপুত্র এই আমিহি। রাজপুত্র থেকে যুবরাজ হয়ে ওঠা, কিংবা যুবরাজ থেকে রাজা হয়ে ওঠার বৃত্তান্ত কি কোনওভাবে ছুঁয়ে যাচ্ছে আমারই ফেলে আসা দিনগুলো!

রূপোলি বিজ্ঞরাগের আলোকিত হয়ে ওঠা বইটির বাকি অংশটুকু তখন যেন চন্দ্রকের মতো আমাকে টানছে। রহস্যময় লোকটির হৈয়ালিময় কথাবার্তা ক্রমশ বিভ্রান্ত করা সত্ত্বেও আমি পড়ে ফেলতে চাই বইটির শেষ অংশটুকু। সেই অভীক্ষায় যে-পর্যন্ত পড়েছি তার পরের পৃষ্ঠা ওপ্টাতেই সহসা আবিষ্কার করি, আর মাত্র কয়েকটি পংক্তিই লেখা আছে সেখানে। বাকি সব সাদা ধূ ধূ পৃষ্ঠা। পড়তে চাইছি প্রবল আগ্রহে, অথচ না পেয়ে আমি চিৎকার করে উঠি, কী হল, এর পর কী হল? আর কিছু লেখা নেই কেন!

পেভুলামটা তখনও দুলিয়ে যাচ্ছে আমার স্মৃতি, সত্তা, আমার জীবনযাপন। চারপাশে তখনও সেই আলো আধার। সেই অতি প্রাকৃত জটিলতার আবর্তে দুলতে দুলতে শুধু গুনতে পাই অস্পষ্ট কষ্টের, বাকি পৃষ্ঠাগুলো আপনছি তো লিখবেন অতঃপর। প্রতিদিন একটু একটু করে লিখবেন। আপনি রাজই পার হবেন আপনার জীবনবৃত্তান্ত, আর এক পৃষ্ঠা এক পৃষ্ঠায় করে ভরে উঠবে এই কালো কালটে ঢাকা বইটির বাকি পৃষ্ঠাগুলো। সাদা পৃষ্ঠা ক্রমশ ভরে উঠবে রূপোলি ছটা ছিটানো অজস্র অক্ষর।

## সবাই গেছে বনে

এযা দে

বনের মধ্যে পায় চলা পথ। সন্দের বৌকে আবছা নারীমূর্তি, মাথায় আব্রুনিমিয়ামের হাঁড়ি। হাইওয়েতে চলন্ত গাড়ির সামনের সিটে বসা গৌতম জানালা দিয়ে এক বলক দেখে বলে ওঠে, —দেখ দেখ, এ যে আদিবাসী।

পেছনের আসনে নামী এন জিও সংগঠনে স্ত্রী সূচরিতা দপ করে জ্বলে ওঠে, —এ যে আদিবাসী মনোটা কী? আদিবাসী কি বেতলা রিজার্ভ ফরেস্টের হরিণ, না জলদাপাড়ার হাতি? তোমাদের এই অ্যান্টিচ্যাড আমি একমম সহ্য করতে পারি না, গরিব পিছিয়ে পড়া মানুষ আর তোমরা ভাব কিনা দৃষ্টব্য জানোয়ার, চিড়িয়াখানার বাঘ সিংহ!

—আহা সূচরিতা, তুমি গৌতমের কথাটা এত সিরিয়াসলি নিচ্ছ কেন? দাম্পত্য কলহের সম্ভাবনা সমূল বিনাশে উদ্যোগী হন গৌতমের বন্ধু সুব্রতের ছোটোমা অর্থাৎ ছোটো মাম্মণ্ডুর। —কথা কী জানো বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃকোড়ে। নইলে সরকারি সংরক্ষণের কুপায় আদিবাসী এখন কোথায় নেই। সব শ্রেণীর চাকরিতে ছড়াছড়ি। কিন্তু যার যেখানে আদতে বাস সেখানেই তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। সেটা দেখতে চাওয়া দোষের নয়।

—ছোটোমা ইজ রাইট। এই যে এতলোক কলকাতায় এসে বাঙালি দেখে, আমরা মাইন্ড করি? নেভার। সুব্রত দলটির রসিক সদস্য।

—তোমরা জল টল কিছু খাবে না কি? লাঞ্চ খেলে তো সেই দুটোর সময়। অভিজ্ঞ সেনানায়কের মতো সকলের মনোযোগ সূকৌশলে ভিন্নমুখে চালিত করে সুব্রত পত্নী অনু।

—একটু চা পেলে মন্দ হ'ত না। পাঁচটা বাজছে, টি টাইম ওভার হতে চলল। ছোটো মামীর প্রস্তাবে সকলের সায়। ভ্রূহিভার জানাল সামনে মাতৃকাঘাট, সেখানে চা পাওয়ার সম্ভাবনা। একদিকে ফাঁকা খেতে, ফসল কাটা হয়ে গেছে, অন্যদিকে ইতস্তত জঙ্গল। মাতৃকাঘাট এক-রস্তার ধারে কয়েকটি বুপড়ি। একটিতে চায়ের দোকান, বোয়ামে লেড়ে বিস্কুট, হলদে বাদামি ভাজাভুজি। সবচেয়ে বড় দোকানটি মুদিখানা। চাল, ডাল, তেল মশলার সঙ্গে সাজানো আলু পোয়াস, শুকনো দাগধরা ফুলকপি, সবুজ সবুজ বেগুন, শ্রিয়ামন বাঁধাকপি। চাল থেকে কুলুছে এক ছড়া খানিকটা হুন্দর কাঁটালি কলা। ভ্রূহিভার খবর দিল আর লোকালয় নেই। এখান থেকে পাকদণ্ডি গুরু।

—অর্থাৎ এই দোকান কাটিই হচ্ছে লাস্ট পোস্ট অফ সিভিলাইজেশন। এরপরে আদিম অরণ্য। বিদায় সভা জগৎ।

সুব্রতের এককালে নটকটীটকে উৎসাহ ছিল। এখানে মাঝে মাঝে শখটা চাগিয়ে ওঠে।

সবাই গাড়ি থেকে নামে। হাত পা টানটান করা দরকার। সেই সকালে ভুবনেশ্বর থেকে বেরিয়ে দুপুরে ফুলবানি পৌঁছানো পর্যন্ত একটানা যাত্রা। সারকিট হাউসের প্রান্তনে আকাশ হৌওয়া শালগাছের ফাঁকে ফাঁকে দৌঁদুয়ায় খানিকক্ষণ এলানো ‘কী দারুণ জায়গা’, ‘হোয়াট আ রিলিফ আফটার ক্যালকটা’? এবে চবাচোয়া ত্রিপ্রাহরিক আহার (‘নতুন স্বাদের রান্না তাই না?’ ‘চিৎড়ি ভাজাটায় সাদা তিল দিয়েছে সেনেহ? ভাল লাগছে’)। আবার যাত্রা। সে প্রায় যন্টা তিনেক হয়ে গেল।



— বেশ ঠাণ্ডা তো। সন্ম, মিলি এদিকে এস। আরেকটা সোফোর পরবে। অনু ছেলে ও মেয়েকে ডাকে।

— জঙ্গল সর্বদা বেশি ঠাণ্ডা। ছোট মামা ব্যাখ্যা করেন। — আর এটোতো মাঘ মাস। কখায় বলে না মাঘের শীত বাঘের গায়ে।

হাঁ, মাঘ মাস বলেই তো সুব্রত অনু আসতে রাজী হল। শনি রবি সঙ্গে পড়েছে সরস্বতী পুজো। বেশ ক'দিন ছুটি। ভুবনেশ্বরে সুব্রত কোম্পানীর রিজিওনাল সেলস্ ম্যানেজার হয়ে আসার পর থেকে পরিবারের পাঁচজন তো বটেই, আশীষসজ্ঞন বন্ধুবান্ধব এমন কি স্বল্প পরিচিতের ভীড়ে তারা হিমসিম। বাঙালি মাঝেই দুঃখ বিশাশ ওড়িশা বেছে তাদের একরাতের জার্নি মধ্যবিত্ত রেশ উপযোগী ছুটি কানোনের ট্যুরিস্ট রাজ্য—সমুদ্র জগন্নাথ কানারক, লিঙ্গরাজ জঙ্গল, কটকি শাড়ি কাপড়। সেখানে অফিস কাছারি, স্কুললেজ বাবসাবাণিজ্য যেন থেকেও নেই। হরদম শেষমহুর্তে এস টি ডিতে কাতর অনুনয়—‘তিন দিনের জন্য পুরীতে সতেরো জনের রিজার্ভেশন চাই, প্রিজ’ অথবা ‘চিক্কাস সানরাইজ সানসেট দেখতেই হবে। রক্তার গেষ্ট হাউসে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য ন’জনের জায়গা করে দাও’ ইত্যাদি সামলাতে হচ্ছে। এদিকে সুব্রতের জীবিকা একটি বিশেষ ব্রান্ডের সিগারেট বিক্রি (যদিও ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। রাজ্যের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে বিক্রি বাটা বাড়তে হয়। অনু প্রায়ই একলা, ছেলেমেয়ে সংসারে ব্যতিব্যস্ত। কককাতার লোকের দোষের দোষ রাখা যেমন সুব্রতের পক্ষে শক্ত তেমনি অনুরও অতিথিদের সঙ্গে দেখা পারতপক্ষে হয়ে ওঠে না।

তবে ছোটমামা ছোটমামীর কথা আলাদা। তারা মাইডিয়ায় গুরুজন, ভাগী জামাইয়ের সঙ্গে বাসে ড্রিংক ফিংক করেন, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম গ্রহণ করেন না। তিনি যখন সপ্তাহ দুয়েক আগে টেলিফোনে বললেন, এবারে সরস্বতী পুজোর সঙ্গে শনি রবি পড়েছে, ভাবছি দু একদিন ছুটি অ্যাড করে তোমাদের ওখানে ঘুরে আসি, তখন সুব্রত উত্তরটা আন্তরিকই ছিল।

— ভাবছি নয় ছোটমামা একেবারে চলে আসুন। দুজনে আসছেন তো? — অফকোর্স। তোমাদের মামী কি আমাকে এ বাসেও একলা ছাড়েন ভেবেছ? হা হা। রুবিব বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর তাঁর খবরদারির শিকার তো শুধু আমি। ভাল কথা জঙ্গলে একটা ট্রিপের প্ল্যান আছে। চল, সবাই মিলে যাওয়া যাবে।

— জঙ্গল মানে সিমলিপাল তো? ওখানে মামা আর কিছু নেই, ভেতরে গাঁ হয়ে গেছে, জমি চাষ হচ্ছে।

— আরে না না আমি স্বয়ং কনজারভেটর অফ ফরেস্ট হয়ে সাধারণ ট্যুরিস্টদের মতো তোমাদের সিমলিপাল নিয়ে যাব ভেবেছি। দেখাযা যাওয়া হচ্ছে জান? ফুলবানি, আ রোমান্টিক প্রেস, সেই পুটিশ আমলের জঙ্গল, আনন্দপ্রেম্ভ একেবারে আনাকে, শুধু কিছু আদিবাসীরা থাকে। খাটি আদিবাসী, সাঁওতালদের মতো আমাদের পাল্লায় পড়ে পোষমানা আদিবাসী নয়।

— ওয়াস্তারফুল। তবে আমাদের একটা প্রবলেম আছে। এই যে অনু কথা বললে।

— হ্যাঁলে, ছোটমামা কেনন আছে? হ্যাঁ প্লান গুণ্ডালাই। কিন্তু কী করে যাব বল, এটা ফেস্টিভারি ফার্স্ট উইক, মার্চের শেষে সন্ম মিলির পরীক্ষা। সুব্রতরও কাজে প্রচণ্ড চাপ, ট্যুরের কোটা শেষ করতে হবে, ইয়ারের এটিং —

— আরে রাখ তো। তোরা আজকালকার ছেলেমেয়েরা যা হয়েছিস না, শুধু কেরিয়ার

আর কেরিয়ার। বাচ্চাদেরও তেমনি তৈরি করেছিস, পড়া আর পড়া। আর সুব্রতকে বল দ্বিন বেড়িয়ে আসলে ফ্রেশ ব্রেনে আরও বেশি করে বিড়ি সিগারেট বেচতে পারবে।

ছোটমামার কথায় বিস্তারিত জানা গেল কিছুদিন আগে পূর্ণাঙ্গদের কনজারভেটর অফ ফরেস্টদের একটি কনফারেন্সে ওড়িশার চিফ কনজারভেটর বিজয় মিশ্রর সঙ্গে তাঁর বেশ ভাল আলাপ হয়েছে। কথায় কথায় যখন প্রকাশ পায় ভুবনেশ্বরে তাঁর নিকট আত্মীয়ের অবস্থান, তৎক্ষণাৎ মিশ্রর সকলের প্রতি সাদর আমন্ত্রণ—ওড়িশার জঙ্গল দেখতে আসুন। রিয়েল জঙ্গল, ট্যুরিস্টের জঙ্গল নয়। সেই অনুযায়ী এই উইক এন্ডে ফুলবানি জেলার বেলঘর যাবার প্ল্যান। সুব্রত অনু এখন রাজী, বাচ্চাদের বলা হয়ে গেছে, সকলের সাগ্রহ প্রতীক্ষা।

এমন সময় দিন সাতকে আগে সুব্রতর ঘনিষ্ঠ বন্ধু মুন্ডা অ্যাডভার্টাইজিং-এর অ্যাকউন্টস ডিরেক্টর গৌতম সেনের ফোন—শনি রবি সরস্বতী পুজো একসঙ্গে পড়াতে আর একদিন ছুটি যোগ করে সে ও তার স্ত্রী সুচরিতা ওড়িশা আসতে চায় রিলাক্স করতে— তারা তো শুধু মিঞা বিবি। ছেলেপুলের ঝামেলা নেই ফাঁক পেলোই এদিক-ওদিক বেরিয়ে পড়ে। না, না পুরী কানারক চিক্কা তাদের দেখা। এবারে ক'দিন থাকতে চায় শুধু ভুবনেশ্বরে (‘আ মার্ভেলাস টাউন, বাঙ্গালার অফ দি ইস্ট’।) শুনে প্রথম প্রতিক্রিয়া পরপর দেবারোপ ‘আরও সবাইকে ডেকে ডেকে বল আমরা থাকতে থাকতে একবার ওড়িশা বেড়িয়ে যাও, এখন নাও হেলা সামলাও।’ অতঃপর কলকাতা-ভুবনেশ্বর ক'টি এস টি ডি কল—সুব্রত, ছোটমামা, ছোটমামা-বিজয় মিশ্র, ছোটমামা-সুব্রত ও সুব্রত—গৌতম। সমস্যা সমাধান। টাটা সুমোর ব্যবস্থা হয়েছে, সবাই এঁটে যাবে। ওড়িশার আমলাতন্ত্রের সদতি পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে ঢের বেশি।

গুজবার ভোরে পুরী এক্সপ্রেসে সকলের আগমন। সন্ম মিলির স্কুল, সুব্রতর অফিস, অতিথিরা নিজেই হৈ হৈ করে বাসে যাত্রার প্রস্তুতিতে। একদিনের মধ্যে গৌতম সুচরিতার কাছের মানুষ হয়ে গেলেন অনুর ছোটমামা ছোটমামী। পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে রওনা। যদিও দুপুর ও রাতেব খাওয়ার সব ব্যবস্থা পাকা। তবুও বাড়তি রসদে বোঝাই টাটা সুমো—বিক্টি, আলু চিপস, চানাচুর, কজুরদাম, কোক মিরিভ, খাবার জল এক কারিয়ার, পেপার প্লাস, গ্রিন লেবেল চা, অমূল্য ওড়ো দুধ, চিনি, আপেল, কমলা এবং লাইমহুস কর্ডিয়েল জিন রাম হুইস্কি।

মাকুকাঘাটে নেমে এই রসদভাঙারে এবার হাত।

— কী বের করব? একে চানাচুর না চিপস? অনুর প্রশ্নে ছোটমামার তৎক্ষণাৎ উত্তর—কেক কেক।

—এই না ফুলবানিতে এত খেলে। এখনই আবার কেক খাবে। ভুঁড়িটা খেয়াল আছে? বিরক্ত ছোটমামী।

—আরে ঠাণ্ডায় জার্নিতে বিশ্রাম পায়।

দেখা গেল খিওরিটা শুধু বড়দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মিলি আর সন্ম অনেক সাধাসাধনায় ছোট এক টুকরো ভাগ করে খেল, বাকি প্রায় আশু কেঁকটাই সাবাব করে ফেলে বড়রা। এদিকে পেশোলা চায়ের অর্ডার দেওয়া হয়েছে। সকলের ঠাট্টা আগ্রহ করে সুব্রত তার কোম্পানির সিগারেট বিক্রির খবরখবর করতে চলল পানের দোকান। মিলি আর সন্ম খেলায় মাতো। অল্প খেলা। মিলি গা হাত পা দুটোয় মাথা নেড়ে গায়—নাঙ্গে পাশু হিয়ে—এ। সন্ম পাশু



অঙ্গভঙ্গি করে ধূয়ো চান— হিলে—এ হিলে—এ হিলে—এ। বার কয়েক শুনে ছোটমামী জিজ্ঞাসা করেন

—আচ্ছা এটা কী বলছে ওরা?

সূত্রত ততক্ষণে ফিরে এসেছে। অপ্রতিভ মুখে উত্তর দেয়

—আর বলবেন না, মিলিটা যা দুই হয়েছে, কিছুদিন আগে আমি কোরাপুট ট্রারে গিয়ে রাজ্য্য গাড়ি খারাপ হওয়াতে আটকে যাই। নির্জন জায়গা। কয়েক ঘন্টা স্ট্রাভেড। শেষে লোকালয়ের খবর করতে গিয়ে পড়ি একটা আদিবাসী গায়ে। সেদিন ওদের কী একটা পরব ছিল, খুব নাচ গান হুসা চলছে। ওখানে এ লাইনটা শুনি। সমানে রিপিট করছে। আমারও মুগ্ধ হয়ে গেল। ফিরে এসে এদের গল্প করেছে আর অমনি মিলি গুরু করেছে আদিবাসী আদিবাসী খেলা।

—কে বলবে সবে পাঁচ কমপ্লিট করেছে। সন্মুখ দশ ঘরের, অথচ ওর কথায় ওঠেনোস করে। বড় হয়ে যে কী গেছে মেয়ে হবে। অনুর গলায় মেহ মিশ্রিত আশঙ্কা।

—তোমাদের সকলের চা শেষ হ'ল? চল উঠে পড়ি। সামনে রোড, অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।

ছোটমামার তাগিদে সবাই চা সেরে গাড়িতে ওঠে। ছোট মামী জিজ্ঞাসা করেন

—আচ্ছা এ যে নাসে পাপু না কী বলছে, ও কথাগুলোর মানে নেই?

—হ্যাঁ হ্যাঁ মানে আছে বৈকি। আমি ওদের মুখিয়াকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। মানে হ'ল — আমাদের পাপ হচ্ছে না।

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে চলতে শুরু করেছে। সূচরিতা বলে

—স্ট্রেঞ্জ! এরকম একটা গানের কলি হয় না কি। আমাদের পাপ হচ্ছে না! সে আবার কি। আচ্ছা কোন রিচ্যুয়েল অনুষ্ঠান সঙ্গে নেই? ওরা তা এমনি এমনি গানটান করে না।

—হ্যাঁ, রিচ্যুয়েল মানে জানোয়ার বলি আর কি। গানটা তারই সঙ্গে মুখিয়া বলছিল। বাকি লাইনগুলোতে বলে জীবটি যে মারা হ'ল তার জন্য ওদের পাপ নেই, পাপ তো যে খাঁড়টা কাটছে তার, যে দড়িতে জানোয়ারটা বাঁধা তার কিন্তু নাসে পাপ হিলে—এ আমাদের পাপ হচ্ছে না।

—রাইট। এতক্ষণে পরিষ্কার হ'ল। খাওয়ার জন্য জানোয়ার মারা। আদিবাসীদের জীবনে অনর্থক কিছু নেই। নাচগান অনুষ্ঠান সবই কাজের, ফাংশনাল। প্রকৃতির মতো, সব কিছুই কাজের, মূল উদ্দেশ্য প্রাণরক্ষা বা প্রজাতিবৃদ্ধির তাগিদ।

—আর যারা সভা মানুষ প্রকৃতি থেকে তারা বড় দূরে। আমাদের সবকিছু অর্থহীন অকসেজো। এই যেমন আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে কী জামি পরাগ কী যে চায়। এ গানের তো প্রকৃতিসত্ত্ব কোনও ফাংশনাল রোল নেই। কী বল?

গৌতমের পাস্টা বন্ধুতা। আধুনিক শিক্ষিত বাঙালি দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক আদানপ্রদানের একটি স্বাক্ষর।

—দিন থাকবে থাকতে ঘাট রোডটা ক্রস করে ফেলতে পারলে ভাল হত না ছোট মামা? চারিদিকে ঘনিয়ে আসা অন্ধকার দেখতে দেখতে সূত্রত বলে। মিলিকে টিপ পরিণয়ে গলার কাছে ঘিরতে বাঁধতে অনু যোগ করে

—কী অন্ধকার। আশ্চর্য, দেখ একেবারে নিবু। পাখীটাখার ডাক পর্যন্ত নেই

—দিনের পাখীরা সব বাসায় ফিরে গেছে, রাতেই পাখীদের এখন সময় হয়নি। জঙ্গল বিশেষজ্ঞ ছোটমামা জানান।

—গান করলে হয় না? কোরাসে 'আমাদের যাত্রা হ'ল শুরু'?

গৌতমের প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ নাকচ। সূচরিতা বলল

—যাত্রা শুরু কোথায়, যাত্রা তো শেষ হতে চলেছে।

ছোটমামাও ব্যস্ত স্বরে বাধা দেন

—না না কোরাস গানটান নয়, ভাইভারের অসুবিধা হবে। একেই ঘাট রোড তার ওপর রাস্তার কন্ডিশন ভাল নয়। ওকে ডিসটার্ব কর'না। অতঃপর সবাই চুপ। দূরে তলার অন্ধকারের গায়ে এখানে ওখানে ফুটে ওঠে আলোর বিন্দু। সন্মুখ জঙ্গল দেখায়

—দেখ দেখ শুধু তলার দিকে আলো, ওপরে একেবারে অন্ধকার।

—তলায় ওগুলো আদিবাসী গাঁ। এই পাহাড়ে কোনও মানুষ থাকে না। শুধু জঙ্গল পাখী জানোয়ার। তাই আলো নেই। ওপরে উঠছি তো আমরা।

—ওপরে কোথায়? সাধারণত নীরব কর্মী সদাচঞ্চল সদা তৎপর মিলি গাড়ির ভেতর হাত পা খেলাবার সুযোগ না পেয়ে মুখ খোলে

—এক্কেবারে চুড়িয়ে। আমাদের ওপরে আর কিছু থাকবে না, খালি তারায় ভরা আকাশ। ওখানেই রাতে থাকব সবাই।

—এই অন্ধকার জঙ্গলে? সন্মুখ কষ্টসহরে উদ্বেগ।

—কেন, ভয় করছে নাকি দাদুদাই?

না না ভয় করবে কেন? অন্ধকারের আমরা সবাই কী করব?

—যার যা হচ্ছে। কেউ তো আর দেখতে পাবে না। কী মজা তাই না?

মিলি হঠাৎ গায়ে ওঠে

—নাসে পাপু হিলে—এ

সঙ্গে সঙ্গে সন্মুখ ধূয়ো — হিলে—এ হিলে—এ হিলে—এ।

অনু ধমক লাগায়। —আবার তোমারা এ বোকাবোকা খেলাটা আরম্ভ করলে?

—পাক থাক ওটাই চলুক। বিশেষ অসুবিধা তো হচ্ছে না। সব কিছু বারণ করলে হয়।

—সারাদিন গাড়িতে বন্ধ, এখন আবার বাইরের কিছু দেখার নেই। ওদের সময় কাটে কী করে।

ছোটমামা ছোটমামী একসঙ্গে নাতিনাতিস্নর পক্ষ নেন।

পাহাড়টাকে পাক দিয়ে দিয়ে ওপরে উঠছে আধ কাঁচা রাস্তা। শুধু জঙ্গল আর অন্ধকার, অন্ধকার আর জঙ্গল। আরও ঘন হয়ে আসে। গাড়ির হেডলাইট পুরো জালা। তবু বেশি দূর দেখা যায় না। দৃষ্টিটা ঠেকে যায় কৌপলতাগাছে। বাঁ দিকে খাড়া পাহাড় ডান দিকে খাদ। দুই জঙ্গলে ঢাকা। থেকে থেকে এখানেযেখানো পাথরে ঢাকা ঠেকে, সামলাতে সামলাতে গাড়ি এদিক ওদিক হেলে। সকলের মনপ্রাণ টানটান এই বুঝি পাহাড়ে ধাক্কা খেল, বা এই যে তাদের ধারে চলে এসেছে। গাড়ি যত বেশি বাঁক নেয় তত যেন বাড়ি আরোহীদের চাপা উদ্বেগ উত্তেজনা। এমন কি জঙ্গল চয়ে খাওয়া ছোটমামাও পুরোপুরি স্থির নন। মস্তব্য করেন— অন্ধকারের সময়টা বেশি মনে হয়। আসলে কিন্তু আমরা বেশিক্ষণ উঠিনি। সব মিনিট কুড়ি হ'ল মাতৃকাখাট ছেড়েছি। সঙ্গে সঙ্গে সবিস্ময় প্রতিক্রিয়া। —বলেন কি মোটে কুড়ি মিনিট।

এদিকে আমাদের তো 'মনে হ'ল যেন পেরিয়ে এলেন অন্তর্বহীন পথ' পরিহিত হান্ধা করে গৌতমে। বিজ্ঞাপন সংস্থায় হিসেবের দায়ে থেকেও তার শব্দের সঙ্গীতচর্চা বন্ধ হয়নি। সুযোগ পেলেই জানান দেয়। সুযোগা সাহধর্মিনী (হোটমামী) স্বামীর সঙ্গে সঙ্গত দেন,

— যাট রোড তো, পাক দিয়ে দিয়ে ওঠা, তাঁই মনে হয় অনেকখানি রাস্তা। তারপর তিনিও চুপ। বনজঙ্গল অন্ধকার সবাইকে গ্রাস করে ফেলে। মিলির পর্যন্ত মুখে আওয়াজটি নেই। তারা উঠছে তো উঠছে, পথ শেষই হয় না, হঠাৎ দুপুর ওপরে দেখা যায় সারি সারি আলো। হোটমামা বলে ওঠেন— এ তো, এম্মে গেলি। ওটা নিমস্র বেলঘর ফরেস্ট বাংলাে। — কী আলোর ঘটা দেখেছেন। হারিকেনে লগ্নন হাজাকে এমন রোশনাই। অবাক হয় সুব্রত, ওড়িশার অভ্যন্তরে ট্রার করবার তার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা আছে। বলতে বলতে ডাইভার ক্র্যাচ আকসেসলিটার পায়ে চেপে ধরে। এক বৌকে গাড়ি খাড়া পাহাড় বেয়ে পথের শেষ প্রান্তে এসে যেন হঠাৎ থেমে যায়। অন্ধকারে পাহাড়ের চূড়ায় আলোর মালা। সাজিয়ে দাঁড়িয়ে এক অপক্লপ নির্মাণ।

— ফ্যাক্টস্টিক। — মার্ভেলস। — দারুণ। — অবিশ্বাস্য। সুব্রত গৌতম অনু সূচরিতা উচ্ছ্বসিত। সন্ম সোৎসাহে যোগ করে

— ঠিক যেন ফোয়ার টেলসের প্যালেস, না মা?

একতলা বাংলাে ছাঁদের বাড়ি, সামনে টানা বারান্দা। মাঝখানে সিঁড়ির ধাপে অপেক্ষমান স্তিত বিনীত অভ্যর্থনা বাহিনী ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার মহান্তি, রেঞ্জার রাউত রায়। সঙ্গে বনবিভাগের স্থানীয় অধস্তন কর্মী যারা গাড়ির বৃত্ত থেকে গোটা কয়েকটা ওভারনাইট ব্যাগ ও খাদ্য পানীয়ের বিপণপার জলের কারিয়ার নামিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তৈরি। স্বয়ং চিফ কনজারভেটর অফ ফরেস্টের 'বঙগালি' গেস্ট বলে কথা।

ভেতরে পা দিয়ে সকলের মনেই, এক আওয়াজ— বা। কাঠের বাড়ি, মোকতে দিশি কার্পেট, জেলখানার সতরঞ্চি, অর্থাৎ কয়েদীসে হাতে বোনা। তাগেরই তৈরি 'সাবাই' ঘাসের খাকি দড়িতে কাঠের গ্রেম ঢাকা খাস বিলিতি ডিজাইনের সোফা সেট।

ময়ূরঞ্জ জেলার বিশেষত্ব— সেই কবে বৃটিশ আমলে কোন মেম বা সাহেবের দেওয়া নক্সা অনুযায়ী জেলে বোনা হয়ে চলেছে এত বছর ধরে। শুধু মাঝখানে রেমোনান গোলাপি সানমাইকাটপ সেন্টার টেবিলে স্বাধীনতা-পরবর্তী রুটির খাপ। শোবার ঘরে সুরু সুরু খাটে পাতলা তোষক বাগিস কদল সবের ঢাকায় গোলাপি সবুজ ফুল পাতা।

— একেবারে টিপিক্যাল ফরেস্ট বাংলাে। মস্তব্য করে গৌতম, ফরেস্ট বাংলাে সম্প্রদে যার অভিজ্ঞতা শুধু বাংলাে সিনেমা ও গল্প উপন্যাস প্রাপ্ত।

— সতি লােকালয় থেকে এত দূরে এমন চমৎকার ব্যবস্থা! ভাবাই যায় না। ইলেকট্রিক পর্যন্ত আছে। আশ্চর্য!

অনু ছেলেমেয়েদের মা। জীবনের ব্যবহারিক দিকটায় তার নজর সবচেয়ে আগে।

— না না ম্যাডাম ইলেকট্রিক কোথা থেকে আসবে, ডায়নামো চলছে। আপনাদের জন্য স্পেশাল ব্যবস্থা। তারে ব্যাৎ এয়ারোটো পর্যন্ত, তারপর বন্ধ করে দিতে হবে। ভেরি সিরি।

— এনাফ এনাফ। এখানে তো আলো থাকাকই কথা নয়। বাড়ি চার ঘন্টা সময় হাতে।

এখন তো সাতটাও বাজে নি। আপনাদের এয়ারেঞ্জমেন্ট একেবারে পারফেক্ট।

— ভুবনেশ্বর ফিরে কাইন্ডলি একটু সারকে বলে দেন যে আপনি স্যাটিসফায়ড।

কেরিয়ার সচেতন বিচক্ষণ ডি এফ ওর সময়োপযোগী অনুরোধ।

— হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়। মি: মিশ্রকে বলব বৈকি।

এদিকে লাগেজগুলি মিসে কর্মীরা দাঁড়িয়ে, সেগুলির কোন কোনটা কোন ঘরে রাখা হলে সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়। অত:পর সদলে ঘরবাড়ি পরিদর্শন। বসার জায়গার দুদিকে দুটি শোবার ঘর, লাগোয়া আধুনিক বাথরুম। পেছনে খোলা বারান্দার একাংশ ঘিরে খাবার ব্যবস্থা। নামে গিয়ে মাটির আঙিনা পেছিয়ে বর্দিবে রাস্তা ভাঁড়ার ইত্যাদি, ডান দিকে আনিয়ে আরও দুটি শোবার ঘর, আনেক্সা পেছিয়ে খোলা জায়গা। ঠিক হ'ল মেনে বিন্দিং-এর একটি ঘরে মামামামী ও অনাতিতে সূচরিতা অনু মিলি। আনেক্সের ঘর অপেক্ষাকৃত নিরেন্স, সেখানে গৌতম আর সুব্রত, সঙ্গে সন্ম। কিন্তু ঘরটি একটু বেশি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা এবং সন্মর সর্দির ধাত তাই তার আপত্তি অগ্রাহ্য করে শেষে মেয়েদের সঙ্গে চালান। আরেকটি ঘর হুইল স্টাফেদের জন্য। বন বিভাগের কেউ না কেউ তো খবরদারির জন্য রাস্তা থাকবেনই। সব জিনিসপত্র আলাদা রাখারখির পর ডি এফ ও মহান্তির সবিনয় নিবেদন

— সার একটু চা আনবে বলি

— আমরা তো মাটকাখাটে চা-টা খেয়ে তারপর পাহাড়ে চড়লাম। কী তোমরা আরেক কাপ চা খাবে না কি? খাবে তো বল। প্রধান অতিথি হোটমামা দলের নেতা হিসেবে জিজ্ঞাসা করেন।

— এরকম জমাটি শীত, এমন রোমান্টিক জায়গা, আর কী না চা খেয়ে নষ্ট করব!

— ঠিক ঠিক। সুব্রতর ইন্সটিমেন্ট প্রত্যাখ্যানে সকলের সায়।

— তাহলে চা-টা থাক এখন। ঝামেলায় কাজ নেই। তারপর মি: মহান্তি আপনাদের মিশ্রসাহেব তো বসছিলেন ট্রাইবাল ডাল দেখাবার বন্দেবস্ত থাকবে।

— সব রেডি সার। আপনারা একটু ফ্রেশ হয়ে নিলেই শুরু করব।

— চল তা হলে একটু হাতমুখ খেওগা যাক।

— এই ঠাণ্ডায়। কী দরকার বেশ তো আছি। গৌতম শীতকাতুরে।

— না না চল, সবাই স্ট্রেচস্ট্রেচ করে বসি। সেই সকাল থেকে এক জামাকাপড়ে।

সূচরিতা উঠে পড়ে। ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

— সতি তো। কলকাতা থেকে কষ্ট করে বয়ে আনা পিওর সিল্কের শাড়ি, আদিবাসীদের তো দেখা উচিত। গৌতমের স্বামীসুলভ টিপনী। এদের ছেলেমেয়ে নেই বলে নিজেরই বাচ্চাদের মতো সর্বদা খুনসুটিতে ব্যস্ত। অনু এবারে মেয়েদের দল পাকায়।

— বেশ করব। চলুন মামীমা চল সূচি আমরা খুব করে সাজি।

ওরে গৌতম তুই তো মেয়েদের দলে জয়েন করলে পারিস। তোর এ ফসসা ফসসা সোন্দর চেহারা সোনালি চশমা, আদিবাসী মেয়েরা তো তাকে পেলেই ফ্যানাচি হবে। সুব্রতর আচমকা সোমসাইড গোল।

— বা বা সুব্রতর দেখি বেশখয়ের পা দিয়েই মুড় এসে গেছে। হোট মামার স্প্রংশন মস্তব্য।

— তা তুমি নিজেও তো টাল ডার্ক আন্ড হ্যান্ডসাম। যাও না একটু পাউডার টিউডার মেখে এস না।

— আগে একবার রাসার ব্যাপারটা দেখে নিলে হ'ত, কত দূর কী করছে। বেশি ঝালটাল দিলে বাচ্চা দুটোর অসুবিধা। হোটমামী অভিজ্ঞ গৃহিণী। এখানেও হাল ধরতে চান। অগত্যা



সূচরিতা আর অনুকেও মামীমার সঙ্গে রামাঘরে যেতে হয়। ফিরে এসে রিপোর্ট — একেবারে রাজবাড়ির আয়োজন, এত চিকেন, আলু ফলকপির পাহাড়, ডেকচি ভর্তি কাটা টমাটো, রাশি রাশি পোনামাছ ভাজা, মস্ত কড়িয়ে দুধ জাল হচ্ছে, অন্য উনোনে বিশাল ডেকচিতে ডাল। সুগুহিনী অনু হতবাক— এত খাবে কে? এতো এলাহি ব্যাপার মামা। আমরা তো মোটে ছ'জন। মিলি আর সন্মু মিলে তো একজনের মতোও খায় না। ঝানু আমলা ছোটমামা ব্যাপারটা উড়িয়ে দেন।

—ও সব নিয়ে ভাবিস না। স্টাফেরা আছে, কাজের লোক, ড্রাইভার, লোক কম নাকি।

—জামাইয়ের নামে মেরে হাঁস গুটি শুদ্ধ খায় মাস।

ছোটমামী সহাস্য মন্তব্য করে তাদের ঘরে ঢুকে গেলেন।

—আমরা সাজি আর তোমরা ততক্ষণে সন্ধ্যাহিকের আয়োজন কর। সূত্রতকে নির্দেশ দিয়ে মিলি ও সূচরিতাকে নিয়ে অনুর শোবার ঘরে প্রস্থান। স্থিত বিনীত ডি এফ ও উকি মারেন।

—লোক আছে-সব দেখাশুনা করবে। আমার কি সার থাকার প্রয়োজন আছে? আপনার অনুমতি হলে আমি সার আদি?

—নিশ্চয়। প্রিজ ডোন্ট বদার। ঠিক আছে। আপনি কি এত রাতে সেই ফুলবানি ফিরে যাবেন?

—সার।

—আপনি অনেকক্ষণ আগেই চলে যেতে পারতেন। এতটা রাস্তা—

—আমরা অভ্যস্ত সার। আমি থেকেই যেতাম। কথা কী কাল একটা ফ্যামিলি ফাংশান আছে...

—না, না কিছু দরকার নেই। সব ব্যবস্থা তো করেই দিয়েছেন। থ্যাংকস আ লট। গুড নাইট।

—গুড নাইট সার। ভুবনেশ্বরে একটু বলে দেবেন সি সি এফ কে। নমস্কার।

চারিদিক তাকিয়ে সূত্রত বলে— জিনিস কোথায় খুলব বলুন তো? এটাতে বসার জায়গা, আবার যাতায়াতেরও প্যাসেজ। প্রাইভেসি নেই, বেডরুমে সরু ব্রেসিং টেবিল, এক চিলতে বেডসাইড টেবিল, ওখানেও প্লেস নেই।

—লেটস হ্যাভ ইট হিয়ার। এখানেই সব নিয়ে এস, বসি। অত কী আছে। এই জঙ্গলের মধ্যে কে দেখল না দেখল কী এসে যায়।

ছোটমামার বীধন ছাড়া আহ্বানে গৌতম হাসে।— আপনি মামা সতি আমাদের নেতা।

—বয়স হচ্ছে এখন আর এত ঢাক ঢাক গুড় গুড় ভাল লাগে না। তাছাড়া এমন কিংবা করছি? সিভিলাইজড ওয়ার্ল্ডে পারফেক্টলি নরম্যাল। এই ইন্ডিয়ান আপার কাস্ট মিডল ক্লাস হচ্ছে যত হিপোক্রিট।

মিলি এর মধ্যে ঢুপি খুলে পোশাক না পাশ্বে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। সারাদিন গাড়িতে আটকা থাকার পর এখন মহা উৎসাহে সন্মুকে হাত ধরে টেনে নিয়ে আভিমান্য চলে গেল। সেখান থেকে জোর গলায় শোনা যায়—

—নাঙ্গে পাপু হিল্লো—এ।

—হিল্লো—এ হিল্লো—এ হিল্লো—এ। সমান জোরে সনুর ধুয়া।

ছোটমামা শুনেতে শুনেত মুদু হেসে বলেন

—এ তো মিলি আর সন্মু ঠিক বলছে, আমাদের পাপ হচ্ছে না।

মেয়েরা সাজগোজ করে বেরিয়ে এল। ঠাণ্ডার মধ্যে সবাইকে কর্তিগান, শাল নিতে হয়েছে। ফলে দামি দামি শাড়ির বাহার অনেকটাই ঢাকা। টেবিলে আর সি গোস্ত রিজার্ভ, রুরিবাড, কোক মিহিগু, কিসান লাইম জুস কর্তিয়েল ও জল। বার টেবিলের ভূমিকায় সুব্রত। প্রত্যেকের রুচি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন মিশ্রণ, হাল্কা হলুদ ঝুইঙ্গি জল, মেরুন রাম আর কোক কমলা রঙের মিহিগু দেশানো জিন, খয়েরি রাম জল, সাদা জিন অর লাইম। গৌতম আলু চিপস, চানাচুর, কাভুর প্যাকেট সাজিয়ে রাখে টেবিলে।

—বাস্তাব্য কী নেবে? সন্মু মিলি এদিকে এস, মিহিগু নাও। না? আচ্ছা কোকই দাও ওদের। ওরা পেলস হাতে নিয়ে একটু চুমুক দিয়ে কাভুর প্যাকেট হাতে দৌড়। সোজা বাইরে। ছোটমামা আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু করেন

—এস, লেটস স্টার্ট। টু দিস ওয়াগারফুল ফরেস্ট,আ প্লেস অব ফ্রিডম। এখানে আমরা সবাই ভুলে যাব, সবাই স্বাধীন, সবাই সমান।

—জঙ্গলের মানুষের সঙ্গে এক। যোগ করে সূচরিতা।

চিয়ার্স-চিয়ার্স।—চিয়ার্স।

এক চুমুক দিয়ে গৌতম কিন্তু কিন্তু করে বলে

—ছোটমামা আমাদের উইশটা সেই আদিকালের লিবার্টি ইকোয়ালিটি ফ্রেটানিটি গোছের হয়ে গেল না?

ছোটমামা ছোটমামী একসঙ্গে রে রে করে গুঠে।

—আই বিলো ফলানো নয়। আঁতলেমি চলবে না। গুলি মারো ফ্রেঞ্চ রেভোলিউশান। পেছনে খাবার জায়গা থেকে সত্তপর্ণ গলাখাকরি। ছোটমামা পিছনে মুখ না ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—কিন্তু বলবেন?

—সার, ম্যাস্ত্র তৈরি, আনবে? রেঞ্জার রাউটারয়ের নিবেদন।

—ম্যাকস? ভেরি গুড, নিশ্চয়। আনতে বলুন।

দেখ না দেখ দুই বড় প্লেট গরম গরম পাকোড়া ও ছোট দুটি ডিশে ছাড়ানো চিনে বাদাম এসে গেল।

—বাস আর চিন্তা কী। নাও সবাই নাও। সূচরিতা শুরু কর। লেডিজ ফার্স্ট। অনু নে, কী নিবি। গিমি, তোমাকেই এখনো দেখলাম না।

পাকোড়ার প্লেটটি ছোটমামীর মুখের সামনে তুলে ধরেন মামা।

—আঃ কী করছ। রাখে রাখো, যে যার নিয়ে নেবে।

এর মধ্যে মিলি আর সন্মু একবার এসে দুটো গরম পাকোড়া মুখে দিয়ে উঃ উঃ করতে করতে পালিয়ে গেল। একটু বাদে এলোপাথারি ঢাক পেটোর আওয়াজ।

—সার, এরা সব রেডি। নাটচ্যা সেয়ে ওরা আবার রাতে তলায় গিয়ে ফিরবে। পেছনে রাউটারয়ের সসকোড তাতা।

—চল সবাই বাইরে যাই। লেটস ক্যারি আওয়ার জিংকস।

মেয়েরা একটু দ্বিধাগস্ত। তাদের মদ্যপান নিজেদের শ্রেণীর বন্ধুনাঞ্চলের একান্ত গণীতেই

সীমাবদ্ধ। ছোটমামী এদিক ওদিক তাকিয়ে বলেন

—আমাদেরওলা বরং এখানেই থাক, আমরা পরে এসে দরকার মতো....

—আরে দূর! কতবার উঠবে। এখানে কে কী ভালবাসে এসে যায়। এটাতো আর আমাদের নিজেদের জায়গা নয়। বনজঙ্গলে সকলে স্বাধীন। নাও, নাও সবাই যে যার ড্রিংক হাতে নিয়ে চল।

—তাছাড়া তোমরা তো কোকমিরিভা লেবুর জলের কামোফ্রাজে রীতিমতো সুব্রিতি, সুব্রত আশ্বাস দেয়।

সকলে গেলস হাতে বাইরে আসে। আঙিনার মাঝখানে বড় বড় কাঠের খণ্ড একত্র করে আগুন জ্বালানো। অগ্নিকুণ্ডের ডানদিকে দূরে সারি দিয়ে বসে একদল কালোকালো নারীপুরুষ। কোশে রাখা বাদ্যযন্ত্র — জিপসিদের মতো চ্যাটালো দুটো ঢাক, বাজাবার কাঠি। মিলি আর সন্স এদেরই কাছে ঘুরঘুর করছে। মাঝে মাঝে কাঠি তুলে নিয়ে মিলির বাজাবার চেষ্টা। মানুষগুলির মুখে প্রশংসার হাসি।

আঙনের এদিকে, অর্থাৎ রামায়ের ও মেন বিল্ডিং-এর মাঝখানে পাতা কাঁচি চোয়ার। খাবার জায়গা থেকে আনা। সবাই সেওলিতে বসে।

সূচরিতা বলে—আচ্ছা এদের ভাষা তো আমরা বুঝব না, কেউ কি একটু বলে টলে দিতে পারে?

—হ্যাঁ মাডাম, ঐ তো ওদের মুখিয়া আছে। আরে এই, হাতের ইঙ্গিতে ভাকে রাউতরায়। বছর ছাব্বিশ সাতাশের একটি সার্ভ প্যান্ট পরা ছোকরা সামনে আসে।

—এর তো খুবই অল্প বয়স, এ আবার কিসের মুখিয়া। সূচরিতার সন্দেহ যায় না।

—আজ্ঞে স্কুলে আট ন' ক্লাস পড়েছে, ওড়িয়া বোঝে, বলতেও পারে। ওই দলের নেতা। ছোটটি এসে প্রথমে দেখাল ঢাক দুটো, একটা ডাকপু, অন্যটা টাংপু, কাঠি হচ্ছে পিটো ডি। সূচরিতা ব্যাগ থেকে নোটবই বের করে লিখতে শুরু করে।

—তুমি কি এখানে ফিল্ড ওয়ার্কে এসেছ নাকি? গৌতম খোঁচা মারে।

—নো ক্রিটিসিজম। এখানে স্বামীগিরি ফল্গবে না।

ছোটমামার ধমকে গৌতম মোটেই দমেনা, বরং বলে

—বাঃ আপনারা সবাই তো বললেন আজকের রাতে নো আঁতলেমি।

—ওহে, সবচেয়ে বড় কথা ফ্রিডম, স্বাধীনতা। ও যদি দুটো কথা লিখতে চায় লিখুক, নতুন কিছু শিখতে চায় শিখুক। যার যা প্রাণ চায় কর। প্রকৃতির কোলে প্রকৃতির মতো।

—কিন্তু মামা প্রকৃতিতেই সবচেয়ে বেশি নিয়মের রাজত্ব—বংশবৃদ্ধি প্রাণরক্ষা। অনু সম্ভবত নিজে মা তাই তারই খটকা লাগে। —সেখানে স্বাধীনতা কি?

এদিকে মেয়েদের আর ছেলেদের দল আলাদা আলাদা সারি বেধে দাঁড়িয়ে। পরস্পরের কোমর জড়িয়ে সেই অতি পরিচিত ভঙ্গিমা। মুখিয়ার ইঙ্গিতে বাজনা বেজে ওঠে। সহাস্যে মেয়েরা পা ফেলে ফেলে সামনে এগিয়ে আসে, সঙ্গে গান — সারি মালি জুরি মালি।

আবার কয়েক পা পিছনে হটে—নাতে মালে দেল মালে।

অনুর প্রশংসার জবাব কেউ দেয় না। সবাই নাচগান দেখছে। শুধু সূচরিতা মুখিয়া আর রাউতরায়ের কাছ থেকে কথাগুলো লিখে নিতে ব্যস্ত। এবারে ছেলেদের দলে কোমরে হাত জড়াজড়ি করে এগোয়। সেই একই পদক্ষেপ খালি গানের কথাগুলি আলাদা—এলে দে মিচু

এলে দে রানি আবার পিছনে হটে সেই কয়েক পা—আম নেই সওপা তাতাম।

সূচরিতা খুব মন দিয়ে বানান করে লিখে যাচ্ছে। রাউতরায় দেখাভী।

—এটি হচ্ছে ওদের বিয়ের গান। মেয়েরা জিজ্ঞাসা করছে, ও বন্দুরা কনেকে টিকভাবে পৌছালে কি? সূচরিতা ইংরিজি ওড়িয়া থেকে বাংলা করতে ব্যস্ত। গৌতম আর থাকতে পারে না।

—আচ্ছা তুমি কি সিরিয়াস? ওদের ভাষা থেকে ওড়িয়া, ওড়িয়া থেকে ইংরিজি, ইংরিজি থেকে বাংলা। ক'হাত হ'ল? তাহাড়া ক্লাস এইটের বিদ্যেতে এ ছেলেটিই যে টিক অনুবাদ ছেড়েছে ধরে নিলে কী করে? —গানটার মানে হয়তো, মুরগির ছানা দে, মুরগির ছানা দে।

—সেটাই মোর লাইকালি। ছোটমামী যোগ করেন।

—তোমাদের তো কোনও অসুবিধা করছি না। সূচরিতা জেদ ছাড়ে না। সে লিখে চলে ছেলেদের উত্তর।

এদিকে নাচগান বাজনা চলছে। একই মুদ্রা, একই গান, একই বাজনা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। কিছুক্ষণ চলার পর থেমে যায়। নারীপুরুষের দল আবার দূরে অন্ধকারে গিয়ে বসে। রাউতরায় ব্যাখ্যা করে, সার, মাঝে মাঝে একটু রেস্ট দরকার।

—নিশ্চয় এদের নাচ তো প্র্যাকটিক্যালি এগ্জারসাইজ। পরিশ্রম বেশ হয়।

ছোটমামা খুব একটা মুগ্ধ মনে হ'ল না। ছোটমামী যোগ করেন

—নাচের সঙ্গে গান গাওয়াতে কিন্তু খুব মনোহর লাগে।

—একটা জিনিস খেয়াল করেছেন? একই কথা ফিরে ফিরে বলছে, একই স্টেপ বার বার ফেলছে সমানে। এক তাল এক গান একরকম পা ফেলা কেমন যেন একটা পিপিড বিন্দু আপ করে সবকিছুর বেগ যেন বেড়ে বেড়ে যায়। সিগারেট বেচলে কী হবে সুব্রত নাচগানেরও সমঝদার।

—সবাই এক রকম দেখতে লক্ষ্য করেছেন? আঙনের আভাষ মনে হচ্ছিল যেন কালো পাথরে খোদাই একসার মুর্তি। অনেকটা আগেকার দিনের সেই হালিউড ফিশ্বের আফ্রিকা। কী বল মামীমা? অনুর মুখ খুলেছে।

—হু। শুধু পরনে শাড়ি বুড়ি।

—আমরা কেমন বেমানান শিক্ষাটিক পরে আছি। উচিত ছিল সাদা ফুলসার্ট আর প্যান্ট পরা। মেমসাহেবদের মতো। আচ্ছা শুনহ, আমাদের কেবলের মহাপাত্রকে টেলিফোন করেছিলে? বলেছিল এ মাস থেকে স্টার মুভিজ আর টি এনটি দেবে। দিচ্ছে কোথায়।

—ভুলে গিয়েছিলাম। তোমাকে নম্বরটা দেব, তুমি কর। বেটাকে ধরাই তো যায় না। সব সময় বাইরে। কে একটা ছেলেকে বসিয়ে রেখেছে টেলিফোন ধরতে, না বোঝে হিন্দি না বোঝে ইংরিজি। কম্যুনিকেন্ট করাই প্রবলেম।

—আচ্ছা এই অনু সুব্রত তোমরা এখানে আবার ঘরসংসার এনে ফেললে। তোমাদের আর কিস্যু হবে না। খালি চাকরি ছেলেপুলে আর সংসার। একেবারে যানির বলদ।

অপ্রতিভ অনু সুব্রত —সরি ছোটমামা।

এদিকে সূচরিতা রাউতরায়ের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

—আচ্ছা এরা কোন জাতের আদিবাসী?

—এরা কুটিয়া বন্দ।



—এদের ভাষা তো একেবারে আলাদা মনে হচ্ছে। ওড়িয়ার সঙ্গে কোনও মিলই নেই। আমি তো একবর্ণও বুঝতে পারলাম না—বছরানেক ওড়িশাবাসে অভিজ্ঞ অনুর মন্তব্য।  
—আমরাই ম্যাডাম বুঝতে পারি না, আপনি কোথা থেকে পারবেন। এদের ভাষা হচ্ছে কুই।

মিলি কাছেই ছিল, অমনি হাত তালি দিয়ে 'কুই কুই কুই কুই' বলে আঙনের চারদিকে দৌড়তে লাগল, সন্মুখের পেছন পেছন।

রাউতরায় আরও বলে, বড় ব্যাকওয়ার্ড জাত, খুব গরিব। চাষবাসই ঠিকমতো শেষে নি, হাতের কাজও জানে না, বাবসত্যিবাষ তো দূরের কথা। একেবারে প্রিমিটিভ।

—চলে কী করে? গৌতম প্রশ্ন করে।

—ঐ রকমই চলে, সার। পুরুষগুলো সকালে উঠে দু এক ঘন্টা এটা সেটা কড়ায়, কাঠকাঠ কাটে তারপর 'শল্ল' খেয়ে নেশা করে পড়ে থাকে। মেয়েরা জঙ্গলের কাছাকাছি গায়ে গিয়ে যেতে কাজকর্ম করে যা আনে তাতেই গ্রাসাচ্ছাদন হয় আর কি।

—আহা এখানকার পুরুষদের কী সুখের জীবন। পরিবারের অমবজ্ঞ যোগাতে হয় না, শিকার পাট নেই। কমপ্লিট ফ্রিডম। এ-বা-ন-র ম'লে কক্ষ হব কী বলিস সূরত? গৌতমের প্রতিক্রিয়া

—সে লাইন কী আর আমাদের জন্য খোলা আছে ভেবেছিল। দেখগো যা এখানেও কোনও গণ্ডী কি ভেরিয়ার এলউইন এসে বাসে গেছে।

—ফাইন, ফাইন! ফের আঁতলেমি। এবারে ছোটমামীর তিরস্কার।

—সরি সরি। দাও গেলাসগুলো দাও। টাইম ফর রিনিউএল। সবাই একই জিনিস তো? অনুভূত গৌতম ও সূরতর প্রশ্নও ভর্তি ভর্তি গেলাস নিয়ে পুনঃপ্রবেশ।

—রঙগুলো একটু বেশি গাঢ় মনে হচ্ছে না? ছোট মামী সিদ্ধি। তেমনটা ঠিকমতো মেনে টেপে ঢালছ তো?

—একটু সামান্য বেশি দেওয়া হয়েছে মামীমা। আন্তে আন্তে সিঁপ করুন। নাচগানের মধ্যে তো বারবার উঠে যাওয়া যাবে না।

ছোটমামা একটু চেখে জিজ্ঞাসা করেন।

—আমারটা কি সুপারলার্জ না কি একেবারে পাতিয়াল দিচ্ছে হে?

—কী যে বলেন ছোটমামা, আপনি হলেন আমাদের নেতা, আপনার একটু আধটু বেশিভে কী আসে যায়।

এর মধ্যে বনবিভাগের কর্মীরাও মাঝে মাঝে রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যাচ্ছে। অ্যামেন্সের অবশিষ্ট ঘরটিতে। উর্ভতনের, বিশেষ করে মহিলাদের উপস্থিতিতে অশ্রুত পুরুষের পানাহার মোটেই সমীচীন নয়। অতএব

—কী রে, কী হ'ল হঠাৎ রাউতরায়ের জোর গলায় তাড়া খেয়ে নারীপুরুষের নাচিয়ে দলটি উঠে না পড়ে।

—বাবু, একটা কথা ছিল, জোড়হাতে সামনে দাঁড়িয়ে মুখিয়া, একটু খাওয়া দাওয়া না হলে—

—সত্যি, আমরা একলাই খেয়ে যাচ্ছি এটা ঠিক নয়, ছোটমামী তৎক্ষণাৎ বলেন।

—কিন্তু এদের উপযোগী জিনিসের সেকান কোথায় এই পাছাড়ে?

সূরত রীতিমত চিন্তিত।

—সব সার ওদের সঙ্গেই আছে, 'শল্ল'ই খায় এরা। আজ নাকি 'মন্তল' এনেছে। আর সঙ্গে ভাজাভুজি আমরা দিয়েছি। ওটা আপনার কাছে বকশিস নেবার ছতো।

—হা হা। বেশ বেশ। উই ডেন্ট মাইন্ড। ইন ফ্যাক্ট আমাদেরই দোষ শুধু নিজাদের পানভোজনে ব্যস্ত। এই যে এস এই নাও। এবারে আরও ভাল করে নাচ। ছোটমামার হাত থেকে টাকা নিয়ে প্রসন্ন মুখে দলে ফিরে যায় মুখিয়া। আনন্দ কোলাহল হাসি।

—এইবারে দেখবেন নাচে কেমন লাইফ আসে। পেটে কিছু মাল পড়েছে তো, এখন টাকাটাও হাতে পেল। খুশ মেজাজ।

আঙনটা ভাল মাল ধরছে। দাঁড় দুলছে শীতের শুকনো কাঠ। এই উঁচু জুলছে উঠছে তার ললকল মিশা, যেন তারায় ভরা কালচে নীল আকাশকে ছুঁতে চায়। বাজনা বেজে ওঠে। পুরুষ ও নারীর দল সহাস্যে এগিয়ে আসে। আঙনের আভাষ চারিদিকে লালচে রঙ যেন স্টেজে লাল স্পট লাইট পড়েছে নাচিয়েদের ওপর। সব তামাটে বাদামি মুখ হাত পা—ক'পা এগোয় মেয়েরা সঙ্গে সময়েত গান—সরি সারি জুরি মালি। আবার ক'পা পেছোয়—নাতে মালে দেল মালে। ছেলেদের দল এগোয়—এলে দে মিচ এলে দে রানি। আবার ক'পা পেছোয়—আম নেই সওপা তাতাম।

সূরত দেখতে দেখতে হঠাৎ রাউতরায়কে বলে

—মুখিয়াকে জিজ্ঞাসা করুন তো আর কোনও নাচ, অন্য কোনও গান জানে কি না।

রেঞ্জার এক গাল হেসে বলে—না সার ঐ একটাই নাচ ওদের।

—তবু একবার জিজ্ঞাসা করুন না। অগত্যা রেঞ্জার মুখিয়াকে ডেকে প্রশ্নটা বোঝায়। মুখিয়া তো অবাক, প্রায় বিহ্বল, এমন প্রশ্ন যে আদৌ হয় তাই সে ভাবতে পারে না। মাথা নাড়ে, না। সূরত আবার বলে—আচ্ছা অন্য নাচ না হোক, যেটা করছে তারই কোন ভ্যারিয়েশন মানে বৈচিত্র্য সম্ভব তো? একটা নতুন পা ফেলা, নতুন কথা একটা যোগ করা।

রাউতরায় রিলে করে মুখিয়াকে। সে কেমন হতভম্ব। নতুন পা ফেলা? নতুন কথা বলা? অপ্রতিভ মুখে মাথা নাড়ে, না। সূচিচিটা এতক্ষণ দর্শক ছিল এখন পরিস্থিতিটা একেবারে ঝুলে যাচ্ছে দেখে বলে

—ওরা বারবার ঐ এক নাচই নাচে, এক গানই গায়। এটা ওদের জীবনের অঙ্গ। শখ মেটানো নয়, প্রয়োজন। সেই কবে কোন কাল থেকে করে আসছে।

—স্ট্রেঞ্জ, সূরতর ছোট মন্তব্য।

এদিকে কিছু খাদ্যপানীয়ের ইন্ধন পড়ায় নাচিয়েদের দারুণ জোশ এসেছে। কোমরে হাত জড়ানো তরুণ তরুণীর সারি দুটি গানের ভালে তালে এক দুই তিন পা ফেলে সমানে এগিয়ে আসে আঙনের দিকে, আবার তালে তালে পিছিয়ে যায় অন্ধকারে। আসে, ফিরে যায়, ফিরে যায় আবার আসে। আঙনের আলোয় হাজার হাজার বছরের একটা আদমি চলন্ত চিত্র। চিরকাল একই ভঙ্গি একই পদক্ষেপ একই সঙ্গীত। বহুৎসবের অনাদিকে নিত্য নূতনের সন্ধানে নিবেদিত মনপ্রাণ আধুনিক মানবমানবী। যেন দুটি ভিন্নকালের মানুষ একটা স্থানে মুখোমুখি।

—দারুণ দম এদের বলুন। গৌতমের সপ্রশংস মন্তব্য।

—দেখছ কেমন ফিট। এতটুকু চর্বি নেই। অনু পেটটা পিঠে সাঁটায় নিতে চেষ্টা করে।

—ওরকম নাচলে আমরাও ফিট থাকতাম। ছোট মামীর জবাব।

— দ্যাটস ইট। কাম লেটস অল ডাঙ্গ। চলতো সকলে নাচি।

হেটোমামা উঠে দাঁড়ান। তাদের মুখের কথা না বুঝলেও শরীরের ভাষা বুঝতে নাচিয়েদের জুল হয়না। খিল খিল হাসতে হাসতে দল ভেঙে কয়েকজন যুবতী হেটোমামার দৃ হাত টেনে ধরে নিজেদের মধ্যে নিয়ে চলে। বাকিরাও হাসলে।

— সুবত গৌতম তোমাদের মামাকে সামলাও। হেটোমামীর জরুরি নির্দেশে দুজনেই এগিয়ে যায়। এবারে অন্যমেয়েরা তাদেরও দুহাত ধরে ফেলে। অগত্যা এদের সামলাতে অনু ও সূচরিতার উত্থান।

— মামীমা চলুন আমরা যাই।

বাড়তি ছ জনকে নিয়ে মেয়েদের সারি এখন বেশ লম্বা। সবাই হাসছে বাজনা বাজছে জোরে। গলা খুলে গাইছে মেয়েদের দল— সারি মালি দুরি মালি। অজানা ভাষাকে ছাপিয়ে যায় সুরছন্দতাল স্পর্শ। সম্মিলিত আদিম শক্তির আকর্ষণে সুসভা নাগরিকের দেহমনের সুনিয়ন্ত্রিত আড়ম্বৃত্য ভেঙে চুরমার। তাদের বলিষ্ঠ বাহুর বন্ধনে গানের তালে আপনিই অনভূত পা পড়তে থাকে আদিম অকৃত্রিম নাচের পদক্ষেপে। সবাই হাসছে, সবাই মত্ত। বেথার প্রয়োজন নেই। নাতে মালে দেল মালে সবাই গাইছে। আদিবাসী পুরুষের নির্ভেজাল দলটির অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ কণ্ঠে প্রত্যুত্তর, এলে দে মিচু এলে দে রানি। তবে তাল রেখে এগিয়ে পেছিয়ে আসে। সকলের দেখাদেখি সন্ ও মিলু পরস্পর কোমর জড়িয়ে দিকি তাল মিলিয়ে এগিয়ে পেছোয়।

সারি সারি মানুষের ঢেউ এসে ভেঙে পড়ছে আবার ফিরে যাচ্ছে। ঘন কালো অন্ধকারে নির্জন পাহাড়ের চূড়ায় আদিম আর আধুনিক জগতের মধ্যে কোনও বাধা নেই। আঙনের আঙায় সকলের মুখ এক, যেন দেলের দিনে লাল আবারে ঢাকা পরিচিত মুখের নতুন অজানা রূপান্তর।

হঠাৎ বাজনা বন্ধ হয়, নাচতে নাচতে পা যায় থেমে। গান শেষ। মেয়েদের দল হেসে যাচ্ছে, হাসে সুবত গৌতম সন্ মিলি সূচরিতা অনু হেটোমামা হেটোমামী। হা হা হা হি হি হো হো হো। আদিবাসী পুরুষের দল অন্ধকার খোঁবে বসে পড়েন। তাদের মুখে মুদ হাসি, চোখের দৃষ্টি অর্থহীন, কাচের মত চকচকে অথচ অর্থহীন। হঠাৎ একটি মেয়ে দল থেকে বেরিয়ে এসে গৌতমকে জড়িয়ে ধরে দুগালে চুমু খেতে শুরু করে। বাকি মেয়েরা খিল খিল হেসে গড়িয়ে পড়ে। গৌতম এক মুহূর্ত খতমত খোঁবে মেয়েটিকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। হন হন ক'রে আঙিনা পেরিয়ে চলে যায় বাওয়ার জায়গায়। বেসিনের কল খুলে মুখে জলের খাপটা দিতে থাকে। এক ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে ডাকে, — সূচি, বসে আছ কেন, সাবান দাও সাবান।

— কী হে আজকালকার ইয়াং ম্যান, একটা জোয়ান মেয়ে নিজে থেকে তোমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে আর তুমি কি না সাবান চাইছ! তোমাদের প্রবৃত্তি টুণ্ডিগুলো গেল কই? হেটোমামা চেয়ারে বসতে বসতে বেশ জোর গলায় বলেন।

— সব আছ হেটোমামা সব আছ। বন্ধুর হয়ে জবাব দেয় সুবত। তবে প্রবৃত্তি প্লাস। প্লাস কলগেট টুপপেট মাইসোর স্যাভাল সাবান সামসিফ শ্যাম্পু। হা হা হি হি হি হো হো হো। হি থামিয়ে সূচরিতাকে ধমক দেন হেটোমামী।

— এই সূচি তুমিই বা কেনমন স্ত্রী। তোমার স্বামীকে একটি মেয়ে তোমারই চোখের সামনে সিডিউস করছে আর তুমি কিনা হি হি করে হাসছ?

— তেরো বছর বিয়ে হয়েছে মামীমা। টাইম ফর আ ব্রেক। বিবাহের পরবর্তী অংশ বিরতির পর। হি হি হো হো।

গৌতম গম্ভীর মুখে তোলোলেত মুখ মুছে বেরিয়ে আসে।

— এদের পুরুষগুলো কি হিজড়ে না কি। মেয়েদের সামলাতে পারে না।

— বোধ হয় 'অরগোর দিনরাত্রি' দেখেছে। হেটোমামী সবর ওপরে টেক্সা মারলেন। হা হা হি হি হি হো হো হো।

সকলের আনন্দ দেখে সোহাসহে মিলি গেয়ে ওঠে।

— নাদে পাপু হিয়ে—এ হিয়ে—এ।

সদে সদে সনুর ধুরো — হিয়ে—এ হিয়ে—এ হিয়ে—এ।

— ঐ তো ঠিক কথা। মেয়েটার কী দেখ। যে হাত জড়িয়ে ধরেছে তার পাপ, যে টোট ছুঁয়েছে তার পাপ। মেয়েটার কো-ও-নো পা-প হচ্ছে না। আজকে সুবির মিরিভা আর জিন মিশ্রণের পরীক্ষাটা সাংঘাতিক কার্যকরী মনে হচ্ছে।

— এরা কী ফুল অফ লাইফ বলতো। আর মেয়েদের কী ফ্রিডম। যা প্রাণ চায় তাই করে। কোনও ইনহিবিশান নেই। জাস্ট লাইক নেচার। সুবতর স্বরে স্পষ্টত মোহিত।

— আচ্ছা আদিবাসী পুরুষরা কই ওরকম লাইভলি মনে তো। মেয়েরা দিবা তোমাদের হাত ধরে নিয়ে গেল, কোমর জড়িয়ে নাচতে লাগল। আর পুরুষের দল দেখ, আমাদের ছুঁতেই পারল না। আমাদের ধরে নাচা তো দূরের কথা আমাদের কাছাকাছিই এল না। এরা এত আড়ম্ব কেন?

দুটি সন্তানের মাতা অনুর গলায় পরিষ্কার কোভ অসন্তোষ।

— তোমরা যাও না, টেনে নাও কয়েকটাকে। বার বারকে হচ্ছে। গো অ্যাহেড গো অ্যাহেড। গিমি, তুমি এদের নেত্রী, তুমি এদের লিড নাও না। দেখ দেখ কোনটাকে পছন্দ। হেটোমামার উদার প্রস্তাবে মামী বিরত—

ফাজলামি ক'র না। সুবত তোমার মামাকে কটা দিয়েছ? আর নয়। মামী বাড়িয়ে যাচ্ছে।

— বেশি দিই না মামীমা, সতি বহলিছ।

এদিকে অনু আর সূচি নিচু গলায় আদিবাসী পুরুষের অতিরিক্ত মদ্যপান ও মোক্ষম কোনও কর্মে অনীহাধর মধ্যে সম্ভাব্য যোগসূত্রের আলোচনায় মাতো।

— এদের কি ম্যাট্রিয়ালি নাকি? এতক্ষণে ধাতস্থ গৌতমের প্রশ্ন। রেঞ্জার রাউটারায় ও বনভাগের কর্মীরা যারা এতক্ষণ এদের উদ্দাম নাচনামা চূড়নের সময় অশ্রবজনকভাবে নিজেদের অদৃশ্য করে ফেলেছিল তারা এখন মস্তবলে হাজির হয়ে গেছে। সসঙ্গ্রহ দূরত্ব থেকে রাউটারায় জানায়।

— না সার পুরো প্যাট্রিয়ালি। পলিথ্যামিও আছে। ওদের বিয়ে হচ্ছে বর পছন্দকরা মেয়েটিকে জোরে হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় পিছন পিছন সবাই তাড়া করে। আগে থেকে সব ঠিক করা থাকে। ওটা একটা অমুঠান।

— অর্থাৎ পুরুষ বাহুবলে নারীটিকে জয় করেছে। প্রান্তবাসী মানুষের সেবায় নিয়োজিত এন জিও কর্মী সূচরিতার ব্যাখ্যা।

সুবত আর গৌতম এবারে হাসতে শুরু করেন।

— পুরুষের বাহুবল! এদের আবার পৌরুষ। তার আবার খামচা! হা হা হা হো হো হো।



যত সব অর্থহীন অনুষ্ঠান। আবসর্গ। মেয়েরা তো এদের গ্রাহ্যই করে না, কমপ্লিট ফ্রি।  
মামীমা হঠাৎ বলে ওঠেন

— ঘন্টার ফ্রিডম। কী আমার স্বাধীনতা! এবারে ওঠোতো সব অনেক হয়েছে। খাওয়া দাওয়া করা যাক। রাত মন্দ হল না। বাচ্চা দুটোকে এখন খাইয়েদিয়ে শোয়াতে না পারলে আজ আর ঘুমবে না, বাঘুচড়া হয়ে যাবে।

বলতে বলতে ছোটমামী একেবারে চেয়ার ছেড়ে দৌড়ে দাঁড়া।

— না, না, কী যে বল নাইট ইজ স্টিল ইয়াং। বোস বোস। কেন বাগড়া দিচ্ছ বলতো। বেশ তো সবাই এনজয় করছি।

— মামীমা, মামার কথাটা কিন্তু কন্সিডার করার মতো। সূর্যত চেষ্টা চালিয়ে যায়। সমস্ত আপত্তি অগ্রহা ক'রে ছোটমামী অনু ও সূচরিতাকে নিয়ে রান্নাখাবের দিকে এগোন। একটু পরেই ফেরৎ।

— রান্না হয়ে গেছে, খাওয়ার সব তেমনি পড়ে আছে, লোকজন কোথাও নেই। ভাগ্যে এখানে কুকুর বেড়াচ্ছে নেই, থাকলে সব নষ্ট হ'ত। যাক এখন ওঠ দেখি লোকজনের ডাক, টেবিলে সব লাগাক। আমরা মেয়েরা একটা আসছি। শোওয়ার ঘরের লাগোয়া বাথরুমের দিকে চললেন। একটু পরেই প্রায় সোজতে সোজতে অনু আর সূচরিতার প্রবেশ।

— একটাও ড্রিংক নেই টেবিলে। তোমরা কি বোতলগুলো সব উঠিয়ে দিয়েছ নাকি? লাইম জুস কর্তিয়েলের খালি বোতল মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। এত লাইমজুস কে খেল? ব্যাপারটা কী?

— এ আবার কী! কই আমরা তো বোতল ওঠাই নি। চল তো দেখি। বিস্মিত সূর্যত ও গৌতম উঠে পড়ে। মামা মন্তব্য করেন

— অনুত তো।

গৌতম সূর্যত ফিরে আসে।

— আশ্চর্য! আমাদের দুজনের পরিদ্রাবর মনে আছে সেন্টার টেবিলে বোতলগুলো রেখে এসেছিলাম। সব বোতলেই প্রচুর ছিল। আধাবোতল ইইফি, তিনভাগের এক ভাগ রাম আর এতকিউ জিন খরচ হয়েছে। ঘরগুলোও দেখলাম যদি মনের ভুলে কেউ রেখে থাকি। কোথাও নেই। সবচেয়ে আশ্চর্য লাইমজুস কর্তিয়েলের ব্যাপারটা। পুরো বোতল ছিল এখানে খোলা হ'ল। এক আঙুল বোধহয় খরচ হয়েছে। শুধু তো মামীমা নিশ্চিন্ত। আর পুরো বোতলটা খালি!

এবারে ছোটমামা ওঠেন। হাঁক ডাক।

— টোকিদার, এই টোকিদার। বাইরের দিকটা তো খালি পড়েছিল। আমরা তো সবাই এখানে আউন।

সূর্যত আর গৌতম আউট হাউসে খবর করে এসে জানাল, টোকিদার, রাঁধুনি, হেলপার, ড্রাইভার সবাই নেশায় চুর। টোকিদারের নাক ডাকছে, রাঁধুনি আউট। অনু এবং সূচরিতার 'ওমা কী হবে কী কাণ্ড' ইত্যাদি সামলে আমলাপত্নী বানু গৃহিনী ছোটমামী হাল ধরেন।

— চল চল আমরাই বেড়ে টেড়ে নিই গিয়ে। রান্না তো হয়ে গেছে। ওদের ভরসায়া থাকার দরকার কি।

— ঐ বেটারাই আমাদের ড্রিংকের বোতলগুলো শেষ করে ফেলেছে। লাইমজুসটাকে

বোধহয় মাল ভেবেছে। এরকম অভিজ্ঞতা আমার এত বছরের চাকরি জীবনে হয় নি। হয়তো আমরা বাইরের লোক বলে এরাও নিজেদের ফ্রি মনে করেছে।

ছোটমামার এখন নেশাশো মাথায় উঠেছে। প্রায় স্বাভাবিক। ছোটমামী বিরক্ত মুখে বলেন

— আর ফ্রি ফ্রি ব'ল নাতো। কিসের থেকে ফ্রি আর কিসের জন্য ফ্রি? যত সব কেলোর কীর্তি।

— ইস আমাদের ক'দিনের রসদ! গৌতমের মনে পড়েছে সে আকাকউন্স ভিরেক্টর। হিসেব রাখা তার কর্তব্য। তার পর যোগ করে

— জুসলের বাসিন্দা তো, সরল আদমি, আমাদের মতো আপন পর ভেদ নেই। সূচরিতা মানবার পাত্রী নয়।

— দেখ টোকিদার রাঁধুনি আদিবাসী কি না জানা নেই। খুব সম্ভবত না। ওরা দেখবে টিক প্লেইনসের লোক। আদিবাসীরতো নিজেদের ড্রিংক এনেছে। শুনলে তো কী যেন হ্যাঁ 'মহল'। ঐ তো সব ঐ কোণে বসে আছে। অন্ধকারে জটলার দিকে হাত দেখায় সূচরিতা।

— সূচি টিকই বলেছে। এদিকে তো ওরা ছিলই না। নিশ্চয়ই এই বাংলার স্টাফদের কীর্তি। ছোটমামী সায় দেন।

— থাক থাক ওসব ভেবে লাভ নেই। ফরেস্টের লোকদের ডাকি।

তার আবার আনেন্সের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। সূর্যতর ডাকে বেরিয়ে এসে কাজে লাগে। খাবার দবার আনা হয়। মুরগিটা ধরে গেছে, মাছে নুন পড়ে নি। আলুফলকপি আধকাঁচা আধপোড়া। বন বিভাগের কর্মীরা অপ্রস্তুত। জোর করে ধরে আনে প্রধান দৌষী রাঁধুনি। সে তো কোনও ক্রমে টলে টলে দাঁড়ায়, স্থির থাকার ক্ষমতা নেই, চোখ আধরোজা, হাত জোড় করে বলে

— আইজ্ঞা আমে মদমুলা লোক অ আইজ্ঞা। ফেনা দেবে। ছোটমামা হাতের হৃদিত্তে ওকে চলে যেতে বলেন। ছোটমামী স্বামী পাশে।

— টিক আছে টিক আছে একটা রাত চলে যাবে। অনু, যাও তো ফল আর আলু চিপসগুলো নিয়ে এস। বাচ্চাদের দাও।

মামা বলেন— আজকের রাতে সব কিছু ক্ষমা। কী বল। যা আছে এস তাই এনজয় করা যাক।

থেকে উঠে ঘরে যেতে যেতে এগারোটা বাজে বাজে। আউনায় কাঠগুলো প্রায় জ্বলে শেষ। নাচিয়ে গাইয়েদের মুদ্র কোলাহল, তাদের পানাহার চালু রয়েছে। অনু জিজ্ঞাসা করে

— এরা নাকি তলায় গিয়ে ফিরে যাবে? এই অবস্থায় যাবে কী করে? ড্রাইভারের কীর্তি তো শুনলে।

— আরে ওদের ভাবনা ওদের ভাবতে দাও। এবারে আলো নিভবে। তার আগে যে যার ঘরে চল। ছোটমামী শক্ত হাতে সবাইকে চালিত করেন।

— ইট ওয়াজ আ ওয়াডারফুল নাইট।

— সত্যি অবিশ্বাস্যবী।

— শেষটা আরও মজার।

— থ্যাংকস টু ছোটমামা, দারুণ লাগল।

— ওট নাইট, — ওড না ইট, — ওড নাইট।

মিলি মায়ের সঙ্গে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বলে ওঠে,

— নাঙ্গে পাপু হিলে—এ

সনুও ফিসফিস করে, — হিলে—এ হিলে —এ হিলে —এ। সকলে হাসে। ঠিক বলেছে। হা হা হা।

গৌতম আর সুব্রত আনন্ডে আসে তাদের নির্দিষ্ট ঘরে।

— কী একখানা রাত বলতো। মিলি আর সনু এই দুটো বাজা ছাড়া এই গোটা পাহাড়ে সবাই মাতাল। হা হা হা। সকলে শুয়ে পড়ে। বলতে বলতে আলো নিভে গেল। কোনক্রমে জুতো মোজা গরমজামা ছেড়ে হাতড়ে হাতড়ে আন্দাজ মত ঠিক জায়গায় রেখে দুজনে শুয়ে পড়ে।

খানিক বাদে আধো ঘুমের মধ্যে গৌতম বলে

— সুব্রত আই সুব্রত বাইরে কে যেন টোকা দিচ্ছে।

— দূর। কে টোকা দেবে। ঘুমজড়ানো স্বর সুব্রতর।

— না রে ঠিক মনে হল।

— তুই দেখ গে যা। আমি উঠছি না।

গৌতম ওঠে। অন্ধকারে সাবধানে ছিটকিনি নামিয়ে দরজাটা অল্প ফাঁক করে। বাইরের ঘন অন্ধকার। নিভন্ত অগ্নিকুণ্ডের আগুনে স্নান আভাষ একটি নারীমূর্তি। উঠে এসেছে বারদায়া। টলে টলে হাসছে। তাকে দেখে হাত বাড়িয়ে দেয়।

হাজার হাজার বছর ধরে যেমন বাড়িয়ে দিয়েছে নতুন কিছু তো জানা নেই।

## ওয়ানছা

গোপালকৃষ্ণ রায়

উঠানে পা দিয়েই সুরেন জামাতিয়া সুর ক'রে ডাকে, সুরি—

ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে সুগন্ধা। তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে সুরেন হাসি হাসি মুখে বলে, শোন বিধিকে (বেউ) নাথ মশাই রাজি হয়েছে। তোমার বুজাছুককে (মেয়ে) সামনের রবিবার দেখতে আসবে।

আগর গাছের নিচে একটা মোড়া টেনে নিয়ে সুরেন বসে। কুড়ি ফুট উঁচু টিলার উপর তার বাড়ি। চারদিকে চারটি বড় খর। টিনের চালা। মূলি বাঁশের বেড়া। মাটি দিয়ে সুন্দর করে নিকানো। নখলা (উঠান) ঝকঝকে তকতকে। কোথায় একটা পাতা পড়ে নেই। পশ্চিম দিকের ঘরের পাশেই বেশ বড় গান্ডিলক (রান্নাঘর) তার পাশেই গাইনক (গোয়াল)। সেখানে গোটা চারেক গরু ছাগল।

সুরেনকে দেখেই একটা গরু হাসা করে ডেকে উঠে। সুরেন বলে, গিরি কোথায়? এখনও জাব দেয়নি?

সুগন্ধা বাজন করতে করতে বলে, নাথ মশাই রবিবার আসবেন?

সুরেন ইতিমধ্যে গায়ের পিরানটা খুলে ফেলেছে। রোমশ বুকে বার কয়েক হাত বুলিয়ে বলে, বুঝলে বিধিকে, আজকাল আর তিন মাইল হেঁটে কাকরাবন যেতে কষ্ট হয়। আমাদের এই শিলখাটিতে কেব থেকে যে বাস চলবে, কে জানে?

সুগন্ধা জানে, মানুষটা এমনি। সব প্রশ্নের জবাব ঠিকঠাক মত দেয় না। নিজের প্রশ্নও মাঝে মাঝে ভুলে যায়। অথচ শিলখাটির চৌধুরী সে। জামাতিয়াদের সবচেয়ে বড় গ্রাম শিলখাটি। গোমতী নদীর ধারে। বিশাল বড় গ্রাম। প্রায় দু' হাজার জামাতিয়ার বসবাস। তাছাড়াও আছে প্রায় পঞ্চাশ ষাট ঘর বাঙ্গালী। দেশ ভাগের পর কুমিল্লা থেকে চলে এসেছে। মাস কয়েক এখানে সেখানে ঘুরে, অবশেষে শিলখাটিতে বসতি শুরু করেছে। তাদের দরবার দেখে গায়ের চৌধুরী সুরেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। প্রথম দিকে শিলখাটির জামাতিয়ারা বসত তৈরি করতে বাধা দিয়েছিল। ওয়ানছাদের (বহিরাগত) সহজে বিশ্বাস করতে চায়নি তারা। এই নিয়ে জামাতিয়ারা অনেকবার সুরেনের কাছে দরবার করেছে। তারা বলেছিল, ওয়ানছারা বরক (মানুষ) ভাল নয়। দেখছো না, উদয়পুরে প্রায়ই গণ্ডগোল হচ্ছে। আমাদের গায়েও ঘেট পাকাতো পারে।

সুরেন বলেছিল, ঘরছাড়া মানুষওলো কোথায় যাবে? আর আমাদের কি-ই বা ক্ষতি করবে, বল?

— ভবিষ্যতের কথা ভাব। ওদের বুঝাবুঝি (সম্ভানসত্তি) তারা কি আমাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে পারবে, পারবে না।

সুরেন যে এ সব কথা ভাবেনি তা নয়। তবুও তাদের বুঝিয়েছিল, ওদের ছেলেমেয়েরা আমাদের ছেলেমেয়েদের বন্ধ হয়ে যাবে। একসঙ্গে পড়বে, খেলবে, ইচ্ছুক যাবে। অবশ্য পরে আর কেউ অমত করেনি। জমির দামও বাঙ্গালীরা ভাল দিয়েছিল। তারা টিলার উপর বাড়ি করেনি। সমান জমিতে চারচালা টিনের ঘর তুলেছে। কেউ কেউ দালানও করেছে। সুরেনও



পাচকানি জমি বিক্রি করেছিল। সবই চাষের জমি। বাঙ্গালীরা মাটি ফেলে জমি উচু করে, তার উপর ঘর বানিয়েছে। সুরেনের টিলার নিচেই ঘর তৈরি করেছিল, বিভূতি দাস। সুরেনের সমবয়সী। বিভূতির সঙ্গে ছিল তার মা বাবা আর স্ত্রী।

সুগন্ধা তালপাতার পাখাটা নখলার (উঠোন) উপর রেখে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। সুরেন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলে, সুমি কোথায়।

সুগন্ধা জবাব দেয় না। সুরেন বলে, আমার কথা না শুনেই তুমি চলে গেলে যে বড়। আজকাল দেখছি আমাদের কেউ গ্রাহির মধ্যেই আসছে না। এঁা, ব্যাপারটা কী?

সুগন্ধা এক ঘটি জল নিয়ে আবার ফিরে আসে। সুরেনের সামনে জলের ঘটিটা রেখে আবার পাখাটা হাতে তুলে নেয়। সুরেন বলে, উজ্জ্বল স্কুলে গেছে?

সুগন্ধা নাথ মশাইর কথা শোনার জন্য উদ্দীপ্ত, অথচ সুরেন তার প্রথম কথায় কিছুতেই ফিরে আসছে না। সে জানে, বার বার জিজ্ঞাসা করেও, নাথ মশাইর কথা শোনা যাবে না। তার কথা শুনেও তাকে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

সুগন্ধা বলে, উজ্জ্বল তো ইচ্ছুক গেছে। কাল থেকে ওর পরীক্ষা। কেরাচি (কেরোসিন) এনেছো?

— হ্যাঁ। কিছু ভালো মাইকিও এনেছি।

রবিবার দিন নাথ মশাইরা তো এখানেই খাওয়া দাওয়া করবে।

— ভালো মাইকি (চাল) তো ঘরেই ছিল। তার চেয়ে দুটো বড় তগমা (মুরগী) আনলেই পারতো।

সুরেন বলে, সব ঠিক করে এসেছি। নিমু ফেরার পথে নিয়ে আসবে।

সুযোগ বুঝে সুগন্ধা বলে, নাথ মশাইরা ক'জন আসবে।

সুরেন বলে, বললো তো চারজন। তার বিহিকও (স্ত্রী) আসবে নাকি?

— সে তো আসবেই। তার বুচামারিও (জামাই) আসবে।

সুরেন ঘটি থেকে ঢক ঢক করে খানিকটা জল খায়। বার দুই রোশম বুক হাত বুলিয়ে সুমি কোথায়?

সুমি যে গাইরিঙ (টং ঘর) গেছে সে কথা সুগন্ধা চোপে যায়। গাইরিঙের কথা শুনেই মানুষটা চোঁচামেচি গুরু করে দেবে। এইমাত্র তিন মাইল পথ চোঁড়িয়ে কাকরাবন থেকে ফিরলো। ইচ্ছা করলেই মানুষটা রিক্সায় যেতে পারতো। কিন্তু যাবে না। পয়সার জন্য নয়, রিক্সায় উঠলেই নাকি তার ভয় করে। যা রাস্তা! রিক্সাওয়ালা তো সারাটা পথই হেঁটে হেঁটে রিক্সা টানে। সুগন্ধাও একদিন সুমিকে নিয়ে রিক্সা ক'রে কাকরাবন গিয়েছিল। একটা চাকা গর্তে আটকে গিয়েছিল। আর একটু হলে, রিক্সাটি উল্টে যেতো। বাক্স! তারপর থেকে সে আর কোনওদিন রিক্সায় যায় না। সুমি আবার রিক্সা ছাড়া যায় না। সে বলে, আমি চৌধুরীর মেয়ে না, আমি হেঁটে যাব কেন? সুগন্ধা বুছাইর (স্বামী) মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, হয়তো মারের (বান্ধবী) বাড়ি গেছে। এখুনি আসবে।

সুরেন খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়। বলে, মেয়েটার বিয়ে দিতে পারলে, বাঁচা যায়। বয়স তো প্রায় এককুড়ি হল।

সুগন্ধা বলে, নাথ মশাইকে সব বলেছো তো? সুরেন জবাব দেবার আগেই, সুমির গান কানে আসে। গান গাইতে গাইতে টিলার সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠছে সে।

“তাবুক তেই লেরালিয়া, রমদি লরক, যাক বায় যাক রসদি”

তিনি নিজেই লামা ফির গনা নাঙানাই বাসকাও মিলিনা স্বর্গ।”

(এখন আর দেবী নাম ধরগো তোর হাতে হাতে ধরগো। আজ আপন পের ফিরতে হবে সামনে মিলন স্বর্গ।)

সুমির গান শুনেই দু'জনে চুপ করে। উঠোনে উঠেই সুমি বাবাকে জড়িয়ে ধরে। বলে, কখন ফিরলে, বাবা।

সুরেন মেয়ের মুখের দিকে তাকায় না। সে দুয়ের একটা টিলার দিকে তাকিয়ে থাকে। সুগন্ধা আবার রান্না ঘরে ফিরে যায়।

সুমি বলে, আনমা (মা), আবার তুমি গানভিনকে (রান্নাঘর) যাচ্ছে। ডাক্তার না তোমায় বারণ করেছে।

সুরেন এবার কিছু বলার সুযোগ পায়।

সে টিলার দিকে দৃষ্টি রেখেই স্বগতোক্তি করে,

— আর কেউ যদি এই কাজগুলো না করে, তাহলে তো লুমাকেই (তোর মা) করতে হয়।

সুমি ফিক করে হেসে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে। সুরেনও মেয়েকে পাশে বসিয়ে আদর করে বলে, কোথায় গিয়েছিলি, মা?

সুমির পরনে রেগনাই, গায়ে ব্লাউজ, তার উপর সুন্দর ফুলতোলা একটা রিছ (বক্ষবন্ধনী) গলায় রংকুটান (রূপার টাকার মালা), দু'হাতে দুটো বোয়াতি (বালা)।

বটতলায়। তারিনী কাকী পূজো দিল। আনমাই তো আমাকে যেতে বললো।

সুরেন বলে, খুব ভাল করেছো। ওই বটগাছের মধ্যে স্বয়ং শিব থাকেন। বটগাছটা কি আজকের। তোর চুচর চুচো ওই বটগাছটাকে ওইখানাই দেখেছো। ওই বটগাছের মধ্যে শিব অবস্থান করেন। তাকে বাইরে থেকে দেখা যায় না। ভক্তি ভরে যে যা কামনা করে, সে তাই পায়।

— সামনের শিব চতুর্দশিতে আমি কিন্তু ওখানে পূজো দেব, বাবা।

সুরেন বলে, নিশ্চয়ই। তোর মায়ের সঙ্গে যাবি।

দাদাকেও নিয়ে যাব। — সুরেন বলে, খুব ভাল কথা। কিন্তু উজ্জ্বল কি যাবে?

— হ্যাঁ বাবা, আমি বললেই যাবে।

সুগন্ধা আবার ফিরে আসে। তুমি তুইছায় (ছোট নদী) যাবে না? বেলা যে গড়িয়ে এল।

— হ্যাঁ যাই।

সুমি পাশের ঘরে যায়। সুরেন ভাবে, রবিবার দিন যে নাথ মশাই আসবে, সুমিকে বলা দরকার। আবার ভাবে থাক, পরে বললেই চলবে। হাতে তো এখনও দু'দিন সময় আছে। বরং আগে উজ্জ্বলের সঙ্গে একটু পরামর্শ করে নেওয়া ভালো। এ বছর সে উদয়পুরে কলেজে ভর্তি হয়েছে। কাকরাবনে যে কবে কলেজ হবে, কে জানে!

সুগন্ধা আবার তাগালা দেয়।

সুরেন বলে, এই যাচ্ছি। যাব, আর দুটো ডুব দিয়েই চলে আসবে।

(২)

টীলা থেকে নেমেই ডানদিকে তাকায় সুরেন। যখনই নামবে এবং যতবার নামবে ডানদিকে

পোড়া বাড়িটায় তার চোখ পড়বেই। গত কুড়ি বছরের মধ্যে এর কোন ব্যতিক্রম হয়েছে কিনা সুরেন মনে করতে পারে না। ওটা বিভূতি দাসের বাড়ি। তারই বেচে দেওয়া জমিতে বাড়ি করেছিল বিভূতি। শিলঘাটতে আরও পঁচিশ ত্রিশ ঘর বাঙ্গালী বাড়ি করেছে। প্রথমে তাদের কেউ জমি বেচতে চায়নি। পুরো জামাতিয়া পল্লীতে বাইরের লোকের বসবাস জামাতিয়ারা পছন্দ করেনি। তাদের জীবনযাত্রা আদব-কায়দার উপর বাঙ্গালীদের প্রভাব পড়বে। উদ্দেশ্য-কাকরাবনেও এইসব ঘটনা ঘটেছে। শিলঘাটের জামাতিয়ারা তাই ঠিক করেছিল, ওয়ানছাঘের এখানে বসতি গড়তে দেবে না। অনেক দরবার, সভা সমিতি হয়েছে। গায়ের “চৌধুরী” সুরেন। শেষ পর্যন্ত তারই সুপারিশ আর অনুরোধে জামাতিয়ারা বাঙ্গালীদের কাছে জমি বিক্রি করেছিল। সুরেনও বিভূতির কাছে পাঁচকানি জমি বেচেছিল।

খুব নরম প্রকৃতির মানুষ ছিল বিভূতি। তবে খুব বাচিয়েও ছিল। রাত থাকতে তুইছাতে মাছ ধরতে যেতো সে। ভোর হবার আগেই ফিরে আসতো। তারপর মাছ বিক্রি করতে তিন মাইল হেঁটে চলে যেতো কাকরাবন। প্রায় প্রতিদিনই এক সের আধ সের মাছ সুরেনের বাড়ি পাঠিয়ে দিতো। লক্ষা ঘোমটা টেনে সুগন্ধার কাছে মাছগুলো দিয়ে যেতো বিভূতির বউ — সরলা।

খুব ধীরে ধীরে কথা বলতো সরলা। খালুই শুদ্ধ মাছ রান্নাবারের বারান্দায় রেখে বলতো, তোমার ভাই পাঠিয়ে দিয়েছে।

সুগন্ধা বলতো, ভাইকে বলে, প্রতিদিন কেন মাছ পাঠায়! বসো।

সুগন্ধা তার দিকে একটা পিড়া ঠেলে দিয়ে বলতো, ভাই কাকরাবন চলে গেছে?

দিনকয়েক যাতায়াত করার পর অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল সরলা। নামলায় বসে গল্প করতে করতে কখন যে তার ঘোমটা যাড়ে নেমে আসতো, বুঝতেই পারতো না।

দু’ চারদিন বিভূতির চোখে পড়েছে। মুহূর্তের মধ্যেই চোখ সরিয়ে নিয়েছে সে। সুগন্ধা একবারটি বাঁশফুলের ডালনা সরলার হাতে দিয়ে বলতো, ভাইকে খেতে বলো।

সব বিষয়েই বিভূতি সরলার সঙ্গে পরামর্শ করতো। মাছ চাষের জন্য একটা ছড়া বান্দাবস্ত নিতে চেয়েছিল বিভূতি। সুরেন সে ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল। বিভূতি চাষ করতো না। বর্গাদারও জোগাড় করে দিয়েছিল সুরেন। এমনি করেই দুই পরিবার পরস্পরের আপন হয়ে উঠেছিল।

তুইছার ঘাটে বসে এসব কথাই ভাবছিল সুরেন। মান করার কথা ভুলেই গিয়েছিল সে। এই বিভূতির মেয়ে সুমি। রবিবার কাকরাবন থেকে নাম মশাই তাকে দেখতে আসবে।

সুমি ছুটতে ছুটতে তুইছার ঘাটে এসে হাজির।

—তুমি এখনও নাওনি? এতক্ষণ বসে বসে কী করছিলে?

—ও তাই তো! কি যেন ভাবছিলাম সে, মা। তুই যা, আমি দু’টো ডুব দিয়েই চলে আসছি। সুমি বলে, না, আমি দাঁড়াছি। তুমি ডুব দাও। বাবার পাশে হাঁটতে হাঁটতে সুমি বলে, ক’দিন থেকে তুমি কী ভাবছো, বলতো বাবা?

সুরেন, ভিজ়ে গামছা গায়ে জড়িয়ে বলে, ক’খন আবার কি ভাবলাম? — ঘাটে এতক্ষণ কী করছিলে? আনমা কখন ভাত বেড়ে বসে আছে।

টিলা দিয়ে উঠতে উঠতে আড়চোখে পোড়ো বাড়িটা এক বলক দেখে নেয় সুরেন। সুমি বলে, তুমি যে বলছিলে, বাড়িটায় ভূত থাকে, কই একদিনও তো দেখলাম না।

সুরেন সুমির মুখের দিকে তাকায়। বলে, আমাদের কাউকে ভূত দেখা দেবে না। কাউকে ভয়ও দেখাবে না।

সুমি বলে, বাড়িটা বিভূতি বাঙ্গালের ছিল, তাই না বাবা।

সুরেন মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে বলে, বাঙ্গাল বলে না মা। ওরা আমাদের আত্মীয়ের চেয়েও বড় ছিল। কিন্তু কি দিয়ে কী যে ঘটে গেল—

সুরেনের বুক উজাড় করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে।

সুগন্ধা চেঁচিয়ে বলে, শুধু গল্পো করলেই চলবে, খেতে হবে না?

৩

শিলঘাটের অনেক জামাতিয়া এখনও জুম চাষ করে। অবশ্য লাসল চষা জমিও তাদের আছে। পাহাড়ে আগুন দেবার আগে আরাধ্য দেব দেবীর পূজা করে। আগুন দেবার দিন জুমের মালিক জুমে যায় না। ঘর বন্ধ করে প্রার্থনা করে। হে পাহাড়ের পশুপাখী, কীটপতঙ্গ, গাছ গাছালি, তোমরা আমাকে ক্ষমা করো। আমার করার কিছু নেই। আমি শুধু পূর্বপুরুষের ধারা বজায় রাখছি।

জুম পাহারা দেবার জন্য ওরা গাইরিঙ (টংঘর) তৈরি করে। মই বেয়ে তরতর করে উপরে উঠে যায়।

সুরেনের জুম চাষ নেই। তার প্রতিবেশি শিবু জামাতিয়া এখনও জুম চাষ করে। অবশ্য তার লাসল চষা জমিও আছে। অবশ্য সুরেনের চেয়ে ভালই বলতে হয়।

একটা পুখিরি আছে তার। মাছ বিক্রি করেও, ভালই আয় হয়।

শিবুর ছেলে পুরন্দর অবশ্য চাষ করে না। সে উদয়পুর কলেজ থেকে বি এ পাশ করে কাকরাবনের বেসিক স্কুলে মাস্টারী করে।

সুমির সঙ্গে তার ভাব-ভালবাসা। দুজনে লকিয়ে গাইরিঙও যায়। নির্জন টংঘরে বসে পরস্পরকে আপন করে পায়। মাঝে মাঝে সুমি পুরন্দরের কোলে শুয়ে গান গায়। বেসিক স্কুলের সুমিতা জামাতিয়ার কাছে গান শিখেছিল সে। আগরতলার বর্ণা দেববর্মার কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছিল সুমিতা। ককবরক ভাষায়। অমৃদিত রবীন্দ্রসঙ্গীত সুমিকে শিখিয়েছিল সে। গাইরিঙও পাশাপাশি বসে সুমি সেই রবীন্দ্রসঙ্গীত মাঝে মাঝে গায়।

পুরন্দর বলে, গান শেখাটা ছেড়ে দিলে কেন?

—কী করবো? সুমিতা যে (দিদি) যে উদয়পুর বদলি হয়ে গেলেন।

পুরন্দর বলে, বিয়ের পর আমরা উদয়পুরেই থাকবো। তখন আবার গান শিখবে। সুমি পুরন্দরের গায়ে চিমাটি কেটে বলে, বিয়ে, তোমার সঙ্গে বাবা বিয়েই দেবে না।

—কেন? আমি কি পাত্র হিসাবে খারাপ? আগামী মাসে তো আমার ভালো চাকরি হয়ে যাচ্ছে। মধুবন রিয়াং কথা দিয়েছে।

—সত্যি!

—তিনি সত্যি।

বলেই পুরন্দর সুমিকে জড়িয়ে ধরে। সুমি বাধা দেয় না। পুরন্দরের বৃকে মুখ রেখে বলে — এবার তুমি আমার বাবাকে বল।

সুমিকে বৃকের মধ্যে আরও জোরে চেপে ধরে পুরন্দর বলে, চাকরিটা পেলেই তোমার বাবাকে বলব। মধুবন রিয়াং বলেছে, সামনের মাসেই এ্যাপোয়েন্টমেন্ট পাওয়া যাবে।



—সুমি বলে, তোমার বাবা, রাজি হবে তো? পুরন্দর বলে, আমার বাবা তো রাজিই আছে। তোমার বাবাকেই বলবে?

— কেন? তোমার বাবা-মা বলবে।

পুরন্দর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। টংঘরে দুটি অব্যাহা হৃদয়, আরও বেশি চঞ্চল হয়ে ওঠে।

পুরন্দর বলে, চল, এবার ওঠা যাক। সুমি মুখ তোলেনা। বলে, শুনেছি, আমার বাবা নাকি কাকরাবনে কার সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা বলছে।

তাই। বলেই হেসে ওঠে পুরন্দর। বলে, আমার কাছ থেকে তোমাকে কেউ নিতে পারবে না। সুমি পুরন্দরের বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলে আমি যাবই না।

হঠাৎ একজোড়া লারিমা (প্রজাপতি) উড়ে এসে টংঘরের বেড়ার ওপর বসে। পুরন্দর বলে, দেখ, কি সুন্দর দুটো লারিমা।

— সুমি বলে, ঠিক তোমার - আমার মতো।

(৪)

বিভূতির কথা আজ বেশি করে মনে পড়ছে সুরেনের। কাকরাবন যাবার কথা তারই। নাথ মশাই বা অন্য কারও সঙ্গে কথা তো তাকেই বলতে হত। খুব বেশি হলে সুরেনকে সঙ্গে নিয়ে যেত। টিলার সিঁড়ি থেকেই ডাকতে ডাকতে উঠানো এসে দাঁড়াতে।

— দাদা আছে, নাকি?

— এস বিভূতি, এস। বস, খবর কি বল? বিভূতি বলতো বৌঠান কোথায়?

— সে আর কোথায় যাবে? তার তো একটাই যাবার জায়গা, ভাই। দেখো গিয়ে, গানডিনাকে কিছু একটা করছে।

বলেই সুরেন হো হো করে হেসে উঠে। বিভূতিও যোগ দেয়।

সুরেন বলে, বল কি খবর?

বিভূতি বলে, তুমি যে পুথিরিটা বন্দোবস্ত করে দিয়েছো, কাল সেখানে জাল ফেলবো। তাই আজ সন্ধ্যায় পূজা হবে। তোমাদের সবাইকে তো যেতে হবে।

— আরে বাব্বা! এ তো ভবর খবর। যেতে তো হবেই

সুগন্ধা দুটো মালায় কয়েকটা পিঠে এনে দু'জনের সামনে রাখে।

সুরেন বলে, দেখলে, এতক্ষণ কোথায় ছিল।

বিভূতি হেসে ওঠে, ব'লে বৌঠান.....

সুগন্ধা বলে, আমার নেমন্তন্ন সেই সকালেই হয়ে গেছে। সরলা বলে গেছে।

বিভূতি বলে, তাহলে আমি হেরে গেলাম।

সুরেন টিলার নিচে পোড়ো বাড়িটার দিকে তাকায়। গানডিনাকে আর গাইলক পুড়ে ছাই। আর দু'খানা ঘর অর্ধদগ্ধ।

১৯৮০ সালের ঘটনা। শুধু ঘটনা নয়, একটা রীতবৎস ভয়াবহ দাঙ্গা। কিছুদিন থেকে সেই দাঙ্গার আওতা দিকি দিকি জ্বলছিল। শুরু হয়েছিল পশ্চিমপাড় থেকে। একটি লজ্জাকর ঘটনা। সেই লজ্জাকর ঘটনার পরিণতি যে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় পরিণত হবে, তা শিলঘাটির 'চৌধুরী' সুরেন জামাতিয়া আঁচ করতে পারেনি। বিকি বিকি আগুন জ্বলতে হঠাৎ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে, তাও ভাবতে পারেনি সে।

ঘটনাটি দুঃজনক সন্দেহ নেই। জামাতিয়া সমাজে এই ধরনের ঘটনা আগে কখনও ঘটেছে বলে, মনে করতে পরে না সুরেন। জামাতিয়ারা নারীকে সম্পদ ভাবে। তাই তাদের অসম্মান করে না তারা। পোশাক পরিচ্ছদ এখনও তারা কিছুটা আদিম। পরনে থাকে কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত লম্বিত রেগনাই ব্রাউজের উপর রিছা থাকে কখনও বা গুঁড়ুই রিছা। জীবন যাপনে যেমন সরলা তেমনি পোশাক পরিচ্ছদেও নির্বিকার। তাদের চোখে যা অত্যন্ত প্রভাবিক, বাইরের লোকের মনে তাই আদিম বাসনার জন্ম দেয়।

পেটান জামাতিয়ার বোড়শী কন্যা সীতাকে একটি 'বঙ্গাল' ছেলের আদিম কামনার শিকার হতে হয়েছিল। সন্ধ্যার সময় জুম থেকে ফিরছিল সে। পাহাড়ের পাশে তার পথ রোধ করেছিল নবীন বালার জোয়ান ছেলে কার্তিক। অধ্যসম্পন্ন করেনি সীতা। হাতের টাককাল— (দা) দিয়ে কার্তিকের ঘাড়ে কোণ মেরে ছুটে চলে এসেছিল।

জামাতিয়া সমাজ এই ধরনের বেয়াদপি সহ্য করে না। নারীর উপর অত্যাচার জামাতিয়া সংহিতায় অমার্জনীয় অপরাধ।

সীতাকে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিমপাড়ার নারী পুরুষ ছুটে এসেছিল সুরেনের কাছে। বিচার চাই। এই জঘন্য অপরাধের বিচার চাই।

সুরেন বুঝেছিল, এবার শিলঘাটিতে আগুন জ্বলবে। কিছু রক্তপাত ঘটবে।

পশ্চিমপাড়ার জামাতিয়ারা বলে, চৌধুরী, তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম, ওয়ানহাদের এখানে বসতি করছে দিও না। তুমি গুনলে না।

সুরেন বোঝাবার চেষ্টা করে, এক কার্তিককে দিয়ে সব বঙ্গালীকে বিচার করো না। চল থানায় গিয়ে কার্তিকের বিরুদ্ধে আগে এজাহার দিয়ে আসি।

উত্তেজিত জামাতিয়ারা বলে, এজাহার দিয়ে কি হবে। থানার বাবুও তো বঙ্গাল। আমাদের বিচার আমরাই করবো। তুমি অনুমতি দাও। ব্যাপারটি যে তার আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, তা বুঝতে পারে সুরেন। বলে, তোমরা, আমার কথা শোন। আগেই আইন নিজেদের হাতে নেওয়া উচিত হবে না। আমাদের যা করবার, সেটা তো পরেও করতে পারবো। থানাকে জানিয়ে রাখলে, আমাদের আর দোষ থাকবে না।

উত্তেজিত জামাতিয়ারা ফিরে যায়। তবুও সুরেন স্বস্তি পায় না। পিরানটা কাঁধে ঝুলিয়ে আরও তিন চারজনকে সঙ্গে নিয়ে সুরেন সেই রাতেই কাকরাবন যায়। থানায় গিয়ে সব ঘটনা বিস্তারিতভাবে বলে। সে একথা জানাতে ভালো না, ব্যবস্থা নিতে দেরি করলে, যে কোন মুহূর্তে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠতে পারে।

রাতেই বিভূতি এসেছিল। তার চোখে মুখে উদ্বেগের ছায়া। উদ্ভিন্ন বিভূতি বলেছিল, আমাদের কী হবে সুরেনদা। কি যে ঘটবে, আর কি যে ঘটতে পারে, তা সুরেনও ভান করে জানে না। তবুও বিভূতিককে আশ্বস্ত করে, না, না, ভয়ের কিছু নেই। দুদিন বাদে সব ঠিক হয়ে যাবে, তবে একটু সাবধানে থেকো।

থিকি থিকি আগুন সেই রাতেই দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। নিমেষের মধ্যে পশ্চিমপাড়ার আগুন ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব পাড়ায়। উন্মত্ত জামাতিয়ারা লাঠি, ব্লড টাককাল আর মশাল নিয়ে "বঙ্গাল" বসতি, আক্রমণ করে। অক্রান্ত মানুষের আর্ত চিংকারে শিলঘাটির রাতের স্তব্ধতা ভেঙ্গে থান থান হয়ে যায়। আগুনের লেলিহান শিখা তিন মাইল দূরের কাকরাবনের আকাশকেও লাল করে দেয়। বিধ্বস্ত সুরেন ছুটে যায় পশ্চিম পাড়ায়। কয়েকটা রক্তাক্ত ত মেহ এদিক ওদিক

ছড়িয়ে আছে। কিছু বাড়ি পড়ে ছই হয়ে গেছে। কিছু মানুষ দক্ষ। ফিরে আসে পূব পাড়ায়। বিভূতির বাড়ি জ্বলছে।

—বিভূতি...

একটা চিৎকার করে সেই দিকে ছুটে যায় সুরেন। সব শেষ। চারটে দক্ষ দেহ হাতিনা আর নামলায় পড়ে আছে।

—আর একজন, আর একজন কোথায়? বিভূতির দু'মাসের মেয়ে?

দক্ষ বাড়ির সামনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে সুরেন। এক সময় ডুকরে কেঁদে ওঠে সে। কাদতে কাদতে বলে, বিভূতি, আমি কথা রাখতে পারলাম না। আমাকে তোমারা ক্ষমা কর।

আবার কান্নায় ভেসে পড়ে সুরেন। ধীরে ধীরে সুগন্ধা তার পাশে পাঁড়ায়। বলে, চল ঘরে চল।

—বিভূতির মেয়ে, দু'মাসের দুধের বাচ্চটাকেও ওরা পুড়িয়ে মারল। বিহিক, দু'মাসের শিশুকেও ওরা পুড়িয়ে মারল।

সুগন্ধা বলে, না বুছাই (হাম্মী), আমি মেয়েটাকে বাঁচিয়েছি। ঘরে চল, দেখবে।

সেই গানটা গাইতে ঘরে ফেরে সুমি। “তাবুক তেই লোরালিয়া রমদি লরক, যাক বায়, যাক রমদি”...

এখন আর দেরি নয়, ধরগো তোরা হাতে হাতে ধরগো।

ছকা হাতে হাতিনায় বসে একটা পাহাড়ের দিকে তাকিয়েছিল সুরেন। সুমি তার কাছে এসে পাঁড়ায়। বলে, সকাল থেকে তুমি কি ভাবছো, বাবা? চমকে ওঠে সুরেন, তাড়াতাড়ি বলে, কিছু ভাবছি না তো মা। ওই পাহাড়টা দেখছিলাম। সুমি বলে, দুপুরে তুইছার ঘাটে গিয়েও কি তুমি পাহাড় দেখছিলে? কি হয়েছে, বল, আমার কাছে, মিথ্যা বল না।

সুরেন ছকেটা পাশে নামিয়ে রেখে, সুমিকে কাছে টেনে নেয়। তার মুখটা দু'হাত দিয়ে ধরে তাকিয়ে থাকে। সুমির মুখে সরলার মুখ দেখতে পায় সে। ঠিক একই মুখ, একই রকম চোখ, ঠিক একই রকম টিকানো নাক। এখনি হয়তো বলে উঠবে, তোমার ভাই পাঠিয়ে দিল, দিদি।

সুমি বাবার মুখে মুখ নামিয়ে বলে,

দাদা তো এখনও ফিরলো না, বাবা সুমি মেরেকে আরও বুকুর গভীরে টেনে নেয়।

(৫)

সুগন্ধা ঘুরে ফিরে প্রশ্ন করে, নাথ মশাইকে সব কথা খুলে বলেছো তো।

—হ্যাঁ, সব কথাই বলেছি, বিহিকা।

—ওদের বলেছো, সুমি বিভূতির বুজাক (মেয়ে)। আর আমার আবুক তুই খেয়ে বড় হয়েছে?

—অত কথা কি করে বলা যায় বলেছো? শুধু বলেছি বাপ-মা মরা দু'মাসের শিশুকে আমার মানুষ করেছে।

সুগন্ধার কৌতূহল মিটতে চায় না। কেমন যেন ভয় ভয় করে তার। জামাতিয়ার ঘর মানুষ। এমন মেয়েকে কি বাঙ্গালারা বউ করে নেবে? সে আবার প্রশ্ন করে, পণের কথা সব বলেছো?

সুরেন বলেন, সুমির সব সম্পত্তির হিসাব দিয়েছি। পাঁচ কানি জমি আছে। একটা পুখির আছে। আর উনিশ বছরের সব ফসলের টাকা ডাকঘরে রেখে দিয়েছি। সব শুনে তোমার হব

চামাই আর চামাইজুক খুব খুশী!

—আমারাও যে রং বুতান, বৃন্দাবন ফুল, দাব দেব, তা-ও বলেছ তো?

সুরেন এবার হেসে ফেলে। হাসতে হাসতে বলে, এ সব কথা নয় পরে বলা যাবে।

আগে ওরা এসে দেখে যাক। হাজার কথা চালাচালি না হলে কি আর বিয়ে হয়।

সুগন্ধা বলে, তা ঠিক!

সুরেন বলে, তুমি সুমিকে ব'লে দিও সকালে যেন ধৈই ধৈই করে বাইরে না যায়।

নাথ মশাইরা যে দেখতে আসবে, সুমিকে বলেছো তো?

সুগন্ধা বলে, না, এখনও বলিনি। আর বলারই বা কি আছে?

সুরেন বলে, ওই পূবদরটার সঙ্গে, এখন আর পহিরিঙ-এ যায় না তো?

সুগন্ধা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। পাড়ায় দু'চারজন বলেছিল, তোমার সুমির সঙ্গে পূবদরকে ভালো মানাবে। দু'জন তো প্রায়ই জুমে যায়, টংঘরে বসে গান করে।

এ সব কথা শুনে সুরেনের ভালো লাগেনি। সে বাঙ্গাল বাড়িতেই সুমির বিয়ে দিতে চায়।

বিভূতি বেঁচে থাকলে যা করতো, সুরেনও তাই করতে চায়। তাতে বিভূতি আর সরলার আত্মার শান্তি হবে। স্বর্গে বসেও তারা খুশী হবে।

বিভূতির সব সম্পত্তি যকের মত আগলে রেখেছে সে। উনিশ বছরের ফসলের টাকা ডাকঘরে জমেছে। শুধু বাড়িটা মেরামত করেনি সে। লোকে যদি ভাবে সুরেন জামাতিয়া, বাঙ্গাল বাড়িটা দখল করে নিল। পোড়ো বাড়িটার চারদিকে আগাছার জঙ্গল। বেড়ায় টিনের চালে এখনও পোড়া চিহ্ন। বিয়ের পর সুমি যদি সারিয়ে নেয় নেবে—আর যদি বেঁচে দিতে চায় দেবে। সেটা তার ব্যাপার।

সুরেন বলে, তুমি সুমিকে কাল ঘরেই থাকতে বল। নাথ মশাইরা তো সকাল দশটার মধ্যেই এসে পড়বে।

সুগন্ধা বলে, আমি তো বলবোই, তুমিও বলে দিও। সুমি তোমার কথা খুব শোনে।

—আমার মেয়ে, আমার কথা শুনবে না? নিশ্চয়ই শুনবে। উজ্জ্বল যেন কাল আর উদয়পুর না যায়। মেয়েটা আমার দাদা ছাড়া কিছু বোঝে না।

পাহাড়ে সন্ধ্যা নামে। টিলার বাড়িগুলোয় আলো জ্বলে ওঠে। বাঙ্গাল পাড়ার ঘরে ঘরে শীশ জ্বলে। দূরের জুমে কে যেন আগুন দিয়েছে। আগুনের শিবার মাথায় কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। সন্ধ্যার পর শিলঘাটের রাস্তা-ঘাট নির্জন হয়ে যায়। টিলার ঘরে ভাতের খটখট আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যায়।

সুমি লাফাতে লাফাতে বাড়ি ফেরে। পরনে নিজের হাতে তৈরি রেগনাই। গায়ে ব্লাউজ। তার ওপর নকশা তোলা রিহা। আজ সে খোঁপা হৈছেছে। তার মধ্যে গুঁজে দিয়েছে গোটা কয়েক শেত করবী।

সুরেন হাতিনায় বসে তামাক টানছিল। সুগন্ধা তার সামনে বসে চালের কাঁকর বাছছিল। সুরেন বলে, সুমি এলি?

—হ্যাঁ বাবা।

—আয় এদিকেআয়। আমার কাছে বস।

সুগন্ধা মেয়ের মুখের দিকে তাকায়। কী মিষ্ট মুখ। ঠিক সরলার মত

সুমি বাবার পাশে বসে। তার হাঁটুর ওপর খুতনি রেখে বলে, বল।



মোয়ের মাথায় হাত বলাতে বলাতে সুরেন বলে, শোন মা, কাল আর ঘর থেকে বেরোস না।

সুমি বাবার মুখের দিকে তাকায়। মুখে বলতে হয় না। তার চোখে অনেক প্রশ্ন ফুটে ওঠে। সুগন্ধা একমানে কাকর বাছে। সুরেন বলে, কাল, কাকরাবন থেকে তোকে দেখাতে আসবে। বাবার কথা শুনে সুমির মুখের রং পাশ্চাতে থাকে। সুরেন আবার বলে, তোর বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে।

সুমি সোজা হয়ে বসে। সরাসরি দৃষ্টি মেলে দেয় বাবার মুখের দিকে। সুগন্ধা আড়চোখে একবার মেয়েকে দেখে।

সুরেন বলে, নাথ মশাই আসবে। তার ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ের কথা হচ্ছে। সুমি উঠে দাঁড়ায়। হাতিনা থেকে নামলায় নামে। সুরেন ছুটোটা বেড়ার পাশে রেখে বলে, ওরা খুব ভালো ঘর। ছেলটিও ভালো।

সুমি বলে আমি বিয়ে করবো না।

সুরেন অবাক হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকায়। সুগন্ধাও চমকে ওঠে। সুরেন সুমিকে চেনে। একবার না করলে, তাকে দিয়ে হ্যাঁ করানো শক্ত। সুগন্ধা চাল নিয়ে রান্না ঘরে যায়। তারও বুক টিপটিপ করে। এখনি হয়তো বাড়িতে বজ্রপাত ঘটবে।

আশঙ্কায় তার বুক কঁপে ওঠে।

সুরেন ধীরে ধীরে বলে, ও কথা বলতে নেই মা। বিয়ে তো দিতেই হবে।

সুমি বলে, না, আমি বিয়ে করবোনা। না, না, না।

সুরেন মনে মনে প্রচণ্ড দাঙ্কা খায়। তবুও শান্ত গলায় বলে, তাই কি হয়, মা। কাল নাথ মশাই তোকে দেখতে আসবে।

সুমি বলে, ওরা তো ওয়ানছা! আমি ওয়ানছাকে বিয়ে করবো না।

সুরেন ও সুগন্ধা দু'জনই চমকে ওঠে। সুরেনের ধৈর্যচিহ্নি প্রায় ঘটে যাবার উপক্রম হয়। সে শিলখাটির চৌধুরী। ধীর হ্রি বিচক্ষণ, তাই সহজেই নিজেকে সামলে নেয়। বলে, পাগলামো করো না, মা। আমরা তো তোমার ভালই চাই।

সুমি সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝালো সুরে জবাব দেয়, ওয়ানছার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে, তোমরা আমার কী ভালো করতে চাও— না, আমি ওয়ানছাকে বিয়ে করবো না।

মোয়ের জবাব শুনে সুরেনের মাথা গরম হয়ে ওঠে। মেজাজ ঠিক রাখতে নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে। তাহলে কি সে বিভূতির কাছে অপরাধী হয়ে থাকবে? না, এ হতে পারে না। সে হাতিয়া থেকে নামলায় নামে। মোয়ের দিকে দু'পা এগিয়ে যায়। সুমি দেখে, বাবার মুখের রং পাশ্চটে গেছে। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে। ওঁঠ দুটো থর থর করে কাঁপছে। সুরেন বলে, কাল ভূমি ঘরে থাকবে কাকরাবন থেকে নাথ মশাই দেখতে আসবে।

বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে দু'কণ্ঠে সুমি বলে, আমি ওয়ানছাকে বিয়ে করবো না।

আর ধৈর্যকে মনের মধ্যে ধরে রাখতে পারে না সুরেন, জামাতিয়া চৌধুরীর ধৈর্যচিহ্নি ঘটে। সে বলে, তুইও তো ওয়ানছা।

ওই পোড়ো বাড়ির বিভূতির মেয়ে তুই।

— আমি ওয়ানছা— আমি বিভূতির মেয়ে। সুমির মাথায় আগুন জ্বলে। সমস্ত টিলাটিই যে লাগিদের মত খুরছে। তার মনে হয়, সে দ্রুত দুর্গাবর্তের মাথা তলিয়ে যাবে

— না, না, না— আমি ওয়ানছা নই।

সুমি চিৎকার করে মাটিতে বসে পড়ে।

— আনমা, আনমা গো আমি ওয়ানছা নই।

বলেই হাউ হাউ করে কঁদে ওঠে সুমি।

সুগন্ধা ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে। তার বুক মুখ লুকিয়ে সুমি, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে, আনমা বল, আমি কী ওয়ানছা?

সুগন্ধার বুকের মধ্যে একটা তীব্র যন্ত্রণা চেপে বসে কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে যায়। দু'চোখে বন্যা নামে। মেয়েকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে বলে, না সুমি না, তুই ওয়ানছা ন'স। তুই আমার মেয়ে। আমার মেয়ে.....

সুগন্ধা হাউ হাউ করে কঁদে ওঠে।

ধীর হ্রি বিচক্ষণ সুরেন বিচলিত হ'য়ে ওঠে। তার বুকও যেন কান্নায় ভরে ওঠে। সুগন্ধার মত কঁদতে পারলে সে হাস্য বোধ করতো। সে আর দাঁড়াতে পারে না।

ঘুম আসে না সুগন্ধার। পাশে চুপ ক'রে শুয়ে আছে সুমি। মাঝে মাঝে সে ফুঁপিয়ে উঠছে। মোয়ের পিঠে ধীরে ধীরে হাত বোলায় সুগন্ধা। পাশের ঘরে সুরেনও নিদ্রাহীন। এমন যে হবে সে ভাবতেই পারেনি। মায়ার বান্দন যে এত কঠিন, এই প্রথম উপলব্ধি করলে সুরেন।

পাছড়ে রাত গভীর হয়। শিলখাটি নিঃশব্দ নিঃশব্দ। যেন একটা প্রাণহীন প্রেতপুরী।

একসময় তন্দ্রা এসে সুগন্ধাকে আচ্ছন্ন করে। সুমি ধীরে ধীরে উঠে বসে। নিঃশব্দে মাচাং থেকে নামে। পা-টিপে টিপে দরজার কাছে এগিয়ে যায়। ভেজানো দরজা ধীরে ধীরে খোলে। হাতিনা। সেখানে থেকে নখলা। নখলা পেরিয়ে, গাইনকের পাশ দিয়ে, পিছনের সরণ পথে দিয়ে নেমে যায় সুমি। ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

না, না, আমি ওয়ানছা নই, আমি ওয়ানছা.....

তন্দ্রা ছুটে যায় সুগন্ধার। পাশে সুমি নেই।

আশঙ্কায় চাপা আত্নানাদ ক'রে ওঠে সে।

— সুমি!

দরজা খোলা। সুগন্ধা ছুটে বাইরে যায়।

— সুমি, কোথায় গেলি। উজ্জ্বল, ওঠ। তোর বাবাকে ডাক।

ঘরে নেই, গাইনকে নেই। রান্নাঘর ফাঁকা।

— সুমি... বুক ভাঙ্গা চিৎকার ক'রে ওঠে সুগন্ধা। তার আত্নানাদ রাতের শুকতাকে ভেঙ্গে বান খান করে দেয়। শুক, নির্বাক হতভম্ব সুরেন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে।

উজ্জ্বল ভাবে, সুমি পুরন্দরের বাড়ি যায়নি তো। পুরন্দরের সঙ্গে ভাব-ভালবাসার কথা তার জানা আছে। প্রায় লাল দিয়ে টিলা থেকে নেমে সে পুরন্দরের বাড়ির দিকে ছুটতে থাকে।

— পুরন্দর, পুরন্দর।

উজ্জ্বলের ডাক শুনে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে পুরন্দর।

— কি হল, উজ্জ্বল।

— সুমিকে পাওয়া যাচ্ছে না।

— পাওয়া যাচ্ছে না মানে? কোথায় যাবে সে?

চল।

পুরন্দরের বাবা-মা বেরিয়ে আসে। আশে পাশের বাড়ি থেকে সবাই বেরিয়ে আসে। কেউ ছুটে যায় গাইরিঙ, কেউ বা ভুইছার ঘাটে। আশে-পাশের বন-বাদারে। না, কোথাও নেই সুমি। রাত শেষে ভোরের আলো ফোটে। পুরন্দর পোড়ো বাড়িটার দিকে এগিয়ে যায়। আগাছায় জঙ্গল সরিয়ে ভিতরে ঢোকে। ভাঙ্গা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢোকে। ভাঙ্গা দরজা দিয়ে ভিতরে তাকিয়ে চমকে ওঠে সে। দম্ভ বাড়ির কড়িকাঠে সুমির দেহ ফুলছে। নিজের হাতে তেরি রিছা দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে সুমি।

## অবনীবাবু হারিয়ে গেলেন

অসীম সেনগুপ্ত

দিনান্ত বেলায় অবনীবাবু যখন একটু শান্তি পেতে চাইলেন তখনই হারিয়ে গেলেন। একেবারে নিখোঁজ। দূরদর্শনে বা খবরের কাগজে যোগ্য বেরয় নি। তবু নিকটস্থের একটু বিবরণ দেওয়া যেতে পারে। নাম, অবনীরঞ্জন কর, বয়স ৬২, উচ্চতা মাঝারি, কপালের বাদিকে একটা বড় লাল তিল, মাথার চুল পাকা, পরনে আধময়লা ধূতি পাঞ্জাবী— মাঝে মাঝে কিছুই মনে থাকে না। অবনীবাবু কবে থেকে নিখোঁজ তার দিনক্ষণ বলা যাবে না। কেউ জানে না।

চল্লিশ বছর বিভিন্ন স্কুল কলেজে মাস্টারী করে সাতানকই-এর জন মাসে অবসর নিয়েছিলেন। এজন্য কোন ভাবাবেগটো গেল না। তারপরদিনই সূর্য উঠেছিল। পৃথিবী সংসার যেমন চলছিল তেমনই চলেছে। সিসিফাসকে আর পাথর ঠেলে তুলতে হবে না। বেশ খুশীই হয়েছিলেন অবনীবাবু। একবছরের মধ্যে পেনশনও পেয়ে গেছেন। ইড়া-পিঙ্গলা-সুন্মুন্নায় একটু একটু টিউটানি অনুভব হচ্ছে। হতেই পারে। অবনীবাবু জ্ঞানতঃ মিথ্যাকথা বলেন না, জীবনে একটি পয়সাও অসংভাবে উপার্জন করেন নি, কখনো কারো অপকার করেন নি। উপকার যদি করে থাকেন— নিঃশব্দে। তবু মনের মধ্যে চিন্তার ইদুর কুটকুট করে কাটে। পেনশনের সামান্য টাকায় সংসার চলেনা। ছেলেটাকে একটা চাকরী পেতে হবে। বিয়ে দিতে হবে মেয়েটার। মধ্যবিত্তের লোভে পড়ে ফিনাস কোম্পানীতে টাকা খাটাতে গিয়ে দেউলক্ষ্যধিক টাকা মার গেল। আর সঞ্চয় বলতে কিছু নেই। কিন্তু বুকের মধ্যে আছে বর্ষদিনের পুরনো একটা রক্তাক্ত ঘা।

উত্তরাধিকার সূত্রে অবনীবাবু পেয়েছেন গড়িয়ায় তিনতলার ওপর একটা খোঁচা। বুদ্ধিজীবী মার্কিনী নাম এ্যাপার্টমেন্ট। নিজদেশের সাবেকী বাড়ি ভেঙ্গে প্রোমেটার বানিয়েছে চারতলা ফ্ল্যাট। অবনীবাবুর মনে হয় ভিন্দুদেশে বেড়াতে এসে দুদিনের জন্য কোন হোটেলে আছেন। কংক্রিটের বস্তি। ভালো মন্দ মিলিয়ে বিচিত্র সব প্রতিবাসী। এই বিচিত্র কেমিক্যাল কম্বিনেশনে অবনীবাবু তলায় পড়ে থাকেন সেডিমেন্টের মত। এজন্য তাঁর কোন দীনতাবোধ নেই। পিছনের দিকে তাকান না। সামনের দিকও নয়। ভূরে থাকেন একটা শূন্যতায়। শূন্যই তো পূর্ণ।

অবনীবাবু লোকের সঙ্গে মিশতে পারেন না। অন্ধের মত হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে থাকেন একটা নিতল অন্ধকার। যেখানে আশ্রয় নেওয়া যায়। হাজার বছর আগেকার বন্ধুরা অনেকেই নামকরা কবি লেখক। কত দামী দামী পুরস্কার পেয়েছে। অবনীবাবুকে কেউ মনে রেখেছে, কেউ ফেলে দিয়েছে। এজন্য দুঃখ নেই। এককালে তো তারা তাঁর গানের দীপে আলো ছেলে দিয়েছিলো। যথেষ্ট। এখন বেলাশেষে ওসব কথা অবনীবাবু মনে করতে চান না। তবে স্বভাবের কালো গর্ত থেকে এখনও অবনীর মনে মাঝে মাঝে একটু কবিতা জেগে ওঠে।

শরীরটাও ভাল যাচ্ছেনা। মাতুল সূত্রে পেয়েছেন ডায়াবেটিস। নিজের উপার্জন অনিশ্চয়। ব্রাদ সুগার ৬৮৪ পি. পি., রক্তচাপ ১৪০/৯০, ই. সি. জি. রিপোর্ট হাট ব্লক আছে। হিমোগ্লোবিন ১১; সোমোগ্রাফিতে তলপেটে কি একটা পাওয়া গেছে। হয়তো ডিফারেনসিয়াল ক্যালকুলাস। সুগারের জন্য একরকম না খেয়েই আছেন। অবনীবাবু কারো সেবা বা সহানুভূতি চান না।



তার মনে হয় ও দুটোর মধ্যেই একটা ভেদভ্রান্ত লুকিয়ে আছে। অদ্ভুত এক স্বার্থপরতা আছে অবনীবাবুর। হয়তো অহংকারও। কারো ভালোবাসা তিনি চান না কিন্তু নিজে ভালোবাসতে চান। সরলস্বভাব মত মানুষটা নিজেকে ওঠিয়ে নিয়েছেন। একলা পথ হাঁটেন। নিজের সঙ্গে কথা বলেন। আবার বাড়ী ফিরলে বাড়ীর মানুষগুলোকে দেখেও ভাল লাগে। একটা কর্তৃত্ববোধ নাইট ল্যাম্পের মত দুচোখে জ্বলে ওঠে। আলোটা যদিও অনুত একটা আভাসমাত্র।

যাই হোক এভাবেই গড়িয়ে গড়িয়ে নিজের কক্ষপথে ঘুরে চলছিলেন অবনীবাবু। দুই গতির মাঝের দরজা হঠাৎ একদিন বন্ধ হয়ে গেল। মনে হতে পারে অবনীবাবু মারা গেলেন। তখন। নিখোঁজ হলেন। প্রতিদিনের মত ভোর চারটোর সময় উঠে মনিং ওয়াকে বেরিয়েছেন। এই সময়টায় নিজেকে নিজের কাছে পাওয়া যায়। সময়টা তখন শীতকাল। তবে খুব জঁকালো শীত নয়। নিজের সঙ্গে কথা বলতে বলতে পথ চলতে চলতে কখন যেন একটা কবিতা উঠে এল অবনীর মনে—

.... একটা বিষম কুয়াশার ভাপ উঠছিল মাটি থেকে।

মোরগের ঘুম ভাঙ্গানো ভোরের হাওয়ার সঙ্গে কথা বলে

পথ চলতে খুব ভাল লাগছিল।

রঙ ওঠা চাদের মত একটা অন্ধকার জড়িয়েছিল

গাছপালা, দূরের উঁচু রেল লাইনটাকে।

পেছনের আকাশে ঝুলে ছিল একটা মরা চাঁদ

দড়িতে কোলাহো মৃত বধূটির মত।

পূবে তখনও কমলা রঙ লাগে নি।

শব্দহীন পায়ে কুয়াশা জমাট হচ্ছে কাছের আকাশটার গায়ে।

অতল শূন্যতায় কান পাতলে শোনা যায়

চরাচরব্যাপী তারকপ্রদান।

ধনহীন কণ্ঠ বহুদূর থেকে কে যেন ডাকছে। কে যেন ডাকছে।

কিন্তু যাবটা কোথায়? সব ঠিকানাই তো হারিয়ে গেছে।

পুরনো শবের মত ভাঁটার টানে ভেসে যাচ্ছে অস্তিত্ব—

স্বত্বহীন সপ্তা।

প্রান্তবেলায় কোড়ো হাওয়ার ঝাপটায় স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছি না।

ছেলেবেলায় খেলতে খেলতে যেমন বল হারিয়ে যেত

এমনি চেনা পৃথিবীটাকে আর কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।

চারিদিকে এরা কারা?

আমার মনের নির্জন নিসঙ্গতটুকু লুণ্ঠ করে নিয়েছে।

আমি যত বৃদ্ধ হই পৃথিবীতে তত পরবাসী—

চারিদিকে সর্বকিছু অস্পষ্ট স্থিতির মত লাগে।

বহুদূর থেকে কে যেন ডাকছে। কে যেন ডাকছে।

শেষরাতেই আকাশ আলো করে কিন্তু আগেই ফিরে গেছে বিদেহীরা।

আসন পাততে পারি নি।

শিশির ভেজা পথ চলতে চলতে খুব কাদতে হচ্ছে করে।

ইচ্ছে করে বৃকের ভিতর জমাট বাঁধা কান্নাটাকে

একটা প্রচণ্ড ক্রোধের আওনে গলিয়ে ফেলি।

নিজেকে পাথর ছুঁড়ে মারি।

রেগে উঠতে গিয়ে থমকে যাই।

অতল শূন্যতা থেকে ভেসে আসছে তারকপ্রদান।

কে যেন ডাকছে। বহুদূর থেকে কে যেন ডাকছে।

এমনি করে বারবার কে দিচ্ছে ডাক!

হয়তো আমিই ডাকছি আমার।

বর্ষা বসন্তে শীতে অধ্যাপে নিজেই বুঝি নিজেকে।

আমিই কি ঈশ্বর?

একটা অশ্রুত দপ করে জ্বলে উঠতেই তাকিয়ে দেখলাম

চোখের সামনে রাজা হয়ে উঠছে দিগন্ত।

জবাকসুমশল্পশম।

সর্বময় শূন্যতায় অশ্রুত উচ্চারণে কে যেন জপছে অখণ্ডতারকপ্রদান।

কবিতার ঘোর কাঁটতেই অবনীবাবু একটু দাঁড়ালেন। পাশের চায়ের সেকান থেকে এক গ্লাস দুধ চিনি ছাড়া লিকার নিয়ে রোক্ষে বসলেন। পাঁচটা বাজে। ভোরে বেড়ানো পুরুষ মহিলাদের ভিড় বাড়ছে। আলো বাড়ছে। চা খেয়ে অবনীবাবু বাড়ীর দিকে ফিরলেন। প্রথমে একটু বিভ্রম। কোথায় যাব? কেন যাব? শিশুর আঁকা ছবির মত পিছনের এলোমেলো মানুষটাকে মুছে ফেলতে চাইলেন। মনটা এখন ভাঙ্গাচোরা আয়না। বহুসত্তা নানা মাত্রায় প্রতিফলিত। কি ক্ষতি তাতে? তিনি তো প্রস্তুত হয়েই আছেন। মস্তবড় সুবিধা বাড়ীর কাছেই শ্রাশান। কিন্তু তার দরকার হবে না। মৃত্যুর পর তাঁর জীর্ণ কাঠামোটা মেডিকেল কলেজে দান করার চুক্তিপত্রই সই করেছেন।... তবু যদি শ্রাদ্ধের প্রয়োজন হয় একটা ফটো এনালার্জ করিয়ে রেখেছেন। খবর নিয়েছেন হিন্দু মিশনে অল্পটাকায় পারলৌকিক কাজ করা যায়। একটা ইচ্ছাপত্র লিখে নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন তাঁর অস্তিত্ব অসুস্থতা বা মৃত্যু সংবাদ আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব কাউকে যেন না দেওয়া হয়। চোখের জল ফেলার কোন দরকার নেই। লোকলজ্জার ভয়ে সামাজিক আচার আচরণ মানারও কোন প্রশ্ন নেই। এখন অবনীবাবুর শুধু অপেক্ষা। তবু দশকাঠির ঘর থেকে চিস্তার ঘূর্ণগোলা অবিরাম আওয়াজ তোলে। মাঝে মাঝে বৃকের মধ্যে বরাদ্দ পোড়ে। ফাঁটা ফাঁটা রক্ত ঝরে। বরাদ্দ ভিজ় যায়। জ্বলে উঠতে গিয়েই নিভে যান। হরে কৃষ্ণ হরে রাম।

চিস্তার ঢেউএ দেল খেতে খেতে অবনীবাবু যখন বাড়ী ফিরে এলেন তখন পাঁচটা কুড়ি। গায়ে জড়িয়ে আছে একটু অবসাদ। তুহোড় চোরের মত স্তম্ভপের দরজা খুলে ভেতরে ঢোকেন। নিজের হোটেল ঘর তখন ঘুমন্তপুরী। ভোরের কাক আর দুটো চারটে পাখির ভাঙ্গা ভাঙ্গা ডাক ছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই। একটু পরেই পৃথিবীর মাথায় হাতুড়ি পড়বে। শব্দে শব্দে ভাদপতে থাকবে পৃথিবীর দেহ।

সকাল ৬-৩০ মি: অবনীবাবু স্নান করলেন। ৬-৪৫ মি: অবনীবাবু টবের ফুলগাছগুলোতে জল দিলেন। সকাল ৭টা: অবনীর স্ত্রী উঠে পড়েছেন। একটু পরে চা পাউরুটি কলা এল। কোন কথা বা বলে অবনী খেয়ে নিলেন। ৭-৩০ মি: — অবনী বাজারে গেলেন। ৮-৩০ মি: —

বাজার থেকে ফিরে এসে আরেক কাপ চা খেলেন। তারপর চুপচাপ। সারাদিন চুপচাপ। আসলে কথা বলতেই ভাল লাগেনা। যা বলবেন, কোন না কোনভাবে সেটা তাঁরই দেখে যাবে। তাঁর জন্যই বৃষ্টি হয়না, শীত পড়েনা, এত গরম, দফায় দফায় লোড শেডিং, টেলিফোন বিকল, ইলেকট্রিকে সাড়ে দশ টাকারও বেশি বিল হয়, অগ্নিমুখা বাজারে স্বীর পক্ষে সংসার চালানো সম্ভব হয় না, ফেলোটার চাকরী হয় না। মানুষের বাবারা কত কি করে, মেয়ের বিয়ের কোন আলেআলাম নেই, এতটাকা মার গেল (বুদ্ধিহীনতা), ইতাদি ইতাদি। এসব হয়তো সবই সত্য। কিন্তু অবনীবাবু বুতরাষ্ট্র চোখে দেখেন না। কিন্তু কথাগুলো কানে যায়, বুকে পোড়ে। লোকের সদ দু-একজন ছাড়া ভাল লাগেনা। এক মিনিউটে কথা ফুরিয়ে যায়। বই পড়া ছাড়া কোন কিছুই প্রতি আকর্ষণ নেই। ছেলেরাও স্ত্রীকে অপরিচিত বলে মনে হয়। কি একটা ক্যাটালিস্ট ঘনত্বকে জলের মত তরল করে দিচ্ছে। জলের দাগ মুছে যাচ্ছে। অবনীবাবু নিজেকে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, কোন কিছুর প্রতি তাঁর কোন মোহ নেই। তাঁর সমস্ত জীবনটাই জলের লিখন। কিন্তু এজন্য কোন বার্থতাবোধ নেই। প্রাণের গভীরে একটা আনন্দ ও রসিকতার সুর সবার অলঙ্কৃত গুনগুনিয়ে বেজে চলে। অথচ একটা দুঃখ অহংবোধ শিকারী কুকুরের মতই তাঁর পায়ে গোড়ালি শুকতে শুকতে চলে আসছে। সেটা কামড়ায় না কিন্তু সদগু ছাড়ে না। সারাদিন কুয়াশার মধ্যে থাকেন। সবার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন। তবু ভয়, দরজা খুলেই কোন দুমুখো সাপ ছোবল দের।

বিকেল ৬ টা: (তারিখ জানা যায় নি) — এইভাবেই চলছিল। হঠাৎ অবনীর গুন কর একদিন হারিয়ে গেলেন। তাঁকে যে খুঁজে পাওয়া যাবে সে সম্ভাবনা কম। চেহারাটা অতি সাধারণ। মানুষটা আরো। অল্প ভিড়েই হারিয়ে যান। এতটাই নগণ্য যে তার উপস্থিতির চেয়ে অনুপস্থিতিটাই চোখে পড়ে। ক্রাস রটিনে তাঁর অবনীর গুন কর নামটা সংক্ষেপে দাঁড়িয়েছিল এ. আর. কে. সবার তুচ্ছতায় সেটাই হয়ে গেল আর কে? সত্যিই তো তিনি আর কে? বাঘি বহুর পৃথিবীতে বাস করেও তিনি কেউ নন। এই অবহেলা পেয়েই কত বর্ষাবসব কেটে গেছে। এখন কোন দুঃখ নেই। গান শুনতে গাইতে ভাল লাগত। আর ভাল লাগে না। এখন কোন দুঃখ নেই। কবিতা পড়তে ছবি আঁকতে ভাল লাগত। আর ভাল লাগে না। এখন কোন দুঃখ নেই। এতদিনের উচ্ছ্বাসটা কেমন কৃত্রিম হয়ে ঠোঁটের কোনো থমকে যায়। এখন আর দুঃখ পান না। এখন সব একাকার নিরাকার। শুধু অনেক রাতে নিজের মধ্যে কান পেতে শোনেন বহুর থেকে কে যেন ডাকছে। বায়ু তরঙ্গ ভেসে আসে সেই ডাক।

এইসব ভাবতে ভাবতে রাত বাড়ল। এখন রাতি এগারোটো (তারিখ জানা যায় নি)। রাতের ক্রটি যাওয়া হয়ে গেছে। বিছানায় বসে প্রতিদিনের মত ঘুটিতে এ্যালার্ম দিলেন অবনী। ঘুমের জন্য এ্যালার্মে পয়েন্ট টুফাইড খেলেন। অদ্বকার ভায়ে ঘড়ির কর্কশ আওয়াজে রোজ ঘুম ভাঙ্গে। প্রতিদিনই অবনে কাল ভোরে হয়তো একটানা এ্যালার্ম বাজবেই যাবে, তাঁর আর ঘুম ভাঙ্গবে না। প্রচণ্ড হতাশা নিয়ে আরো একটা দিনের দরজা খোলেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা তো এতবহুর ধরে কেউ ঘড়ির শব্দ শোনেননি।

সেদিন কি কারণে শুধু খেয়েও ভাল ঘুম আসছিল না অবনীরা। রাত দেড়টায় বিভনায় উঠে বসলেন। ভাবলেন একে কি বলি যাব? বিদ্রূত নিরা। আর তখনই মনে পড়ল সারের একটা বই আছে ট্রাবল্ড স্লিপ। এককথায় বইটার নাম মনে হওয়ায় খুশী হলেন। আজকাল কিছু মনে থাকে না, মনে পড়েনা। কলেজজীবনে পড়া কিছু কিছু লেখক কিছু কিছু বই ও

লেখকের নাম মনে করতে চেষ্টা করলেন। পারলেন না। অথচ ওয়ালডেন ও গ্রীন মানসন মনে পড়ল। মনে পড়ল কোয়ান্টাম মেকানিক্স, আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথের পূজার গান আর হপকিন্সের কথা। হপকিন্সের হাইপোথিসিস আমি মানি না — নিজের মনে মনেই বললেন। শক্তি চার্জ, সূন্যী গাঙ্গুলী, আলোকগুণন, সমরেন্দ্রের দুচারটে কবিতার লাইন খাপছাড়া ভাবে মনে পড়ল। বিভূতিভূষণের কথা একটু ভাবলেন। মনে পড়ল দিব্যেন্দ্র সঙ্গে একদিন পথে দেখা হয়েছিল। যেন বহুযুগের ওপার থেকে আসা একটা মানুষ। কেমন আছে উৎপল বসু? মাঝরাতে খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যেই জীবনানন্দের কথা মনে হল তখনই অবনীবাবুর মনে উঠে এল কবিতার কটা লাইন —

বিগত যৌবনারাশি, ছেনাল নারীর মত সময়ের বাতিস্তরে হেসে দিয়ে আছে।

অবসন্ন ব্যাক্তিচারে ক্লাস্ত দেহ জলে ভাসা শব।

প্রথর আলোর মধ্যে কী কুসংস্কৃত নগরীর দেহমন

তিলে তিলে গলে পড়ে।

অসহায় চোখে দেখি জীবনের মেটামরফসিস।

কুয়াশা জড়ানো দূর দিগন্তে নিয়নের রূপসী আভাষ

সমস্ত আকাশ জুড়ে যেন খুব কালো একটা শকুনের

ডানা খাপটানি।

সূর্য, নারীমুক্তি, নগ্নতা, সভ্যতার নবীন চেহারা।

জীবিত পিতৃকুল এর জন্মদাতা।

স্বাধীন রমণ আর উলঙ্গতার প্রতি সীমাহীন লোভে

যত বেশি স্পর্ষিত, তত বেশি বুদ্ধিজীবী।

সভ্যতার আশ্চর্য সংজ্ঞা : বাজারী বিজ্ঞাপন কারা যেন সেঁটে দিয়ে গেছে।

কোন উদ্ভাবিকার আমি দিয়ে যাচ্ছি পরবর্তী প্রজন্মের হাতে?

নিসঙ্গ একান্তে একা নিজেকেই অসহ্য ভাবি।

নির্জনতা নিশাড়ে পুড়ছে যেন কত অলিঙ্গান নিয়ে।

এখন মধ্যরাতে খোলা জানলার ফ্রেমে আবৃত আকাশ।

অল্প হাওয়ায় নড়ে উত্তের গাছের পাতাগুলো।

অনন্ত শূন্যতা থেকে ধ্বনিরই মুখরতা প্রাণে এসে বাজে।

ছেঁড়া খোঁড়া মেঘের চাদর মেলা আকাশের গায়ে —

তার ফাঁক দিয়ে জলভরা চোখে চেয়ে আছে শুকতারা।

অদৃশ্য আকাশ পথে থেকে থেকে ঈষৎ আলোর রেখা

উন্মাদ ফোয়ারার মত জ্বালায় আতসবাজি।

সময়ের নিঃসীম ব্যাপ্তিতে অর্থহীন হয়ে গেছে ঘড়ির ঘোষণা।

বাতাসের গায়ে খোলা ছাতিম ফুলের গন্ধে

মিশে গেছে ফ্যাকাশে কুয়াশা।

ল্যাম্পপোস্টে ঠকঠক : রাতের পাহারাওয়ালা ঘুম চোখে বিভ্রিভি করে।

ভোলের প্রথম ট্রেন যাওয়ার এখনো ঢের দেরি।



দিশান্ত স্পন্দনহীন।

জনপদের মত বিশাল শিমুলগাছে কোথায় লুকিয়ে কীড়ে

একটা বকের ছানা কুকড়ানো শীতে।

এমনি এক অন্ধকার, তল (নেই শুনাতাই সারাদিন খুঁজি।

দিনগুলো রাতগুলো কি ভীষণ অস্পষ্ট

জলে থেওয়া ছবির মতন।

মনে কবিতা আসতেই সেই পলকহীন অন্ধকারে সবকিছু কেমন এলোমেলো হয়ে গেল অবনীবাবুর। চকিত ভাললাগাটা একটা তিক্ত স্বাদ হয়ে উঠল। উকিমারা বালকের মত নিজের অস্তিত্বটার দিকে একবার লুকিয়ে তাকালেন। ক্রোশের আওয়াজ জলে উঠল মনে। ইচ্ছে হল ভয়ংকর চিংকার করে নিজের অস্তিত্বটা একদিয়ে দেন। স্বল্পায়ু মূর্খ পৃথিবীটাকে এই মুহূর্তে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলেন। তিনি জবাবদিহি চান। অবনীর ভিতরের অবনীটাকে কারা কেন কখন খুন করে গেল? কী হাসাকার? কে দেবে জবাব? যৌন সময় কোন কৈফিয়ৎ যেন না। ভাদ্রাকলসীর দিকে ফিরে তাকায় না।

মানের অস্থিরতাটা যখন একটা খিটলো আসছে তখন হঠাৎ একটা নাটক করতে ইচ্ছে হল অবনীর। সত্যিই চিংকার করে সবার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলেন। শুরু হল মধ্যরাত্রির অতি সংক্ষিপ্ত নাটক।

[চিংকার। রাহিটা কাচের গেলোসের মত ভেসে গেল। দরজা খুলে বেরিয়ে এল স্ত্রীপুত্রকন্যা। সকলের মুখে উৎকণ্ঠার সঙ্গে একটা বিরক্তি। মুখটা করুণ করলেন অবনী। নাট ল্যাম্পের নীলাভ আলোয় পাতলা অন্ধকার। মাথাটাও গেল নাকি— ওরা হয়তো ভাবছে। অবহেলার একটা জোরালো জবাব দেওয়া গেছে ভেবে অবনীর মনে খুশী ভাব জাগল। মঞ্চ আটফুট বই দশফুট একটা আয়তক্ষেত্র। অবনীবাবুর থাকার জায়গা। সেট বলতে চারদিকের দেয়াল। পূর্বে একটা বড় জানলা। এক দেয়ালে যামিনী রায়ের বিভালা। অন্য দেওয়ালে প্রকারের ঘোড়া। একটা জীর্ণ সোফা; অন্যটি প্রসন্ন ডিভান। জানালার ধারে সারি সারি টব। কেমন যেন ভৌতিক দেখাচ্ছে। ডিভানে বিছানার উপর বই-এর স্তুপ, কাগজ কলম, নানাধরনের ওষুধের স্ট্রিপ, বিস্কুটের কোটো, ক্যাসেট প্রেয়ার, নদীর ডিবে, মৌমবাতি-দেশলাই ইত্যাদি। দেহের সম আয়তনের জায়গাটুকু ফাঁকা। সেইখানেই আধশোয়া অবস্থায় অবনীবাবু। নাটকের আবহঙ্গমীত রাস্তায় একটা কুকুরের কীড়া। অবনীবাবুকে নিয়ে নাটকেরে চরিত্র চারটি।]

স্ত্রী—(চশমা ছাড়া বলে ভুরু কঁচকে) কী হল, হঠাৎ চিংকার করে উঠলে? খারাপ স্বপ্নপট? হয়েছেটা কি?

ছেলে—(পাজামার দড়ি বাঁধতে বাঁধতে) কত রাত হয়েছে জানো? লোকজন ছুটে এল বলে।

অবনী (গোপন উল্লাসে) না, না সবই আসবে। সেসব দিন মরে গেছে। হাত পা কিছুমিক্র করছিল, ভীষণ ঘাম হচ্ছিল, বুকে ব্যথা (সবটাই মিসেব)।

মেয়ে—কাকুরকে ডাকি, ডাক্তার ডাকাও তো দরকার...

অবনী—(এবার তো মুশকিলে পড়া গেল) আরে ডাক্তারটাকার লাগবেনা। এরকম তো প্রাইই হয়। এখন অনেকটা ভাল। জলের বোতলটা দে তো। (তাকিয়ে দেখলেন বোতলটা খালি। এ্যাকুয়াগার্ড থেকে ভরতে হবে) আচ্ছা থাক লাগবে না।

স্ত্রী—কলসী থেকে গেলোসে দে। প্রাইই হয় তো, মাথারতে পাড়া মাথায় করে চিংকার করার কি দরকার ছিল? কী কাণ্ড সারাদিন হাত পা নাড়া নেই, শুয়ে বসে থেকেই... (দেয়ালে একটা টিকটিকি ভেঙে উঠল ব্যঙ্গ করে)

ছেলে—(একটা দুর্দান্ত সমাধান হিসাবে) সুগার ফল করেছে বোধহয়, একটা মিল্লিটিন্সি খেয়ে নাও। সরবিস্টেট আছে? আইসোপটিন?

অবনী—দুটো ডিসপিরিন খেয়ে নিচ্ছি। (চতুর্ভুজ রাখতে অপ্রয়োজনে যেতে হচ্ছে)

মেয়ে—জল নাও। এখন আর শরীর খারাপ লাগছে না তো! কথা তো শুনবে না,

কিন্তুতেই একটা ডাক্তার দেখাবে না। তোমাকে কে বোকাবো?

অবনী—ক্রান্ত বাঁশির শেষ রাগিনী—

স্ত্রী—মরা মরা একটা বাতিক হয়েছে এখন। কতদিন ধরে বলছি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে সব কিছু একবার চেক আপ করিয়ে নাও।

অবনী—(মনে মনে) হ্যাঁ, হাসপাতাল তো আমার বাপের জমিদারী, চেক আপের জন্য ভর্তি করে নেবে। (প্রকাশ্যে) অনেক টাকা লাগে—

স্ত্রী—(ইলেকট্রিক শকের মত) টাকা টাকা করেই গেল। সে টাকা তো কোনদিন চোখেই দেখলাম না (একটু চূপ) সারাজীবন শুধু রান্নাঘরে ডিউটি করেই গেলাম। সামাজিকতা নেই, বাইরে বেরনো নেই, কোন রিগ্রেশন নেই... শুধু রান্না রান্না। কী লাইফ দিদির... ভিতরে ভিতরে বেশ বুঝতে পারছি একেবারে শুয়ে পড়ব।

ছেলেমেয়ে—(একসঙ্গে) অং চূপ করো না—

স্ত্রী—(রাগত সরে) চূপ করেই তো আছি। কবে আর কি বলি... আমার কোন ভয়েস আছে নাকি!

অবনী—(ভিখ চাই না কুকুর সামলা) ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। এখন ভাল, বেশ ভাল, এ্যাজ ফ্রেস এ্যাজ মর্নিং এয়ার (একটু রসিকতার ব্যর্থ চেষ্টা) যাও তোমরা গুয়ে পড়।

মেয়ে—শরীর খারাপ লাগলে ডেকো কিন্তু—

(অবনীর চোখে জলের রেখা)

ছেলে—টন্দারার বাড়ীর একতলার একজন ডাক্তার ভাড়া এসেছে। খুব ভালো মাউথ অরগ্যান বাজায়। দরকার হলে পাওয়া যাবে।

স্ত্রী—আমার ভেখ সার্টিফিকেটটা ওই মাউথ অরগ্যান বাজানো ডাক্তারের কাছে থেকেই নিস (একটু কাছ এসে) বুকে হাত বুলায়ে দেব।

(রাস্তার কুকুরটা কেঁদেই চলেছে)

মেয়ে—বাবা, কুকুরটা কীদেখ কেমন?

অবনী—ভূই যা ভীত বলব তোকে? কোনো আখ্যা টাখ্যা দেখে ভয় পেয়েছে আর কি! আখ্যারা কিন্তু যেখানে ইচ্ছে টুকে পড়তে পারে, জানলার দিকে মাথা দিয়ে ওস না, চুলের ঝুটি ধরে টেনে দিল হয় তো—।

ছেলে—এই তো একদফে আমাদের পরিচিত বাবাকে পাচ্ছি। মিহিমিছি এতরায়ে একটা নাটক করতে গেলে কেন বলতো?

অবনীবাবু ভীষণ লজ্জা পেলেন। বললেন, যাও এখন গুয়ে পড় সব। সকালের ঘানি

## পাহারাদার, আমরাও আছি

আনিথা ভট্টাচার্য

ঘুরতে আর বেশী দেরী নেই। ওরা যে যার ঘরে চলে গেল। নাটক শেষ হল। রাস্তার কুকুরটা আর কাঁদছে না। মরমে মরে গেলেন অবনী। বিড় বিড় করে মোহমুগ্ধের আওড়ালেন। কী দরকার ছিল এই ন্যাকামির, শুভমির? এরা যে সবসময়ই তাঁর প্রতির বিরূপ তা তো নয়। অনুভূতিতে ভালোমন্দের জোয়ার ভাঁটা আসে। এইটাই তো সংসারের নিয়ম। নিজেকে গালি দেন অবনীবাবু। মনে হল তাঁর বয়স হয়েছে কিন্তু বয়স পাকে নি। তবু মনে মনে সমস্ত নাটকটা চিন্তা করে হাসি পেল। এখন আবার আগের মত তাঁর নিজের জায়গাটা নির্জন। কোন শব্দ না করে রাস্তাঘরে গিয়ে একটু লিকার বানালেন। লিকার পর চিনি ছাড়া র-কফি। সাবধানে দরজা বন্ধ করে আবার বিছানায় গিয়ে বসলেন। বাইরে অপেক্ষা করা নিস্তব্ধ তাটা ভোবারমানের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। শরীরটা কেমন হালকা বোধ হতে লাগল। যেন শূন্য ভেসে আছেন। মন হারিয়ে গেল অনন্ত মহাকাশের শেষ দিশেতে তার ধারমিত্তি হিরণ্যগর্ভ অন্ধকারে। মনে হল একটা অতল শূন্যতার মধ্যে তিনি গলে গলে পড়ছেন। যেন একটা মোটামুড়ি রূপান্তর। কোন অনুভূতি নেই, চেতনা নেই। একটা সচেতন অচেতনা ধীরে ধীরে গ্রাস করতে লাগল। সামনে পিছনে যতদূর দৃষ্টি যায় সব ধোয়ামোছা। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ কিস্তি নেই। কী এক। সময় থেমে গেছে। চোখের সামনে একটা অন্য পৃথিবী। পাঞ্চভৌতিক সত্যায় সিরসিরিয়ে উঠল কণাদ মূনির পরমাণুবাদ। এই সময় অবনীবাবু হঠাৎ দেখলেন জানলার বাইরে শূন্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক। স্থির চোখে তাকিয়ে আছে অবনীবাবুর দিকে। লোকটাকে কেমন চেনা চেনা মনে হল। কিস্তি কিস্তি করে বললেন, — এটি তুমি কে? লোকটা কথা বলল না। শুধু হাতছানি দিয়ে অবনীকে ডাকল।

অবনীও তাকে ডাকলেন। লোকটা দেখতে দেখতে খুব ছোট হয়ে গেল। তারপর সার্কাসের ক্লাউনের মত নানা অঙ্গভঙ্গি করতে লাগল। কখনো শূন্যে ডিগবাজি খেতে লাগল। কখনো নীচে পড়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেল। কিছুক্ষণ গায়ে গাছে ঘাসে পাতায় নেচে বেড়ালেন। বাতাসে গা ভাসিয়ে বাতাস হরণে গেল। আবার কখনো শরীরটাকে বড় করতে করতে সমস্ত আকাশটা ভুড়ে রইল। কখনো আঙনের গোলা। কিংবা জলের মত তরল হয়ে ঝরে পড়তে লাগল। এইভাবে নানা খেলা দেখাতে দেখাতে সে আবার লোক হয়ে অবনীকে খেলা জানলার অদূরে ধাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে তাঁকে ডাকতে লাগল। চেনা চেনা লোকটা যে কে ভাবতে ভাবতে বিদ্রূপ চমকের মত অবনী বৃকতে পারলেন লোকটা তিনিনি। তবে ঘরের ভিতর বিছানার উপর বসে এই লোকটা কে? এয়ার কে? এ একটা স্টাফ করা মানুষের কিউরিও। বাইরের লোকটা অনেকক্ষণ ধরে অবনীকে ডাকল। ডাকতে ডাকতে ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল। সেই থেকে অবনীবাবু নির্ভোজ। তবে দিনক্ষণ বলা যাবে না।

প্রাক শরতের রাত এখন গভীর এবং থমথমে। কাঁপা কাঁপা হাতে মাটির কলসি থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে ঢুকক করে এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেলল দীপক। তারপর আর এক গ্লাস। চোখ জ্বলছে, মুখ জ্বলছে, বুকের মধ্যে প্রচণ্ড জ্বালা, মাথায় আঙনের হলকা। আসন্ন জলেও বৃষ্টি এ প্রদাহবে উপশম নেই। এজমালি কলঘরে গিয়ে প্রথমে চোখে মুখে জলের ঝাপটা, তারপর মাথায় জল ঢালা, তার ওপরে সর্বোচ্চ জলধারা — ফোঁকাপড়া ভদ্র স্তম্ভ শীতল করার জন্য দীপক প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। ভেজা শরীরে বৃষ্টি স্পন্দিত বাতাসের হিমেল হাওয়ার স্পর্শ মেখে বিছানার দিকে পা বাড়াতো গিয়ে থমকে দাঁড়ায়, অনুভব করে — কোনো লাভ নেই, আজ রাতে কিছুতেই ঘুম আসবে না। অনর্থক বিছানায় ছটফট করে কী হবে। খোলা বারান্দা থেকে দীপক রাস্তায় নামে। রাস্তা বলতে বাড়ির সামনের কানাগলি। এত রাতে সেখানে কেউ নেই। থাকলে দেখতে পেত মধ্যমাকৃতি মোটামুটি সুস্থী এক যুবক অস্থিরভাবে সদর দেবার সামনের জায়গাটুকতে অস্থিরভাবে পাঁচচারি করছে, কুড়ি পঁচিশ পা যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। তার হাত দুটোও স্থির নেই, কখনও মুঠো করে মাথার কোঁকড়ানো চুলগুলি ধরে জোরে টানছে — এত জোরে যে যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে টাট্টের দুপাশ কঁচকে যাচ্ছে — কখনও নিজের বুকে দুম দুম ঘৃষি মারছে। চলতে চলতে হঠাৎ কখনও দাঁড়িয়ে পড়ে মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটোকে আকাশের দিকে ছড়িয়ে দেয় কিংবা এমনভাবে অকস্মাৎ হাত পা ছুঁড়তে থাকে যেন মনে হয় কোনো অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করছে।

না, সে উদ্ভাদ নয়। শুধু আজকের প্রাক্‌শারদরাতের সমস্ত ওমেটি জ্বালা অন্ধকার অসহায়তা অনিশ্চয়তা একসংগে জমতি বেঁধে তার অস্তিত্বের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাকে অস্বাভাবিক করে তুলেছে। নিদারুণ অসহায় ফেলে দেয় সেই ফুঁসে, অতল গভীর হতাশায় সে ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে, নির্মম নিষ্ঠুর কাতরতায় সে মাঝে মাঝে ওমরে উঠে। চরম অপমানের তাঁর আঘাতে আজ সে জর্জরিত। এই অপমানের প্রতিকার তার জানা নেই, কিংবা বলা যেতে পারে সে জানে এই অপমানের প্রতিকার তার আয়ত্তাধীন নয়, সেই কারণে সে এত অস্থির উদ্ভাদ।

অথচ এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। আজ বিকালে সে যখন অগিমাকে নিয়ে বেরিয়েছিল, তখন বর্ষাক্ত আকাশ পরিষ্কার ছিল, এমন কি রোদের রঙ ছিল সোনালী। ফুবফুরে বাতাস, মনটা বেশ খুশি খুশি লাগছিল। বেরিয়েই একটা মিনিবাস পেয়ে গিয়েছিল এবং শুধু তাই নয়, পাশাপাশি দুটো বসার সীটও মিলেছিল। আগে থেকেই সিনেমার টিকিট কাটা ছিল। এসপ্লানেড অঞ্চলে একটা অভিজাত প্রেক্ষাগৃহে বিদেশি ছবি দেখেছিল। ছবিটা বেশ ভালো, মন ভরে গিয়েছিল। সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে একটা ভালো রেস্তোরাঁয় রাতের খাবার খেয়ে নিয়েছিল। তারপর আর একটা মিনিবাসে চেপে বাড়ি ফিরে আসছিল।

কোথাও কোনো জটিলতা, গোপনীয়তা সংকোচ বা বিদ্‌মাত্র অপরাধবোধের ছিটেফোঁটা ছিল না। অগিমা দীপকের বিয়ে করা বউ। একবছর আগে ঠিক এই দিনটিতে ম্যারেজ অর্জিত্যের কাছে যথার্থই সাক্ষী সাব্দ রেখে পুরোপুরি নিয়ামত তাদের বিয়ে হয়েছিল। আজ তাদের প্রথম বিবাহবার্ষিকী। সেই উপলক্ষে সিনেমা দেখা, রেস্তোরাঁয় খাওয়ার পরিকল্পনা।



যদিও লৌকিক অর্থে বেকার অর্থাৎ বাধাধরা কোনো চাকরি নেই, তবুও পকেটে টুইশনির টাকা ছিল। এবং পরিকল্পনা মফিক দিনটি উদ্দ্যাপন করার পক্ষে সে টাকা যথেষ্ট। তা ছাড়া একটা নিশ্চিত ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনা তার মনকে আকর্ষিত করে রেখেছিল। কয়েকদিন আগে একটা চাকরির ফাইনাল ইন্টারভিউ দিয়ে এসেছে। আজ তার ফলাফল খোঁজ করতে গিয়ে জানতে পেরেছে প্যানেলের তালিকায় তার নাম বেশ উপরের দিকে এবং চাকরিটা হয়েছে যেতে পারে। তবে একেবারে পাকা খবর কাল কিংবা পরও জানা যাবে। চাকরিটাই মোটের উপর ভালো। বেসরকারি বক্তৃতােনর হেড অফিসে আকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট। সব মিলিয়ে প্রথমেই মাইনে হবে প্রায় হাজার আটকে। একটা টুইশনি সে রেখে দেবে। তাছাড়া অনিবার্য দুটো টুইশনি আছে। সব ধরলে মোট রোজগার প্রায় দশ হাজার। দু জনের ছোটোখাটো সংসার মোটামুটি ভালোভাবে চলে যাবে। যত ছোটোই হোক একটা আলাদা বাসা সে ভাড়া করবে, আলাদা সংসার— তার আর অনিবার্য। একটা অদ্ভুত অস্বস্তিকর অপমানজনক ক্রোধান্ত পরিস্থিতির হাত থেকে তারা রেহাই পাবে।

বিকেল বেলায় এইসব সে ভাবছিল, ভাববে ভালো লাগছিল। অনিবার্য সঙ্গে আলোচনা করছিল, আলোচনা করতে করতে একটা সুখের নীড় গড়ে তুলছিল। চারদিক থেকে একটা নরম ভালোলাগার অনুভূতি তাদের ঘিরে রেখেছিল। প্রথম বিবাহবার্ষিকী এই দিনটা তাদের কাছে অনাবিল স্বপ্নময় একটা ফুলশয্যার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিল।

না, ফুলশয্যা তাদের হয়নি। একবছরের বিবাহিত জীবনে একদিনের জন্যও তারা পরস্পরকে নিবিড় করে কাছে পায়নি। এ এক অদ্ভুত যন্ত্রণাময় প্রলীকর পরিস্থিতি। অনিবার্য সঙ্গে দীপকের দীর্ঘকালের প্রেম— বিশ্ববিদ্যালয় পর্ব থেকেই। কথা ছিল, দীপক একটা চাকরি পেলেই ওরা বিয়ে করবে। কিন্তু তিনবছর সম্ভাব্য সর্বকর্ম চেষ্টা করেও চাকরি মেলে নি। ইতিমধ্যে অনিবার্য বাবা-মা মেরের জন্য পাত্র তথা বিয়ের দিনক্ষণ পর্যন্ত স্থির করে ফেললেন। অনিমা যে এত দুঃসাহসী স্থির প্রতিজ্ঞা কে জানত। (সোজা সে দীপকের কাছে চলে এল— ‘ বা হই হবে, জরুরি নোটিশ দাও, আমরা বিয়ে করব।’ দীপক দ্বিগ্নাশ্রয় ছিল, কিন্তু অনিবার্য অটলতার মুখোমুখি তার সব দ্বিধা চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। টুইশনিমাাত্র সঞ্চল করে সে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল। বিয়েটা গোপন রাখা সম্ভব ছিল না, কারণ অনিবার্য বাবা-মায়ের স্থির করি দিন দ্রুত এগিয়ে আসছিল। যখন জানাজানি হল, সংগত কারণেই অনিবার্য বাবা মেরোকে নিজের পথ দেখতে বললেন। উপায়ান্তরবিহীন অনিমা দীপকের বাড়িতে এসে উঠল। দীপকের বাড়িতে অবশ্য মানসিক বাধাটা তেমন জোরালো ছিল না। শুধু বেকার অবস্থায় ছেলে বিয়ে করছে, এইজন্য সমস্যা সঞ্চারিত ছিল। তবে সমস্ত পরিস্থিতির গুরুত্ব যথায়খ বৃষ্টিয়ে বলার পর দীপকের মা ব্যাপারটা অগত্যা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অন্য দিক থেকে, যা যোবার বাস্তব এবং আপাতত অনতিক্রম্য। বাড়িতে চারদেয়াল ঘেরা যেটুকু জায়গা, তাতে সর্ব সাকুলো দুখানা ঘর। সামনে ঘর ব্যবহার অপরিহার্য একফালি খোলা বারান্দা। বাসিন্দা দীপকের বিধবা মা, ছোট বোন, দাদা বৌদি তাদের এক ছেলে এবং দীপক নিজে। এখন অনিমা যোগ হল। একটা ঘরে ছেলে নিয়ে দাদা বৌদি থাকে আর একটা ঘরে মা আর বোন। খোলা বারান্দার এক কোণে অল্প একটু জায়গা চাটাই দিয়ে ঘিরে রান্নাঘর বানিয়ে নেওয়া হয়েছে, আর এক কোণে একটা সরু টোকিতে দীপকের শোওয়ার জায়গা। অনিবার্য সংসারভিত্তিক সমস্যা জটিলতর হল। অনিমা থাকবে কোথায়, শোবে কোথায়। হাজার হোক, চারদিক থেকে দেখা যায় এমন

একটা খোলা বারান্দায় তো তাকে শুতে দেওয়া যায় না। অবশেষে ঠিক হল, মায়ের ঘরেই কনোররকমে আর একটা টোকি টুকিয়ে অনিবার্য শোওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। গত এক বছর ধরে এই ব্যবস্থাই চলছে। অনিমা দীপক বিবাহিত কিন্তু দম্পতি নয়। ওদের সেই বিবাহিত জীবনের আজ ছিল প্রথম বার্ষিকী।

চৌরঙ্গী পাড়ার রেস্তোরাঁর রাতের খাবার খেয়ে একটা মিনি বাসে চেপে ওরা বাড়ি ফিরছিল। টালিগঞ্জ রেলস্টেশনের কাছে নেমে বাড়ি আসতে হয়। ওরা যখন মিনিবাস থেকে নেমেছিল, তখন আকাশে চাঁদ ছিল, হেঁচো হেঁচো মেরে আলোছায়ায় কুৎস ছিল, ভিজভিজ মন কেমন করা বাতাস ছিল আর ওদের হালকা মনটা বেশ খপ্পল ছিল। বাস থেকে নেমে অনিমা বলেছিল— চলো না গো, লোকের ধারে গিয়ে একটা বসি, তারপর বাড়ি ফিরব।

নির্জন লোকের ধারে ওরা বসেছিল। যে ফুলশয্যা ওদের জীবনে আসেনি অথচ যার উপরে তাদের অবিসংবাদিত অধিকার, সেই অলঙ্কৃত ফুলশয্যা তাদের দুজনকে আকর্ষিত করে রেখেছিল। সময় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, পরিবেশ লুপ্ত। তাদের মগ্ন চৈতন্য জুড়ে তখন শুধু বঙ্কিত দাম্পত্যের অম্বর মাধুরী।

অকস্মাৎ একটা ব্যাপ্যাকর্ষণ কর্কটররে স্তব্ধ সময় মাতালোর মত টলতে থাকে, অনাবিল মুগ্ধ পরিবেশ মুখ খুবড়ি পড়ে। দীপক অনিমা পরস্পরের কাছে থেকে ছিটকে দূরে সরে যায়, নিজেদের সামলে নেবার চেষ্টা করে। খান বান ছত্রভঙ্গ আলো ঐধারির বুক ফুঁড়ে সামনে দাঁড়ানো সাদাপোষাক কালো বেস্ট হাতে লাঠি এক অবয়ব। অব্যর্থ পাহারাদার। পা দুটো কঁক করে লাঠিতে ভর দিয়ে সামনের দিকে একটুখানি ঝুঁকে বারবার বিশেষ করে অনিবার্য দিকেই অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে বলে— বাহ বাহ, লীলা খেলার আর জায়গা মিলল না বুঝি?

আকস্মিক ধাক্কায় প্রথমটা দীপকের সমস্ত অনুভূতি অসাড় হয়ে পড়ে, তারপরেই মাথার ভিতরে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ, আগুন, ধোঁয়া। কী করছে, তার গুরুত্ব কী এসব বুঝে ওঠার আগেই সে উন্মত্ত ক্ষিপ্ততায় কনস্টেবলের বুকের উপর লাফিয়ে পড়ে— রাসকেল, মুখ সামলে কথা বল, নইলে সব কটা দাঁত উপড়ে ফেলব।

কনস্টেবল বোধহয় একটু হকচকিয়ে পিছু হটে। তারপর স্মৃতি ধারণ করে। খপ করে দীপকের ডান হাত ধরে মোচড় দিতে দিতে বলে— দেখো। কনস্টেবলের ছেলে বলেই মনে হয়, অথচ... ঠিক আছে, থানায় চল, তারপর ছেনালিপনার মজাটা বুঝবে। — সে দীপকের চিনতে থাকে।

দুর্বিপাকের গোড়া থেকেই অনিমা অনড় পাখর। যেখানে বসেছিল, সেখানেই নিশ্চল বসে থাকে। তার সমস্ত স্পন্দন সমস্ত শব্দ যেন সেটা থেকেই উৎসর্গিত। তার দিকে তাকিয়ে বলে— ঠাকুরগণ যে একেবারে নট নড়নচড়ন। ঘট হয়ে বসে থাকলে তো চলবে না, উঠতে হবে।

অনিমা তবুও নিষ্পন্দ বসেছিল। সে যেন একই সঙ্গে মুক এবং বহির হয়ে গেছে। কনস্টেবল এবার ধমকে ওঠে— আর চড় দেখিয়ে লাভ নেই। ওঠ বলছি, থানায় যেতে হবে।

থানায় তাদের যেতে হয়েছিল। অশ্লীল দারোগা। লোভী চোখ দিয়ে অনিবার্য সর্বাস লেহন করছিল। উচ্চারণের যোগ্য নয় এমন সব বাজা বাজা শব্দ এবং ভাষা ব্যবহার করে আত্মবিস্ময় সুখ উপভোগ করছিল। দীপক ততক্ষণে এক চরম বোধশূন্যতার শিকার, তার চোখে মুখে



কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। কষ্ট ভাষ্যহীন, শুধু একটা বোবা জগত্ব শব্দ থেকে থেকে গুমরে উঠে সমস্ত পরিবেশকে একটা অস্বাভাবিক পরাবাস্তবতার গভীর খাদের কিনারায় ঠেলে দিয়েছে, সামান্যতম পদস্থলনে দীপক অগ্নিমা খানা দারোগা কর্কশ কণ্ঠস্বর, অশ্রীল ইন্দ্রিতে যোর বাস্তব অতলে তলিয়ে যাবে। এমন কি, স্থূল দারোগা পর্যন্ত, কেমন একটা অসন্তোষে আক্রান্ত হয়।

একটু থমকে অনিশ্চিত কণ্ঠস্বরে থানাঘরের আবছায়ায় অনিয়ত ঢেউ তুলে কথার চিল ছুঁতে দেয়— হল কী, এরা কি সব বোবা না কি। প্রত্যন্তরে তবু কোনো কথা ভেসে আসে না। অগ্নিমা তেমনিই অস্তিত্ববিলাসী নৈশশব্দের প্রতিমা, আদৌ কোনো রক্তমাংসের মানুষ কি না সন্দেহ জাগে। দীপকের গোঙানিতে দৃষ্টিগতের ছেদ পড়ে, ফৌস করে অনেকটা বাতাস তার দমবন্ধ বুকের ভিতর থেকে সশব্দে বেরিয়ে আসে। সেই বাতাসের শব্দের সঙ্গে মনে হয় কিছু অশরীরী কথা যেন ভাসমান, কিন্তু বোধগম্য নয়। উৎকণ্ঠ দারোগা সাগ্রহে বলে— হ্যাঁ, হ্যাঁ, কী বলছিলেন, বলুন।

ফৌসস্বরে দীপক এক গ্রাস জল চায়। তারপর একটি মুমূর্ষু মানুষের শেষ প্রত্যয় উচ্চারণের ভঙ্গিতে ভাঙা গলায় ফিসফিসিয়ে বলে— বিশ্বাস করুন, আমরা কোনো অপরাধ করি নি, আমরা দুজন স্বামী স্ত্রী।

হতবাক দারোগা বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে দুলতে বলে— বলছেন কি মশাই, আপনারা স্বামী স্ত্রী! বলতে বলতে ধীরে ধীরে তার স্বাভাবিক মূর্তিতে ফিরে আসে— নাঃ মশাই, ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। স্বামী স্ত্রী, তো মাঝরাতে লেকের পাড়ে হামলে পড়া, এটা কেমন কথা। কোথায় যেন একটা কিছু গড়বড় আছে। আমার পুলিশ জীবনের বিশ বছরে এমন ঘটনা দেখা তো দূরের কথা, শুনিও নি।

জীবনের যে চরম গ্লানি, গোপন যন্ত্রণা, দুঃসহ অপমান তার একান্ত আপন এবং নিজস্ব, আত্মরক্ষার খাতিরে আজ তা নির্দিষ্টায়া পাহারাদারের কাছে মেলে ধরতে হল। সে যে সত্যিই অগ্নিয়ার স্বামী তার অকটা প্রমাণ সে প্রয়োজনে হাফিজ করতে পারবে। ইচ্ছা হলে দারোগা এখনই তার বাসায় গিয়ে সনাতনকরণের জন্য তার দালাকে ডেকে আনতে পারে। এই তার বাড়ির ঠিকানা, থানা থেকে বেশি দূরে নয়। চাঁৎকার করে গলা ফাটিয়ে তার বলতে ইচ্ছা হয়েছিল— হ্যাঁ, দারোগাবাবু, ঠিকই বলেছেন গড়বড় একটা আছে। কিন্তু সেটা স্বামী-স্ত্রীর লেগের ধারে নির্জন মাঝরাতে পর-পরের বনিষ্ঠতা বন্ধতর মাঝে নয়, সেটা আছে মানুষের দ্বন্দ্বসম্ভব কিছু কিছু চাওয়ার মধ্যে, চাওয়া এবং পাওয়ার মাঝখানে পাহারাদারের আবির্ভাব। কিন্তু সে কথা তার বলা হয়নি। চুপ করে ছিল।

যদি হোক, দারোগা তাকে এবং অগ্নিমাতে আরও গোটা কয়েক প্রশ্নের পর ছেড়ে দিয়েছিল। সাবানাবাণী উচ্চারণ করে বলেছিল— ভবিষ্যতে এমনভাবে আরবেগ ভেসে যাবেন না, যান, এখন বাড়ি যান।

এক অতলস্পর্শী নৈশশব্দা যেন অগ্নিমাতে গ্রাস করে রেখেছে। সেই তখন থেকে একটি শব্দও তার মুখ দিয়ে বেরোয়নি। দীপক তার মুখের দিকে তাকাতো পাচ্ছিল না। গভীর নিশ্বাসে তারা পাশাপাশি হেঁটে এই কিছুক্ষণ আগে বাড়ি ফিরেছে। বাড়ির সকলেই তখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। অলকা ঘুমচেয়ে উঠে এসে দরজা খুলে দিয়েছিল। হাই তুলতে তুলতে একবার শুধু বলেছিল— এত রাত হল? ঠিক প্রশ্ন নয়, একটা বিবৃতি। জবাবের দায় নেই,

প্রত্যশাও নেই। অতএব হিমকঠিন নৈশশব্দা কোনোদিকমুখ চিড় ধরে না।

কলতলায় হাত মুখ ধুয়ে অগ্নিমা সোজা শোবার ঘরে ঢুকে গেছে। পাহারাদারের আবির্ভাবের পর থেকে তার মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বেরোয়নি। চোখের আলোয় নিশ্চিন্ত স্থিরতা। রক্তশূন্য ফ্যাকাসে ভাবলেশহীন মুখে মমির প্রলেপ, নড়াচড়ায় অস্বাভাবিকতা। তার চোখ মুখ নড়াচড়ায় পাথরপ্রমাণ মৌনতার স্থবিরতায় দীপক অস্বাভাবিকতার আভাস খুঁজে পায়, ব্যাকুল হয়।

বাড়ির সামনের অন্ধকার সর্ব কানাগলিতে উদ্ভাস্ত্রের মত পায়চারি করতে করতে আজকের ঘটনার সূত্র ধরে মাথার মধ্যে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাওয়া অসংলগ্ন ভাবনার উদগারে দীপকের সমগ্র অস্তিত্ব জ্বলা ধরেছিল। সে ক্রতবেগে হাঁটছিল, মুষ্টিবদ্ধ হাত মাঝে মাঝে উঠে এসে বুকের কপাটে সজোরে আঘাত করছিল, মাথার চুল টেনে উপড়ে ফেলায় এমন মনে হচ্ছিল। কিন্তু নিতান্ত শারীরিক কারণে একসময় ক্রান্তি তাকে গ্রাস করে। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। ক্রান্ত বিধস্ত ক্রোদে অস্তিত্বটাকে কোনোরকমে অপরিসর খোলা ব্যারান্ডার বিছানায় টেনে আনে। তারপর গভীর অবসাদে সমস্ত দ্রাব্য বিকল হয়ে যাওয়াতে শেষরাতে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমের মধ্যে সে এক বিশাল সর্বব্যাপী পাহারাদারকে স্বপ্নে দেখেছিল, যার অবয়ব আছে কিন্তু চোখমুখ নেই।

পরদিন ভোরবেলা মা এবং বানোর সমস্বরে তীক্ষ্ণচাঁৎকারে দীপকের বিকল হয়ে যাওয়া দ্রাব্যক্ষেত্র আবার উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে চাপা বিকৃত কণ্ঠে বলতে থাকে— মা, অলকা— কী, কী হয়েছে... মা, অলকা।

অলকা ছুটে ব্যারান্ডায় বেরিয়ে আসে, তীর উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বলে— ছোটদা শীগগির আয়, ছোটবৌদি কিছু একটা সর্বনাশ করেছে।

ঘরে ঢুকে দীপক দেখে মা বিছানায় শোওয়া অগ্নিমাতে প্রবলভাবে কাঁকুনি দিয়ে আর তার নাম ধরে ডাকছে। অগ্নিমা চোখ মেলেছে না। একটা নিশ্চিন্ত বোধশূন্যতায় দীপক হাণু হয়ে থাকে, তার গলা দিয়ে শুধু একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরিয়ে আসে, কিন্তু স্পষ্ট কোনো কথা ফোটে না।

ইতিমধ্যে দাদা বৌদিও এ ঘরে আসে। অলকা এবং মায়ের জবানিতে জানা যায় ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে বাইরে আসার সময় মায়ের নজর পাশের টোঁকিতে গুয়ে থাকা অগ্নিয়ার উপর পড়ে।

অগ্নিয়ার শোওয়ার ধরন দেখে তার কেমন খটকা লাগে, অগ্নিমাতে ডাকতে থাকেন, দুয়েকবার গায়ে হাত দিয়ে ঠেলাও দেন। কিন্তু কোনো সাড়া না পেয়ে অলকাকে ডেকে তোলেন। অলকাও অগ্নিমাতে জাগাবার ব্য্থ চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে অলকাকে নজরে পড়ে মায়ের জন্য সদ্য কিনে আনা ঘুমের ট্যাবলেটের স্থিতিপটা অগ্নিয়ার মাথার কাছে জানালার তাকের উপর পড়ে রয়েছে, পাত্রে প্রায় খালি জলের গ্রাস। স্থিতিপটা পরীক্ষা করে দেখা গেল সব কাটা ট্যাবলেট উধাও। জাতজানের পরামর্শ মত মা রোজ রাতে একটা করে ঘুমের পিঁড়ি খান। কালই এই স্থিতিপটা কিনে আনা হয়েছিল তার থেকে মায়ের জন্য খরচ হয়েছে মাত্র একটা। অর্থাৎ বাকি নটা ট্যাবলেট অগ্নিমা খেয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার। তারপর মা এবং বানোর সমস্বরে চাঁৎকার।



অর্থাৎ অশ্রু আশ্রয় করে চলেছিল। সকলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে দীপকের দিকে তাকায়। কিন্তু এখন জবাবদিহির সময় নয়। দাদা অশ্রুধার দিকে এগিয়ে যায়, নাকের কাছে হাত রাখে। বলে, এখনও নিঃশ্বাস পড়ছে। বলেই ছুটে বেরিয়ে যায়।

দীপক নিশ্চল দাঁড়িয়েই থাকে, কোনো কথা বলে না, কোনো রকম চঞ্চলতা প্রকাশ করে না, যেন চারপাশে ঘটে যাওয়া এই সব ঘটনার সঙ্গে তার নিজের কোনও যোগ নেই।

কিছুক্ষণ বাদে পাড়ার ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে দাদা ফিরে আসে। ডাক্তারবাবু দেখে শুনে হাসপাতালে নিয়ে যাবার পরামর্শ দেন।

হাসপাতাল। এমারজেন্সি ওয়ার্ড। ডিউটিরত বাস্ত ডাক্তার প্রশ্ন করে— কেসটা কীসের? কোনো উত্তর না দিয়ে দীপক বাড়িতে ডেকে আনা ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনটা এগিয়ে দেয়। হাসপাতালের ডাক্তারের মুখে নৈবাভিক্তির বিরক্তি মাথানো গাভীরের ছাপ পড়ে— স্লিপিং পিল। আটমপটেড সুইসাইড। থানায় খবর দিয়েছেন?

— আজে না, এমারজেন্সি কেস, সময় পাইনি সরাসরি হাসপাতালে নিয়ে এসেছি।

— এসব কেস আমরা সরাসরি টেক আপ করতে পারি না, নিয়ম নেই। প্রথমেই থানায় রিপোর্ট করতে হয়, রিপোর্টের কপি নিয়ে হাসপাতালে আসতে হয়।

— কিন্তু ততক্ষণে তো অনেক দেরি হয়ে যেতে পারে। কেস পুরোপুরি চিকিৎসার বাইরে চলে যেতে পারে। তখন দায়িত্ব কার হবে।

মানবিকতার খাতিরের ডাক্তার বুঝি একটা সদয় হয়। বলে— আচ্ছা, ঠিক আছে। একজন কেউ থানায় চলে যান, আর একজন এখানে থাকুন। পুলিশে খবর দেওয়াটা খুবই জরুরি। জেনারেল ডায়েরির এন্ট্রি নম্বরটা নিয়ে আসুন, তার মধ্যে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ফরমালিটিগুলো তো মানতেই হবে।

দাদার হেফাজতে অগিমাকে রেখে দীপক আবার সেই থানায়। পুলিশ—দারোগা—পাহারাদার। পাহারাদারের অবয়ব নির্বিশেষ, মুখোশ আছে মুখশী নেই। কাল রাতের পাহারাদারেরা—সেই কনস্টেবল, সেই দারোগা—আজ সকালেও কি তরাই রয়েছে পাহারায়? কিন্তু এসে যায় না অবশ্য, কারণ পাহারাদার তাদের নৈবাভিক্তির অবয়ব নিয়ে সব সময় খেঁকেই যায়—সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে সকাল—ধুলোয় মাটিতে কঠিন পাথরে নরম ঘাসে স্বপ্ন দেখার আগে, স্বপ্ন দেখার সময়, স্বপ্ন ভেঙে খান খান করে দিয়ে চরম গ্রানির মুহূর্তে, লজ্জায় অপমানে, দুঃসহ আত্মবিস্ময়ান্বিত গ্রানি থেকে মুক্তির লগ্নে অমোঘ অনিবার্যতায় পাহারাদারের আনাগোনা আবশ্যিক নিয়ম, মেনে চলতে হয়।

ডায়েরি লিপিবদ্ধ হয়। ভারপ্রাপ্ত পাহারাদার সন্ধ্যা চোখ মেলে বলে— আশ্রয়হত্যার চেষ্টা একটা স্টোজারির অপরাধ। জবানবন্দী নিতে হবে, অনেক জবানবন্দী, জানতে হবে প্ররোচনা ছিল কিনা, কার দেখ ইত্যাদি। কিন্তু এখন তো জবানবন্দী নেওয়া যাবেনা কারণ মূল আসামী সংজ্ঞাহীন। এমুণি তার চিকিৎসা করতে হবে। জ্ঞান ফিরলে জবানবন্দী। পাহারাদার তখন অগিমাকে প্রহর করবে। এখন দীপক পাহারাদারের ছাড়পত্র নিয়ে ফিরে যাক। হাসপাতালের ডাক্তারের পক্ষে আর কোনো নিয়মের বাধা থাকবে না।

বিকেলের দিকে অগিমার জ্ঞান ফিরে এল। ডাক্তার আশ্বাস দিয়েছে আউট অফ ডেঞ্জার। দীপক এমার্জেন্সি ফিমেল ওয়ার্ডের দরজায় এসে দাঁড়ায়। ঘরময় ঠাসঠাসি বেড। জীবমৃত্যু

যন্ত্রণা-শ্রাব ফিনাইল ডেটেলের মিলিত গন্ধ, সংস্রাচ্ছন্ন পরিজনের কলগুপ্তন, সীসার মত ভারি দমচাপা বাতাস। এইখানে মৃত্যুর কবল থেকে জীবনকে ছিনিয়ে আনার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা হয়, অপর প্রান্তে কোণের দিকে মেয়েঘর পাতা একটা বেড়ে অগিমা শুয়ে আছে। এখন তার চোখ দুটো খোলা, দরজার দিকে মেলে রয়েছে। অগিমার চোখে দীপকের চোখ পড়ে। দীপক ধীরে পায়ে এগিয়ে যায়, অগিমার পাশে এসে দাঁড়ায়।

— কেমন আছে? মৃদুস্বরে দীপক জিজ্ঞেস করে।

অগিমা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর অতিক্রীণ ক্রান্ত কণ্ঠে বলে— যে ইন্টারভিউটা দিয়ে এসেছিল তার কোনো খবর পেলে?

সম্ভবতঃ ধরে নিয়ে আসা কোনো মানুষ যেমনভাবে থানার দারোগার প্রশ্নের উত্তর দেয়, তেমন শীতল সমতল কণ্ঠে দীপক বলে— আজ তো নয়, কাল খবর নেওয়ার কথা। কাল খবর পাবে। মনে হয়, হয়ে যাবে। কেমন আছে বললে না তো।

অগিমা দীপকের দিক থেকে ধীরে ধীরে মুগ্ধা ওপাশে ঘুরিয়ে নেয়। তারপর ফিসফিস করে বলে— আছি। তুমি?

দীপক হাসপাতালের মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে নেয়, একটু সময় নিয়ে বলে— আমিও আছি।

খট খট জুতোর শব্দ হয়। একটা অবয়ব এগিয়ে আসছে। পাহারাদার। গ্রানিমুক্তির বার্থ চেষ্টার দায়ে অভিযুক্ত চেতনায় ফিরে আসা অগিমার জবানবন্দী নেওয়া হবে। জবানবন্দীর বয়ান তার জানা আছে। পাহারাদার এবারও তাকে ছেড়ে দেবে, ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। এমনি করে বার বার। ধরবে আর ছাড়বে। অগিমা আছে, দীপকও আছে। অগিমা থাকবে, দীপকও থাকবে।

## জীবনের জন্য

### জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

চৌত্রিশ বছরের একটানা চাকরিতে, মহেশবাবুর অনেক ছুটি পাওনা ছিল। চার মাসের মত বাড়িতে কাটিয়ে, আজ অবসর নেওয়ার দিন, তিনি শেষ আঁশ স্যাঁতান। কাল থেকে তার মুক্তি। বাকি দু-দশ বৎসর যদি থেকে থাকে ভাল। নিজের ইচ্ছে মত তা খরচ করবেন। গত চার মাস তিনি কারো সঙ্গে দেখা করেননি। ঘর থেকে বের হ'নি। চার মাসে দাড়ি কামাননি। আরও চার মাস পিছিয়ে ধরলে, আঁট মাস চুল কাটেননি। গেরুয়া আলখান্না দু সেট গোপনে বানিয়ে রেখেছিলেন। পুরো ত্রৈমাসে আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিচ্ছায়া দেখে, নিজেই পুলকিত হলেন। সংযত চরিত্রের মহেশ অধিকারী আজ আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। একটু জোরেই হাঁক দিলেন— 'নীলা একবার দেখ যাও তো কেমন মানাচ্ছে?' ওদিক থেকে কোন সাড়া শব্দ নেই। মহেশ বাবু আরও বার তিনেক হাঁক দিলেন। নীলা রান্না ঘর থেকেই উত্তর দিল— 'কানে কি কালা? শুনতেই তো পাচ্ছি।'

মহেশ বাবু কিছুটা অনুচ্চ কণ্ঠেই বললেন— 'শেষ বয়সে স্বামীদের একবারের ডাকতো কোন স্ত্রীই শুনতে পায় না। তাই একটু—'

নীলা শাড়ীর আঁচলে হাত মুছতে মুছতে সামনে এসে বিষময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মুখ থেকে অক্ষুট স্বরে স্তব্ধ বিষময়ে বললেন— 'এ কি শুনে বাবা! ঘাটের মড়া!'

মহেশবাবু হাসতে হাসতে বললেন— 'সবই তোমার জন্য। আজ রিটার্নমেন্ট, কাল থেকে তো কিছু করে কমে তো খেতে হবে। তোমার ইচ্ছায় ঘাটের মড়া হতে রাজী আছি। কিন্তু তাহলে যে অকালে বিধবা হবে।'

সকাল আটটা সতরোর লোকাল। একটানা গত চৌত্রিশ বছর, সেই কয়লায় টানা ইঞ্জিনের অহম থেকে দ্বিতীয় বর্ণিতে মহেশবাবুরা যাতায়াত করেন। অন্যেরা তাস খেলত। মহেশবাবু বরাবরই হয় জ্যোতিষ, নয় সাধু সন্ন্যাসীদের জীবনী পড়তেন। আজ ট্রেনে উঠতেই সবাই হৈ হৈ করে উঠল। রেলদপ্তরের অমল বলল— 'দাদার তো আজ ডেইলি টিকিট।' 'সুবি বলল— 'চেনাই যায় না। বৌদি মেনে নিল?'

অনেকের অনেক প্রশ্ন। মহেশবাবু কত আর উত্তর দেবেন। শুধু অমলকে বললেন— জালার ধারে আমার সিটটা আবার ছেড়ে দিতে হবে। এখন থেকে রোজ আবার যাচ্ছি। এ সিটটাই আমার চেষ্টার।

— চেষ্টার?

— বোকা। ট্রেনে একটু ভিড় হলেই 'তোরা দু' এক জন হাতটা আমার কাছে মেলে ধরবি। যা যা বলব সঙ্গে সঙ্গে বলবি অসাধারণ। ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে। বাসু আর পায় কে? দেখবি কত খন্দের। সন্তোম বলল— 'তার দরকার হবে না দাদা। জ্যোতিষী আপনি ভালোই জানেন।'

— 'সে ভালো তোদের কাছে। তোরা ঘরের লোক। বিনি পয়সার খন্দের। বাইরে খাটি গরখুঁতের দাম কিংবা ৪ টা বাট চাই। টেড়া পেটালো মাড়ো লাফায়।'

— দুপুরটা কি করবেন?'

— 'কেন? বউবাজারের পাথরের দোকান। সন্ধ্যায় আবার তাদের সঙ্গেই ফিরব।'

মহেশ বাবুর চেষ্টার মতো। বাকুঝাকে। পরাধীন ভারতে জন্ম। তাই ঠিক ঠাক জোক্তর হতে পারেননি। তবুও যে কাজে যা। উকিল হব, আর শামলা গায়ের থাকবে না তাহি কি হয়? এ সব কাজের এই দম্প্ত। জ্যোতিষী বা ভাগ্যগণনা, বই পড়ে তিনি শিখেছেন ঠিকই। তবু তার মনে হয় যে হাত বা কোষ্ঠীতে মানুষের পুরো ছায়া পড়ে না। একটু ফাঁক থেকে যায়। আসলে জ্যোতি-দর্শন না হলে জ্যোতিষী হয়না।

হাওড়া বর্ধমান কর্ডের সুপার ফার্স্ট লোকাল। আঁপিস যাত্রীই বেশী। গ্যালপিং ট্রেন। সব স্টেশনে থামেনা। কামারকুণ্ড থেকে একজন মহিলা উঠলেন। হাতে টিফিন কারিয়ার। বসস কম। মনে হয় দু' এক বছর বিয়ে হয়েছে। স্থিতির সঙ্গে সিঁদুর ঠিক পাকাপাকি লেপ্টে যায়নি। মাথায় আধ-যোমটা। ট্রেনে উঠে মহেশবাবুকে দেখে সম্মোহিতের মত অপলকে তাকিয়ে রইলেন। পরের স্টেশন বারই পাড়া। একজন নেমে যেতেই দু'জনকে ভিসিয়ে মহেশবাবুর পাশটাতে এসে বসলেন। এ খানটায় বসতে পারাটা যেন পরমপ্রাপ্তি বলে মনে হল। হঠাৎ নীচ হয়ে মহেশবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে বলল— 'বাবা আমাকে একটু কুপা করতো হবে।'

মহেশবাবু বিব্রত বোধ করলেন। বললেন— 'মা জ্ঞানী আমি সাধারণ জ্যোতিষী। কুপা তো করেন সাধু মহাশয়ার।'

— বাবা আমার স্বামী হাসপাতালে। রোজ এই ট্রেনে দুপুরের খাবার নিয়ে যাই। দিন দিন অবস্থা খারাপ হচ্ছে।'

মহেশবাবু এসব কথা খবর কি দেবেন ভেবে পেলেন না। আরও নানান কথা খাঁকি ফাঁকি কিছুটা অনুমান করে বুঝলেন যে মেয়েটির বাড়ি কাছে পিঠে। ভালোবেসে বিয়ে করেছিল। ছেলোটো স্বজাতির নয়। স্বামী বা বাপের ঘরের নিকট আশ্রয় বড় একটা কেউ নেই। স্বামী সরাফারী চাকুরে। পেটে আলসার। আজ ভালো থাকে তো, কাল খারাপ। শিয়ালদার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। ঝাড় ফুক তুক তাকের পর হাসপাতাল। ভর্তি হতে তাই একটু দেবী হয়েছে।

মানুষের একটানা দুঃখের কাণ্ড শুনতে খারাপ লাগে। মাঝে মাঝে দু' একটা কথা বলতেই হয়। হাইলে লোকে কষ্টদয়ীনে ভাবে। মহেশবাবু নিঃসন্তান। এই বৌটির ওপর একটু মমতাবোধ করলেন। বার্কাকের শেষ বেলায় পৃথিবীর মানুষকে ভালবাসার ইচ্ছে জাগে। সন্তানের মত কাউকে আঁকড়ে ধরতে পারলে, মনে হয় আরও কিছুদিন বাঁচার অধিকার হয়ত বেড়ে গেল।

অথচ আজকেই প্রথম গেরুয়া পরে সংসারের বন্ধন আলগা করতে চাইছিলেন, আর আজকেই নতুন করে বন্ধন। মহেশবাবু মেয়েটির কথা খাঁকি ফাঁকিওলি সহন্যভূতি দিয়ে জোড়া লাগাতে চাইলেন। বললেন— 'সত্যিই তো। — আহা, —না বাপু বড় বিপদ—'

দুঃখের কথায় সহন্যভূতি জানালে দুঃখীর মনে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় চোখের জল টলমল করে। অশ্রু সংকলন। মহেশবাবুর গেরুয়া বসনে দু' ফোঁটা চোখের জল টপ করে ঝরে পড়ল। তার মনে হল গেরুয়া বস্ত্র কি কঠিন বস্ত্রের বাপু। প্রথম দিনেই এই তাপের পবিত্র বস্ত্রে মানুষের ত্রিতাপ জ্বালায় আঁচ এসে লাগল। বাকী দিন তো পড়েই আছে।

বৃষ্টির নাম উঠা। মহেশবাবুর সহন্যভূতি, কষ্টঘরের আর্দ্রতায় সে হঠাৎ মনে কেমন হয়ে গেল। চটকতে মহেশবাবুর পায়ের কাছে উপুড় হয়ে আঁত কণ্ঠে বলে উঠল — 'বাবা বাঁচান!' ট্রেনে ভর্তি লোক। যাই মনে দুঃখ দাড়ে দেহে গেরুয়া বসন থাকে থাকুক, কিন্তু আজ বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত তিনি এস-এস ব্রেশওয়াল কোম্পানীর চিফ সেক্রেটারী। তার আভ্যন্তরে তেরটি



চা বাগান। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন তার কোন ক্ষমতাই নেই এই মেয়েটির দুঃখ দূর করার। এক গাড়ী লোক। তাকে হয় নিষ্ঠুর অথবা ভণ্ডাবাছে ছিঁ ছিঁ। তার মত মানীলোকের এক কি দৃষ্টি। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, গাছ-পালা, বাড়ী ঘর, মানুষ। মানুষের সংসার। ক্ষত এসেই মিলিয়ে যাচ্ছে। মহেশবাবু মনে হ'ল যে আর থামার কোন উপায় নেই। এতদিনকার সহযাত্রী রেল দপ্তরের অমল পাশে বসে মহেশবাবুর অবস্থা বুঝতে পারছিল। সে বৌটিকে হঠাৎ বলল— 'ছিঁ ছিঁ মা, বাক্যকে এভাবে বিবর্ত করলে চলে? আচমকা কিছু চাইলেই কি হয়? আগে উনি মহানিশার ধ্যানে বসুন, পরে এ গাড়ীতে ওকে রোজই পাবেন।'

পরের দিন কিন্তু মেয়েটি এল না। তার পরের দিনও না। প্রায় মাসবাক্যে বাদে হঠাৎ মেয়েটি ট্রেনে উঠল। মহেশবাবু কেন, অমলও চিনতে পারেনি। বিধবার পোশাক। কদিন আগেও যে সিঁথিতে সিঁদুর ছিল, একটু তাকালেই তা বোকা যায়। সে মহেশবাবুর পাশেই এসে বসল। নিজেই বলল— 'বাবা আপনি আর কি করবেন, সবই আমার কপাল!'

— 'এখন যাচ্ছ কোথায়?'

— 'এখনও উইডো পেনসনের কাগজপত্র ঠিক হয়নি। তাছাড়া যদি ওর অফিসে একটা চাকরি পাই—চেষ্টা তদ্বির না করলে কিছুই যে হয়না।'—মেয়েটি বলল।

— 'আর ক'দিন ইঁটাতাড়ি করতে হবে?'

— 'দেখি'

এসব কথাই কথা বাড়ালে দুঃখ কষ্ট বাড়ই বই কমনা। মহেশবাবু আর কথা বাড়ালেন না। তার নিজের সন্তান নেই। মেয়েটির ওপর একটু মায়ামি হয়। যতই এই শেষ, আর হয়ত দেখা হবেন। নিজের নাম ঠিকানায় একটা ছাপানো কার্ড পকেট থেকে বার করে মেয়েটিকে দিয়ে বললেন— 'মা তোমার ভাগ্য, তোমার। শুধুই তোমার। আমার কিছুই করার নেই। তবে যদি কোনদিন কোন প্রয়োজন বোধ কর আমাকে মনে রেখ।'

কামারকুণ্ডতে মেয়েটি নেমে যেতেই রেলদপ্তরের অমল মহেশবাবুকে খেঁকিয়ে উঠল বলল— 'দাদা কি দরকার ছিল উটাকা খামেলার?'

মহেশবাবুও লজ্জা পেলেন। বললেন— 'সদা বিধবা তো মায়ামি হ'ল।'

অমল আরও দু'চার কথা বলত। মহেশবাবুই লজ্জিত পরে বললেন— 'আসল কথা কি জানিস ট্রেনে উঠলেই মনিটা কেমন যেন বাড় হয়ে যায়। বিশাল মাঠ বিশাল আকাশের মধ্য দিয়ে যাই তো।'

মহেশবাবু আরও দু'একটা ভাবের কথা হয়ত বলতেন, কিন্তু এই হঠাৎ পথে দেখা হওয়া মেয়েটির জন্য তার মনে খুব ভারী হয়ে বইল। বিশেষ করে সেই প্রথমদিন স্বামীকে বাঁচাবার জন্য তার তীর আকুলতার কথা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না। নিজের মনে মনে বললেন— 'আহা সীতা সারিতীর দেশের নাম-ই তো ভারতবর্ষ।'

মহেশবাবু মেয়েটির কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। সেদিন সকাল থেকেই প্রবল বর্ষণ। বিকালের দিকে জোরে বৃষ্টি নামল। অনেক কষ্টে হাওড়া এসে পৌঁছলেন। দশটা বেজে গেছে। ঘরে ফেরার যাত্রী ঝড় একটা নেই। ফাঁকা ট্রেন। সারা দিনের ধকল। ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। একটা বিকট বাজ পড়ার শব্দে তত্না ভেঙ্গে পেল। তাকিয়ে দেখলে মাঠের মাঝখানে ট্রেনটা থেমে আছে। পাওয়ার ব্রক। ট্রেনের কামরায় একিকটায় মহেশবাবু আর এক পাশে বোধ হয় দু'একজন বসে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমক দেখা যেতে না যেতেই পলকে মুছে যাচ্ছে।

ওদের স্পষ্ট করে দেখা যাক বা না যাক দু'একটা কথা কানে আসছিল। মহেশবাবুর কান খাড়া হয়ে উঠল। তার পোশাকের বড় গেলুকা। কানের রঙ আর দশজনের মতই।

— মেয়েটি বলে উঠল— 'এই ধোং হচ্ছেটা কি।' তারপর একটা গিল্ গিল্ হাসির শব্দ। আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। মেয়েটি আবার বলে উঠল—

— 'তুমি বড় ছেলেরানুস'

— 'আর তুমি?' এবার পুরুষ কণ্ঠ

— 'আর যাই হোক তোমার মত বেহায়া নেই।' মহেশবাবু উৎকণ্ঠ হয়ে অনুভব করলেন যে নারী কণ্ঠ মধুময় এবং অন্ধকার হলে পার্থিব আর অপার্থিব পৃথিবী একাকার হয়ে যায়। একাকার হ'ল না। আলো জ্বলে উঠল। মহেশবাবু তাকিয়ে চমকে ওঠার আগেই মেয়েটিই এগিয়ে এসে প্রণাম করে বলল— 'বাবা এত রাতে?' তারপর হৈকে ছেলেটিকে ডেকে বলল— 'এই শুনছ এদিকে এসো, প্রণাম কর।' ছেলেটি অনিচ্ছাসত্ত্বেও অবনত হওয়ার ভঙ্গী করল। এরপর মহেশবাবুকে আর প্রশ্ন করতে হল না। মেয়েটিই গড় গড় করে অনেক কথা বলে গেল। তার সার মর্ম কতকটা এই রকম—মেয়েটির অর্থাৎ উমার স্বামীর অসুখের সময় এই ছেলেটি অনেক সাহায্য করেছে। স্বামী মারা যাবার পর একা বিধবাকে সবাই বানের জলে ভেসে আসা বেওয়ারিশ পুকুরের মাছের মত ভাবে। তখন এই ছেলেটি চওড়া বুক দিয়ে দাঁড়ায়। তারপর এক সময়—

মহেশবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারলেন না। একটু মুদুরে বললেন— 'সবই ঠিক, তবুও এত তাড়াতাড়ি। একটা স্মৃতি মুছতে না মুছতেই—'

উমা উত্তর বলে উঠল— 'আমার মত স্বামীর স্মৃতি খুবই সত্য। আবার আমাকে সংসারে বেঁচে থাকতে হবে সেটাও তো মিথ্যে না।'

মহেশবাবু আর কথা বাড়ালেন না। তবুও তার মনে হ'ল, এই মেয়েটি গত বছর হয়ত প্রথম স্বামী নিয়ে সংসার করেছে। এ বছর এক দ্বিতীয় স্বামী। যুগ যুগ ধরে বিবাহিত জীবনের প্রাথমিক সংলাপ তো একই থাকে। সেখানে মেয়েটির প্রথম প্রেমের উজ্জ্বল অক্ষরগুলি সমানভাবে কি জ্যোতির্ময় থাকবে? বইয়ের বর্ষা আরও জোরে চেপে এল। ঘন ঘন বাজ পড়ছে। মোঘাচ্ছন্ন বিশ্ব চরাচরে প্রলয়। মহেশবাবু আপৎকারণের বিধি-বিধানেরও যে কি অসীম মূল্য তা অনুভব করার চেষ্টা করতে লাগলেন। তবু একবার জিজ্ঞাসা করলেন— 'ছেলেটি কি করে মা?'

— উমা ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিল— 'তেমন কিছু নয়, তবে দু'এক মাসের মধ্যেই একটা ব্যবসা সুরু করবে।' মহেশবাবু দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়লেন। মেয়েটি তার নতুন স্বামীকে নিয়ে কামারকুণ্ডতে নেমে গেল। ট্রেনে এখন তিনি একা। তার মনে হ'ল বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকে, তার পরপর কয়েকটি এমন ভুল আছে যা পরের জীবনে শুধরে নিলেও, স্ত্রী এখনও তাকে সেই প্রসঙ্গ থেকে রেহাই দেননা। তার বারবার মনে হত যে আর একবার যদি বিয়ে করার সুযোগ আসত, তাহলে এ ভুলগুলি আর হত না। সেই সুযোগ তার জীবনে আসেনি। মেয়েটির জীবনে তো এল। এরপরে ওরা সুখে থাকবে।

এরপরেও মহেশবাবু এদের দু'জনকে কখনও সখনও একসঙ্গে যেতে দেখেছেন। চোখে মুখে খুশী খুশী ভাব। হঠাৎ মনে দুয়েক বাদে দুপুরের ট্রেনে মহেশবাবু একা ফিরছেন। সঙ্গী সাথীরা ফেরে বিকলে হঠাৎ মেয়েটি মাছের মতো কামরায় উঠল। একা। থান পরা বিধবার

বেশ। মহেশবাবু আর তাকাতো পারলেন না। মাথা নীচু করে রইলেন। তার মনে হল, কিসের গেরুয়া? কিসের ঈশ্বর? অথচ মহেশবাবু তাকান আর নাই তাকান উমা এসে পাশটিতে বসল। মহেশবাবুর মুখ দিয়ে আর কথা বেরল না উমাও নীরব।

বাগাইপাড়ার পর ভিড় একটু হাল্কা হয়ে এল। মেয়েটি আগের মতই প্রণাম করে বলল— 'বাবা মন খারাপ করবেন না। আপনাদের জামাই ভালেই আছে।'

— 'তোমার সিঁদুর, তোমার শাঁখা, রঙিন শাড়ী?' মহেশবাবু আতঁকতে জিজ্ঞাসা করলেন। কানের কাছে মুখ এনে উমা ফিস্ফিস্ করে বলল— 'সব আছে বাবা আবার বাড়ী গিয়ে পরব। আজ যে আমার বিধবা-পেনসন আনার দিন বাবা। মাসে এই একটা দিনের জন্য আমি আমার প্রথম স্বামীর স্ত্রী হয়ে যাই।'

নির্বাক মহেশবাবু ট্রেনের জানলা দিয়ে উদার-আকাশ উদার-মাঠের দিকে তাকালেন। সেখান থেকে নিঃশ্বাস নেওয়া ছাড়া তার আর কোন উপায় ছিল না।

## ঘুম

বিজন কুমার ঘোষ

সকালে চান করে আমি বেরিয়ে পড়ি। বাড়ি থেকে বাস স্ট্যান্ড আট মিনিট। এই পথটুকু চিন্তা করতে করতে যাই, কোথায় যাব? কী মতলবে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি? একটা উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে। বাড়ির সামনে ছ মাসের একটি শিশুর অন্নপ্রাশন। ওই বাড়ির লোকজনের সঙ্গে আমাদের তো বটেই, পাড়ার কারও কথাবার্তা নেই। আমরা বহুর দলেক এ বাড়িতে এসেছি, কেন যেন আলাপ হয়নি। তবে বার ছয়েক হেড অব দি ফ্যামিলি হিসেবে নিমন্ত্রিত হয়েছি। চারবার বিয়ে, দু বার অন্নপ্রাশনে। বুড়ো ভদ্রলোক সন্তুর্পণে কড়া নাড়েন, তারপর ব্যাগ থেকে একটি কার্ড বের করেন। সারাদল বকবক করা বিস্ত্রী অভ্যাস। তাই বলে একবারও কথা না বলাও সমান বিস্ত্রী। ওই প্রথম বারই যাই। তারপর থেকে কার্ড পেলে আমিও হাওয়া। যেন ওই দিনই আমার কোনও জরুরি কাজ আছে। তবে একটাই সুবিধে, পরে দেখা হলেও মিথ্যা কথা বলতে হয় না। কেহা বলার ভয়ে ও বাড়ির কেউই চোখের দিকে তাকায় না পর্যন্ত। শুধু পাড়ায় থাকি বলেই নেমন্তন্ন থেকে ইচ্ছে করেন না আমরা।

যাই হোক পরপর বাস আসছে, কিন্তু কোথায় যাব? কোন বাসে উঠব? মিনিট দশেক চিন্তা করার পর অবশেষে একটায় উঠে বসি। একজন কুঁদঘাটের টিকিট চাইল। অর্থাৎ কুঁদঘাটে যাবে। আমিও একখানা টিকিট কাটি। আমিও কুঁদঘাটে যাব। একটা সন্ধ্যা আছে বাসটা ওখানে গিয়ে শেষ হবে। সাতশ বছর আগে একটা বাঁশের নড়বড়ে সেতু ছিল। আমি কতদিন সেতু পেরিয়ে আমার এক বন্ধুর বাড়ি গেছি। কলেজে আমরা একসঙ্গে পড়েছি। সাতশ বছর পর আজ কুঁদঘাটে যাব। বন্ধু আছে কিনা জানি না। বন্ধুর বাবা মা ছিলেন বাড়িটা ছিল নিজেদের। বিক্রি না হলে এখানেই থাকার কথা।

পরিচিত জায়গায় বাড়িটা খুঁজে বের করতে পারবই। নিজেদের গুপার আস্থা আছে। আমার বন্ধু ইনসমনিয়ায় ভুগত। বড় কষ্ট পেত। বলত, মাসে আড়াইশো টাকা গুণ্ড খেয়ে মাত্র পনেরো মিনিটের জন্য ঘুমেই। একটাই ছেলে, বন্ধুর মা ভবিষ্যৎ কী হবে ভেবে দুঃখ করতেন। এদিকে আমি খুব ঘুম কাড়ুরে। এসব কথা শুনে আমার হাসি পেত। বন্ধুকে বলতাম, আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কত আড়াইশো টাকা বাঁচাই তা জানো?

বন্ধু স্নান হেসে বলত, তুমি ভাগ্যবান। আমার বাবার সামান্য পেনশন।

— ভাগ্যবান কিনা জানিনা, আমার মা বেলো নটার সময় চুলের মুঠি ধরে টেনে তোলে। সেই অবস্থাতেও আমি ঘুমিয়ে থাকি। বন্ধু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, তুমি নিশ্চয়ই দেহিতে শুতে যাও?

— কোথায়? নটার মধ্যেই শূয়ে পড়ি। দুপুরেও ঘুম পায় সে তো তুমি জানোই। কতদিন ক্লাসে বকুনি খেয়েছি।

বন্ধু গুম হয়ে বসে থাকে ওর চোখ বড় বড় করে। চোখের মণির চারপাশ লাল, আমাকে নিশ্চয়ই ঈর্ষ্যা করে।

— তুমি তো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভালেই নম্বর পাও।

আমি বলি, তুমি তো না ঘুমিয়ে আমার চেয়েও ভাল নম্বর পাও।

সেই বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি বাবু বহুর পর। কলেজ থেকে বেরিয়ে আর দেখাই হয়নি। দেখা



হয়নি? এখানে এসে একটু ভাবি। হাঁ, একবার হয়েছিল বাঁকুড়ায় হাওড়া স্টেশনে। ও যাচ্ছে বর্ধমানে স্বশ্রুতবাড়ী। আমি চলেছি কর্মস্থল বাঁকুড়ায়। দুজনের ট্রেন ধরার তাড়া। ওর পেছনে বৌ ছিল। একটি কালো রোগা মেয়ে। আমি একা। আমার সঙ্গে দুখানা ভারী ভারী সূতকেশ। সবো বদলি হয়েছি। বন্ধু রসিকতা করল, দেখো, ঘুমিয়ে পোড়ো না যেন, মাল বেপাজ হয়ে যাবে।

আমিও বলি, তোমার মাল অবশ্য অটুট থাকবে। — বলেই ভাবি, অপরিচিতাকে নিয়ে এতটা রসিকতা বোধহয় ঠিক নয়।

বন্ধু আলাপ করিয়ে দিয়ে বলল, বড় ফাজিল!

আমি বললাম, আপনার স্বামীও কম নয়। এক দিন বাঁকুড়ায় আসুন না। বৌ ছেলে আছে। বড় কোয়ার্টার। অসুবিধে হবে না।

— আগে আমার বাড়িতে আস।

— যাব। কলকাতায় মাসে একবার আসতেই হয়।

বাস, এটুকুই কথা। তারপর কত জল ঘরে গেলে। আমি আর কুঁদঘাটে যাইনি। বন্ধুও বাঁকুড়ায় আসেনি।

আরে কুঁদঘাট তো চেনাই যাচ্ছে না। বাস থেকে সবাই নেমে না গেলে আমি বুঝতেও পারতাম না। খাল একটা আছে বটে, কালো কাদায় প্রায় বুজে এসেছে। আগে ছিল পায়ের তলায় একটি বাঁশ, ব্যালান্স রাখার জন্য আর একটি। এখন পাকা সেতু। মোটর, রিক্সা, অটো চলেছে। মানুষ গিজ গিজ করছে। পরপর দোকান। বহুতল বাড়ি। মোটামুটি সাঁকো পেরিয়ে মিনিট চারেক হাঁটার পরে বন্ধুর বাড়ি। ঘড়ি মিলিয়ে সেরকম জায়গায় এসে অন্তত সাত জনকে জিজ্ঞাসা করি। কেউ বলতে পারে না। সবাই প্রশ্ন করে, ঠিকানা কী? কী করেন?

আমি বলি, এদিকেই একটা স্থলে হেড মাস্টার ছিলেন।

— কোন স্থল? অনেকগুলি স্থল কিন্তু এদিকে।

— তা তো জানি না।

— পদবী কী?

— মিত্র। খুব লম্বা। — মরীয়া হয়ে শেষে বলি, রাতে ঘুম হয় না—

পাশে দাঁড়ানো দুজন হে-হে করে উঠলেন, আমরা তাঁর ছাত্র। রিটারার করেছেন—?

— করার কথা। আমরা একসঙ্গে কলেজে পড়েছি।

— আপনি স্যার সোজা চলে যান। ডান দিকে বাড়িটা। গেটে চিনা জুই ফুলের গাছ দেখতে পাবেন।

সাতাশ বছর আগে গেটে কী গাছ ছিল চিন্তা করি। মনে নেই। উঠানো একটা আম গাছ ছিল। একদিন দুপুরে গল্প করছি, ধূপ করে একটি আম পড়ল। তখন শেষ বৈশাখ। বেজায় টক। আমি বলি, গাছটা কেটে ফেল।

— কেন কাটবে? — বন্ধু বলে : মা আচার বানায়। গাছটা ছায়া দেয়। চিনা জুই গাছের তলা দিয়ে ভিতরে ঢুকে বন্ধুর নাম ধরে ডাকি। একটি শাড়ি পরা মেয়ে বেরিয়ে এল, আপনি কে?

— তোমার বাবাকে চাই।

মেয়েটির কথায় ওর পেছনে পেছনে দোতলায় গোলাম। বন্ধু অবাক। একটা মোটা ইংরেজি

বই পড়ছিল। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল, কী মনে করে?

আমি এক কথার উত্তর দিলাম না। বললাম, তোমার এখন ঘুম হয়তো? বা গ্যাঞ্জাম। তখন খুব নিরিবিচলি ছিলাম। তোমার বাড়িটা কিছুতেই চিনতে পারি না। দুটো অল্প ছিল। স্থলের হেড মাস্টার, দুই নম্বর ঘুম হয় না। প্রথমটা কাজে লাগল না। দ্বিতীয়টায় কাজ হাল। দেখিয়ে দিল চিনে জুই ফুলের গেট।

বন্ধুর মুখে বিবর্ণ হাসি, ঘুম না হওয়াটা একটা অসুখ। মাত্র আধ ঘন্টার জন্য ঘুম আনতে আমার মাসে পাঁচশো টাকা খরচ। — খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে বন্ধু : এই অসুখের নাম করে বাড়ি চেনাটা খুবই ইন্ডিস্টেন্ট!

আমি থতমত খাই। সাতাশ বছরে জল অনেক খোলা হয়ে গেছে। আমি বাঁকুড়া থেকে মেদিনীপুর, তারপর জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, বহরমপুর, স্কেন্দনগর নানান শহরে বদলি হয়েছি। বন্ধুই যোগাযোগ রাখেনি। তাহলে আমাকেও এভাবে ঠিকানা হাতড়াতে হত না।

চা এল। বন্ধু একটা কৌটো এগিয়ে দেয়, বিস্কুট আছে, খাও।

তারপর কী মনে করে সেটা তো বললে না?

চায়ে চুমুক দিয়ে এবার আমি উত্তর দিই, এই আধ ঘন্টা গল্পা করে চলে যাব, তখন বুঝতে পারবে আমি কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে আসিনি।

বন্ধু চুপ করে গেল।

জানলাম দিয়ে উঠানো তাকিয়ে থাকি। আম গাছটা নেই। আমিও চুপ। ওর বৌ এসে দাঁড়াল। গিন্নিবাঁমি। বলি, আপনার সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে দেখা হয়েছিল। তারপর এই—

— না এলে দেখা হবে কী করে?

— এতদিন বদলির চাকরি করেছি জেলায় জেলায়। এখন রিটারার করে কলকাতায়।

— আসবেন মাঝে মাঝে।

মনে মনে বলি, আপনার স্বামীর তো একটাই প্রশ্ন, কী মনে করে এসেছি। যেন বন্ধুর কাছে এমনি আসতে নেই।

আধ ঘন্টা হতে উঠে দাঁড়াই। বন্ধু কিন্তু কিছুই বলল না। ইংরেজি বইটাতে ফের ডুবে গেল।

জীবনের স্বাভাবিক সূতো ছিড়ে গেলে চেনা মানুষ অচেনা হয়ে যায়। আমার বন্ধুর হয়েছ তাই। অনানন্দ। খিটখিটে। চিন্তিত। কিছুটা সন্দেহপ্রবণতার জন্যই ঘুরে ফিরে একই প্রশ্ন। সূতরাং আমি কিছু মনে করিনি। আবার বন্ধুর বাড়িতে আসব। আধ ঘন্টা, এক ঘন্টা, দু ঘন্টা— এই ভাবে সময় বাড়িয়ে দেব। বন্ধু কথা বলতে না চাইলেও আমি বলে যাব। কত কথাই তো বলার আছে। এক সঙ্গে ইংরেজি বই দেখেছি, লঞ্চে চড়ে বেড়াতে গিয়েছি আউট্রাম ঘাট থেকে ডায়মন্ডহারবার। ভবানীপুরে সেই রেস্টুরেন্টে দুপুর জমিয়ে কত আড্ডা দিয়েছি। কথার কি শেষ আছে? ভিন্দার ঘন্টাও লেগে যেতে পারে এক এক দিন।

ডিপোয় পরপর বাস দাঁড়ানো। পছন্দসই সিটে বসি। দিনটা ভালয় মন্দয় বেশ কাটছে। বাস ছেড়ে দিল। খুব একটা ভিড় নেই। টিকিটের কথায় চমকে উঠে বুঝতে পারি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

কোথায় এলাম? তাকিয়ে দেখি শহীদ মিনার। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি। কুঁদঘাট থেকে এসপ্লানেড। এবার কোথায় যাব? নেমে পড়ি। ট্রামগুলো উত্তর দক্ষিণ থেকে এসে পাক নেয়ে



আবার উত্তর দক্ষিণে চলে যাচ্ছে। বাস্তব মানুষ পাতাল রেলের নামে। একদল উঠছে। ফলগুলাদের তারবার চিৎকার। পুরনো অফিসে একবার টু মারলে হয়। খিদে লেগেছে। পার্কে সিমেন্টের বেঞ্চে বসে পড়ি। সামনে ঘাসের ওপর আরো ঢোব বুজ আসছে একটা লোকের। গভীর মনোযোগ দিয়ে একজন কানের খোল পরিদ্রাভ করছে। একটা বাকমাক্টে বাকার মধ্যে ভালগোল পাকিয়ে গুণে আছে। চারপাশের অলস ছবি দেখছি।

তোলা উন্নয় নিয়ে একটা লোক এগিয়ে এল, বাবু, অমলোটে, টোস্ট, কেক—

দুটো মরিচ টোস্ট, অমলোটের অর্ডার দিয়ে ওর হাতের কাজ দেখাতে থাকি। কাপের মধ্যে কাঁচালাঙ্গা, পেঁয়াজের কুচি দিয়ে ডিম ফেঁটতে থাকে। কোথা থেকে ঝাউপাতার শো-শো শব্দ আসে। চোখটা কোনও রকমে খুলে রাখার চেষ্টা করি।

—বাবু, গরম ধরুন। চা দেব?

শাল পাতায় অমলোট টোস্ট এগিয়ে দিতেই গোটা পাঁচেক কাউ এডে। আমার হয়ে লোকটাই ওদের তড়িয়ে দেয়। তারপর চা বানাতে বসে।

আজ শীতল বাতাসের দিন। গরম খাবার খেয়ে শরীরটাকে বরফের লাগছে। ঘুম লাগা ভারটা কেটে গেল। কোথায় যাই?

আমার বন্ধু যদি আমার ঘুমের হাজার ভাগের এক ভাগও পেত, তা হলে এজমের মতো হয়ত বেঁচে যেত। লাখ খানেক টাকা অন্তত সেফ হয়। আর আমিও বাঁচতাম যখন তখন ঘুমের হাত থেকে। বন্ধুকে বলা হয়নি সেবার হাওড়া স্টেশনে দুটো স্ট্রিকেশ লেখে সাবধান করে দিয়েছিলো, দুটোই হাওয়া হয়ে যায়। আমার জামা কাপড়, টাকা পয়সা যায় যাক, অফিসের অনেক দরকারি কাগজপত্র ছিল। এক সময় চাকরি যায় যায় অবস্থা। অনেক কাঠখড় পড়িয়ে তবে রক্ষে।

হাসিও পায়। খবরের কাগজে পড়ি প্রতারকের দল প্রথমে খুব আলাপ জমিয়ে চা সিগারেট খেতে দেয়। তারপর বেইশ্ব ঘুম। সুযোগ বুঝে তার মালপত্র নিয়ে চম্পট। আমার বেলায় একটা নয়া পয়সাও খরচ হল না।

সুতরাং বন্ধুর যদি না ঘুমিয়ে ঘুমের পয়সা খরচ হয় আমারও কি বাড়তি ঘুমিয়ে কিছুটা হয়? কাগজে কলমে অনেক ভুল করেছে। বসের বকুনি, অপমান, সাসপেনশন—অনেক সহ্য করতে হয়েছে। অনেকে হেসে পরামর্শ দিয়েছেন, আপনি এক মাস ছুটি নিন। একটা মাস টানা ঘুমান দেখি। তারপর ফেরা হয়ে অফিসে জয়েন করুন।

অফিসে আমার নামই হবে ঘুমের রাজা। আড়ালে বলত, ঘুম বাবু। একটা সময় প্রায় পাগল হয়ে যাওয়ার মতো আতঙ্ক। চোয়াল বসতে না বসতেই ঘুম। অফিস ছুটি হয়ে গেছে, আমি টেবিলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছি। বোয়ারা ঘরে তাল্লা দিতে এসে কতদিন ঘুম বাবুকে জাগিয়ে দিয়েছে। বাধকরমে গিয়ে চোখে ঘনঘন জলের ঝাপটা দিয়েও বিশেষ সুবিধে হত না। মিনিট দেশেক পরেই বুদ্ধের ওপর মাথা নেমে আসে। কলিগরা হাসাহাসি করে। পেন, মানিবাগ এটা ওটা চুকিয়ে রেখে শেষে চোয়াল পয়সা আদায় করে। বোয়ারা টেবিলে চা দিয়ে গেছে, আমার ঝুঁপ নেই, ঠাণ্ডা জল। বলতে গেলে গোটা চাকরি জীবন তছনছ করে দিয়েছে ঘুম। সুতরাং বন্ধুর চেয়ে আমি কম যাই কিসে?

আমার গুণের শেষ নেই। আমি নাকি ফুলশয্যার রাতে দরজা বন্ধ করা মাত্র ঘুমিয়ে কাপা। নতুন প্রমীরা নাকি তখন খুব ভাললাল কথা বলে। আর নতুন বৌ সেই সব গুনতে গুনতে ফিক করে হাসে। কখনও বা রাঙা জাল বোনে। আমার বেলায় সব ভৌ-ভৌ। সেজন্য

আজও আমায় কথা গুনতে হয়, এমন লোক বাবার জন্মে দেগিনি!

আমি বলি, বেশি দিন বাঁচব না, সে কটা দিন একটু ঘুমিয়ে নি। আমার কোনও নেশা নেই। চা খাই না, পান খাই না, সিগারেট খাই না, মদ খাই না, গাঁজা খাই না। নেশার মধ্যে আছে একটু ঘুম। তাতেও নজর।

একটা কথা বলে নেওয়া ভাল, আমি কিন্তু কুঁড়ে নই। জীবনে প্রচুর কাজ করেছে। করে থাকি। স্কুল কলেজে টপটপ পাশ করেছে। ক্রীড়ার বছর চুটিয়ে চাকরিও হয়ে গেল। অফিসে খুব একটা কামাই করিনি। তবে হ্যাঁ, যখন তখন ঘুম এসে পড়ে। আমি নাচার। কেউ বলতে পারবে না ঘুমোই বলে কোনও ফাইল পেঁজা পড়ে ছিল। বসের তো এটাও দেখার কথা। সুতরাং আমাকেই বলতে হত, কোন কাজটা ফেলে রেখেছি বলুন তো? আপনারা ঘুমান না, কিন্তু আড্ডা মারেন, ক্যান্টিনে আধ ঘণ্টার টিফিন দু ঘণ্টা নিয়ে যান। ইউনিয়নবাজি করেন ফাঁকি দেওয়ার জন্য। আমার টেবিল অলগুয়েজ সাফ। টিপটপ। হ্যাঁ, গোটা কতক প্রমোশনও পেয়েছি। আমার দিকে তাকিয়ে যারা বাঁকা হাসি হাসে তাদের স্মরণ করিয়ে দি, প্রমোশন কিন্তু ঘুমের জন্য নয়, কাজ দেখেই!

তবু গুনি আমি নাকি মড়ার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোই। অনেকে সেই অবস্থায় দেখেও ফেলেছে। নেহাৎ ক্যামেরা ছিল না তাই প্রমাণ দেওয়া যাচ্ছে না।

কথাটা আদর্শে ঠিক নয়। বাসে অনেকবার নির্নির্ভিত হয়েছি। কী মশাই, রাতে কী করা হয়? কেউ বলেন, উঠে দাঁড়ান তো, আমাকে বালিশ পরিয়েছেন? অথচ দেখুন আমার গায়ে কত লোক হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আমি কিছু বলি না। তাদের কষ্টটা বুঝি। ঘাসে আমার জামাটা ভিজে গেছে। স্নোলও পড়েছে। আমার একটুও যেনা করেনি। বাড়ি গিয়ে জামাটা আলগোছে কাচতে দিয়েছি।

কিন্তু আমার বেলায় লোকেরা কত অধৈর্য। কত ঠাট্টা বিক্রপ। ঘুমোলে আমার মুখটা ক্রমশ হা হতে থাকে। কতদিন কাগজের গোলা মুখে চুকিয়ে দিয়েছে দুকুতিরা।

আবার বলি আমি কুঁড়ে নই। এখনও ভোর পাঁচটায় উঠি। মর্নিংওয়াক না করে মেয়েদের যে সব কাজ একলা মেয়েরাই নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল সেগুলি পরপর করে যাই। ফ্রিজ যখন ছিল না তখন রোজ বাজারে যেতাম। এখন সপ্তাহে দুদিন বাজার করি। মাছ মাংস ডিপ ফ্রিজে রাখি। তরি তরকারি ভাল করে ধুয়ে শুকিয়ে চুকিয়ে দি। বাজার থেকে ফিরেই গুনতে হয় কাঁচালাঙ্গা নেই। জিরে নেই। আবার তক্ষুনি ছুটি। আমার সেই দুর্দান্ত ছুঁস্ত পোজ কেউ দেখে না। কেবল ঘুম নিয়েই কেছা করে!

কলেজ লাইফে বন্ধু প্রায়ই ষোঁটা দিত, বেশ আছে, বিনে পয়সায় যত পার ঘুমিয়ে নিছ! আর সারা রাত জেগে জেগে আমি মরতে চলেছি!

আমি চোরের মত মুখ করে থাকি। যেন ঘুমের দেশে আমি অধৈর্য অনুপ্রবেশকারী। একটা মজার ব্যাপার, কলেজের বন্ধু বলতে ওই একজনই টিকে আছে। সাতাশ বছর পরে হলেও দেখা তো করতে গেছি। হয়ত ওয়ার যাব। আর কে কোথায় থাকে, কী করে, কিছুই জানি না। মজাটা হল, এক জনের চোখে ঘুম নেই আর একজনের প্রচণ্ড ঘুম। একটু ঘুমের জন্য একজনের প্রণব পয়সা খরচ, অন্যজন জায়গা বেজায়গায় ঘুমিয়ে পড়ে। পকেটমারের পাল্লায় পড়ে। সুতরাং সেদিক দিয়ে বিচার করলে আমার ক্ষতিও কিছু কম নয়। বিপরীত চরিত্র বলেই হয়ত বন্ধুত্ব টিকে আছে।

আমাদের ছিল কো-এডুকেশন কলেজ। ফার্স্ট ইয়ারের মিলি মৌলিকের কথা মনে পড়ে।



খুব বড়লোকের মেয়ে। দেখতেও বেশ। একদিন মাটিচি শোয়ের দুটো টিকিচি নিয়ে হাজির। হামলাতে। শো-এর পর রেস্টুরেন্টে ও খাওয়াবে। দুটো প্রস্তাবই মনের মতো।

হা কপাল, হল অন্ধকার আর ঠাণ্ডা হতেই আমার মাথা ঝুট হতে শুরু করল। কিছুতেই সোজা রাখতে পারি না। সর্বশব্দ, দু একবার মিলির গায়েই চলে পড়লাম। মিলি ক্রমাগত চিমটি কাটতে লাগল। কীসের কী, ঘুমের প্রবল শ্রোতে ভেসে গেল মিলি ও তার চিমটি।

পরদিন তেতলার করিডরে মিলির সঙ্গে দেখা। কাচামুচ মুখে ক্ষমা চাইতে যাব, তার আগেই হাতে একটা চিঠি ধরিয়ে দিয়ে এক রকম ছুটে পালাল। আমি ক্রাস কামাই করে তক্ষুনি পার্কে গিয়ে চিঠিটা পড়ি : শ্রেষ্ঠপিয়রের হামলেট দেখতে গিয়ে যে ঘুমিয়ে পড়ে তার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্কই থাকতে পারে না।

হ্যাঁ, এসব আমার উঠতি যৌবনের কথা। তবে এখনকার কথাও কম দুঃখের নয়। ভেবেছিলাম রিটারার করার পর বোধহয় অবস্থার পরিবর্তন হবে। বৃদ্ধদের ঘুম এমনিতেই কম। শারীরিক মেহনত না থাকায় আরও কম। হায়, আমার বেলায় হয়ে গেল উল্টো। বিকেলে কোনও বাড়িতে বসে আছি। জোর আড্ডা চলছে। টিভিতে দারুণ প্রোগ্রাম। হঠাৎ আমার ত্বতনি বুকে লেগে যায়। সবাই চোখ ঘুরিয়ে তাকায়। সেদিন সকালে চা জলখাবার বাওয়া হয়ে গেছে, খবরের কাগজ পড়ছি, চোখটা একটু লেগেও এসেছে, এই ফাঁকে দেওয়াল থেকে বাবার আমলের জার্মানি ঘড়িটা কে চক্ষুদান করল। গুরু হয়ে গেল তুমুল হুটগোলা।

যথারীতি সব দেখাই আমার। স্ত্রীর মন্তব্য, কোন আক্কেলে দরজা খোলা রেখে ঘুমতে বসলে? রাতে কি নাক ডাকেনি?

আমি নিচু গলায় বলি, মাত্র তো পাঁচ মিনিট—

— চোরের কাছে পাঁচ মিনিটই যথেষ্ট। রাস্তার পাশে ঘর। বলি করে কমনসেল হবে? পড়তে যদি অন্যের হাতে বৃকতে!

এটা ঠিক, যখন যার হাতেই পড়ি না কোন, সর্বত্রই আমার অবস্থা এক। তো সারা জীবনের সব লোকসান একত্র করলে বন্ধুর চাইতে আমি কি খুব পিছিয়ে থাকব?

চমকে উঠি। পার্কে এখনও বেলা তিনটেই নিমন্ত্রণ রোদ। চার পাশ দিয়ে প্রবল গর্জনে বাস, মিনি, মোটর, অটো ছুটতে। এবার বাড়ি যাওয়া যেতে পারে। আর দেরি করলে বাসে উঠতে পারব না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইঁদুরদের খেলা দেখলাম। চিনেবাদাম ছুঁড়ে দিতে ইঁদুরটা মুখে করে গর্ভের মধ্যে ঢুকে গেল। আবার উঁকি দিল কেউ কিছে কি না!

আমার বাস আসতেই উঠে পড়ি। ঠিক করেছি এতক্ষণ ঘুমোইনি যখন, তখন বাকি পথটাও ঘুমোব না। আজ একটা রেকর্ড সৃষ্টি হবে।

ভাবতে চেষ্টা করি কেন এত ঘুম? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কী পাই? জনলার ধারেই সিট। গাড়ের মাঠের বিখ্যাত গিরিধিরে বাতাস। এই দুটোই ঘুমের মহৌষধ। প্রতিজ্ঞা করেছি আজ কিছুতেই ঘুম নয়। ঘুম মানোতো সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থা। মৃত্যুর সমান। আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সচেতন থাকতে চাই।

কে যেন গায়ে হাত দিয়ে ডাকছে, ও মশাই—

পড়মাড় করে উঠে বসি। ৪৭-এ বাসটা ভিগোয় এসে ফের লেকটাউনের দিকে যাত্রা শুরু করেছে।

## হারানো সময়

দীপঙ্কর দাস

বিশ্বাস করতে অসুবিধে হয়। আবার অবিশ্বাস করার মতো পরিস্থিতিও নেই। প্রদীপ যেন তার বিচার বুজি এবং অনুভূতি দিয়ে কিছুই সেলাতে পারছে না। যদিও তেমন করে দেখলে, —অর্থাৎ তৃতীয়পক্ষেব দৃষ্টিতে দেখার মতো করে দেখলে, কোন কিছুকেই অস্বাভাবিক বলে মনে হওয়ার মতো কোন কারণ নেই। সবটাকেই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবেই মনে হবে। তবু প্রদীপের চোখে এখন সমস্ত ঘটনা প্রবাহটাকে একটু অস্বাভাবিকই লাগছে।

মা যদি মৃত্যুশয্যা গুণে মৃত্যুকে মাথার কাছে দাঁড় করিয়ে রেখে বিচার মতো এক অসম যুদ্ধ লড়তে থাকেন, তাহলে তার ছেলেমেয়েরা কখনোই হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। যার যেমন সাধা সকলেই তার মতো করে চেষ্টা করবে মাকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার। কিংবা অনিবার্য মৃত্যুকে অন্তত কিছুকালের জন্য হলেও, দূরে সরিয়ে রাখার। প্রদীপের চোখের সামনে আজ ক'দিন ধরে যে ঘটনা প্রবাহ বয়ে চলেছে, তার সব অভিমুখই তে মৃত্যুপথবাস্ত্রী মার অনিবার্য মৃত্যুকে প্রতিহত করার জন্য মার ছেলেমেয়েদের সাধ্যাভীত প্রচেষ্টার দিকেই প্রবাহিত। প্রথম দিন থেকে প্রদীপও নিতান্ত দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। দৌড়ঝাঁপ সেও কম করেনি। এখনো অফিস যাওয়ার পথে সকালে অন্তত একঘণ্টা এবং অফিস থেকে ফিরে বাড়ি না গিয়ে বিকেলে ঘন্টা দুই সময় নার্সিংহোমে কাটিয়ে যায়। ডাক্তারের সাক্ষাৎ না পেলে মার জন্য নিমন্ত্রণ আয়াকে খুটিয়ে খুটিয়ে জিজ্ঞেস করে মার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা সৃষ্টি করতে চায়। এটা যদি অস্বাভাবিক আচরণ বলে মনে না হয়, তাহলে তার ভাইবোনদের অস্থিরতা, দৌড়াদৌড়ি, মাকে আরো কোন উন্নত নার্সিংহোমে হৃদাণ্ডিত করে আরো কোন নামী চিকিৎসকের অধীনে রাখা যায় কিনা, তাই নিয়ে আলোচনা, —এসবকে অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে কেন প্রদীপের চোখে!

প্রদীপ জানে ভাইবোনের মানসিক উদ্বেগ, অস্থিরতা, অভিনব পরিকল্পনার পেছনে মার চিকিৎসা সংক্রান্ত কারণটাই মূল চালিকাশক্তি নয়। এর পেছনে রয়ে গেছে অন্য কিছু, অন্য তাগিদেব উপস্থিতি। আর যেহেতু প্রদীপ এই অন্য কিছুকে সনাক্ত করতে পারছে না, তাই তার কাছে সবটাই অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে।

মস্তিস্কের রক্তস্রবণে আক্রান্ত হয়ে মা এখন রোগশয্যা অচেতন। “ম্যাসিভ সেরিব্রোস্ট্রিকিউলার হেমাটোমা।” ... ঘটনাটা ঘটার পরমুহূর্ত থেকেই মা ‘কোমা’য় পৌঁছেয়ে গেছিলেন। শরীরের ডান দিকটা— মুখের ডান অংশ থেকে শুরু করে ডান হাত, ডান পা পর্যন্ত সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এই রোগীর ভবিষ্যত কী হবে পারে তা অনুমান করে নিতে বিশিষ্ট নিউরোলজিস্ট হতে হয় না। সাধারণ প্রাণ্ডয়বন্ধ মানুষই পারে বুঝতে। তবু যতক্ষণ প্রাণ আছে, চেষ্টা করতেই হয়। সেই চেষ্টা শুরু হয়েছিল প্রথম দিন থেকেই।

সকাল তখন প্রায় ছটা। প্রদীপ সবে বিছানা ছেড়েছে। ফোনটা বেজে উঠল। প্রদীপ ফোন ধরে গুনল বড়দি বিভার উৎকণ্ঠিত কণ্ঠস্বর, — “দীপু শিগগিরে আয়।”

বিভার গলা তখন তিরতিরি করে কাঁপছে। এই কণ্ঠস্বরের মধ্যে এমন কিছু ছিল যা প্রদীপকে তখনই জানিয়ে দিয়েছিল যে চূড়ান্ত কিছু একটা ঘটা গেছে। তাই বিভার গলায়



“দীপু, শিগগির আয়”, সামান্য নির্দেশটুকু শোনার পর প্রদীপ দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন করেনি। করার কোন প্রয়োজনই বোধ করেনি।

প্রদীপকে বাসি মুখে ভোর সকালে প্যান্ট জামা পরতে দেখে তম্মা বিস্মিত গলায় জিজ্ঞাস করল, —“এই ভোর সকালে কোথায় যাচ্ছে?”

—“সিদি ফোন করেছিল। এফুনি ওবাড়ি যেতে বলেছে।” ক্ষতহাতে প্রদীপ মাথায় চিরুনি বুলিয়ে পায়ে চুটি গলিযে বাড়ি থেকে বেরতে বেরতে তম্মাকে বলেছিল, —“মনে হয়না খুব শিগগির ফেরা হবে। দুধটা এনে রেখ।”

বছর আট আগে প্রদীপ পৈত্রিক বাড়ি থেকে মিনিট দশকেই হটাৎ পথের দূরত্বে খালের ওপারে কাঠা আড়াই জমির ওপর নিজের জন্য একটি ছোট বসন্ত বাড়ি তৈরি করে সপরিবারে বসবাস করছে। পৈত্রিক বাড়িতে এখন বড়দি বিভা এবং মা থাকেন। ভিন্নবাড়িতে বাস করলেও প্রদীপ কিংবা তম্মার কাছে ওবাড়ির সঙ্গে কোন রকম দূরত্ব যেমন সৃষ্টি হয়নি, তেমনি বিভা এবং মার কাছ থেকেও প্রদীপ দূরে সরে যাননি। দুই বাড়ির মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ থেকেই গেছে।

বাড়ির কাছাকাছি পৌছিয়ে প্রদীপের বৃকটা ছাঁৎ করে উঠেছিল। বাড়ির সামনের রাস্তায়, বাড়ির বাইরের বারান্দায় এই ভোর সকালেই পাড়ার লোকজন ছেলে ছোকরা জড়ো হয়েছে। সকলের চোখমুখেই উদ্বেগের ছায়া। তারা প্রদীপের জন্য রাস্তা ছেড়ে দিল। প্রদীপ মার ঘরে উকি দিয়ে দেখল মা খাটের ওপর শুয়ে আছেন। একেবারে সংজ্ঞাহীন। মার পায়ের কাছে বসে আছে বড়দি। মাথার কাছে পাড়ার জোৎস্না মাসি। খাটের পাশে শরীর ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নারায়ণের মা।

“সকালে উঠে যেমন বাথরুমে যান, তেমনি গেলেন। বাথরুমেই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন। ভাগিস বাথরুমে দরজা বন্ধ করেননি। আর তখন বসেই ছিলেন। তাই মাথা ফাটেনি। তারপর থেকেই এই অবস্থা।” বিভা প্রদীপের মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে নামানো গলায় বলল।

“ডাক্তারকে খবর দিয়েছি?” প্রদীপ শুকনো ভিড় দিয়ে টেট চটে নিল।

“হ্যাঁ, নারায়ণ আর কেশারবাবু গেছে ডাক্তার নাগের বাড়ি। এখুনি এসে পড়বে।” ঘরে সিলিংফ্যান পূর্ণ গতিতে চলা সন্তেও জোৎস্না মাসি একটা তালপাতার পাখা নিয়ে মার মাথায় বাতাস করতে করতে সাড়া দিলেন।

জ্যোৎস্নামাসির কথা ফুরোতেই ডাক্তারবাবু এসে উপস্থিত হলেন। পেছনে পেছনে কেশার বাবু।

রোগীকে যথাসম্ভব ঝুঁটিয়ে পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবু বললেন, মনে হচ্ছে সেরিব্রাল আটাক। এফুনি পেশেন্টকে শিফট করতে হবে। সেরি করা চিক হবে না।”

“কোথায় নিয়ে যাই বলুন তো? হাসপাতালে কি চিকিৎসা কিছু হবে? তাছাড়া হাসপাতালে যে আডমিশন পাওয়া যাবে, তার নিশ্চয়তা কোথায়?” প্রদীপ ইতস্তত করে বলল।

“আপত্তি না থাকলে আমাদের ওখানেই নিয়ে আসুন। মানে সেবাদান মেডিকেল কমপ্লেক্স-এর কথা বলছি। আমি ফোনে জ্ঞানিয়ে দিচ্ছি। আডমিশনে কোন সমস্যা হবে না।” ডাক্তারবাবু ফিরে গেলেন।

মাকে নার্সিংহোমে ভর্তি করানোর পর প্রদীপ এবং বিভার প্রথম কাজ হলো ভাইবোনদের

খবর দেওয়া। মার মাথার সি. টি. স্ক্যান রিপোর্ট পাওয়ার পরেই আর্টেলিভি নিউরোলজিস্ট প্রদীপ এবং বিভাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন,—“মনে মনে প্রস্তুত হয়ে থাকই ভাল। পেশেন্ট-এর রিকোভারির চাপ ভেরি ভেরি রিমোর্ট।”

বিভা সকলের বড়। তারপর প্রদীপ। প্রদীপের পরে এক বোন, রেণুকা। বিয়ের পর সে স্বামীর কর্মসূত্রে বোকরোয়া বাসী। রেণুর একটি ছেলে। রাড়ির কাছে এক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তৃতীয় বছরের ছাত্র। হস্টেলেই থাকে। এস. টি. ডি’র মাধ্যমে খবর পেয়ে একাই এসেছে রেণুকা। রেণুকার পরে দুই ভাই। অলক এবং উৎপল। অলক কোলভিভিয়ার ইঞ্জিনিয়ার, মারিফ। আসানসালে পোস্টিং। সেও এসেছে একা। সামলেই ছেলের হায়ার সেকেন্ডারি। এখন স্কুল কামাই সম্ভব নয়। উৎপল থাকে বহরমপুরে। পূর্ত বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার। তার একটি ছেলে, একটি মেয়ে। উৎপল বহরমপুরে পরিবার রেখে চলে এসেছে। বহরমপুরে কোয়ার্টার্স আছে পূর্ত বিভাগের। অন্যান্য কর্মীরাও আছেন। একা থাকতে খুব একটা অসুবিধে হবে না উৎপলের স্ত্রীর। সকলেই উঠেছে পৈত্রিক বাড়িতে। অনেকদিন পরে বাড়িটা আবার গন গন করছে। ভাইবোনদের উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি দুখী করেছে বিভাকে। মার এতবড় বিপর্যয়ের ব্যাঘাৎ যেন অনেকটা হালকা হয়ে গেছে ভাইবোনদের উপস্থিতিতে। বিভাই প্রদীপকে বলেছিল সেদিন,—“কতদিন পরে বাড়িটা আবার ভরে উঠল বলতো? হুইও ক’দিন এসে থাকনা এ বাড়িতে।” কথাটা বলার পরে বিভা নিজেই নিজের কথার যুক্তিহীনতা টের পেয়েছিল। ফলে নিজে থেকেই বলেছিল,—“তাও বা কেমন করে হয়! তা হলে তম্মা ছেলেমেয়ে নিয়ে ও বাড়িতে একা থাকবে কেমন করে!”

প্রদীপ মনে মনে একটা হিসাব সেয়ে নেয়। মার বয়স সত্তর ছাড়িয়ে ছিল ক’দিন আগে। বিভার বয়স এখন একাশ বয়স। প্রদীপ আটচল্লিশ পেরিয়ে ঊনপঞ্চাশ। করুণা ছেতল্লিশ। অলক তেতল্লিশ। উৎপল চল্লিশ। অর্থাৎ মার কোন ছেলেমেয়েই অপরিণত বয়স্ক নয়। সকলেই বিয়ে থা করে নিজের নিজের পরিবার নিয়ে স্বতন্ত্র মাটিতে শেকড় ঢালান করে দিয়েছে অনেককদিন আগে। তৈরি হয়ে গেছে পৃথক পরিচিতি। এখন সকলের সাধ-আত্মা, স্বপ্ন-আশা, সবকিছুই পাক যায় নিজস্ব পরিবারকে কেন্দ্র করে। এই বয়সে মাতৃবিয়োগের সম্ভাবনা দেখা দিলে শোকে কাতর হয়ে পড়ার কিংবা চিত্তভাবনায় মাথা খারাপ করে ফেলার মতো কোন কারণের সৃষ্টি হওয়ার কথা নয়। ঘটনাটা ঘটার পর—অর্থাৎ মা মারণ অসুখে আক্রান্ত হওয়ার পর,—প্রথম ক’দিন প্রদীপের মন নানান কারণে একটু বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। মার চিকিৎসা যাতে সঠিক এবং যথাযথ হয়, এর জন্য কিছু ব্যাকুলতাও জন্মেছিল মনে। তবে নার্সিংহোমের ব্যবস্থা এবং মার চিকিৎসায় নিযুক্ত ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে মার প্রকৃত অবস্থা এবং সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে পরিদ্রাঘ ধারণা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর মন স্থির হয়ে গেছে। সম্ভাব্য পরিণতিতে মেনে নেওয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি তৈরি করে নিচ্ছে। কিন্তু বিভা থেকে শুক করে উৎপল —সকলের মনের আদোলন দেখে প্রদীপ মাঝে মাঝেই অবাধ হচ্ছে। মেলাতে পারছে না কিছুই।

“আর একজন রেসিটিউটে নিরোলজিস্টকে নিয়ে এসে মাকে দেখালে হতো না? মানে একটা সেকেন্ড ওপিনিওনের কথা বলছি আরকি....” ঢোক গিলে অলক সেদিন প্রদীপকে বলেছিল।

“নার্সিংহোমে যিনি মাকে আটোও করছেন, তিনিও যথেষ্ট নামী নিরোলজিস্ট। অন্তত



আমার তো তাই মনে হচ্ছে।" প্রদীপ কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়ে উত্তর দিয়েছে।

"সেটা অবশ্য ভুলি ভাল বুঝবি। আমি তো বখশিশ শহর ছাড়া।" অলকের এই মন্তব্যটাকেও প্রদীপ স্বাভাবিকভাবে নিতে পারে নি। মার চিকিৎসার দায়িত্ব—অর্থাৎ উপযুক্ত ডাক্তারের হাতে সঠিক পদ্ধতিতে চিকিৎসিত হচ্ছেন কি না মা, —এর প্রত্যক্ষ দায়িত্ব যেন সকলে প্রদীপের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছে।

"আমি আবার ভাল বুঝব কেনম করে?" প্রদীপ অসহিষ্ণু গলায় বলেছে।

— "ডাক্তারদের যোগ্যতা বোঝার মতো জ্ঞান তাদের থাকতে পারে, আমার নেই।"

"এর জন্যই লোকে বড় কোনো নার্সিংহোমে পেশেন্ট ভর্তি করায়।" করুণা আঁচল দিয়ে মুখ মুছে বলল— "এখানে তো সময় আছে, দেখনা মাকে আর একটি ভাল কোনো নার্সিং হোমে শিফট করানো যায় কিনা!"

"এই অবস্থায় শিফট করাবি?" প্রদীপ একরকম চমকে উঠেছে, — "তোদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে।" প্রদীপ থেমেছে। চোখ তুলে বড়দিক থেকে শুরু করে উৎপলের মুখের দিকে তাকিয়েছে। চেষ্টা করেছে সকলের মনের ভাষা পড়ার। কেউ কি সমর্থন জানাচ্ছে প্রদীপকে। প্রদীপের মনে ছিল, কেউ সমর্থন করছে না। আর এই মনে হওয়াটাই প্রদীপকে ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত করে তুলেছে। ক্ষোভের সঙ্গে বলেছে প্রদীপ, "মার অসুখটা তোরা বুকেও বুঝতে পারছিস না। ম্যাসিড সেরিব্রাল হেমোরাজ। স্ক্যান রিপোর্ট পাওয়ার পরে সব কিছুই পরিষ্কার হয়ে গেছে। এই পেশেন্ট-এর চিকিৎসা বলতে তেমন কিছু নেই। তোরা যত বড় ডাক্তার, যত নামী নার্সিংহোমেই নিয়ে যা না কেন, সবাই একই চিকিৎসা করাবে, যে চিকিৎসা এখানে হচ্ছে।" এতদূর বলে প্রদীপ থেমেছে। অনুভব করেছে সে যেন পরোক্ষভাবে মার চিকিৎসার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছে। এখানেই তো আপত্তি প্রদীপের। মা তো সবার। সে কেন আগবাড়িয়ে সব দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে!

ক্ষুব্ধ বিরক্ত প্রদীপ বলেছে, "ঠিক আছে, তোরা যেখানে মাকে নিয়ে যেতে চাইছিস নিয়ে গিয়ে ভর্তি করা। অথবা কথা বলে সময় নষ্ট করছিস কেন!"

"দাদা মিছিমিছি রেগে যাচ্ছে। আমরা তো কেবল কবকগুলি প্রস্তাব দিচ্ছি। কখনো তো বলিনি, এক করতাই হবে, মানতেই হবে।" অলক প্রদীপকে শান্ত করতে চেষ্টাছে।

এভাবেই দিনগুলি কেটেছে। নানা প্রস্তাব, নানা পরিকল্পনা, কখনো সখানো, — "আমার একার পক্ষে সম্ভব নয় যে মার ট্রিটমেন্টের দায়িত্ব কাঁধে নিতে পারি। পারলে নিশ্চয় এখানে ফেলে রাখতাম না। এতদিন হয়ে গেল অথচ সামান্য ইনপ্রভমেন্ট তো পরের কথা, দিন দিন অবস্থার অবনতিই ঘটে চলেছে।" —এ জাতীয় পিছজালানো মন্তব্যও বাতাসে ভেসেছে সকলের বাক্যালাপের সূত্র ধরে। আর প্রদীপ দিনদিন অনুভব করেছে, সে তার ভাইবোনদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে পড়ছে। তার এবং আর সব ভাইবোনদের মাঝখানে সূক্ষ্ম একটা বিভাজন রেখা টানা হয়ে গেছে।

সবকিছু এ পর্যন্ত প্রদীপের কাছে সয়ে এসেছিল। কিন্তু এরপর যা ঘটল, তা প্রদীপকে কেবল বিস্মিতই করল না, সেই সঙ্গে একেবারে হতবাক করে তুলল।

নার্সিংহোমের সাক্ষা ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে। তিনতলায় মার ফেরিন ঘর থেকে নীচে নেমে এসেছে সবার। নার্সিং হোমের সামনে রাস্তার ধার ঘেঁষে ছোটমতো একটা জটলা করে দাঁড়িয়েছে প্রদীপরা। যেমন করে সাক্ষা দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

আলাচনা করে মাকে নিয়ে। কার চোখে মার কি কি উন্নতি ধরা পড়ছে, কে মার কানের কাছে মুখ নিয়ে শব্দ করে মা বলে ডাকার পর মার চোখ মেলে তাকানোর মতো বিরল ঘটনার সাক্ষী হতে পেরেছে, কার মনে হচ্ছে, এতদিন যখন টিকে গেছেন তখন মা হয়তো অসম্ভবকণে সম্ভব করে তুলতে পারেন, —অর্থাৎ মা আরোগ্য লাভ করে আবার বাড়ি ফিরে যেতে পারেন, —এসব নিয়ে রোজকার মতো পরস্পরের মধ্যে বাক্যালাপ করে আরো কিছুটা সময় ব্যয় করছিল সবাই।

এ জাতীয় আলাচনায় প্রদীপের কোন উৎসাহ না থাকায় সে একটু তফাতে দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট শেষ করল। সিগারেটের দহ্মাংশটুকু আঙুলের টোকার মাঝ রাস্তায় ছুঁড়ে দিল।

এমন সময় বিভা এগিয়ে এল প্রদীপের দিকে। বলল, —আজ নিয়ে কতদিন হলো দীপু?

"মানে?" প্রদীপ অপ্রস্তুত হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"বলছি মার অসুখটা আজ নিয়ে কতদিন গড়াল?"

"লাস্ট মাহের নান্নটিং-এর সকালে মা অসুস্থ হলেন। আর আজ নতুন মাসের তিন তারিখ। লাস্ট মাহ তো তিরিশ দিনের। তার মানে গত মাসের বারোদিন, আর এমাসের তিন দিন, —মোট পনেরোদিন হলো।"

"পনেরো দিন পরেও মা বেঁচে আছেন, তাই না?"

"হ্যাঁ, বেঁচে তো আছেন।"

বিভা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না। রাস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে যান চলাচল দেখতে দেখতে কিছু যেন ভাবল। তারপর গলা নামিয়ে বলল, "আমার অফিসের এক সহকর্মী, লতিকা, লতিকা দত্ত, —তুই বোধহয় দেখেছিস। মাঝে মাঝে এ বাড়িতেও এসেছে, —মার সঙ্গে ভালই মা আলাপ ছিল। সেই লতিকা আমাকে এক সিদ্ধ-তান্ত্রিকের সন্ধান দিয়েছে। বলেছে, যদি মা পনেরো দিন বেঁচে থাকেন তাহলে সেই তান্ত্রিক মাকে আরো অনেকদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন। তান্ত্রিকের দেওয়া সামান্য জল আর বাতাসা খাইয়ে দিতে হয় রোগীকে। তাহলেই রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে। লতিকার শ্বশুরশশি-ও এরকম সেরিব্রাল আটাক একেবারে কোমা অবস্থায় পৌঁছিয়ে গেছিলেন। ডাক্তাররাও জবাব দিয়ে দিয়েছিলেন। পনেরোদিন বেঁচে থাকার পর লতিকাও এ তান্ত্রিকের দেওয়া জল-বাতাসা খাইয়ে দিয়েছিল শ্বশুরকে। তিনি তারপর তিন বছর বেঁচে আসল। কথাও বলতে পারতেন। আমি যাব তাঁর কাছে। মার জন্য জল-বাতাসা নিয়ে আসব।"

"কোথায়?... মানে সেই বাবা থাকেন কোথায়?"

"বর্ধমানের আগে, মেমারিতে। মেমারি স্টেশনে নেমে বাস ধরতে হবে। নামতে হবে জালালখালি নামের একটা গ্রামে। স্টেশন থেকে বাসে ঘণ্টা দেড়েক সময় লাগে। তারপর আছে যেটে মিনিট তিরিশ যেতে হবে। তবেই তান্ত্রিক বাবার আশ্রম। আশ্রমেই একটা পুকুর রয়েছে। সেইপুকুরে শেষরাত্রে মনে সেরে বাবার কুটিরের সামনে লাইন দিতে হয়। বাবা দেখা দেন সকাল ছটায়। দর্শনাধীনের মুখে রোগভোগের কথা শুনে জল-বাতাসা দেন।"

"তার মানে আগের দিন মেমারি রওনা দিতে হবে। হয়তো বিকেলেই পৌঁছাতে হবে মেমারি। না হলে জালালখালির বাস ধরা যাবে না।"

"হ্যাঁ, লতিকা এরকমই বলেছে। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় জালালখালির শেষ বাস মেমারি



স্টেশন থেকে ছেড়ে যায়। বাসটা মিস করলে জালালখালি যাওয়ার কোন উপায় নেই।”

“রাতের থাকার ব্যবস্থা আছে জালালখালিতে?”

“ব্যবস্থা বলতে তেমন কিছু নেই। দু-চারটে চালাঘর আছে বটে। তবে দর্শনাগারীরা আশ্রমের মাঠেই কাটিয়ে দেয় বাসটুকু। শেষ রাতেই তো মান সারতে হয়, ঘুমোনার সময় কোথায়।”

এরপর সাময়িক নীরবতা। নার্সিং হোম থেকে কয়েকগা হাঁটলেই বাসস্ট্যান্ড। দক্ষিণ মুখী সব বাসই দাঁড়ায়। তেমন কিছু ভিড় হয় না। তবে কোনদিন প্রদীপরা এই স্টপ থেকে বাসে ওঠে না। হেঁটে যায় আরো কিছুটা দূর। একসঙ্গে। কথা বলে পর-পর করে। বেশির ভাগ কথা যদিও মাকে উল্লেখ করেই শুরু হয়, তবু ঘুরতে ঘুরতে ফিরে যায় তাদের কিশোর কালেও। বিভা সকলের বড়। বিভার চোখের সামনে তারা ভাইবোনেরা জন্মেছে, বড় হয়েছে, সকলের কৈশোরকে দেখেছে সে। তাই এসময় মুখা বন্ধ থাকে বিভাই। করুণা কোনদিন তার খেলনার বস্তু খুঁজে না পেয়ে প্রদীপকে সন্দেহ করে খিমচে দিয়েছিল। অলক কোন এক বিশ্বকর্মা পূজার আগের দিন ঘড়ির সূতোয় মাঞ্জা দেবে বলে কাছ গুঁড়োতে গিয়ে হাত কেটে ফেলেছিল। মা তখন কী রকম ঘাবড়ে গিয়েছিলেন বুঝে দেখে। উৎপলের ক্রিকেট ব্যাটের হ্যান্ডেলটা ভেঙে যাওয়ায় আর একটা নতুন ব্যাট কিনে দেওয়ার জন্য কেমন বায়না ধরেছিল মার কাছে। আর মা তাঁর লক্ষ্মীর ঝাঁপ খেতে চাকা বের করে কী ভাবে উৎপলের বায়না মিটিয়েছিলেন—এরকম, এ জাতীয় তুচ্ছ অথচ গভীরভাবে মর্মস্পর্শী সব ঘটনার স্মৃতিচারণের মাধ্যমে দিয়ে তারা হেঁটে যায় অনেকটা রাস্তা। সেই সঙ্গে কখনো কখনো আনানন্দ হয় করুণা। দেখতে দেখতে অনেকদিন হয়ে গেল সংসার ফেলে চলে এসেছে। স্বামী রমাতোষের শরীরও ইদানীং তেমন ভাল যাচ্ছে না। হাই প্রেসারগার আর উত্তরতর চাপে বড় হচ্ছে মানুষটা। গত বছর তো একটা ছোট্ট বাটো হার্ট আটকান-ও হয়ে গেছে। একা কাজের লোকের ভরসায় এমন মানুষটাকে কতদিন ফেলে রাখা যায়!

প্রদীপ নিন পাঁচেক আগে বলেছিল করুণাকে—“তুই একবার ঘুরে আসতে পারিস বোকারো। রমাতোষ একা আছে, শরীরও তো ভাল নয়। তেমন বুরুলে আবার আসিস না হয়।”

উত্তরে করুণা বলেছে,—“দেখি?”

এই ‘দেখি’র ওপর ভরসা করে রয়ে গেছে অলক এবং উৎপলও। রোজই তো আশঙ্কা হচ্ছে আজকেই বোধহয় শেষ। রাত ফুরিয়ে গেলেই হয়তো পেতে হবে চূড়ান্ত সংবাদটা। এ অবস্থায় দু দিনের জন্য-ও কি কোথাও যাওয়া যায়। এতদিনই যখন মার পাশে থাকা হলো, তখন শেষ সময়টায় দূরে চলে যাওয়ার কোন মানে হয় না।

হেঁটে হেঁটে চাকুরিয়ার ব্রিজ (পেরিয়ে মাস সপ্তকে কয়েক দাঁড়াল প্রদীপরা। আরো কিছু কথা হলো রোজের মতোই। তারপর এক সময় রোজের মতোই উৎপল বলল, “এখন আর বাসের জন্যা ওয়েট করে লাভ নেই। ট্যাক্সি ধরি চল। রাত তো কম হলো না?”

সকলে বাসস্টপ ছেড়ে ব্রিজের মধ্যে সরে এল ট্যাক্সি ধরার জন্য। বিভা একসময় চাপা গলায় প্রদীপকে বলল, “কাল রওনা দেব মেমারি। হাওড়া থেকে দুপুর দুটো পনেরোয় বর্ধমান লোকাল ছাড়ে। মেমারি পাঁচটার মধ্যে পৌঁছিয়ে যায়। পরদিন বেলায় বেলায় ফিরে এসে মাকে তাড়াতাড়ি করে জল বাতাসা...। তুই যাচ্ছিস তো দীপ?”

পাশের স্ট্রাট পোস্টের সোডিয়াম ভেপারের হলুদ বর্ণের আলো এসে পড়েছিল বিভার

মুখের ওপর। ফলে বিভার মুখের একপাশ আলোকিত অন্যদিক আবছা অন্ধকারে ঢাকা। বিভার বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। এতদিন তেমন করে প্রদীপের দেখা হয়নি দিদির মুখে। আজ দেবল। এবং প্রদীপ অনুভব করল দিদির সত্যি সত্যি বয়স হয়ে গেছে। দিদি হয়তো বা ক্রান্তও।

গত কদিন মার চিকিৎসা নিয়ে অনেক অমোক্ষিক প্রস্তাব শুনে শুনে প্রদীপ ক্রান্ত হয়ে পড়েছে। তবু প্রদীপ যেন বিভার কাছ থেকে ঠিক এতটা আশা করেনি। প্রদীপের ইচ্ছে করছিল এদিন বলে দেয়, “দিদি, তুই কি পাগল হয়ে গেছিস। আজকের দিনে তুই কিনা তুচ্ছতার দিকে ঝুঁকেছিস? কৈ, আগে তো তাকে কোনদিন এমন সব উদ্ভট চিন্তাভাবনা করতে দেখিনি?”

বিভা তো চিরদিন সংস্কারমূলক বাস্তববাদী মেয়ে ছিল। লেখাপড়ায় খুব মেধাবী না হলেও একেবারে খারাপ কিছু ছিল না। গ্রাজুয়েশনের পরে নিজের চেষ্টায় ব্যাঙ্কের প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় বসে চাকরি জোগাড় করে নিয়েছিল। প্রদীপ তখনো বেকার। প্রহিমানী স্কুলের শিক্ষক বাবার আয় এমন কিছু ছিল না, যা দিয়ে করুণা অলক আর উৎপলের লেখাপড়ার খরচা চালানো যায়। ফলে দিদির আয়ের ওপর বাবাকে নির্ভর করতে হতো। দিদি বিয়ে করেছিল নিজের পছন্দ মতো পাঠকো। আবার বিয়ের দিন বরেরের মাথায় স্বামী এবং শাশুড়ির অমানবিক ব্যবহারের শব্দের বাড়ি থেকে এক কাপড়ে মাথা উঠ করে বেরিয়ে আসে। আপস করেনি সমাজের কাছে। শশুরস্কুলের সঙ্গে। আর বিয়ে ভেঙে যাওয়ার মাস ছয়েকের মধ্যেই ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকের বাবার অকাল বিয়োগের পরে প্রদীপদের মাথার ওপর যখন আকাশ ভেঙে পড়েছিল তখন এই দিদিই তারা হাতদুটো মেলে ধরে তাদের মাথার ওপর ছাদ তৈরি করে দিয়েছিল। —“আমি তো আছি, তাদের চিন্তা কি?”

সত্যি সত্যি কোন চিন্তা করতে হয়নি প্রদীপদের। প্রদীপ আর এমন কি চাকরি করে? রাজা সরকারের ফ্লক। এতদিনে সেকশন অফিসার। প্রদীপের সাধা ছিল না করুণার বিয়ে, অলক উৎপলের ইঞ্জিনিয়ারি পড়ার খরচা চালান। সবটাই তো দিদি টেনেছে। দিদিই করেছে। মার পাশে অনড় বটাগছের মতো দাঁড়িয়ে থেকেছে। এখন ভাইবোনেরা সবাই প্রতিষ্ঠিত। নিজের নিজের জগত সংসার নিয়ে আছে। কেবল দিদির জন্য আর আলাদা কোন জগত তৈরি হলো না। দিদিই হতে দেয়নি। মাকে ঘিরেই দিদির জগত। সেই দিদি মার মৃত্যু আশঙ্কায় যদি হঠাৎ করে তুচ্ছতাক, দৈবশক্তিভিঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাহলে প্রদীপ কেমন করে পারবে সেসব প্রত্যাখান করতে?

প্রদীপ বিভার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, —“যাব। তুই বলছিস, আর আমি যাব না, তাই কখনো যাবের দিদি?”

যথাসময়ে বর্ধমান লোকাল হাওড়া স্টেশন থেকে দুপুর দুটো পনেরোয় বর্ধমানের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। মাঝদুপুরের বর্ধমান লোকাল। তাই যাত্রীদের ঠাসাঠাসি ভিড় ছিল না। বিভা বসেছিল জানলার ধারে। পাশে প্রদীপ। সঙ্গে ছোট্ট একটা ব্যাগ। ব্যাগে একরাতের জন্য শাড়ি জামা তোয়ালে নিয়েছে বিভা। সঙ্গে প্রদীপের পাজামা, পাঞ্জাবী। ব্যাগটাকে মাথার ওপর বান্ধে তুলে রেখেছে প্রদীপ।

ট্রেন লিলুয়া স্টেশন ছাড়ার পরেই প্রদীপ লক্ষ করল বিভাব শান্ত পাষণমূর্তি একটি একটু করে ভাঙতে শুরু করেছে। ট্রেন যতই এগিয়ে যাচ্ছিল, চলন্ত ট্রেনের খোলা জানালা দিয়ে হু হু বাতাস এসে যত ব্যাপটা মারছিল বিভার মুখে চোখে, বিভা যেন তত বেশি করে বসব ভুলে



চপল কিশোরীতে রূপান্তরিত হইছিল।

“কতদিন বাইরে বেরোনা হয়না বল তো দীপু!” মুখের ওপর উড়ে আসা চুলের গোছা হাত দিয়ে সরাতে সরাতে বিভা বলল, “মাকে ফেলে একরাতেই জন্যও তো কোথাও যাওয়াব উপায় ছিল না। সেই বাড়ি আর অফিস, অফিস আর বাড়ি।”

প্রদীপ ধীরে ধীরে নিজেকে এক বিক্রম জড়িয়ে ফেলছিল। দিদি কি কোন প্রমোদ ভ্রমণে বেরিয়েছে! দিদি যে উদ্দেশ্যে এই ট্রেনে উঠেছে, সেই উদ্দেশ্যের সঙ্গে বাড়ির বাইরে বেরুনের প্রসঙ্গ আসছে কেমন করে?

সেই শুরু। সারা রাত্য় বিভার আচরণ দেখে প্রদীপের বিক্রম ঘন থেকে ঘনতর হয়ে উঠেছে। ট্রেন এক একটা স্টেশনে দাঁড়োছে আর বিভা জানালায় মুখ রেখে প্রদীপকে জিজ্ঞেস করছে, —“এটা কোন স্টেশনের দীপু?”

“শ্রীরামপুর।”

“ওম্মা! শ্রীরামপুর! তোর মনে আছে দীপু, আমরা যখন অলকের বিয়ের পাণ্ডী খুঁজছিলাম, তখন এই শ্রীরামপুর থেকে একটা ভাল সম্বন্ধ এসেছিল। মেয়েটাকে খুব পছন্দ হয়েছিল আমাদের। কিন্তু পাণ্ডীপক্ষ আমি জিজ্ঞাসি শুনে পিছিয়ে গেল!” ... বিভা কাঁধের ওপর থেকে খসে পড়া শাড়ির আঁচল ঠিক করতে করতে শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। ট্রেনের শব্দও পারল না সেই শব্দকে আড়াল করতে। তারপর বিভা বলল, “মেয়েটা এখন কোথায় আছে, কোন ঘরের বউ হয়েছে কে জানে। যেখানেই থাকুক যেন সুখে থাকে।”

ট্রেন যখন ব্যান্ডেল স্টেশনে দাঁড়াল, প্রদীপের মুখ থেকে স্টেশনের নাম শুনে বিভা প্রায় কিশোরীর মতো এমনভাবে দুই হাতে তালি বাজাল যে কামরার সহযাত্রীরা কাঁধ ফিরিয়ে বিভাব দিকে না তাকিয়ে পারল না। প্রদীপ লক্ষ করল সহযাত্রীদের চোখে চাপা কৌতুকের স্কেত। এক প্রৌঢ়ার এমন বাচালতা দেখে যেমন কৌতুক বোধ করে সকলে, সেরকম কৌতুক খেলে গেল যাত্রীদের চোখে।

“মাই গড! ব্যান্ডেলা সেই যে সেবারের শীতে আমরা সবাই মিলে পিকনিক করতে ব্যান্ডেল চার্চে এসেছিলাম। মা-ও সঙ্গে এসেছিলেন। মনে পড়ছে না দীপু? ফেরার সময় মার শরীরাটা হটাৎ করে একটু খারাপ করেছিল। করবেই তো, আঘাতে ঘটাপটির অভ্যাস তো ছিল না মার। মার শরীর খারাপ করতে দেখে উৎপলটা এমন নার্ভাস হয়ে পড়েছিল যে কী বলবে?”

“তুইও ভীষণ ঘাবড়ে গেছিলি। অস্থির হয়ে আমাকে তাড়া দিচ্ছিলি, একটা ডাক্তার ডাক দীপু। একটা ডাক্তারের খোঁজ কর।”

“মোটেরি না। আমি বরং বলছিলাম, অবেলায় যাওয়া দাওয়া হয়েছে, তাই বদহজম হয়ে গেছে মার। একবার বমি হয়ে গেলে ঠিক হয়ে যাবেন।”

প্রদীপ কথা বাতাল না। এই বিভাকে দেখে এখন কে বলবে সে মার অনিবার্য মৃত্যুকে প্রতিহত করার জন্য শেষ চেষ্টা হিসেবে কোন এক তাত্ত্বিকবাবার মস্তপুতঃ ওষুধ আনতে চলেছে।

কর্মমান স্টেশনে নেমে প্রদীপ যখন জালালখালির বাস ধরার জন্য ব্যস্ত হয়ে বিভাকে তাড়া দিল, —“চল দিদি। জোরে পা চালা। দেরি করলে বাসে বসার জায়গা পাবি না।” তখন বিভা প্রদীপকে অগাধ বিষময়ে ডুবিয়ে দিয়ে প্লাচিকর্মের একটা ধার ধোঁয়ে স্থির হয়ে

দাঁড়িয়ে রইল!

“কি হলরে দিদি? দাঁড়িয়ে রইলি যে! বাস ধরবি না?” প্রদীপ জিজ্ঞেস করল।

“নায়ে। বাস ধরব না।”

“কেন? শরীর খারাপ লাগছে?”

“না না। শরীর ঠিক আছে।”

“তাহলে?”

“এমনি। কী হবে ওসব তুচ্ছতাক করে? সব অর্থহীন। আমি তো আর ওসব বিশ্বাস করি না।”

প্রদীপ সাড়া দিল না। বিতর্কিত চোখে বিভার দিকে তাকিয়ে রইল।

“আমি জানি দীপু, তুই ভীষণ অবাক হচ্ছিস।” ফ্যাকাসে হাসি হাসল বিভা, তারপর শাড়ির আঁচলটাকে টেনে বুক পিঠ ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে বলল, “ঐ সব তুচ্ছতাক দৈবশক্তিত্বের ওপর আমার কোন দৃর্বলতা জন্মানি। আসলে আমার মনে এক ধরনের লোভ, হাঁরে দীপু, এক ধরনের লোভ জন্মে গেছিল।”

“লোভ?” প্রদীপ শুকনো জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল। “কিসের লোভ? তুই লোভে আক্রান্ত হবি, একথা আমাদের বিশ্বাস করতে হবেই দিদি।”

“সভি লোভ। এই যে মার আসয় অনিবার্য মৃত্যুকে ঘিরে তোরা সবাই এক সঙ্গে হতে পেরেছিস, আমার চোখের সামনে আমার সব ভাইবোনেরা এক সঙ্গে রয়েছে, —এই সময়েটাকে যতদূর সম্ভব দীর্ঘ করার একটা লোভ আমাকে যেন তেঁন প্রকারে মার মৃত্যুকে বিলম্বিত করার দিকে ডাকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তাদের সব কটাকে এতদিন পরে এক সঙ্গে পেয়ে আমার মনে হচ্ছে আমাদের ছেলে বেলুটাঁই বোধহয় ফিরে এসেছে। তাদের রাগ অভিমান, তাদের হাসি-ঠাট্টা কদিন ধরে দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে আমার সময়জ্ঞান লোপ পেয়ে যাচ্ছে। ... মা চলে যাওয়ার পর এসব তো শেষ হয়ে যাবে।

ভবিষ্যতে এরকম দিন আর আসবে কিনা কে জানে?” বিভা থামল। গ্লুথ পায়ে ফেরার ট্রেন ধরার জন্য বিপরীত দিকের প্লাচিকর্ম যাওয়ার উদ্দেশ্যে স্টেশনের রেলব্রীজের দিকে হাঁটা শুরু করল বিভা। হাঁটতে হাঁটতে আবার আগের মতো ধরা গলায় বলল, “ট্রেনে আসতে আসতে ট্রেন পাচ্ছিলাম ছেলেবেলাকে জোর করে ধরে রাখতে নেই। হারানো সময় হারিয়ে গিয়ে ক্ষুধিত হয়ে ফিরে এলেই বেশি আনন্দ দেয়। এই তো অনেক। মা এবার চলে যাবেন।

তোরাও দূরে দূরে সরে যাবি। খালি খুঁটিটাই আমাকে আনন্দ দেবে। এই বেশি।

প্রদীপ বিভাকে বলল, “এখানে দাঁড়া দিদি, আমি ফেরার টিকিট কিনে আনছি।”

বিভা বিভাকে বলল, “এখানে দাঁড়া দিদি, আমি ফেরার টিকিট কিনে আনছি।”

বিভা বিভাকে বলল, “এখানে দাঁড়া দিদি, আমি ফেরার টিকিট কিনে আনছি।”

বিভা বিভাকে বলল, “এখানে দাঁড়া দিদি, আমি ফেরার টিকিট কিনে আনছি।”

বিভা বিভাকে বলল, “এখানে দাঁড়া দিদি, আমি ফেরার টিকিট কিনে আনছি।”

বিভা বিভাকে বলল, “এখানে দাঁড়া দিদি, আমি ফেরার টিকিট কিনে আনছি।”

## সেই চিঠিটা

অরুণ মুখোপাধ্যায়

সেই চিঠিটা!

চোখে পড়তেই এক নিঃশব্দ আত্নান্দে বৃক্কের ভিতরটা কেঁপে উঠল সমুদ্রের।

দরকারী একটা কাজের খোঁজে পুরনো ব্রিফকেশটা ঘাটাঘাটি করতে করতে চিঠিটা চোখে পড়ল। এই চিঠির আনুমানিক এক মাসখানেক ঘটাঘাটির কথা প্রায় ভুলেই ছিল সে এতদিন। চিঠিটা হাতে তুলে নিতেই গভীর এক বিষমতায় ছেয়ে গেল তার মনটা, ভাবল— কী বলবে এ চিঠিটাকে— অশ্লীল? চিঠি? এক আত্মত্যাগিক মৃত্যুর বার্তাবহ চিঠি? নাকি সে মৃত্যু-রোষে তার বার্তার সাক্ষী? তার জীবনের অনপনয়ে এক কলঙ্কের দাগ যেটা তাকে সারা জীবন বহন করতে হবে?

চিঠিটা হাতে করে কিছুক্ষণ স্থব্ধ হয়ে বসে রইল সমুদ্র। তারপর ধীরে ধীরে দুঃস্বপ্নীয় এক স্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে লাগল সে। তার পক্ষে স্মৃতির আরম্ভটা সুখের, কিন্তু পরিণতিটা চরম দুঃখের।

চিঠিটা সমুদ্রের পিসিমণির। বাবার আপন মেজদির। বিয়ে করেননি। একটা মেয়ে-স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। সমুদ্রের বাবার বিয়ের পর থেকেই আলাদা বাসভাড়া করে থাকতেন বাবার তৈরী বাড়ি ছেড়ে। কমলেশবাবু বাধা দিয়ে বলেছিলেন, তোমার আলাদা থাকার কী দরকার, এ তো তোমারও সংসার মেজদি, বাড়িতে তোমারও অংশ আছে, এ বাড়িতে তোমার কোন অস্বস্তি হবে না; তা ছাড়া তুমি বিয়ে করবে না স্থির করবেছ। এখন না হয় তোমার চলে যাবে, কিন্তু বুড়ো ব্যাসে কে দেখাবে তোমায়?

—তখন দেখা যাবে। তাছাড়া একটু দূরে থাকলে সম্পর্কটা ভাল থাকে, এক সংসারে থাকলে একটা রিসক থেকে যায়। তাছাড়া আমি তো খুব দূরে থাকছি না, কালীঘাট থেকে ভবানীপুর—কতটা আর দূর, যাওয়া-আসা তো থাকবেই। এতেই সম্পর্কটা ঠিক থাকবে।

কমলেশবাবুর নব পরিণীতা বধু অপরাধবোধে বিদ্ধ হয়েছিলেন, বলেছিলেন, আমিও এ বাড়িতে পা দিলাম, আর আপনিও চলে যাচ্ছেন মেজদি, এর জন্য যেন আমিই দায়ী, আমাকেই অপরাধী করে রেখে গেলেন।

—তা একেবারেই নয় কল্যাণী, এটাই ভাল হল, তোমাদের সংসারের একজন হয়েই আছি, তবে একটু দূরে—এ পর্যন্ত। তারপর কল্যাণীর কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, অববাহিত নন্দকে সংসারের ভেতরে থাকতে নেই, একটু দূরে থাকাই নিরাপদ—উভয়ের পক্ষেই, বলেই হেসে ফেললেন মিনতি, স্বস্টা একটু তুলে বললেন, একটু দূরে থাকলে সম্পর্কটা আরও নিবিড় হয়, আমি প্রায়ই আসব, তোমরাও যাবে, ব্যাস।

এইভাবেই মিনতি বাড়ি ছেড়ে তার ভবানীপুরের বাসায় চলে এলেন। আরও সুবিধা হল, স্কুলটাও খুব কাছে—হাঁটপথ মাত্র। সময় পেলেই ছুটে ছুটে যেতেন কালীঘাটের বাড়িতে, কমলেশ ও কল্যাণীও মিনতির বাসায় ঘন ঘনই যেত অস্তত সমুদ্র হওয়ার আগে পর্যন্ত। তাঁর বাপের বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আরও বেড়ে গেল সমুদ্র হওয়ার পর থেকে, সে-ই বড় আকর্ষণ, তার সঙ্গেই সব চেয়ে বেশী খাতির জন্মাবার পর থেকেই—বড় একটা গিনি দিয়ে

বিভাব : বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা

১৬৩

তার মুখ দেখেছিলেন মিনতি, সমুদ্র নামটাও তাঁর দেওয়া, সুমু—সুমুস্ত নামের আদুরে সংস্করণও তাঁরই করা, তার হাতেখড়িও পিসিমণির হাতে, যদিও সে সময়ে হাতেখড়ির আচার্য মেয়েরা হতে পারতেন না, কিন্তু তিনি তা গ্রাহ্য করেননি। কমলেশবাবুও মনে নিয়েছিলেন তার শিক্ষিতা ব্যক্তিত্বময়ী মেজদিকে। শুধু কি তাই, সুমুর পাঠ্য জীবনের পরিকল্পনাও তাঁর একেবারে গোড়া থেকে—নিজের স্কুলের ছোটদের বিভাগে তিনি ভর্তি করে নিলেন সমুদ্রকে। কল্যাণী এসে দিয়ে যেত ও নিয়ে যেত, কিন্তু স্কুলে সুমুর দেখাশোনা এবং পড়াশোনার অগ্রগতি সমস্তে নিজের রাখার দায়িত্ব তার পিসিমণির। প্রতি শনিবারে স্কুল ছুটির পর সুমুকে তার বাসায় নিয়ে আসতেন তিনি, রোদ পড়লে বিকেলে কালীঘাটের বাড়িতে দিয়ে আসতেন, কমলেশ ও কল্যাণীর সঙ্গে গল্প-গুজব করে কাটিয়ে সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে আসতেন। এই ছিল সুমুর বাল্যকালের পাঠ্য জীবনের রকম। কমলেশ-কল্যাণী দরুণ খুশি। 'পিসিমণি' সন্দেহনাত্মক কল্যাণীই শিখিয়েছিল ছেলেকে।

হাইস্কুল স্তরে পৌঁছেও সুমুর রকমের কিছু হেরফের হল। ভবানীপুর মিত্র ইনসটিটিউশনে মিনতিই ভর্তি করে দিয়ে এলেন তাকে। ভর্তির ফর্ম পূরণের সময় কমলেশই হাসতে হাসতে বলেছিল সুমুর গার্লফ্রেন্ড জায়গায় তোমার নামটি বসিয়ে দাও মেজদি।

—তাই কি হয়? বাবার অধিকার আমি কেড়ে নিতে যাব কেন? তুমিই সহ্য কর। ঠিক হল সুমু প্রতি রোববার পিসিমণির কাছে গিয়ে সাধারণত থাকবে, তাঁর কাছে পড়বে, সন্ধ্যায় পিসিমণির সঙ্গে কালীঘাটের বাড়িতে ফিরবে।

এ ভাবেই আগাগোড়া পিসিমণির পারিবারিক নিবিড় স্নেহছায়ায় ও পড়াশোনার তীক্ষ্ণ তত্ত্বাবধানে এগিয়ে চলল সুমুর পাঠ্যজীবন। স্কুল ফাইনাল ও হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় খুব ভাল রেজাল্ট করে বেরিয়ে এল। কমলেশ-কল্যাণী মন্তব্য করল, সুমুর এই কৃতিত্ব সম্পূর্ণ তোমার মেজদি।

—তা কি করে হয়? তোমাদের ছেলে আদৌ ভাল ছিল নাকি? সুমু রীতিমত প্রস্তুত ও বুদ্ধিমান ছেলে। বড় হলে আরও কৃতী হবে।

এবার সুমুর কলেজে পড়ার বিষয় নির্বাচনের আধানেও মিনতিই অগ্রবর্তিনী। যদিও তাঁর নিজের বিষয় ছিল দর্শন—এম, এ পর্যন্ত, তবু সুমুর পাঠ্য বিষয় নির্বাচনে এল অর্থনীতি, কেননা তাঁর মতে, যদিও সুমু হায়ার সেকেন্ডারিতে বিজ্ঞান নিয়ে পাশ করেছে তবুও সে অর্থনীতিই পছন্দে, কারণ অর্থনীতি কোন পড়ায়কে তার পরিপার্শ্বের সমাজ ও মানুষকে যত ঘনিষ্ঠভাবে চেনাতে পারে বিজ্ঞান ততটা পারে না, তাছাড়া অর্থনীতি মানববিদ্যাগুলোর মধ্যে পয়লা নম্বরের আর্থনরিক বিষয়, কর্মজীবন এতে চাহিদাও বেশী বর্তমান যুগে। কমলেশের কাছে মেজদির এ যুক্তি অকট।

অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হল সমুদ্র এবং তিন বছর পড়ে প্রথম শ্রেণী পয়েন্ট সে বেরিয়ে এল।

পরীক্ষার ফল বের করার দিনে কমলেশের বাড়িতে ছোট-খাট একটি উৎসব লেগে গেল। উৎসবের মধ্যমণি কমলেশ-কল্যাণী মেজদি, সুমুর পিসিমণি। একদিকে তাদের মেজদির প্রশংসায় গদগদ হয়ে বাবা-মায়ের প্রণামের ঘটা, অন্যদিকে সুমু পিসিমণিকে পরম আদরে শ্রদ্ধায় জড়িয়ে ধরে অভিব্যক্তি—বিসময়ি—এ তোমারই অবদান, তুমি সত্যি অতুলনীয়। তিনি সুমুর গায়ে মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, আরে ছাড় ছাড়, বলি



শোন, আমার কাজ তো এখানেই শেষ, এবার থেকে তোার নিম্নের ভাবনা, নিজের সিদ্ধান্ত, এম, এ টা পড়বি না চাকুরি খুঁজবি ভাল করে ভেবে নেবে। পিসিমণিকে ছেড়ে দিয়ে তাঁর পায়ের কাছে বসে পড়ল সুম, বলল, পিসিমণি এত দিন তুমি আমাকে গাইত করছে, সব বাবস্থা করে দিয়েছে— সেই কে-জি থেকে, এখন এ্যানুফ হাচ্ছ কেন ?

—দেখ সুম, তুই এখন আডালট, এখন কেরিয়ারের সিদ্ধান্তটা তাকেই নিতে হবে, অবশ্য কমলেশকে জিগোস করে নিতে পারিস। তবে আমার কাছে জানতে চাইলে বলব, তবে এ বলটা চাপিয়ে দেওয়া নয়, তুই যদি শিক্ষা লাইনে যেতে চাস, অর্থাৎ অধ্যাপনা করতে চাস তাহলে এম, এ টা পড়লেই চলবে না, ডকটরেটটাও করতে হবে, অর্থাৎ দুই এবং কমপক্ষে, রোজন্ট বেরোনো পর্যন্ত চার বছর, মোট ছয় বছরের ধাক্কা। অর্থ হল একটু বেশী ব্যয়ে চাকুরিতে ঢুকতে হবে, তবে এখনই যদি চাকুরিতে ঢুকিস তাহলে অল্প বয়স থেকেই চাকুরিতে উন্নতি হবে, শেষে খুব বড় পদ থেকে অবসর নিবি। সে ক্ষেত্রে গ্রাজুয়েট স্তরটাই যথেষ্ট, এম, এ পড়ার দরকার হবে না তাহলে। এবার ভেবে দেখ।

—বন্ধুরা আমাকে আই, এ, এস পরীক্ষায় বসতে বলাছে, তোমার কী মত ?

—পদটা সম্মানের সঙ্গেই নেই, কিন্তু বিপদ হল— আই, এ, এস অফিসারদের শাসক দলের তাঁবেদারি করছে হয়ে ওঠে। তবে সত্যনিষ্ঠ জনদরদী আই, এ, এস অফিসার হয়ে যদি টিকে থাকতে পারিস তা হলেই মঙ্গল। চেষ্টা করে দেখতে পারিস যদি তুই নিজে থেকে রাজি থাকিস।

শেষ পর্যন্ত মতি স্থির করে আই, এ, এস পরীক্ষায় একবারেই উত্তীর্ণ হয়েছে সুমন্ত। এবারেও এক ছোট-খাট উৎসব—এবার পিসিমণির বাড়িতে। কয়েকজন বন্ধুকে ডেকেছিল সে, বিশেষ করে তার জীবনের হ্রেড ফিলোসোফার এ্যান্ড গাইড—পিসিমণির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে। বন্ধুরা তো তাঁর সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ— কী ব্যক্তিত্ব, কী সমাজ চেতনা, কী সহমর্মী মহিলা। সুমন্ত মনে মনে পিসিমণির জন্য গর্ব অনুভব করে।

একটু জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই মাঝে মাঝেই সুমন্ত বাবার দরত তুমি কেন একা এখানে থাকছ পিসিমণি, চল না বাড়ি ফিরে, বাড়িতে থাকলেই তো তোমাকে সব সময় কাছে পেতে পারি।

—তুই কি ভাবছিস আমি বাড়ির সঙ্গে বাগড়া করে এখানে চলে এসেছি ? তা একবারেই নয়। এই তো বেশ ভাল আছি, কেমন স্বাধীন। তাছাড়া তুই এখানে সব সময় আসিস, কমলেশ-কল্যাণীও আসছে মাঝে মাঝে, আমিও তাই প্রায়ই যাচ্ছি ও বাড়ি। সবতো ঠিকই আছে, আমার কথা এত ভাবিস না, শুধু মন দিয়ে পড়াশোনা কর।

আজ আরও বড় হয়ে, আরও বেশী জেনে-বুঝে সুমন্তকে একই কথা বলাতে হচ্ছে পিসিমণিকে— তুমি বাড়ি চলে এসো। এখন এ অনুরোধের কিছু বাড়তি যুক্তি আছে, যেমন, প্রথমত তাঁর অবসর নেওয়ার সময় হয়ে এসেছে, দ্বিতীয় সমস্যাটিকে তাঁকে একা একাই বাসায় পড়ে থাকতে হবে তা দুঃসহ লাগতে পারে। দ্বিতীয়ত তাঁর আর্থারাইটিসের বাথটা মাঝে মাঝে খুব চাড়া দিয়ে উঠছে, বেশী হাঁটতে কষ্ট হয়, শেষে অচল হয়ে পড়ে থাকলে কে দেখাশোনা করবে, কারণ সুমন্ত তো পোস্টিং পেয়ে জরান করতে পারে— কোথায় কত দূরে পোস্টিং হবে সে জানে না এখনও, পিসিমণিকে জেতেই তো যেতে হবে একা রেখে। এই-ই হবে পিসিমণির সঙ্গে তার প্রথম ছাড়াছাড়ি। ভাবতে ভাবতে মনটা বিয়দ হল তার। তবু

ওসব কথাই বলল সে। উত্তরে মিনতি সব উড়িয়ে দিল, বলল, দুব পাগল ছেলে, আমার জন্য ভাবিস না, রিচার্চারমেন্টের পর কি বসে থাকবে না কি ? ভাবছি রাস্তার ছেলেদের ডেকে এনে বাড়িতে বসে পড়াবো, এতদিন তো নিজের জন্য করলাম, সমাজের জন্য কিছু করি, তাতে আনন্দ আছে। আর আমার আর্থারাইটিসের ব্যথার ও আমার পিতৃধন, তাঁর ঠাকুরদার কাছ থেকে পেয়েছি, তা আমৃত্যু আমার সঙ্গী। তুই আমার জন্য ভাবিস না, পোস্টিং পেয়ে জরান কর, মন দিয়ে নিষ্ঠায় সঙ্গে, সুনামের সঙ্গে কাজ করবি সব সময়, তোরা পিসিমণির এ আশীর্বাদ সর্বদা তাঁর সঙ্গে আছে জানবি। তবে হ্যাঁ, তুই এই প্রথম দূরে যাচ্ছিস, মনটা তো একটু খারাপ হবেই, কোথায় থাকছিস, কী খাচ্ছিস, শরীরটা ঠিক ঠাক আছে কিনা— এসব নিয়ে চিন্তা তো থাকবেই, কমলেশ-কল্যাণীও তেমনই চিন্তা করবে। তবে ঘন ঘন চিঠি দিস সব জানিয়ে, তাহলে আমাদের উদ্বেগটা কম হবে। পেছন দিকে কম তাকিয়ে কেরিয়ারের সামনের দিকে বেশী তাকাবি এখন। আমরা ঠিক আছি, ঠিক থাকবো, কোন চিন্তা নেই। একটা কথা বলে দেই, চাকুরির প্রথম দিকে পিসিমণিকে দেখতে আসবার জন্য ঘন ঘন ছুটি নিবি না, প্রথমে একজন সং ও দক্ষ অফিসারের ইমেজটা তৈরি করা তাঁর সর্বপ্রথম দরকার, এটা কখনও ভুলবি না।

সুমন্ত সুম পোস্টিং পেল কুচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জে। জরান করে ছয় মাসের মধ্যে মসৌরিতে ট্রেনিং, তারপর স্বস্থানে ফিরে আসা, মহকুমা শাসকের কাছে মনোনিবেশ করা, পাঁচ বছরের মাথায় জেলা শাসকের পদে উন্নীত হওয়া, বিভিন্ন জেলায় বদলি হওয়া এবং শেষে রাইটার্সের ডেপুটি সেক্রেটারীর পদ পেয়ে কলকাতা আসায় সময় লাগল তার প্রায় দশ বছর। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বাড়ি ও পিসিমণির সঙ্গে চিঠিতে ও সাপ্তাহিক যোগাযোগ অব্যাহত ছিল তার; লক্ষ্য করছিল, পিসিমণির শরীর ক্রমেই যেন পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে, এ অচল অবস্থা রোধ করার কোন চিকিৎসা, কোন ওষুধ আর কাজ করছে না আজকাল। এবারে কলকাতায় এসে পিসিমণির ছেড়ারা দেখে চমকে উঠল সুমন্ত— হাত-পা ওকিয়ে যেন কাঠি হয়ে গেছে, চোখ অন্ধ। দেখে সুমন্তর বৃকের তেতরটা বেনোয়া মোচড় দিয়ে উঠল, একটু কঠিন স্বরেই বলল, আর নয় পিসিমণি, এবার বাড়ি ফিরে চল, এ অবস্থায় তোমায় এখানে দেখাবে কে ?

—দেখ সুম, তুই এখন মস্ত বড় অফিসার, এমন অস্থির হলে কি হোকো মানায়, আমি এখানে ঠিকই আছি, আমাদের স্কুলের পিয়নের সঙ্গে পারল দেখাশোনা করছে। সেদিন কল্যাণী এসেছিল, বলেছিল, তোমারই বাড়িতে বসে তোমার একটু সেবা করার সুযোগ দাও যেজদি, এখানে এভাবে পড়ে দিলে না। তাকেও এ কথাই বলে দিয়েছি। পাকল দরজার আড়ালে ছিল এতক্ষণ, এবার বেরিয়ে এসে বলল, জানেন দাদাবাবু, এ ছইল চোয়োর বসেই পথের ছেলেমেয়েদের পড়ায় ঘন্টার পর ঘন্টা, আমি দিদিমাকে বলি, এ শরীর নিয়ে এত কষ্ট কেন করেন, কিন্তু উনি শোনেন না।

—তুই থাম তো পারল। মিনতি ধমকে ওঠেন, ওর কথা শুনিস না সুম, আমার খুব একটা কষ্ট হয় না, তাছাড়া আমি ওদের আরেক পড়িয়ে তো ছেড়ে দিতে পারি না, কেসটিস শেষ হোক।

—তাহলে একজন বড় ডাক্তার দেখিয়ে, একজন নার্স রেখে নতুন করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিই পিসিমণি ?



—জানার-নার্স দিয়ে কী হবে? এ অসুখ চিকিৎসার অতীত।

পিসিমণিকে চলায় কে? সমস্ত হেরে গেল, ভাবল— তার এই পরম আপন পিসিমণি —  
চিরকাল স্বাধীনচেতা, আত্মনির্ভর, সংকল্পে অটুট, কর্তব্যে অটল, সংস্কারমুক্ত, পরম স্নেহময়ী,  
কিন্তু প্রয়োজনে কঠোর— এক মহীয়সী নারীমূর্তি, তার জীবনের ছিল এক ছায়াশীতল আশ্রয়।  
কল্পটা বুকে চেপে পিসিমণির পা ছুঁয়ে চলে এল সমস্ত সেদিন।

এর পরের ছ'মাসের ঘটনা দ্রুতই ঘটে যায়। মিনতির আর্থারাইটিসের ব্যাথা আরও  
বড়ে, হাত-পা প্রায় অচল। কমলেশ-কল্যাণী প্রায় অসি। হা-হুতাল করে চলে যায়, কোর  
করে কিছু বলতে সাহস পায় না, জানে মেজদিন কোন কথাই শুনবেন না। সমস্ত আসে আরও  
ঘন ঘন, এসে পিসিমণির পাশে চুপ করে বসে থাকে, মাথায় পিঠে হাত বোলায়, ভয়ে কথা  
বলেন না। পিসিমণিই বলেন দেখ সমু, জানি না, তুই তোর বিয়ের প্রস্তাবটা বার বার ঠেলে  
দিচ্ছস শুনেছি, কমলেশ-কল্যাণী কি হচ্ছে হয় না তুই সংসারী হোস। বিয়ের সিদ্ধান্তটা খুব  
ব্যক্তিগত বলে আমি বিশ্বাস করি, তাই তোকে কোনদিন কিছু বলিনি এ ব্যাপারে, কিন্তু আজ  
তোরা সংসারী মূর্তিটা দেখে যেতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে। সে সুযোগ কি আর হবে, তাই ভাবছি।  
এবার মুখ খুলল সমস্ত, বলল, পিসিমণি, ভাবছে। তাহে, তুমি সংসারী হচ্ছে না, কিন্তু আমার কি  
পিসেমশাই, পিসতুতো ভাই-বোন পাওয়ার ইচ্ছে ছিল না? মনে কর তোমার আদর্শেই চলছি।

—এই তো দেখছি আমাদের সমুখ মুখ ফুটেছে। আরে, আমার জীবনযাত্রাই যে তোকে  
ফালো করতে হবে এ কথা তোকে কে বলে দিয়েছে?

—কেউ বলে দেয়নি, শিখে নিয়েছি। তবে এখন যদি তুমি অনুমতি কর, বাস্কেটুকু লজ্জা  
পেয়ে বলতে পারল না সমস্ত।

—তা হলে তো আর দেয়নি নয়, আর দেয়নি না, হাতে হাতে ধরগো, বলে হেসে ফেললেন  
মিনতি। কমলেশকে তাহলে খবরটা দিতে হয়। শুভম শীঘ্রমু। তার কোন জানাশুনা মেয়ে  
থাকলে কমলেশকে আগেই বলবি, পরে কেবোরা বিপাকে না পড়ে।

সমস্ত-পিসিমণির এ সব কথাবার্তার পর তিন মাসও কাটেনি। এর মধ্যে একদিন রোববার  
সকালে পারুলকে দিয়ে সমস্তকে ডেকে পাঠান, জরুরি দরকার।

সমস্তও তড়িঘড়ি করে এসে হাফির— কী বিশেষ দরকার পিসিমণি? কথায় তার  
উদ্বেগ ফুটে উঠল, তার সামনে চেয়ার টেনে বসে পড়ল, বলল, শরীরটা খুব খারাপ লাগছে?

—ঠাটা হয়ে বসে শোন। তোকে হঠাৎ ডেকেছি একটা কারণে, বলে একটা মুখবন্ধ খাম  
দেখিয়ে বললেন, এর মধ্যে আমার লেখা একটা কাগজ আছে, তাতে যা যা লেখা আছে সেসব  
অক্ষরে অক্ষরে পালন করবি, একটুও যেন অন্যথা না হয়। এখনই খামটা ছিড়বি না। খুলে  
পড়ার দিনক্ষণ লেখা আছে খামের কোণায়, এ দিন এ সময় খুলবি, এর আগেও নয়, পরেও  
নয়। খামটির ভেতরের কাগজে কি লেখা আছে তা নিয়ে কৌতুহল ভ্রমণ করতে হবে, কিছু  
জিজ্ঞাস্য করবে না, বেশ শক্ত আদেশের সুরে বলে খামটি সমস্তর হাতে ভুলে দিলেন মিনতি।

সমস্ত হতবাক খামটা হাতে প্ত হলে বসে রইল, পিসিমণি কি লিখেছেন জানবার অদমা  
কৌতুহল থাকলেও মুখ দিয়ে কোন কথা বের হল না সমস্তর।

—খুব সাবধান, এ খামের কথা কাউকে বলবি না, দেখবি কারুর হাতে না পড়ে, তাহলেও  
এমন জায়গায় রাখবি না যে খামটি খোলার দিনক্ষণ ভুলে গেঁড়িস, তোর চোখের সামনে  
নেই।

—আমাকে কী কর্তব্য পালন করার নির্দেশ দিচ্ছে তোমার লেখায় জানি না, কিন্তু আমি  
কোন রক্মি পাচ্ছি না পিসিমণি।

—সারা জীবন আমার কথা শুনে কাজ করেছিস, এবার তোর শেষ পরীক্ষা, আমার  
আশীর্বাদ রইল তোর মাথার ওপর, বলে মিনতি তার শীর্ণ হাতটা বাড়িয়ে দিল সমস্তর  
মাথার দিকে, সমস্তও তাঁর হাতটা টেনে এনে মাথার ওপর চেপে ধরে রাখল কিছুক্ষণ,  
তারপর হাতটা টেনে নিয়ে এসে বললেন মিনতি, তোরা সব সুখে থাকিস।

সেই রোববার থেকে সমস্তর মাথায় ঘুরছে এক চিন্তা— কী আছে খামের মধ্যে, তাকে কী  
জানাতে পারে পিসিমণি? তার কথাও কেমন রহস্যমাখা, কথায় কিসের যেন একটা ইঙ্গিত,  
শেষ বিদায়ের সুর, তার মাথায় রেখে যেন শেষ আশীর্বাদ। তাঁর কি মনে হয়েছিল তিনি আর  
বঁচবেন না? তিনি কি পরলোকের ডাক শুনতে পেয়েছেন? অনেক আগেই কেউ কেউ মৃত্যুর  
ঘন্টা শুনতে পায় বলে গল্প শুনেছে সমস্ত, পিসিমণির ব্যাপারটাও কি তাই? কিছু বুঝে উঠতে  
পারে না, কাকুর সঙ্গে পরামর্শ করে বুকে নোবার উপায় নেই। খামটি খোলার দিনক্ষণ তো  
সামনের রবিবার সকাল চটা। সময় যেন তার আর কাটবে না, প্রতিদিনকে বড় দীর্ঘায়িত মনে  
হয়। অফিসে মন বসে না, ভেতরটা তার ছটফট করতে থাকে সব সময়।

আবার আর একটা চিন্তা হল— যদি ঠিক দিনে ঠিক সময়ে খামটি খুলতে ভুলে যায়। তাহি  
একটা বড় সাদা কাগজে বড় বড় করে দিনক্ষণ লিখে টেবিলের ওপর রেখে দিল সমস্ত।

সারা সপ্তাহটা দারুণ উদ্বেগের মধ্যে কাটল সমস্তর। এর মধ্যে এক দিন অফিস ফেরৎ  
পিসিমণির সঙ্গে দেখা করে এসেছে। পিসিমণি খুব গম্ভীর। বেশী কথাবার্তা হয়নি। ওঠার  
সময় মিনতি আর একবার শ্রবণ করে দিয়েলেন সমস্তর রবিবারের কর্তব্যের কথা।

আজ সে রোববার এলো। বেশী সকাল সকাল বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল সমস্ত যেটা তার  
অনভ্যাস। উঠেই মুখ বুজে আটটা বাজার অপেক্ষায় বসে রইল। চা, আল, খেল, চোখ ঘড়ির  
কাঁটার দিকে অপলক। ঘড়ির কাঁটা যতই আটটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল ভেতরে চাঞ্চল্য  
বড়তে লাগল। ভাতাভাড়ি তার ব্রিফকেসের তলা থেকে খামটা বের করে এনে টেবিলে  
রাখল, মনে প্রশ্ন এল— খামটা খোলার সময় কেন আটটার বেঁধে দিলেন পিসিমণি? কী  
উদ্দেশ্যে কোন এক রহস্য ভরে রেখেছেন তিনি এ খামে? শুধু আমার জন্যে?

ঠিক আটটা বাজতেই দ্রুতহায়ে খামের মুখটা খুলে ফেলল সমস্ত। ভেতরে চার ভাগ করা  
বড় একটা কাগজ—ভর্তি লেখা এ পাতা-ও পাতায়, সঙ্গে মুখবন্ধ করা ছোট একটি খাম—  
উপরে লেখা ‘চিঠিটা পড়়ে তারপর খামটা খুলিস’।

পিসিমণির চিঠি সমস্তকে সন্বেদন করে। নিঃশব্দে চিঠিটা পড়়তে লাগল সমস্ত—

শনিবার, ভবানীপুর

মেহের সমু

যেহেতু এই মুহুর্তে তুইই আমার সবচেয়ে বেশী বিশ্বাসভাজন সেহেতু তোকেই কাজের  
ভারটা দিচ্ছি। তোর কাছে আমি ঋণী হয়ে রইলাম। জন্মাবার পর থেকেই তুই আমার সান্নিধ্যো  
বধ হয়েছিস, আমার আশ্রয়-উপদেশ মেনে চলেছিস, আমিও যেক্ষণকৃতভাবে, পরম আদরে  
তোকে মানুষ করে তোলার দায়িত্ব অনুভব করেছিলাম। মনে হয়, আমি সফল হয়েছি, আমার  
জীবনে স্টেটাই সব চেয়ে বড় গর্বের জায়গা। আমার নিজের সন্তান থাকলে এমনই হত।

তোর ছেলেবেলায় তোর মনে আমার সখ্যকে কোন প্রশ্ন আসেনি, আসার কথাও নয়,



কিন্তু বড় হয়ে তোর পিসিমণিকে কিছুটা রহস্যঘেরা মনে হত নিশ্চয়ই, হয়তো তোর জানতে ইচ্ছে করত— কেন আমার পিসিমণি বিয়ে করেন নি, কেন নিজের বাড়ি থাকতে অন্য জায়গায় বাসা করে আছি। আরও অনেক কৌতূহল হতো তোর ছিল। তার কিছু উত্তর আজ তোকেই দিতে ইচ্ছে করছে। শুধু ব্যসনে মন, তুই এখন জ্ঞানে বুদ্ধিতেও অনেক বড় হয়েছিস, ঠিক বুঝতে পারবি। তবে শোন—

এম-এ পড়ার সময় এক সহপাঠীর সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ছেলেটি সং এবং মেধাবী। ভেবেছিলাম এ ছেলের সঙ্গেই ঘর বাঁধব, কিন্তু তা আর ভাগ্যে হল না। ছেলেটি এক রোড এক্সিডেন্টে মারা যায়। তখন থেকেই জীবনে বিয়ের সংকল্প পরিত্যাগ করলাম। বেশ তো কাটিয়ে দিতে পারলাম একক জীবন শুধু একজনকে যৌবনের যুগি নিয়ে।

এবার উত্তর দেই কেন বাপের বাড়ির সংসার থেকে আলাদা বাসায় কাটিয়ে দিলাম জীবনের অধিকাংশ সময়। আমাদের সমাজে মেয়েদের মর্যাদা দান এবং মেয়েদেরও আত্মমর্যাদাবোধ অনেকটাই শিখিল। তাছাড়া তাদের স্বাধীন-চিন্তা, আত্মনির্ভরতা (সে বোধকে রক্ষায় সহায়তা করে। আমি একদম বতী পরিবারের মধ্যে থেকে কোন রিক্স না নিয়ে স্বাধীনতা, আত্মমর্যাদা ও আত্মনির্ভরতা নিয়ে যেতে থাকতে চেয়েছি, অন্য দিকে সমাজের প্রিও একটা কর্তব্য বোধ করেছি যেটা আমি চেষ্টা করেছি আমার সীমিত ক্ষমতায় রাস্তার শিশুদের থেকে এনে পড়িয়েছি, সামান্য টিফিনও তাদের হাতে দিয়েছি শুকনো মুখগুলোর দিকে চেয়ে। নিজের জন্য এবং সমাজের জন্য এর চেয়ে বেশী কিছু করার সাধা আমার ছিল না। আর শিক্ষকতাকে যদি বলিস সমাজ সেবা তাও তিরিশ বছর ধরে করলাম।

তুই জানিস, আমি কঠিন আর্থারথারাইটিসের রোগী। এ রোগ আমার বংশসূত্রে পাওয়া। বাবা এ রোগে মারা যান। তাঁর মৃত্যু যন্ত্রণা, নিদ্রাশূন্য অবস্থা আমি দেখেছি। যখনই আমার মধ্যে এ রোগের লক্ষণ দেখা দিল তখনই বুঝলাম— এ আমার কাল রোগ। এ রোগের প্রকোপ বাড়তেই আমার মৃত্যু চিন্তা এল। এর মধ্যে কাগজে পড়ে নিয়েছি— এ দেশে মার্সি কিলিং-র স্বপক্ষে একটা জনমত গড়ে উঠছে, নিন্দা মাসানি তার বড় প্রবক্তা। একটা ডিগনিটি নিয়ে মরার পক্ষে এই মার্সি কিলিং আমার কাছে সমর্থনীয় মনে হল। এখনি ডাক্তারবাড়িতে বলতে ইতনি জানালেন, এটা হত্যার সমিল, ডাক্তারের পক্ষে ক্রিমিন্যাল অফেন্স। আমাকে মার্জনা করবেন। তখন ভাললাম, আকাশভরা সূর্যতারা বিশ্বভরা প্রাণের মধ্য থেকে একটা ক্ষুদ্র প্রাণ নিজেই খসিয়ে দিলে কতটুকুই বা ক্ষতি হবে? শুধু তোরা কষ্ট পাবি কিছুদিন। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।

তাই শনিবার রাতে অতিরিক্ত মাত্রায় ঘুমের গুণ্ড খেয়ে আমি বেছামুত্তার সংকল্প নিয়েছি। তুই এই চিন্তা যখন পড়বি তখন আমি আর পৃথিবীতে নেই। লক্ষ্মী সুমু আমার, খুব কাগাকাটি করিস না, তাদের দরগা দুঃখ হবে জানি, আরও বাড়বে দুঃখটা এই ভেবে কেন আমি নিজেই এ মৃত্যুকে ভেঙে আনলাম। সুমু, তুই হয়তো জানিস, আমি ভগবানে বিশ্বাস করি না, আমার কাছে মানুষই সব, তার মর্যাদা নিয়ে যেতে থাকার অধিকার, স্বাধীন চিন্তা ও কর্মের অধিকার, স্বনির্ভরতার অধিকার নিয়েই তো মানুষের বেঁচে থাকায় সার্থকতা, তা আমি প্রোগ্রেসিভ, সম্মানের সঙ্গে, মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছি। তাই যখন দেখলাম এ দুরারোগ্য অসুখটা আমাকে জীবনের শেষ প্রান্তে ঠেলে দিয়েছে, মৃত্যু প্রায় দ্বারপ্রান্তে তখন আমি নিজে শুধু তাকে দূরত্ব দিতে মাত্র। খুব ছোট ব্যসনে দিদি মারা গেলেন, আমি

বেঁচে রইলাম, কমলেশ এল, আমার পৃথিবীতে এতদিন বেঁচে থাকার মধ্যে কোন আপসোস নেই, কারুর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, ফুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ও কর্মের জীবন নিয়ে এবং তাদের সঙ্গে বেশ তো কেটে গেল জীবনটা। সুমু, তোর মনে আছে জীবনানন্দের কবিতা সে লাইনটা— “মাটির ইচ্ছার টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি অনুভব করবি, না এলেই ভাল হত, এসেও যে গভীরতর লাভ হল সে সব বুঝেছি।” হ্যাঁ, ঠিক উদ্ধৃতি দিতে পারলাম তো, না স্মৃতি বিশ্বাসঘাতকতা করল? জীবনানন্দ আমার প্রিয়তম কবি, তাকেও জীবনানন্দ পড়িয়েছি, আর তাঁর জন্মের শতবর্ষে বিতর্ক উঠেছে—জীবনানন্দের দুর্ঘটনায় মৃত্যু বেছা-মৃত্যু নয় তো? মাঝেও প্রকৃতি তখন অমন কবি আর হল কে?

সুমু, যুক্তি দিয়ে সব বোঝার, অনুভব করার চেষ্টা করবি, তাতে দুঃখ কম পাবি। সে কারণেই এ চিন্তা কমলেশ ও কল্যাণীকে পড়তে দিবি, দুঃখ কম পাবে। তাদের সকলকে চিরকালের মত ছেড়ে যেতে আমারও কি কম কষ্ট হবে ভেবেছিস?

এবার তোর করণীগুলি সমক্ষেপে বলি—  
এক, হিন্দু সংস্কার সমিতিতে টাকা দিয়ে গাড়ি বুক করা আছে শ্রুশান খরচ সহ, ফোন করে দিলেই গাড়ি চলে আসবে।

দুই, সুমু তোকে এতদিন সত্যবাদিতার পাঠ শিখিয়েছি, আজ তার বিপরীত একটা অনুরোধ করব এবং তা তোদেরই জন্য। তোর একজন জানাশোনা ডাক্তার বন্ধুকে ভেঙে এনে নরম্যাল মৃত্যুর ডেথ সার্টিফিকেট করিয়ে নিতে পারবি তো? তা না হলে তোকে আবার পেটমর্টেমের হ্যাণ্ডা পোহাতে হবে। তবুও বলি, যদি তুই এতে রাজি না থাকিস অথবা ডাক্তারবন্ধু রাজি না হয় তার বিরুদ্ধে বাবস্থাও রেখেছি— এ চিন্তা সঙ্গে যে ছোট খামটি আছে তাতে সব কারণ দেখিয়ে, ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন সহ আমার সুইসাইড নোট আছে, তাতেই তুই অব্যাহতি পাবি, কিন্তু পেটমর্টেম এড়াতে পারবি না। এ সব ঠিক করার পরই হিন্দু সংস্কার সমিতিতে ফোন করবি। তোর অফিসিয়াল পঞ্জিনেও কাজটা সহজ হবে মনে হয়।

তিন, আমার জীবনের যা কিছু সঞ্চয় তার সবই তোকে দিয়ে গেলাম। আলমারির চাবি আমার টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে আছে। আলমারিতে তোর নামে একটা উইল আছে। তার মধ্যে সব লেখা আছে। যেটুকু সোনার গয়না আছে তা তোর ভাবী বউয়ের জন্য উপহার হিসাবে দিলাম। আফসোস রইল—আমি নিজের হাতে বউমাকে গয়নাগুলি পরিয়ে দিতে পারলাম না।

চার, পেটমর্ট অফিসের পাশ বইয়ে যে ক’হাজার টাকা আছে তার আরেকটা কোন সং নারী কল্যাণ সমিতিতে দান করে দিস।

পাঁচ, আমার কোন শ্রদ্ধা-শাস্তি করবি না। শুধু পথের যেসব ছেলেমেয়েদের আমি পড়িয়েছি তাদের ভেঙে একদিন পেটপুরে খাইয়ে দিস। পারল তাদের ভেঙে আনতে পারবে।

আমার কথা শেষ। এবার বিদায় নেবার পালা। যে সুন্দর পৃথিবীটা আলো, বায়ু, জল আহ্বার দিয়ে আমাদেরক্ষা করে জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে সে সুন্দর পৃথিবীকে প্রণতি জানাই, বিদায় জানাই, আর যারা আমাদের ভালবাসেছিল, শ্রদ্ধা করেছিল, মানুষীর মর্যাদা দিয়েছিল—তাদের সকলকে আমার গভীর স্নেহ ও ভালবাসা জানাই, বিদায় জানাই।

সুমু, তোর মাথাটাকে একটু এগিয়ে দে— তোর কপালে আমার স্নেহ-চশম একে দিলাম,



এটা তোর বাকি জীবনের জয়-তিলক হোক—সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করি। সুখে থাকিস।  
আমার সোনা সুমু, বিদায়। হাঁত

তোর পিসিমণি

চিঠি পড়া শেষ করেই ডুকরে কেঁদে উঠল সুমুস্ত। তার পরেই গলাফটা চিৎকার—  
পিসিমণি নেই। কমলেশ ও কল্যাণী শুনে ছুটে এল পাশের ঘর থেকে, কী হল, কী হল বলতে  
বলতে সুমুস্তর সামনে এসে দাঁড়াল। পিসিমণি নেই, পড়ে গেছে, বলে চিঠি বাবার হাতে দিল  
এবং টেবিলে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল।

মেজদি নেই? কিন্তু এ চিঠি কার এবং কেন— প্রথমে হতভম্ব হয়ে কিছুই বুঝতে পারল  
না কমলেশ, খাটে বসে পড়ে চিঠি পড়ে ফেলল। মেজদি আমাদের সকলকে এভাবে ফাঁকি  
দিয়ে চলে গেল— কী নিষ্ঠুর, বলে কামায় ভেঙ্গে পড়ল কমলেশ, কল্যাণীও তাই। তার  
করণীয় কাজগুলির কথা মনে পড়তেই সুমুস্ত উঠে পড়ল, বলল, বাবা চলো এমুদি।

বাড়ি থেকে শশশন পর্যন্ত সব কাজই সুমুস্ত পিসিমণির নির্দেশমত সমাণ্ড করল, পথের  
ছেলেমেয়েদের একদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থাও করল। পিসিমণির শোকে, স্মৃতিভারের তার  
অশান্ত মন শান্ত হতে অনেক সময় লাগল। এক সময়ে তার বিয়ে হল, পিসিমণি ছাড়া এ  
বিবাহ অনুষ্ঠান তার কাছে অপূর্ণ মনে হল। বিয়ের রাতে পিসিমণির দেওয়া গয়না নন্দিতার  
হাতে তুলে দিল। পিসিমণির সেই চিঠিটা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গেই আর একবার পড়ল, নন্দিতাকে  
পড়াল এবং তারপর পুরনো ব্রিফকেসটাও সম্বল রেখে দিল।

—হাতে ওটা কী? ঘরে ঢুকে নন্দিতা সুমুস্তকে জিজ্ঞাসা করল।

—পিসিমণির সেই চিঠিটা সুমুস্ত চিঠিতা, এগিয়ে দিয়ে বলল। নন্দিতা চিঠিতা নিয়ে একবার  
মাথা ঠেকাল। তারপর পিঠে হাত রাখল সুমুস্ত।

## সাপ

মৃত্যুঞ্জয় সেন

পাটের নোতাটা অর্জুনের প্রায় গা-ছুঁয়ে চলে গেল। তার মুখ দেয়ালের দিকে, কিন্তু ডান  
হাতটা অস্বাভাবিক লম্বা হয়ে ওল্টেদিকে এমনভাবে পড়ে আছে, সেখান থেকে হঠাৎ অর্জুনের  
নয়। সেই হাতটাকেও স্পর্শ না করে বড় দুশীল্যানার সঙ্গে হেলা তার পাটের নোতাটা ঘুরিয়ে  
নিয়ে অর্জুনের পায়ের দিকে নামিয়ে টেনে নিয়ে গেল শেষ প্রান্তে। শেষ প্রান্তে জেনারেল  
ওয়ার্ডের সারি সারি ভিন্টি বাথরুম। বাথরুমের পাশে দাঁড়িয়ে যে তার মাথার গামছাটা  
ভাল করে বেঁধে নিয়ে নোতার ওপরে সমায়োত্রী হওয়া কিছুটা বিবর্ণ ফিনাইল ঢেলে দিল।  
সোখান থেকে হাঁক দিল, ই অর্জুন, ই অর্জুন উঠ। উঠ।

মফঃহুল শহরে ঘিশনারী পরিচালিত লিটল লাভ নামের হাসপাতাল। চার-চারটি বাড়ি।  
শুধু রুগীদের জন্যে। জেনারেল ওয়ার্ডের সঙ্গে আছে একটা ওষুধখানা। তাছাড়া অপারেশনের  
ঘর। ওয়েটিং রুম। এককোয়ার্টার। অনেককিছু। আসলে বাড়িটা প্রকাণ্ড। পঁচিশ ফুট লম্বা। পাঁচ  
পাঁচটা সিঁড়ি উপরে এলে ঢাকনা দেয়া খোলা বারান্দা। বারান্দার পর দরজা ঢেলে ভেতরে।  
সেখানেও প্রশস্ত জায়গা। একটা প্রকাণ্ড ঘর। সেটার নাম, হলঘর। সেখানে অনুসন্ধানঘর,  
অপেক্ষমান মানুষের বসার ব্যবস্থা। তারপর আবার দেয়াল। দু'দিকের দুই দরজা দিয়ে ভিতরে  
ঢোকার ব্যবস্থা। একদিকে জেনারেল ওয়ার্ড। পুরুষ রুগীদের। অন্যদিকে অপারেশনের ঘর।  
ডাক্তারবাবুদের বিশ্রামঘর। এই ভিতরের ঘরটায় অর্থাৎ হলঘরে সারাদিনে এত মানুষ ঢোকে  
যে অর্জুনা সেখানে তখন ঢোকার কথা চিন্তাও করতে পারে না। তবে সন্ধ্যার পরে দু'দশজন  
থাকলেও রাত নটা দশটার পর প্রায় লোকশূন্য হয়ে যায় ঘরটা। কেবলমাত্র ঘণ্টাপড়া রুগীদের  
দু'চারজন আত্মীয়স্বজন থেকে যায়। তারা হয় দেয়ালসংলগ্ন মোজাইক করা টানা লম্বা সিমেন্টের  
ঢালাই-এর বেষ্টিতে শুয়ে-বসে কাটায় অথবা কখনও কখনও হাসপাতালের সামনে এক  
কিলাতে বনানীর মধ্যে পয়চারির করে ফ্রান্ড-হয়ে পরে বসার মত পাঁচ-ছটি পাথরের টুকরোর  
ওপরে গিয়ে বসে পড়ে। ঐ সময়টা অর্জুনদের। অর্জুন অর্থাৎ পাঁচমারির বড় রাস্তার ওপরে  
যেসব উটকো দোকানদার আছে, তাদের বাসিলাস এখানে। দ্বারভাঙার অধিবাসী কমলের  
আছে মুড়ি-ছোলা-ছাতু-চানার দোকান, ভিনগুয়ের লোক রবীন্দ্র ঘড়াই-এর তেলোভাজার  
দোকান, এমন সব মানুষেরা। হাসপাতালে ফ্লোরফ্রিশ স্টাফদের কত্যা ঘোষালবাবু বেশ ছটফটে  
স্বভাবের মানুষ এবং অর্ধশ্রোত্রী। হিসেবপত্র তাঁর কাছে সব কাঁটায় কাঁটায়। কিন্তু গৃহহীনদের  
ক্ষেত্রে তাঁর বৃকের মধ্যে একটা দুর্বলতা ধরে রেখেছেন। তাই রাতে ফুটপাথের দোকানীদের  
স্টেপে কেউ, বাইরের কেউ কেউ তাঁদের হাসপাতালের জেনারেল ওয়ার্ডের হলঘরে জায়গা  
পেয়ে যায়। তবে ভোজের মধ্যে তাদের যে-যার পথ ধরতে হয়।

ভোর হয়েছে। হেলা, জনার্দনার ঘরসাফাই-এর কাজ শুরু করে দিয়েছে। সেই হেলাই  
হাঁকে উঠল, কিরে, অর্জুন, ঘুম ভাঙবে কিনা? ওদিকে ঘোষালবাবুর যে আসার সময় হয়ে  
গেল। তোর চামচে তো বহুত আগে উঠে গেল। সকলেভি উঠে গেল। আমি তো এখন ওয়ার্ডে  
ঢুকব। উঠ উঠ।

অর্জুনেরও সাকরদ আছে। সাকরদের মানে সেই পরানের পেটের ব্যবস্থা করা। সে কথা



ভাবলে অর্জুন নিজেকে অনারকম মনে করে। সে ভাবে, সে যেন একটা নয়। তার মধ্যে যেমন দু-তিনটা মন আছে, উল্টো পাশটা ভাবনা-চিত্ত আছে। অর্থাৎ যখন একটা মন এটা-ওটা করতে বলছে, তখন অন্য মন সেটা—আর একটা করতে বলছে। কোন কিছুই হিংস্রতা নেই, অর্জুন চিন্তা করে। এমন সব। সেভাবেই সে ভেবেছে, তার পেট আসলে একটা নয়, দুটো। একটা তার শরীরের সঙ্গে, আর একটা পরানের সঙ্গে। পরানের সব কিছু দায়দায়িত্ব অর্জুন বেছেছায় নিয়েছে।

জেনারেল ওয়ার্ড বাড়িটার সিঁড়ির পরে বারান্দায় তিনটি বড় দরজা। সেসব দরজা দিয়ে লোকজন যাতায়াত করে। মাঝের দরজাটা সকাল ছটায় খুলে দেয়া হয়। এদিন কেউ নিশ্চয়ই আগেই খুলে দিয়েছে। ৫৫ করে শীতের বাতাস ঢুকছে হলখরে। ঠাণ্ডা বাতাস লাগছে অর্জুনের গায়ে। তার বিছানা পাতা হয় বারান্দা দিয়ে হলখরে ঢুকে অনুসন্ধান ঘরের পাশে যে কোণটা সেখানে। সে জায়গাটা বেশ নিরিবিধি। একটু দূরে রুগীনের লোকজনের জন্যে সিমেন্টের চালা বেঁধি। সেখানে একটা পাখা। অর্থাৎ সেই পাখার বাতাসের ছিটেফোঁটা জোটে অনেকের জামায়। গরমকালে এসব পাওয়া মানে অনেককাল প্রার্থী। আর শীতে কাঁধা মুড়ে দিয়ে থাকলে তো কথাই নেই। কিন্তু গতরাতে কে যেন সেই জায়গায় বসি করে রেখেছিল, ভোর না হলে তো সামাই হবার নয়। অগত্যা অর্জুন মাঝের দরজার পাশের দেয়াল ধরে গুয়ে পড়েছিল। সারারাত ভাল ঘুম হয়নি। উঠতে দেরি হচ্ছে। দরজা হাটা এখন আবার শীতের হাওয়ায় অস্বস্তি হচ্ছে। হাসপাতালে কাটায বহল বোহরায় জন্ম-মৃত্যু নিয়ে কথা বেশি বলে অর্জুন। মনে মনে সে ভাবতে লাগল, শালা, আজকেরকার সকালের জন্মটাই হল গণ্ডগোলে, অকলাগে। বিরক্ত লাগছে অর্জুনের।

এসময় পরান এসে উপস্থিত। হাঁটু গেড়ে অর্জুনের গায়ে হাত দিয়ে, বলল, অর্জুনদা, ওঠো। এরপর বাথরুম তো আবার নোংরা হয়ে যাবে। ওয়ার্ডের পেনসেন্টরা উঠে পড়ছে। অর্থাৎ সারারাতের নোংরা বাথরুম ভোরে পরিষ্কার করার পরে হলখরে যামিনী-অতিক্রমীরা সেই বাথরুম ব্যবহার করে যে-যার জায়গায় ফিরে যাবে। বিনিময়ে হেলার পায়ে মাসকাবারি। যে যা পারে নেবে কমিয়ে। অবশ্য হেলার সামান্যতেই বৃশি। ঝামেলা নেই অর্থাৎ যা পায় তা দিয়ে সন্তোষ উপভোগ করা যায়।

ওয়ার্ডের লোকেরা উঠে পড়ছে, শুনে অর্জুন ঝটপট উঠে পড়ে। চোখ কলসাতে কলসাতে বলল, যাঃ, এত বেলা হয়ে গেল। আজ তো জঙ্গলে ঢুকতে হবে। শোন, তোর তো সব হয়ে গেছে। বিছানাগুলো মজিকদের কোয়টারের রেখে দিয়ে তুই গিয়ে সোকানটা খোল।

পরান বলল, আছে কী, তাই সোকান খুলব?

হঠাৎ অর্জুন বলল, যা আছে, তাই দিয়ে চালা। দেখছি, কী করা যায়।

তোমাকে বললুম, 'পেনসেন্টা ঢেঙ করো, তা তো করবে না।' কথাটা বলতে বলতে পরান উঠে দাঁড়াল। অর্জুনও।

এই সময় কুমল যোশাল হলখরে ঢুকলেন। অর্জুনের দিকে একবার তাকিয়ে অপারেশনের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

(২)

ঘণ্টাখানেক পরে অর্জুন বড় রাস্তার পাশে দীর্ঘ মথ্যা গাছটার নীচে এসে সেখান তার সোকান দেয়া হয়নি। এখানকার এই বড় রাস্তাটা চায়ের-জমি থেকে হাত তিনেক উঠতে।

উত্তরদিকের রেল স্টেশনের পাশ দিয়ে হাসপাতালের মোড়ে গজিয়ে ওঠা ছোটগাটো বাজারটার পাশ দিয়ে পিচ-ঢালা চওড়া রাস্তাটা ধরিয়ে গিয়েছে মাইলটাক। তারপর ডাইনে ঘুরে দমুয়া নদীর প্রায় পাড় ধরে পাশের জেলাতে ঢুকে গেছে। দমুয়া নদীর ওদিকটায় ডাকবাংলো, কোটকাছারি। আর একটু দূরে একটা গ্রামীণ ব্যাকের গ্রাম। তারপাশে শ্রকণ্ড মাঠ। সেখানে পাঁচ পীরের মেলা। চলে এক মাস ধরে। আসে সার্কাস। ভোজবাঞ্জির খেলা, জোড়াময়ের চোশমার খেলা, আরো নানারকম খেলা। অচেনা লোকজন। মাছের বাজার। সবজির বাজার। মনোহারী, এমনকী আসবাবপত্রের সোকানও। আর মাসবানেক পরে শুরু হবে সেই মেলা। তখন সকলেরই যাত্রাভারের পথ এই বড় রাস্তাটি। স্টেশন থেকে দলে দলে লোকজন আসবে। হয় হেঁটে, নয়তো টেম্পো বা ভ্যানরিক্সার। এ রাস্তায় বাস নেই। বাস স্টেশনের অন্যদিকের রাস্তা ধরে সোজা আসবে হাসপাতালের পিছন দিকে। সেখান থেকে আবার যাচ্ছে দমুয়া নদীর বাঁ দিকে থানা এবং স্থায়ী বাজার, সোকানপাট সেখানে। সেখান পর্যন্ত। ওখানই পটোল পাশ্পটি। কিন্তু আদালত বা বাজারহাটে যাবার সোজাসৃজি পথ এইটাই। এই বড় রাস্তার দুপাশে স্থায়ী-অস্থায়ী বহু সোকান। সেখানেই এক মথ্যা গাছের তলায় অর্জুনের আয়ুর্বেদ দাবিহীন।

গাছের নীচে দাঁড়িয়ে অর্জুন চতুর্দিকে তাকাতে থাকে। তার সোকান নিয়ে পরান কোথায় গেল? সোকানটা চলছে না বটে, তাই কি পরান সোকানটা তুলে দিল? অর্জুন মনে মনে বলে, সে তো পরানকে সৈন্য বহল, মেসার জনা অন্যান্য সোকান কদিন পরে বসবে। তখন ভিড়-ভিড় হবে। তখন সব কী হয়ে যাবে। চিন্তার কী আনন্দ?

এ অঞ্চলে অর্জুন এসেছে বছরখানেক। সেও পেটের দায়ে। এখানে আসবার কিছুদিন আগে এক আয়ুর্বেদ কোম্পানীর বাগানে মালির চাকরিতা তার গেছে। রোসবাবুর ছিল সেই আয়ুর্বেদ বাগান, গনেশখাটায়। সে প্রায় চার নিয়ে জায়গা। সেখানে হত নানাজাতের ঔষধির চাষবাস। জনা পাঁচেক মালি করত সেখানুনা। সামান্য টাকা পেত অর্জুন। কিন্তু চলে যেে। কারণ পরিবারের তার আপন বলতে আর কেউ ছিল না। ঐশকুক একটু ভিটে ছিল। সেখানে পিসেমশাই পিসিমার সঙ্গে তার অসুখ বাবাকে নিয়ে সে থাকত। তখন বম্বেরে একটা কাজ পেয়েছিল সে। কিন্তু তার বাবা বিনা চিকিৎসায় মারা যাবার আগে কিছুতেই অর্জুনকে বাইরে কাজে পাঠাতে চায়নি। অর্জুন কিন্তু রাজি ছিল। তারপর বাবার মৃত্যুর পরে পিসেমশাইয়ের রুমমুর্চি অর্জুন ভেবেছিল, এই সামান্য ডাকির জন্যে এত কাণ্ড। একটা তো জীবন তার। সহজে ত্যাগ করতে পেরেছিল পেতুক ভিটের মায়া। তারপর গ্রাম ছাড়া এক সদা কৈশোর্যাসী গ্রাম্যবালকের নানা হাট মোরা।

হঠাৎ অর্জুনের চোখে পড়ল জীবন মরার সোকান। সোকানের আধ-ডাকরুরা পান্ডার নিজে বেধিধতে বসে চা খাচ্ছে খানেক। অর্জুন দ্রুত সেখানে পৌঁছে গিয়ে পরানকে প্রশ্ন করল, কি হল রে পরান, সোকান দিবি না?

অর্জুনদা, ওখানে সোকান দিলে আর চলবে না। সব লোক তো রিগ্গাভানো, না হয় রিগ্গায় চলে যাচ্ছে। কে কিনবে তোমার জড়ি-বুটিয়া ওষুধ? এ হাসপাতালে যারা যাচ্ছে, তারাও প্রশ্ন করল পরান।

মাথা নিচু করে অর্জুন। ততক্ষণে জীবন মরার ছোট ছেলে একটা ছোট্ট কাচের রাসে লেবু-চা এনে বাঁ হাতে ছোট ছোট আঙ্গুর উচু করে অর্জুনের সামনে তুলে দিচ্ছে। অর্জুন হেসে



সেটা নিয়ে জীবনের দিকে তাকায়। জীবন তার বাঁ হাতে একটা গ্লাস চেপে ধরে ডান হাতে একটা চামচ নিয়ে সেই গ্লাসের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে প্রাণপন ঘুরিয়ে যাচ্ছে।

চায়ের গ্লাস ধরে অর্জুন সব এক চুমক দিয়েছে, তখন পরান বলল, তোমার মত সত্যপীর এ দুনিয়ায় কটা আছে জানো?

অর্জুন হাসে। হেসে বোঝায়, সে এ প্রশ্নের উত্তর জানে না।

পরান তার ডান তর্জনী তুলে বলল, এই, এই একটা স্যাম্পেল। সেটা তুমি। তারপর একটু খেমে বলল, সত্যি কথা বলে কী উপকারটা তোমার হয়েছে, বলতো?

সেসব বাদ দে। দোকানটা তো দিতে হবে। খাবো কী আমরা? আর তুই একটা জোয়ানামর্দ, তোর কেন আমার মত অবস্থা?

সে তো তোমাকে বলেছি দাদা। আমি চাষবাস করতে পারব না, চাকরিবারকি করতে পারব না। কোন খাটখাটি করতে পারব না। সব ছেড়েছে দিয়েছি। এমনিতে দিন চলল তো চলল। নতুবা গন ফটাস। কথাটা বলছি পরান গলায় দড়ি দেবার ভঙ্গি করল। তারপর বলল, যেভাবে এসেছি, সেভাবে চলে যাব। ঐ ত্রোমার হেলপারটুকু হতে পারি।

অর্জুন বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে বুঝেছি। চল গিয়ে দোকানটা দি। আর সেই নতুন ফেস্টুনটা আজ থেকে লাগা। অর্জুন অবশ্য মেলাসর সময় সেটা টাঙাবে ঠিক করেছিল।

ঐ সেই আয়র্বেদ ভবন? কিন্তু রাস্তার পাশে গাছের গায়ে লটকায়ে কাপড়ে 'ভবন' কথাটা পড়ে লোক হাসবে না? প্রশ্ন করে পরান।

হাসুক পে। আমার দুঃখেই আমার নিজেরই হাসি পায় মাঝে মাঝে। ভাবি, দুঃখটা কী জিনিস? কেন হয়? তাই উত্তর না পেয়ে হাসি। আর লোকেরা অকারণে যদি হাসে তো হাসুক না। অর্জুন বলল। হাসিও মানুষের বাঁচার ওষুধ, জানিনস? একটু খেমে কথাগুলো বলল অর্জুন।

অর্জুনের কথা শুনে পরানও হাসছে। সেসব দেখে জীবন মারা বলল, কী ব্যাপার অর্জুন, এত হাসির কী হল? ভাল মতকা জুটছে বুঝি? বাবা, এখন তো জড়ি-বুটিয়ার যুগ ফিরে আসছে।

জীবনের কথার কোন উত্তর না দিয়ে তাকে একটা দু-টাকার কয়েন দিয়ে অর্জুন বলল, যা বাকি থাকল, রাতে দেবা চলি। তারপর পরানের দিকে তাকিয়ে বলল, চল।

ওরা রাস্তার এপারে এসে সেই মথুরা গাছের নিচে দাঁড়াল। এখানে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছায়া। আশেপাশে দু চারটে দোকান। কোন কোন দোকান খোলা—কিন্তু খন্দের নেই। কোন কোন দোকানের মালিকই অনুপস্থিত। আবার কেউ কেউ লম্বা খেঁকিতে গুয়ে আছে টানটান হয়ে। নিচের চাষি-জমি থেকে সেই সব ছোট ছোট দোকানগুলোকে গ্রহাণুস্তরের কোন রহস্যবস্তুর বলে মনে হয়। গাছতলায় দাঁড়িয়ে অর্জুন পরানকে দোকান খোলবার জন্যে বলল।

পরান কিছুটা কিছুমিস্ত করে বলল, অর্জুনদা, একে এখানে খন্দের দাঁড়ায় না, তার ওপরে মালপত্র নেই। ঐ ফেস্টুনটা, দু চারটে বোতল, শ্বেতকরবীর আর আকসের কিছু শেকড়-মূল। আর তো সব অকেজো। এই দিনে চলে? তুমিও তো জঙ্গলে ঢুকছো না বরঞ্চাল। সকালে বললে যাবে, গেলে না। মাল দাও। তবে তো বিকালে চেষ্টা করব।

পরানের কথা মন দিয়ে শোনে অর্জুন। পরে খেমে খেমে বলল, কিন্তু পরান, আমার মে ভয় করে। যত রাস্তার প্রয়োজনীয় শেকড়বাকড়, সবই ঐ জঙ্গলের চিরবিচার কাছে। আর চিবি

ফিরে অজ্ঞত সাপ। একেই তো ঐ দিকটা ঘনজঙ্গলে ভর্তি। তার ওপরে বিশ্বধর সাপ। যেতে সাহস হয় না। যেদিনই যাই, সাপের দেখা পাই। সাপগুলো চিবি আগলে বসে আছে। চিবিটা যেন সাপের রাজার তৈরি। পরান, একদিন দেখবি, আমি সাপের ছোবলে মারা যাব।

তাহলে, এ লাইনটা তো ছাড়তে পারো। পরান বলল।

ছাড়ব কিরে? ঐটাই তো একমার জানি। বোসবাবুদের কৃপায় ঐটুকখানি তো শিখেছিলাম। অর্জুন বলল।

রাগের অভিনয় করে পরান বলল, কৃপা যখন বলছ, তখন তারা তোমাকে ছাড়ল কেন? সে বলবো'খন। তুই দোকানটা ততক্ষণে সাজ। আমি হোটেলের খাবার কণ্ঠাটা বলে আসি। কথাটা বলে অর্জুন কেনারামের হোটেলের দিকে চলল।

(৩)

ফিরে এসে অর্জুন দেখল, দোকান সাজানো হয়ে গেছে। রাস্তায় রিক্সা, অটোরিক্সা ছাড়া বেশ কিছু লোক চলাফেরা করছে। এরা কেউ হাসপাতালে এসেছে, কেউ যাবে আদালত। দুইয়ের থানার দিকেও। কেউ কেউ পোস্ট অফিসে যাবে। আশপাশের গ্রামের কিছু লোকও খোরাফেরা করছে। এইসব ছোটখাটো দোকান থেকে টুকটাকি মালপত্র তারা হয়ত কিনবে, যাচাই করবে। অর্জুন দেখল, একজন লোক শ্বেতকরবী মূলের বাণ্ডিলটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। গভীরভাবে কিছু একটা পর্যবেক্ষণ করছে। এদিকে পরান একটানা মুগ্ধ বলে যাচ্ছে। অর্জুন শুনতে পেল পরানের কথা। পরান এখন বলছে, মেয়েদের শ্বেতস্রাব হলে কী কী করতে হবে, কোন গাছের শেকড় লাগবে, কিভাবে কোনদিকে ফিরে কোনদিন কোন রঙের সূতো দিয়ে মাদুলি পরতে হবে— তার নির্দেশিকা।

অর্জুন এসে পাশে দাঁড়াতেই খন্দেরটি শ্বেতকরবীর বাণ্ডিলটা রেখে দিয়ে চলে গেল। পরান কপাল চাপড়ে বলল, আর একটু হলে দাঁও মেয়ে দিলে। যা হোক, আজকের জন্যে হয়ে গেছে। বিশ্রিষ্ট একটা গছিয়েছি। এগারো টাকা। ওর বউ-এর ঝাটটা যা সারাতে পারলুম না।

অর্জুন মুচকি হাসে। বলল, উটে! পাশ্চাৎ। করছিস কেন? ঠকাতে নেই বলেছি না।

সেসব কথায় করণপাত না করে পরান দাঁড়ে বড় রাস্তা পেরিয়ে গেল জীবন ময়রার দোকানে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে বলল, টোস্টের অর্ডার দিয়ে এলুম, অর্জুনদা। এবার তুমি বল, বোসদের ওখান থেকে কেন চাকরি গেল। তুমি তো সব সময় 'সত্যি কথা বলবি', 'সত্যি পথে চলবি', আর। তা সত্যিকারের ভাল কাজ যদি কর, তবে ওরা তোমার ক্ষতি করল কেন? আর কই, অকপে কথা তো কিছু বলনি। এখানে আমার তো প্রায় দু মাস হতে চলল, আমি তোমার লেজুড় হয়ে আছি। আমার পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত তো সব ইতিহাস জেনে নিয়েছি। এবার তোমার কিছু ছাড়ো। আজ এগারো টাকা হয়ে গেছে, বল। আজ তোমার কাহিনী বলতেই হবে। সেদিন তো বললে, বাবাও মরল আর তুমিও ভিটে ছাড়লে। তারপর? ইতিমধ্যে অর্জুন গাছের গুড়ির গায়ে লাগানো ছোট টুলে পা ভাঁজ করে বসে পড়েছে। নিচের পাতা কাপড়ের এ প্রান্তে অনেকটা জায়গা। পরান সেখানে পা ভাঁজ করে বসে অর্জুনকাহিনী শোনবার জন্যে উদগ্রীব।

ওপার থেকে জীবন সাঁতরার ছোট ছেলে স্ট্রেট করে খাবার আনছে। সেটা দেখে পরান বলল, অর্জুনদা, সত্যি সত্যি খুব জানতে ইচ্ছা করছে। আমাকে তো কেউ কোনদিন পাড়া



দেয়নি। তুমি যে কেন দিলে, সেটাই আশ্চর্য। তুমি অনারকম তো। তোমার কথা শোনার তাই এত হচ্ছে।

না, আমি তো তোমার মতই। তাই তোকে ভাল লাগল। সেদিন যখন সরকারী টিউব-কালের বেওয়ারিশ জল তুই খাচ্ছিল, তখনই বুকে নিয়েছিলাম, তোমার কেসটা আমার মত। আরে, আমি অনেক ঘাটের জল খেয়েছি। তোমার অবস্থাটা তাই আন্দাজ করতে পারি। তবে তোমার মত আমি কিন্তু আত্মহত্যার কথা ভাবিনি। তবে আমার প্রথম অভিজ্ঞতাটা একটু বাজে রকমের। এক পুলিশের পালায় পড়েছিলাম। অর্জুন বলল।

পুলিশের? সেকী? বিস্মিত পরান বলল।

এ সময়ে জীবনের দোকানের পট্টবস্ত্র আর ছোয়ার ডাল এসে গেল। একটা রুটিতে কামড় দিয়ে অর্জুন বলল, শোনো না। তো ঝাঁপতলা রেলস্টেশনে সন্দের দিকে এদিক ওদিক করছি।। সারাদিন খাওয়াগুয়া নেই। পড়বি তো পড়, এক পুলিশের হাতে। দেখলাম, সে বেটা চোরফোর বলে আমাকে পাকড়াও করল না। বরঞ্চ ভাল ভাল কথা বলল। তারপর আমার না-খাওয়ার কথা শুনে স্টেশনেরব একটা স্টলে নিয়ে গিয়ে আলুর দম আর পরোটা খাওয়াল। রাতে ফাঁকা স্ট্রাটফর্মের হাওয়ায় বাসে অনেকক্ষণ গল্প করলাম। সারাদিন পরে খাওয়াগুয়া, রাতও অনেক। ঘুম এসে গেল। পুলিশটা বলল, চল, আমরা শুতে যাই। দেখলাম, স্টেশনের পাশেই একটা বাড়ি। অনেকগুলো ঘর। একটা ঘরে ঢুকে সে তার পোশাক পাশ্টাল। আমাকেও একটা লুঙ্গি পরতে দিল। মোরোতে এটা ওটা পাতা। তার ওপর দুজন পাশাপাশি শুলাম। ওপরে পাখা ঘুরছে, সী সা। একটা ছোট জানালা ছিল, সেটা খোলা ছিল। দরজা বন্ধ। ছোট ঘর। পাখার বাতাসও বহল। তবু ঘুম এসে গেল। আমরা সমস্ত বুঝলাম, আমার লুঙ্গিটা কামেরের ওপরে উঠে গেছে। কোনভাবে উঠে গেছে বলে সেটা নামাতেই পাশে আমার পিঠের দিকে মুখ করে শুয়ে থাকা পুলিশটা আবার লুঙ্গিটা তুলে দিল। আমি শোয়া অবস্থায় ঘাড় কাত করে পিছন দিকে ফিরতেই সে ধমক দিল। তার কথায় উপড় হয়ে শুতে হল। আর সে.....

অর্জুনের কথা এই পর্যন্ত শুনেই পরান বলল, যাঃ; সে কখনও হয়? বিস্মিত ব্যাপার। তুমি তেরি করে কথা বলছ।

তেরি করতে যাব কেন? ওটা ঘটনা। আর তারপরদিন সকালেই আমি পালালাম। এরপর কত কষ্ট করলাম। এখনও করছি। তবে তাঁত সোসাইটির কাজটি পেয়েছিলাম ভাল। কিন্তু সেখানেও দু'নছরি। অর্জুনের আক্ষেপ।

কেন দাদা, সেটাও কি এরকম ব্যাপার? কথটা বলতে বলতে পরান তার থালাটা নিয়ে নামিয়ে রাখে।

প্রাস্টিকের বোতলটা মুখে ধরে দু'টোক জল খেল অর্জুন। তারপর বলল, না, দু'নছরি মানুষে নিজের মতোই শঠতা। সে ভারি মজার। আমি ওখানকার এক ধনী লোকের বাড়িতে তখন ছবিফরমেসের কাজ করি। পাশেই চাঁদমনি তাঁত সোসাইটি। তারা আমাকে করে দিল সোসাইটির মেসার। আমার মনিব প্রায়ই সেই সোসাইটিতে আমাকে পায়। আমার নামে পটি দেয়া আছে। কিন্তু আমি তো সেই ছাড়া কিছুই করি না। মাঝে মাঝে আমার মনিবই আমাকে কিছু অতিরিক্ত পরয়া দিত অবশ্য। বলত, তোমার পটি বাবু প্রাণ। দেখতাম, লরি লরি সূতো আসছে। লরি লরি কাপড় আবার চলে যাচ্ছে। তারপর হঠাৎ কী হল, জানি না।

সূতোও আর আসে না। একদিন দেখি, আমার নামে নোটিশ দিয়েছে সোসাইটি। আমি নাকি পটি অনুযায়ী কাপড় জমা দিইনি। দেখলাম প্রায় সাতশ টাকা জমা দিতে বলেছে। আমি তো অবাক। ধরলাম সেক্রেটারিকে। সে আমার কথা শোনে আর তার নাকের মধ্যে চিমটে মত আঙুল চুকিয়ে দুটো তিনটে চুল ছিড়ে বের করে। শেষে একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল, টাকাটা দিয়ে দে, নাহাটা বিপদে পড়বি। আমি পড়লাম সমসায়। আমার মনিব তখন উল্টোদিকের কথা বলছে। বুঝলাম, এ ওদের কারসাজি। একদিন পাত্তার একটা মোয়েকে ফুসলে নেয়া নিয়ে মিটিং চলছিল, তা সেই সালিসি শেষ হতে আমি আমার কথাটা বললাম। ব্যাস্, জ্বলে উঠল। সকলে বলল, এ তোমার এ মনিব আর সেক্রেটারি হরেনের কাণ্ড। তুই শব্দ হ, আমরা ওদের কাছ খুলে দেব। এতদিন ধামা চাপা দিয়ে চালাচ্ছিল। আর এ সত্যি কথাটা বলেছি বলেই আমার সেই মনিব তাড়িয়ে দিল। আমিও অকূল সাগরে পড়লাম।

এ সময়ে পথ চলতি দুজন অর্জুনের দোকানে এসে দাঁড়াল। একজন প্রায় ফিসফিস করে বলল, কালো বানরের হাড় আছে?

পরান বলল, কী করবে?

অনজান বলল, জানো না? কালো বানরের হাড় দিয়ে মাদুলি ধারণ করলে বুক ধড়ফড় সেরে যায়। আছে?

অর্জুন বলল, নাহু। আমরা হাড় ফাড় রাখি না। তবে শিলাজ আছে, নিতে পারো। গায়ে জোর এলে বুক ধড়ফড়নি কমে।

ওরা ফিরে যেতেই পরান বলল, এবার থেকে এ হাড়ফড় দিয়েই মাদুলি করব। হুঁ, তারপর কী হল?

অর্জুন একটু কিছু ভেবে নিল। তারপর বলল, কত জায়গায় যে কত রকমের অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা আর বলে শেষ করতে পারব না। তবে হিতপুরুষের সেই বাবুর বাড়ি থেকে আমি স্বেচ্ছায় কাজ ছেড়ে চলে এসেছিলাম।

কী রকম, শুনি। আগ্রহ নিয়ে বলল পরান।

টুলটা সরিয়ে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে পা দুটো সমান্তরাল বিছিয়ে দিয়ে অর্জুন বসেছে এখন। সেভাবেই বাঁ দিকে একটু বেকে প্যান্টের ডান পকেট থেকে একটা দেশলাই বাগ্ন বের করল। তারপর বুক পকেট থেকে একটা তোবড়ানো সিগারেট বের করে সেটাকে পুনরায় ঠিকঠাক করে নিয়ে ঠোটে লাগিয়ে দেশলাই লাগাল। তারপর একটা দীর্ঘ টান দিয়ে এক-মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, সেটাও বেশ মজার। হরিচরণবাবু মানে হরিচরণ কৈরোজের বড় ছেলের কাণ্ড। আমি তখন হরিচরণের বাড়ির মুনিব। গরু চরানো থেকে শুরু করে খড় কুচনো, মুরগিটুগরী দেখা, মাঠ থেকে ফসল আনা—সব, সব রকম কাজই। ওদের বাড়ি থেকে একটু দূরে একটা বাল-সংলয় এক লেগুয়া একটা বড় ডাঙা জমি ছিল। সেখানে সোমবচ্চর চাষ হত। শশা চাষের সময় মাঝে মাঝে আমাকে রাতে ঐ শশাক্ষেতের টং-ও গিয়ে থাকতে হত। সেবার ছিলামও তাই। সত্যি কথা কী, সে রাতে ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। হঠাৎ কী হল, গেল ঘুম ভেঙে। ঘুমিয়ে পড়েছি বলে বুকটা ধস করে উঠল। ভাগিস, এই সময়ে মাঠের মাল সব গায়েব হয়নি। কিন্তু দেখলাম, দু'রে যেন হরিচরণবাবু। মানে মনে ভাবলাম, হরিচরণবাবু কি তবে আমার কাজ ক্রেত করেতে এসেছিলেন? এইরকম। কিন্তু পরে হিসেব করে দেখলাম, তা হলে তো ওঁকে এদিকের রাস্তা দিয়ে যেতে হত। এত রাতে বামাকা অন্য রাস্তায় ঘোরাফেরা



করবেন কেন। আমি যেন খুব সতর্ক, এমন ভঙ্গি করে চিনি বাজিয়ে দিলাম। দূর থেকে দেখলাম, সে শব্দটা শুনেই হরিচরণবাবু বাস্তার মধ্যে মাথা নিচু করে বসে পড়লেন। ভাবলাম, জল ছাড়ছেন। ওমা, পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট যায় তবু হরিচরণবাবু আর ওঠেন না। তবে কি মরে গেল নাকি, ভাবছি এই সব। ভাবছি, তবে কি হারিকেনটা নিয়ে এগিয়ে যাব। হঠাৎ দেখি, উঠেছে হরিচরণবাবু। দাঁড়িয়ে আমার টং-এর দিকে তাকিয়ে দৌড়ে। আর আশ্চর্যের ব্যাপার, তার পিছন পিছন হরিচরণবাবুর বড় ছেলে খগেনও ছুটছে। মনে মনে ভাবলাম, বোধ হয় খালপাড়ের দিকে কোন কারণে গেছিল বাপবোটা। অনেক রাতে ভয় পেয়ে দৌড়ে বাড়ি গেল। ভয় পাক গে, বলে আমি একবার রাম নাম করে ওয়ে পড়লাম।

এই পর্যন্ত শুনে অধেষ পরান প্রশ্ন করল, কেন গিয়েছিল, জানতে পারলে?

হ্যাঁ, জানলাম তার পরের দিন। সে লোমহর্ষক কাণ্ড। খুন। খুনের ব্যাপার। চোখ বড় বড় করে অর্জুন বলল।

খুন? কে কাকে খুন করল? চমকে উঠে পরান প্রশ্ন করল।

খগেনের বউকে। শোনো সবাই, তারপর প্রশ্ন করবি। তা পরের দিনে ভোরে হরিচরণবাবুর বাড়িতে গেছি। দেখি অন্যদলের মত সবাই ঠিকঠাক। দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। শুধু দেখি, হরিচরণবাবুর চোখ দুটো লাল জবা। আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল একটা কথা। বললাম, বাবুর কি গতরাতে খুম হযনি? দেখলাম, কথাটা শুনে চমকে গেলেন হরিচরণবাবু। তারপর অবশ্য ঘটনাটা কীভাবে জানাজানি হয়ে গেল। থানা থেকে গাড়ি করে একদল পুলিশ এল। খালপাড় থেকে বউটির দেহ উদ্ধার হল। আর বাপবোটার ধরে নিয়ে গেল। আমিও তার পরের দিনই হাওয়া। জানিস পরান, এ হল মিথ্যার অভিশাপ। হরিচরণবাবুরা কত যে মিথ্যে মিথ্যে কেস-কাছারি করে কত লোকের সর্বনাশ করেছিল, তার আর ইয়ত্তা নেই। আমি চাকর মানুষ। আমার ক্ষমতা যতটা, ততটাই করলাম। কাজ ছেড়ে দিলাম। ভাবলাম, গরীবের সম্বল, সত্যটা ঠিক থাকুক।

সে তো ভয়েও হতে পারে। পরান বলল।

আমার ভয় কিসের? আমি তো খুঁই নেই। খুঁইদের কাছে কাজ করব? আমি গরীব মনিষ বলে? অবশ্য বউটাকে তো বাঁচাতে পারিনি। বড়লোকেরা ভেতর ভেতর কী করে তা আর আমরা বাইরে থেকে কী বুঝব? অর্জুন বলল।

সে যাই হোক, তোমার এ আত্মবৈরির ওখানে কী হল? জানতে চাইল পরান। কথা বলতে বলতে পরান তাদের সামনে রাখা লতাপাতা, শিকড়ের ওপরে জল ছিটিয়ে দিল কিছুটা।

অর্জুন বলল, ওঃ, সেই আত্মবৈরির কোম্পানির চার বিশেষ মত জায়গায় হরেক রকমের ঠাকুরের চায়? অবশ্য অন্যজায়গা থেকেও সংগ্রহ করেন নানান গাছ আনতাম আমরা। সেসব গাছ, শেকড়-বাকড় কলকাতা দিল্লি চালান যেত। মাহিনে বেশি নয়, তবে চলে যেত। আসর এতদিন দেখি কী, বাগানের মেন গেটে পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়াল। একদল পুলিশ, সঙ্গে আমাদের বাগানের একটু দূরে বাড়ি এমন একদল। ওরা সোজা বাগানের এক কোণে চলে গেল। একজন আমাদের অফিসখের বসে আমাদের নাম ধাম জিজ্ঞাসা করতে লাগল। পরে দেখি কী, গোটা কয়েক গাছ তুলে এনেছে ওরা। সেগুলো নাকি অফিমগাছ। চায় কসত বীরেন। এ তারই কাণ্ড। তা আমাদের তো এরেষ্ট করে নিয়ে গেল। ফাঁস করে দিয়ে বললাম

সব কথা। বীরেনও স্বীকার করল। বলল, মেজকর্তার নির্দেশে ঐ গাছ চায় করেছে সে। স্বর্গদিন ধরে চলছে। বড়লোকের বড় বড় কীর্তি। তারপর ছাড়া পেয়ে আর সে বাগানমুখো হইনি। তবে ভাবলাম, গাছগাছালি নিয়ে যা অভিজ্ঞতা তাই দিয়ে আমি নিজেই একটা দোকান দিই না কেন। তাই ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে দোকানটা দিলাম।

তা দিলেই যখন, তখন ওদিকে হাসপাতালের সোড়ে যে দোকানপাটগুলো আছে ওখানে দিলে না কেন? পরান প্রশ্ন করল।

ওখানেই তো বসেছিলাম কদিন। কিন্তু পঞ্চায়েতের লোকেরা এসে জানতে চাইল, আমি ওখানকার ভোটার কিনা। যেহেতু অন্য জায়গায় আমার বাড়ি, তাই ওখানে ঠাই হল না। ওরা বলল, স্থানীয় লোকদের আগে চাপ দেয়া হবে সেখানে। ওদিকে ঐ কোর্টের ওখানেও ঝামেলা। আর বাজারের কাছে তো যাওয়াই যায় না। অগত্যা এখানে এসে বসলাম। কোন ঝামেলা টামেলা নেই। প্রতিদিন তোলাও দিতে হয়না। সে বিচারে ডেলি টু ঢাকা তো বাঁচছে। আমি ছিলাম একা মানুষ, চলে যেত। জঙ্গল থেকে লতাপাতা, শেকড়বাকড় তুলে আনতাম। বিনি পয়সার মাল। বিক্রি করলেই হল। তবে ইদনিং সাপের যা উপদ্রব। সেদিন ঝিলের পুকুরে মান করতে যাচ্ছি, হঠাৎ নজর চলে গেল তালগাছটার গায়ে। এমনিতে তো তালগাছগুলোর পাশ দিয়ে প্রতিদিন যাই। সেসব তো আর দেখার কথা নয়। কিন্তু সেদিন নজরটা ওখানে চলে গেল। দেখি, তালগাছের গা জড়িয়ে একটা সাপ ওপর দিকে উঠতে চাইছে। তা কী পারে? লেজটা মাত্র তালগাছের গায়ে ঠেকিয়ে শূন্য সোজা হয়ে গেল সাপটা। তারপর বৃণ করে আমার সামনে পড়ে একটু একে বেকে চুপ চুপ গেল জঙ্গলের মধ্যে।

পরান ভয় পেয়েছে। সে বলল, নাঃ, তোমাকে আর জঙ্গলে যেতে হবে না। এবার অন্য কিছু করতে হবে আমাদের।

(৪)

ইদনিং অর্জুন লক্ষ্য করছে, দোকান সাজাবার দিকে পরান প্রাচণ্ড সময় দিচ্ছে। বিক্রিবাটা যা হচ্ছে তাই দিয়ে নতুন নতুন জিনিস কিনতে আরম্ভ করেছে। কদিন আগে অর্জুনের কাছ থেকে জেদাজেদ করে দুয়েক টাকা কিনা, মাল কিনবে বলে। অর্জুন বলল, শেকড়বাকড়ের দাম তো এত নয়। তবে? পরান বলল, দেখ-ই না কী হয়। দেখল অর্জুন। সে দেখল, পরান শহরে গিয়ে নিয়ে এসেছে একটা ছোট্ট শোকেস। তাতে নানাবর্ণের পাথর বসানো আটটি। ছোট বড়, রূপালি, সোনালি, তামাটে রঙের নানা মাপের বহু মাদুলি। আর একটা কাপড়ে আঁকা নানা রাশিচক্রের ছক। সেসব দেখে অর্জুন বলল, এসব ছকটক কী হবে? এত আংটি কেন?

অর্জুন, আমি প্লান করে ফেলেছি। লতাপাতার সঙ্গে ভাগ্যপরীক্ষাও চালু করব। কেউ অসুখ সারাতে লতাপাতা নিতে পারে, আবার পাথর-মাদুলি নিতে পারে। যার যেমন ইচ্ছা। পরান কথাগুলো বলে হাসল।

গম্ভীর হয়ে যায় অর্জুন। বলল, তা হলে তো মিথ্যে কথা বলা হবে। এসব নকল পাথরে কী রোগ সারে?

সারক, না সারক— আমাদের কিছু যায়-আসে না। যার যাতে পছন্দ, বিশ্বাস—তাই করবে। আমরা কেন ভাঙতে যাব? পরান বলল।

ঠিক আছে। তা হলে, কাউকে জোর করে বিশ্বাস করার কথা বলাবি না। গাছগাছালি,



লতাপাতার, শিকড়-বাকড়ের ওণাওণ দেশের সকলে জানে। যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। তার মাহাত্ম্যের কথা বলবি, বুঝিছিস? অর্জুন জিজ্ঞাসা করে।

আর যেদিন পরানকে এসব কথাগুলো বলল অর্জুন তার পরদিন অর্জুনের একটি দেরি হল দোকানে আসতে। এসে দেখল, পরান তখনও দোকান দেয়নি। গাছতলায় ঠায় দাঁড়িয়ে অর্জুন। সে সেখান থেকে জীবন ময়রার দোকানের দিকে তাকাল। না, সেখানেও নেই পরান।

অসহায়ভাবে নিয়ে অর্জুন দাঁড়িয়ে থাকে। একজন পরিচিত খন্দার একটা নমস্কার ঠেকে চলে গেল। তার একটি পরেই প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে পরান এসে হাজির। অর্জুনকে কোন কথা বলতে না দিয়ে বলল, দাদা, ভাল খবর। হাসপাতালের মোড়ে একটা জায়গা ম্যানেজ করে ফেলেছি। বরাবরের জন্যে। আর প্রথম দিনই প্রাইজ।

ওরা সেই দোকানের দিকে চলাতে শুরু করল। চলাতে চলাতে অর্জুন বলল, প্রাইজ মানে? চলে, দোকানে গিয়ে বলব। পরান বলল।

দোকানের সামনে এসে অর্জুনের চোখ ছানাবড়া। এতো প্রকাণ্ড একটা দোকান। কেবল নিজের তৈরি ফেস্টুনটা, রাতে জ্বালাবার জন্যে কারবাইড-লাম্পটা না দেখলে অর্জুন নিজের দোকান বলে চিনতে পারত না। বলল, একী করেছিছ, পরান?

পরান কাশাবাড় খুলে চক্ৰজলদি একটা পঞ্চাশ টাকার নোট দেখিয়ে বলল, একটি আগে অর্ডার পেয়েছি। রক্ষাকবচ। একশ এক টাকা। বিরুলে ডেলিভেরী নেবার সময় বাদবাকিটা দেবে। গলায় বেশ আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বলল পরান।

মাদুলি! তো কী রোগ জেনেছিস তো? সেভাবে তো শেকড় দেব। একটি অসহিষ্ণু হয়ে বলল অর্জুন।

না না, শেকড়-বাকড়ের কাজ নয়। এ যে তুমি বললে না, সাপ-সাপ। তা ওর সঙ্গে রোগ নিয়ে কথা বলতে বলতে বলে ফেললুম, সাপের দাঁতের মাদুলি লাগবে। সাপের দাঁত দিয়ে তৈরি করতে হবে রক্ষাকবচ। দাম একশ এক টাকা। মা মমসার দিবি আছে— এক দাম। পাটিও মা মমসার কথায় রাজি হয়ে গেল। পঞ্চাশ টাকা অগ্রিম দিল। এক মুখ হেসে বলল পরান।

অর্জুনের মুখে হাসি নেই।

সেটা দেখে পরান প্রশ্ন করল, কি দাম, তোমার আনন্দ হচ্ছে না? কী বলেছিলাম কিনা, প্লেস চেঞ্জ কর?

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, বিরুলে নিয়ে যাবে বলোহে?

হ্যাঁ। পরান উত্তর দেয়।

উত্তর শুনেই অর্জুন হন হন করে চলাতে শুরু করল।

দোকানে হানুবৎ দাঁড়িয়ে থেকে পরান গলা তুলে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় চলেছে?

উত্তর নেই। উত্তর না পেয়ে পরান মনে মনে একটি বিরক্ত হল। যার জন্যে সে করছে,

সে-ই বাহবা দিল না। তারপর সে পাশের দোকানে দাঁড়ানো খন্দার দেখতে লাগল। সেখান থেকে চোখ নামিয়ে তার কাশাবাড়ের গায়ে লাগানো কালীর ছবির দিকে তাকিয়ে ভালব, একটা ধূপ জ্বালিয়ে দিহ। ধূপ জ্বালিয়ে চারিদিকে ঘুরিয়ে দুহাতে সেটা ধরে পরান তার কপালে ঝুঁয়ে চোখ বন্ধ করল। এক সেকেন্ড, দু সেকেন্ড তারপর চোখ খুলেই সামনে দেখল, জীবনের ছোট ছেলে যাচ্ছে। তাকে বলল, একটা ছোট চাপাঠাতে।

চা খেয়ে মনটাকে আবার সতেজ করে খন্দরের আশায় পরান বসে আছে। ইতিমধ্যে একজন এসে কয়েকটা আংটি নাড়াচাড়া করে গেছে। দামে পোয়ানি বলে সে অবশ্য চলে গেছে। তারপর পরান একসময় তার, হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মনে মনে হিসেব করল, তার অর্জুনা তো প্রায় ঘন্টা দেড়েক হল, গেছে। কোথায় গেল, বলে গেল না। কী ব্যাপার! অর্জুনি হলও সে দেখেছে, তার অর্জুনিদা এতক্ষণ তো কোথাও থাকে না। এসব ভাবতে ভাবতে পরান হঠাৎ দেখে অর্জুন দ্রুত পায়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। সে দেখল, তার দাদার ডান হাতে কী একটা ধরা। দূর থেকে মনে হচ্ছে, একটা টায়ার হাতে জড়িয়েছে। টায়ার কেন, ভাবতে থাকে পরান।

রাষ্ট্রায় ঘুরে বেড়ানো একটা ষাঁড় আর একটি হাল অর্জুনের দোকানে সাজানো লতাপাতার একটা আঁচিতে মুখ দিতে যাচ্ছিল। ষাঁড়টাকে তাড়াতে ব্যস্ত হল পরান। ষাঁড়টা চলে যাবার পর চোখ তুলে দেখল, তার অর্জুনিদা তার সামনে। বলল, কোথায় গিয়েছিলে?

এটা অনতে। ধীর কণ্ঠে বলল অর্জুন। তারপর অর্জুন তার ডান হাতটা উঁচু করে ধরল। বিস্মিত পরান দেখল, একটা সাপ। অর্জুন সাপটার মাথা তার হাতের মুঠোয় ধরে রেখেছে। সাপও নিজেকে ছাড়াবার জন্যে চেষ্টা করছে। সে অর্জুনের ডান হাতটা পেঁচিয়ে ধরেছে। আরো জোরে চেপে ধরার জন্যে সাপটা তার শরীরে অনেকগুলো পেঁচ তৈরি করতে ব্যস্ত।

সেটা দেখে আঁতকে ওঠে পরান। গোঁ গোঁ করে কটা ঢোক গিলে বলল, সাপ! সাপ কেন? কামড়ালে মরে যাবে। একী, একী কাণ্ড! তার চিৎকারে পরান আশেপাশের লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইল। আরো ধীর কণ্ঠে অর্জুনকে। বলল, সাপের দাঁত লাগবে না? দাঁত? আবার ঢোক গালে পরান। একটি তোতলা হয়ে বলল, সে তো আমি ব্যবস্থা করেছি। সাদা একটা প্রাস্টিকের টুকরো দেব। ওটাই সাপের দাঁত হয়ে যাবে।

এই শিখলি ভূই? মিছে কথা। বলেছি না, সত্যি কথাটিই গরীবের সম্বল।

দোকান ছেড়ে পিঞ্জরের মত লাফিয়ে ওঠে পরান। একলাফে অর্জুনের সামনে গিয়ে অর্জুনের পা জড়িয়ে ধরল। তারপর কঁকিয়ে কঁকিয়ে ওঠে। কান্দতে কান্দতে বলল, আর কোনদিন এমন কাজ করব না, অর্জুনিদা। আমায় ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।

ততক্ষণে বহুলােক অর্জুনের দোকানটা ঘিরে ধরে সাপ আর দুটো মানুষকে দেখতে শুরু করেছে।



## ভোকাটা

সুনীল দাশ

বিধুর বোয়ের কি দেহাবসায় নামা ছাড়া বেঁচে থাকার আর কোনো উপায় ছিল না? আর রঙেরা মুখ নিয়ে একেবারে যার সঙ্গে তিনটে বছর ঘর করেছে — তার কাজের জায়গায়, তারই চোখের ওপর ওইভাবে সেজেগুজে না দাঁড়াই নেই। স্বামীর চোখের সামনে স্ত্রীর এমন কেশ্যবস্ত্রির কাণ্ড তো আমাদেরও চোখে দেখতে খারাপ লাগে রে ভাই। উঁচু তাক থেকে একতল সজিরের চাঁদরাল ঘুড়ির বাঙুল নিয়ে নামাতে অভিজ্ঞ সাধুখা তাকগুলো বলল শব্দ হালদার আর গণেশ ডিহিদারকে শুনি।

এই মুহুর্তে দোকানে তারা তিনজন ছাড়া আর কেউ নেই। বিধু একটা আগে ভেতরের কারখানায় গেছে একশ আধতল ময়ূরপঙ্খী ঘুড়ি আনতে। বিধুর সামনে মালিকেরা কিংবা তার সহকর্মী দোকানের বা ভেতরের কারখানার কর্মচারীরা এই ব্যাপারে কখনো মুখ খোলে না।

নিচে গণেশ মামার পাশে বসে শব্দ হালদার তিন ডজন পেটকাটি ঘুড়ি গুনে রাখছিল, অভিজ্ঞ সাধুখার কথা শুনে সে একবার উল্টো দিকের গলির মুখটায় নজর করে নিল, তারপর বলল, 'প্রতিশোধ নিচ্ছে, বুঝলে? মেয়ে মানুষদের আজকাল বড় বেশি প্রতিশোধ নোয়ার হিড়িক পড়ে গেছে। ঠিক মতো চিট করতো না পারলে এই হবে। যাতে এরকম অবস্থা না হয় তার জন্যে বিধু কি তার বোয়ের কাছে কাকুতি মিনতি করেনি ভেবেছে? ওরে বাবা লাথির ঢেঁকি চড়ে ওঠে না — একথা আমাদের বাপাঠকুঁদারা বলে গেছে।'

ফর্সা মোটাসোটা বছর পয়ত্রিশ বয়সের শব্দ হালদার মাঝে মাঝেই তার রোগা চোহারার বোটিকে বেশড়ক ঠেগায়। শব্দের বৌ একদিন মালিকদের কাছেও কাম্যাকাটি করে গেছে। শব্দের হিরে বিশ্বাস তার বোটা বাপের বাড়ি এলাকার এক আটো চালক ছোকরার সঙ্গে ভাব ভালবাসা চালিয়ে যাচ্ছে।

গণেশ ডিহিদারকে এখানের মালিক কর্মচারী সকলেই গণেশ মামা বলে ডাকে। সবচেয়ে পুরোনো কর্মচারী। গণেশ মামা খাতা লিখছিল। দুজনের কথা শোনার পর সে একটু চুপ করে থাকল, তারপর বলল, 'কিন্তু রে ভাই, বিধুর বৌ মানে ওই শিবানীকে যখন বিধুর মা আর ভাইবোনরা রীতিমতো ঠেঙিয়েছে—বিধুর ছোটোভাই মধু হারামজাদা তো নিজের বৈদিকে ধাক্কা মারতে মারতে বাড়ির বাইরে বার করে দিয়েছে, বিধুর বোন দুটো শিবানীর চুলের মুঠি ধরে টেনে হিচড়ে সদর দরজায় নিয়ে এসেছে—তখন বিধু একটিবারও নিজের বোকে বাঁচাতে যায়নি কেন? অথচ ওই শিবানীর সঙ্গে বিয়ে না হলে মা বেঁচে থাকতো সে আর বিয়ে করবে না বলে বেঁকে বসেছিল না। পিরিত কাঠালের আঠা এরমধ্যে ধুয়ে গেল একেবারে?'

তিনজনের কথা আপাতত আর এক আলো না, কেননা এইমাত্র ভেতরের কারখানা থেকে বিধু ঘুড়ির বাঙুল নিয়ে এসেছে। এসেই চুপচাপ কাজে লেগে গেছে।

চিরকালই বিধু মুখচোরা, কম কথা বলে। মাঝারি উচ্চতার ফর্সা খুব রোগাটে চেহারা বিধুর। আগে তার শীর্ণ লগ্নাটে মুখটার সবসময় হাসি ভেসে থাকত। আগে দোকান ফাঁকা থাকলে আপনমনে গুননন করে গান গাইতো, সহকর্মীদের হাসি মন্তব্যায় মজা পেতো। কিন্তু

চোখের ওপর, এই দোকানের সামনে, পোটোপাড়ার উল্টোদিকে— কালীমন্দিরে যাওয়ার রাস্তার মুখটায় সে যে দোকানের কাজ করে সেই দোকানের এলাকাতেই শিবানীকে রঙেরা মুখে খন্দের ধরতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিধু যেন পুরোপুরি বোবা বনে গেছে। গুম মেরে থাকে সারাটা সময়। সারাদিন ঘাড় গুঁজে কাজ করে যায়। অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ভেতরে আরো মুখাড়ে পড়ে সে। রাত আটটার দোকান বন্ধ হওয়া মাত্র সে যেন ছিটকে বেরিয়ে যেতে চায় এই এলাকা থেকে। বড় বড় পা ছেলে সতানারায়ণ মিস্ত্রী বাড়ার পেরিয়ে এ ফুটপাথের বাসস্টপের কংক্রিটের ছাঁটনিয়ের সামনে গিয়ে —মোমিনপুর যাওয়ার ট্রাম বাস আগে যেটা পায় সেটাতেই উঠে পড়ে।

এই দোকান এবং কারখানার মালিক বিধুর পিসতুতো দাদার। ওরা অনেক আদায়ীসজনকে কাজ দিয়েছে এখানে। দোকানে পাইকারি চুচুরা সবরকমের খন্দের আসে। পিসেমশাইয়ের বাবা হরিমাধব বসিয়েছিল এই দোকান। হরিমাধবের দুই ছেলে মহিম আর মোহিত এ কারখানার খুব বড় করে তুলেছে। শুধু গোটো কলকাতা শহর নয়, দূর মফস্বল থেকেও আসে পাইকারি খন্দেররা। ডজন হিসেবে, শ' হিসেবে নিয়ে যায় হরেকরকমের ঘুড়ি। বিক্রিবাটা সারা বছরেই আছে। তবে বিশ্বকর্মা পূজার মাসখানেক আগের থেকে পূজো পর্যন্ত — হিমসিম খেয়ে যায় মালিকদের সঙ্গে সঙ্গে কর্মচারীরাও। মোহিত আর মহিমের —তিন তার দুই—মোট পাঁচটা ছেলেও লেগে গেছে এরমধ্যে।

আজ সন্দের মুখে বৃষ্টি হয়ে গেছে একপশলা।

বৃষ্টির সময়টাতেও কালিঘাটের এই বড় রাস্তার দুপাশের ছোটো বড় মাঝারি গলিগুলো ফাঁকা থাকে না। বাজারী মেরারা ছাড়া মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। হলুদ ফুল ফুল ছাপ কাপড়ের ছাতা নিয়ে শিবানী আজ সন্দের অল্প পরে রঙেরা মুখে এসে দাঁড়াবার কিছু সময়ের মধ্যেই খন্দের পেয়ে গেল। অন্য কর্মচারীদের চোখ বাঁচিয়ে, বিধু দেখে নিল একবার, অল্পবয়সী এ ছেলেও উল্টোদিকের গলির মুখটাতে দাঁড়িয়ে কথা বলছে শিবানীর সঙ্গে।

শেষ কেতোসান্তোরে ছোকরা। জিন্সের ট্রাউজার্সের উপর টি-শার্ট চাপানো। পায়ের নকরা জুতো। এ জাতের ছেলেছোকরাদের এই পটটিভাতে বড় একটা দেখা যায় না। শিবানীর রাপের চটকে জুটেছে মনে হচ্ছে। খুব হাসছে শিবানী। এই দোকানের মধ্যে বসেও শিবানীর মুখ দেখা যায়। ভালোরকমের ফাউন্ডেশন মেরে ক্জ, লিপস্টিক, চোখ ঝাঁকা পেন্সিলের লাগে— দক্ষিণ বারাসাতের অনেক ভেতরের গয়েরা মেরেটার এখন জেরা আল্লাদ।

তবে এখান থেকে শোনার উপায় নেই রাস্তার ওপারে গলির মুখে দাঁড়িয়ে রঙেরা মুখের মেয়েগুলো তাদের খন্দেরদের সঙ্গে কি ধরনের কথা বলে।

এ দোকানে কাজের ব্যয় তো তার সাতবছর হ'ল। কোনদিনই তার হচ্ছে হয়নি ওই সব দরদস্তুর শোনার। বিয়ের চার বছর আগে এই দোকানে কাজে ঢুকেছে বিধু। তার আগে বিধু ছোট ভাই মধুর সঙ্গে বিভিন্ন কনস্ট্রাকশনের বাবসায় নামে ছিল। ছোট ভাইয়ের চড়া মেজাজ বেপরোয়া বদমাশত্বের সঙ্গে কিছুতেই নিজেদের না মেলাতে পেরে, বিধু এই ঘুড়ির দোকানের সেলসম্যানের কাছটাই আঁকড়ে ধরেছিল। তার মতো দুর্বল মানুষের পক্ষে এই ভালো আশমনো ফুটি ওড়ানোর মাল বেচবে, তখন তারই চোখের সামনে জমিনের ওপর দাঁড়িয়ে দেহ বেথতে গুরু করে দেবে তার বিয়ে করা বৌ।



পশ্চিম পুটিয়ারির পুরোনো খন্দেরটা এলো এই সময়। লোকটা একটু বেশি বকে। গনেশ মাঝেক সে শুনিয়া যাচ্ছে, 'মানুষের অভাব যত বাড়ুক, হাহাকার যতই উঠুক দাউদজি করে, তারই মধ্যে ফুটি চাগিয়ে ওঠার কোনো ঘাটতি নেই। বলাবামা, শোকে তাপে কেউ কি আর ঘুড়ি, সুতো, লাটাই ধরে? কাগিলে যুদ্ধ বাধলো বলে কি আপনাদের সতরঞ্চ, ময়ূরপাখী, চাঁদিয়াল, পেটকাটি, মুখপোড়াদের বিক্রিবাটী কমেছে? হ্যাঁ, সাবেকী কলকাতার বাবুদের মতো ঘুড়িতে টাকার নেট আটকে আজকাল কেউ আর গৌড়া মেরে কাটাকাটির লড়াইয়ে নামে না টিকই, ঘুড়ির লম্বা লাজও কেউ জোড়ে না আর, তা বলে ঘুড়ি ওড়ানো কি বন্ধ হয়েছে? বাড়ির ছাদগুলো যখন টিভির এ্যান্টেনায় ছয়লাপ হয়ে যেতে শুরু করলো, তখনো সকাল বলেছিল ঘুড়ির মার্কিট এবার একেবারে গৌড়া খেয়ে পড়বে—কই মিললো তাদের কথা?'

ওদিকে ফুটি মারতে এসে কেতামার ছোকরাটা কি এমন রাসের কথা বলছে শিবানীকে যে সে জোরে বিলখিলিয়ে হেসে উঠলো? যন্দের জুটলে, বিশেষ করে একটু শীতলো যন্দের পেলো শিবানী যেন আরো বেশি করে লোকানের উল্টেদিকটায় ঘেঁষে আসে। বিধুকে যেন দেখিয়ে দেখিয়ে বলতে চায়, দাখো, তাকিয়ে দাখো একবারটি, তোমার কাছে দাম না পেলো কি হবে, কত সোমখ পুরুরের কাছে আমার দাম। তোমার মা ভাইবোনের লখি রেটা খেয়েও দুটো বছর তো আমি দাঁতে দাঁত চেপে মার হজম করতে করতে তোমাদের মোমিনপুরের বাড়ি আঁকড়ে পড়েছিলাম, শুধু কি ভাত কাপড়ের জন্যে? ভেবেছিলাম, যতই তুমি মেনিমুখো হওনা কেন, বৌয়ের ওপর অত্যাচার দেখতে দেখতে, শেষে তোমার মতো কুঁকড়ে থাকা মানুষও একদিন না একদিন ফুঁসে উঠবে। মার খেতে খেতে আমার খেঁতেলো যাওয়া দশা থেকে বাঁচাবে। কিন্তু একে জাতের পুরষ তুমি?

এক একটা রাতে স্বপ্নের মধ্যেও বিধু শুনেতে পায় শিবানী তাকে বলছে, 'রাতের বেলায় বৌয়ের শরীর তুমি আদর করে ভোগ করো, সোহাগ করে ফিসফিসিয়ে বলো, আর কটা দিন কষ্ট করবে, মার হজম করে পড়ে থাকবে। তোমার দজল মা আর বোনদের বাপবালায় করা দ্বিষ্টি; তোমার জানোয়ার ভাইয়ের গা ছালানো কথা—চড়া গলায় গালাগাল শুনেও একটাবারের জন্যেও যে রুগে দাঁড়াতে পারেনি—তাকে বাটায়েলে বলা যায়? তোমার চিটিংবাজ ভাইটার মতো অমন পয়সার গরম দেখাতে পারো না টিকই, কিন্তু সাধামত টাকা দিয়ে যাও সংসারে; দেকান থেকে মাসের মেনিলেটা নিয়ে তো নাড়ুগাপালার মতো আদরের বাছাটি হয়ে টাকাগুলো তুলে দাও মার হাতে। ঘরে ওরকম মেরুদণ্ডী হয়ে পড়ে থাকো কেন? তোমায় বলেছি, হাজারো অভাবের মধ্যেও ছেলেকেলা থেকে সখ বলতে ওই আমার একটাই। একটু সাজগোজ করা। মা যদিই বেঁচে ছিল খাবার টিকমত জুটুক, মা জুটুক, বিকেল বেলায় আমার কোমর ছাপানো মাথা ভর্তি চুল বেঁধে দিতে যত্ন করে। তোমার কাছেও সো পাউডার চুলের ফিতে, ক্রিপ ছাড়া বেশি তো কিছু চাওয়ার ছিল না আমার। কিন্তু তাই নিয়ে কম গালমন্দ সরেছি। ছেলালিয়ারা সখ, বেশ্যামাণী, বারোভাতারী কিনা বলেছে দিনের পর দিন। ভুলে-গ্যাছো? এখন কি বলছে? তোমায় আবার বিয়ে দেবে?'

এখন, একতেল আদখেল আর সিকতেনে নিশিগে, পশ্চিম পুটিয়ারির খন্দেরটাকে একশ ফুড়ি শুনে দেওয়ার ফাঁকে বিধু টট করে একবারটি সান্ত্বন উল্টেদিকে তাকিয়ে নিল। এতক্ষণ জিন্দু টিচারি পরা ছোকরার মাথার পেছন দিকটা দেখতে পাচ্ছিল, এবার মুখটা দেখতে পেল।

ও তো অশুভ!

অশুভমান গিদওয়ানি। মধুর বন্ধু। বড়বাজারের পণ্যোপপ্তিতে তিনটে দোকান। সুইস কটনের আড়ৎ। টেরেটিবাজারে আছে বড় কসমেটিকসের দোকান। ছোকরাটাকে মোমিনপুরের বাড়িতে বিধু বার কয়েক দেখেছে। প্রত্যেকবারই অবশ্য দেখেছে চোখ আর কাজকরা লম্বাখালের দামী পাঞ্জাবী পরনে। সেও সময় মধুর ব্যবসার খুব রমরমা। মধু নাকি ওর থেকে অনেক টাকা ধার পেয়েছিল। গোয়ার থেকেই ছোকরার হাবভাব ভালো লাগেনি বিধুর। মধুর সঙ্গে ছাড়া ছোকরা একই বারকয়েক মোমিনপুরে এসেছে জেনে আর তারই মধ্যে শিবানীকে বিদেশী কিনা লিপ্সিকি আর আইলিমার দিয়ে গেছে শুনে বিধু বেশ রাগ করেছিল। রাতে শুতে গিয়ে তা নিয়ে গজগজ করে উঠতেই শিবানীও ফেপে উঠেছিল, বলেছিল, 'সন্দেহ করা তোমার ব্যতিক। ওটা তোমার মানসিক রোগ। বলতে যদি হয় তো তোমার জানোয়ার ভাইটাকেই বলো না কেন? আছে বকের সে পাটা তোমার ও জানোয়ার পাঞ্জাবজ শয়তান ভাইটার মুখের ওপর তো একটা কথাও বলার মুরেদ নেই। সেখানে তো জুহু!'

অশুভকে দেখামাত্র মাথার মধ্যে দপ করে মেনে আওন জলে উঠল বিধুর। ওই বজ্রাত ছোকরাটাকে নিয়ে একদিন সন্দেরে ধরেছিল বলে শিবানী তাকে ব্যতিকগ্রস্ত বলেছিল। এখন? আবার জোরে বৃষ্টি এলো। শিবানীর হলুদ ফুলফুল কাপড়ের ছাতটার নিচে ঢুকেপড়েছে অশুভ। ছোকরা শিবানীকে এমনভাবে জড়িয়ে নিচ্ছে মেনে বৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে ছাতার তলায় আঁকড়ে রাখছে—এমন। বিধুর সঙ্গে বিধুর সহকর্মীরা সকলেই বুঝতে পারছে—বিধুকে দেখানোর জন্যেই এসে সময় বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে ছেলালিমেরে হাসছিল শিবানী। খিলখিল করে হাসতে হাসতেই এইমাত্র গলির ভেতরে দুজনেই ঢুকে গেল। অন্যদের জন্যে নয়, গনেশ মামার সামনেই সবচেয়ে বেশি মরমে মরে যায় বিধু। মোটাগোবের মিলের ধুতির ওপর, কলারওয়ালা ফুল যাও সাদাসাট পরে ছত্রিশ বছর এই দোকানো কাজ করে যাচ্ছে মানুষটা। গনেশ মামার উদ্দেশ্যেই শিবানীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বিধুর। শিবানী মোমিনপুরের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বাধা হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত ওই মানুষটাই একমাত্র তাকে কোনো কথা বলেনি। তাতে বিধুর মনের অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। উল্টে অজিত সাধুখানো একদিন ধমকে উঠেছিল শিবানীর চলে যাওয়া নিয়ে ঠাট্টা করায়। তখন শিবানী এখানে দাঁড়াতে শুরু করেনি। অজিত হাসতে হাসতেই বলেছিল, 'মাঞ্জিটা তোর ভালো মারা হয়নিরে বিধু। বিয়ের সূতায় সব সময় কড়া মাঞ্জা মারতে হয়। নইলে ভোকাটা। এখন শালা খালি লাটাইয়ে সুতো গুটিয়ে যাও। তার মধ্যেও ছেলেছোকরারা হাতা মেরে নেবে।'

বিধু জানে, ওই গলির ভেতরের খালি কুটিগুলোয় হেরেকরকম রেট। তারমাথো নিশ্চয় সেরাটতে ঢুকবে অশুভ। আর একুপি বাচ্চালাল ছুটবে মধুর দোকানে। অশুভ ওই অনেককাল মধুর এক গেলাসের বন্ধু। চরিত্র বলতে অনেক দিন থেকেই মধুর যে কিছু নেই—ভাইয়ের সে খবরটা বিধুর চোখে ভালো আর কে জানে? কে বলবে এই আজকেই অশুভের মতো মধু অন্য কোনো এলাকায় ফুটি মারতে গেছে কিনা?

জানোয়ারটার পক্ষে যাওয়ায়ই স্বাভাবিক। তা না হলে মাত্র দেড় বছরের মধ্যে শয়তানটা এতো টাকা নষ্ট করল কি ভাবে?

অন্য যে কেউ হলে—সে যতবড় ওণ্ডা মস্তানই হোক না কেন—স্বীতিমত ক্যামেলায় পড়ে যেতো। বাবারও তো বাবা থাকে। মধু বিস্ত্র কনসট্রাকশনের ব্যবসায় নামে যেভাবে



এই দেড় বছরের মধ্যে অনেকগুলো পাটির হাজার হাজার টাকা মেরে দিয়ে বসে আছে—  
ভাবলে আঁধারে উঠতে হয়। কিন্তু মধুর কোনো বিকার নেই। অনেককাল থেকে মধুর পলেটিক্যাল  
পার্টিতে ওঠা বস।। সে তার নিজের পাটির তিনচারজনের কাছ থেকেই কমপক্ষে লাখ দুয়েক  
টাকা নিয়ে আর ফেরৎ দেওয়ার নাম করছে না। 'দেবো না' কথাটা কাউকে কক্ষনো সে বলে  
না। দেখতে দেখতে তার ভাইটা কি করে যে এই রকম দুশাস্ত্রী হ'য়ে উঠল ভেবে পায় না বিধু।  
পাটির নাম রাখা হয় যাবে বলে কমরেডেরা এ নিয়ে পাটির বাইরে ভেমন কিছু হেঁচ  
করতেও পারে না।

মধুরের পলেটিক্যাল পার্টিই একজন সাজা কমরেড 'সানি' কী অবস্থা করেছে! ছেলেবেলা  
থেকে মধু পার্টিতে আছে বলে সানি মধুকে নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করে এসেছে। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং  
ডিগ্রামা নিয়ে সানি চাকরি করতো সরকারি সংস্থা অস্থায়ী পদে। মধু তাকে নিয়ে কনস্ট্রাকশনের  
বিজনেসে নামল। বাড়ির প্রান আঁকা থেকে শুরু করে কনস্ট্রাকশনের যা কিছু কাজ তুলে  
দেবার দায়িত্ব সানির। আর ব্যাঙ্ক অপারেশন, টাকা পয়সা লেনদেন ইত্যাদি অফিসের যা কিছু  
কাজ মধুর। এরমধ্যে মধুর এক 'মোসা এসে জটল। সানি নিজের মানুষটা খাঁটি বলে তার  
পার্টির হার্ডকোর কমরেড বলে যাবে জানে— সে লোকটা এভাবে ভদ্র নন্দরী হ'য়ে উঠবে—  
এতোটা সানি সন্দেহ করতে পারেনি। ব্যবসা শুরু করার সময় নিজের স্ত্রীর বিয়ের গয়না  
বিক্রি করে টাকা দিয়েছিল সানি। একসঙ্গে অনেকগুলো সাইটে সুনামের সঙ্গে চলছিল কাজ।  
আর কাজ পাগল ছেলে সানি কাজে মেতে গেলে কাজ ছাড়া আর কিছু খেয়ালে রাখে না। যে  
কোনো কাজই হোক না কেন—হোক পার্টির দেওয়াল লেখা—অটো রিস্রোগে মাইক নিয়ে  
প্রচার হোক—কিংবা হোক স্ট্রিকটর্ণার মিটিং—সর্বত্র সানি যেমন খেটে যায় প্রাণ ঢেলে—  
তেমনি এই কাজেও প্রতিদিন সাইটগুলোতে গিয়ে সকাল দুপুর সঙ্গে লেবার মিস্ত্রিরের জুটিয়ে  
কাজ করিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে একদলও ফাঁকি থাকতো না সানির।

সেই সানিকে প্রায় পথে বসিয়ে দিয়েছিল মধু। একবছরের শেষে হিসেবে বসে সানির  
মাথায় হাত। ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স তাদের ফাঁকা হয়ে এসেছে। উফ্টে ততদিকের ধার। ব্যাঙ্ক একাউন্ট  
ছিল একা মধুর নামে। শুরুতেই কথা হয়েছিল। সরকারী চাকুরে সানির নামে নয় সানির স্ত্রী  
মীনাবার সঙ্গে জয়েন্ট একাউন্ট হবে মধুর। হবে হবে করতে করতে বছর ঘুরে গেল কিন্তু কাজ  
তো খোঁদ ছিল, মধুর একরা নামের একাউন্টেই কাজ চলছে।

মধুকে টাকার তাগিদা দিলে কখনোই সে 'দেবো না' এমন কথা বলে না। হাতে টাকা  
এসেই দিয়ে দেবে। এখন তো দেউলিয়া। কী ভাণ্ডা এই দুঃশময়ী সানির সরকারী চাকরিতে  
পাকা হয়ে গেছিল। তা নাহলে চোখের সামনে কমরেডের স্ত্রী কন্যা না খেয়ে মরছে দেখেও সে  
পাওনা টাকা শোধ করে তাদের বাঁচাতে যাবে না। বিধুর ভাইটি একেবারে আলাদা ধাতু দিয়ে  
গড়া। বিজনেস পার্টির কাছে পলেটিক্যাল পার্টির আশ্রয়কে কিভাবে চাল হিসেবে ব্যবহার  
করতে হবে সেই বিদ্যাটা বোধহয় সে গোড়াতেই শিখে নিয়েছিল।

এইজন্য বিজনেসে নেমে সানির পার্টি অফিসে নিয়মিত হাজিরা হওয়ার খামতি হলেও  
মধুর যাতায়াত আরো বেড়ে গেল। বাবসার যত ব্যাটো। বাজতে থাকলো মধু তত আঁকড়ে  
ধরল পার্টি অফিস। ও ছেলে সার বোঝা বুঝে গেছে। এখন পার্টির কাজে যত সেন্টে থাকবে  
ততই তার মনের জোর বাড়বে। সানি যত ছোঁসের হবে মধুর, 'মধু' যত বেশি করবে ফড়  
হয়েছে তত বেশি করে মানোযোগী হয়েছে পার্টির কাজে। এ এক অদ্ভুত অঙ্ক। মধুর চারিত্রিক

অথঃপতনে শেষ পর্যন্ত পাটির লাভ। পার্টি অফিস তার কাছ থেকে আরো বেশি করে কাজ  
পাচ্ছে।' হুনির পার্টি অফিসের সেক্রেটারির মধুর ওপর আস্থা ক্রমশ বাড়ছে দেখে মধু যাদের  
প্রতারণা করে যাচ্ছে তারাও মধুকে হেনস্থা করার সাহস পাচ্ছে না।

ভুক্তভোগী সেইসব রায়ব বয়্যালদের তুলনায় বড় ভাই বিধু তো মধুর কাছে চুনোপুটি।  
তাই মধু শিবানীকে গলা ঘাটিয়ে গালাগাল দিলে কিংবা ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিলেও  
দুব্বলাদেহ বিধু কিছু বলতে পারেনি। এমন কি শেষ পর্যন্ত যখন শিবানী বলেও বসেছিল  
বিধুকে, 'তোমার মায়ের পেটের ভাই—ওই জানোয়ারটার আমার ওপর এতোটা ক্ষেপে  
যাওয়ার কারণ একটাই। পণ্ডটা একবার নয় বারবার আমার ওপর কাঁপিয়ে পড়তে চলেছে।  
গিদওয়ানির কাছ থেকে বেশি ধার পাওয়ার লোভে তাকে লেলিয়ে দিয়েছে। এখন এসব  
জানার পরও তুমি যদি যেভাবেই হোক তোমার ভাইকে শাস্তোত্তা করার ব্যবস্থা না করো, আমি  
আর একটা দিনও এ বাড়িতে, এই নরকের সংসারে থাকবো না। দরকার হলে আমি 'সেহ  
বেচে খাবো ভব তোমাদের সংসারের অন্ন মুখে দেবো না।'

এরপরেও বিধু অসহায়ের মতো শিবানীর দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া একজন জ্ঞাত  
মানুষ হিসেবে কিছুই করতে পারেনি। বেরিয়ে যাওয়ার মুখে চোখ দিয়ে যেন আশ্রয় চিকরেছিল  
শিবানী। ফোন্ডে বলেছিল, 'যে মানুষ এতোটা কাপুরুষ, ওইরকম জানোয়ার ভাইয়ের বিরুদ্ধে,  
ওই মা-বোনের বিরুদ্ধে—একবারটি রুখে দাঁড়াতে পারে না—তার নিজের গলায় দড়ি  
দিয়ে মরার সাহসটুকুও হবে না কোনদিন।'

মধু দু'বছরের ছোটো বিধুর চেয়ে। বিধু ছেলেবেলার থেকেই খুব কমজোরী। ছেলেবেলা  
থেকেই দূরন্ত ছোটভাইয়ের হাতে মার খেয়ে এসেছে বিধু। ডাক্তার ছেলেবেলাতেই বিধুকে  
পরীক্ষা করে বলেছিল— 'এ ছেলের হাট খুব উইক। শরীর কমজোরী। ওকে দিয়ে ভারি কাজ  
করাবো না। বড় হয়েও ওর ভারি কাজ না করাই ভালো।'

বড় হয়ে ভারি কাজ শেখার দিকে যায়নি বিধু। এই দোকানের কম মাইনের চাকরি নিয়েই  
খুশি ছিল সে। এখানে চাকরি করার তিন বছর পরে গনেশ মামা আনল শিবানীর সম্বন্ধটি।  
দক্ষিণ বারাসাতের খুব গরীব ঘরের মেয়ে। চার বোন, দু'ভাই। সংসারে মা নেই এখন। বাপটা  
তাড়ি খেয়ে পড়ে থাকে এখানে সেখানে। একবেলাও ভাত জোটে না ভালো মতো। কিন্তু  
অতো অভাবের মধ্যেও মেয়েটির রূপ দেখার মতো। গায়ের রঙ খুব ফর্সা না হলেও চোখ,  
নাক, চিবুক—সব মিলে রীতিমত সুন্দরী বলা যায়। কিন্তু একেবারেই কিছু দিতে থতে  
পারবে না বলে বিধুর মা গনেশ মামার আনা এ সম্বন্ধে রাজী হয়নি। কিন্তু গনেশ মামা  
আগেই বিধুকে মেয়ে দেখিয়ে এনেছিল। বিধু জীবনে ওই একবারই মার কাছে শক্ত হতে  
পেরেছিল, বলেছিল, 'এই মেয়ের সঙ্গে যদি বিয়ে না দাও তোমরা বাপের নামে দিবা করছি—  
তুমি বেঁচে থাকতে মা, আমি বিয়ে করবো না।'

দক্ষিণ বারাসাতের গ্রামে ফিরে যাওয়ার উপায় ছিল না শিবানীর। বিধুদের সংসার  
থেকে বেরিয়ে সে খিদিরপুরের যে বাড়িতে রান্নার কাজ জটিয়েছিল সেখানেও বেশদিন  
থাকতে পারল না। সে বাড়িতেও শরীর সামলানো শক্ত হয়ে উঠেছিল। ভেতরে ভেতরে  
প্রচণ্ড ইঁসছিল শিবানী। বিধুর জন্যে সে যত চোখের জল ফেলতো, ততই প্রতিশোধ নেওয়ার  
আশা জ্বলতে থাকতো তার মধ্যে।

বুষ্টিটা থামতেই, আজ দোকান বন্ধ হওয়ার আগেই ছুটি নিয়ে তাড়ি রওনা হ'ল বিধু।



ঘড়ি কেনার খন্দের আজ আর বেশি আসবে বলে মনে হয় না। পশ্চিম পুটিয়ারির পাইকারি খন্দেরটি যাই বলুক, খোদ শহরে ঘড়ি ওড়ানোর চল প্রতিবছরে লাফিয়ে লাফিয়ে কমছে, একটা বিধুরা টের পাচ্ছে ভালোবাসা। সাতবছর আগে এই সময়টার যে পরিমাণে ঘড়ি বিক্রীতে এখন কি আর সেই রকম বিক্রি হয়। বিধুরা ছেলেবেলাতেও, সূতায় মাঞ্জা দেওয়া, ঘড়ি ওড়ানো, উড়ন্ত ঘড়ির লড়াই, কাটাকাটি যত হোত—এখন তার কতটুকু চোখে পড়ে? ঘড়ি কাটার পর, বাতাসে ভাসতে ভাসতে মাটির দিকে নেমে আসতো যখন, কয়েক দশল ছেলে দৌড়াতে দৌড়াতে সেটা ধরার জন্যে। কত এয়ারিয়েন্ট হয়েছে তাতে। এখন কি আর রোজ রোজ সে দৃশ্য চোখে পড়ে?

বিধুরা মনে পড়ছে ছেলেবেলায় সরকারী বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে, তাদের এক দিদিমনি একটা ঘড়ি ওড়ার গানের সঙ্গে নাচ শিখিয়েছিলেন লাফিয়ে লাফিয়ে ছেলেমেয়েদের। গানটা খুব প্রিয় ছিল বিধুরা। প্রথম দুটো লাইন ছিল, নীল বঙ্গা ঘড়ি 'আয়না উড়ি/সবচে ঘড়ি আয়না' উড়ি। তারপরের লাইনটা ছিল—আয়না উড়ি নীল আকাশে 'আয়না উড়ি জোর বাতাসে'। সেই গানের শেষে ছিল ভোকাটা, ভোকাটা, ভোকাটারে/ভোমারা ভোমারা ভোমারারে। শেষ লাইনটায় হাত তুলে তুলে গোল হয়ে নাচতো সবাই। ভোকাটা শব্দটা বলতে খুব মজা লাগতো তার। অথচ এই মুহূর্তে ভোকাটা শব্দটা মনের ভেতরে জাগতেই সেদিনের অজিত সাধুখাঁর কথাগুলো মনে পড়ল বিধুরা। এখন লাটাইয়ে শুধু সূতো গুটানো। বাড়ি ফেরার জন্যে দোকান থেকে বেরিয়ে সত্যনারায়ণ মন্দির ভাঙারের সামনে বাসস্টপে এসে বিধুরা মনে হ'ল কি হবে আগে বাড়ি ফিরে? বাড়ি ফিরলেই তো মা আবার বিয়ের জন্যে কি কি তোড়জোড় করছে তার ফিরিস্তি শোনাবে। সেটা অসহ্য বিধুরা পকেট।

বিধুরা চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কয়েকটা মোমিনপুরের দিকের ট্রাম ছেড়ে দিল, বাস ছেড়ে দিল। হঠাৎ তার ভেতরটা কেন যেন বড় বেশি ফাঁকা বোধ গিয়ে যা খাঁ করত থাকল। আচমকা সে ট্রাম লাইন পেরিয়ে রাস্তার উল্টোদিকে, পোটোপাড়ার মোড়ের বাসস্টপে চলে গেল। তারপর একটা বালিগঞ্জের ট্রামে চেপে বসল।

কোথায় যাবে? কেন যাবে? কিছুই তার ঠিক নেই। শুধু ঠিক আছে—এখন বাড়িতে ফেরা নয়। তার কি সত্যিকারের কোনো বাড়ি আছে? সব মানুষেরই কি সত্যি সত্যি বাড়ি থাকে?

বিয়ের পরপরই, একরাতে শিবানীকে বলেছিল বিধুরা, 'আমায় জানো কেউ কোনোনদিন বুঝতে চায়নি। আমার মা বােনেরা ভাই সকলেই যে যার নিজের দিক থেকে ধরে নিয়েছে; আমার দিক থেকে আমাকে বুঝতে চায়নি। তুমি আমাকে বুঝো, শিবানী'।

শিবানী বলেছিল, 'তুমি মাঝেমাঝে কি রকম শক্ত কথা বলে। আমার মাথায় ঢোকে না। কিন্তু তোমাকে ঠিক বুঝবে।'

'চেষ্টা করো বুঝতে। সবাই সব কিছু পারে না গো। আমি অনেক কিছুই পারি না। যতটুকু পারি তার মধ্যেই বুঝো আমাকে।' বিধুরা এ কথার কোনো উত্তর দেয়নি শিবানী।

এখন ট্রামের মধ্যে বসে বিধুরা বুঝতে পারছিল—তার ভেতরটা ক্রমশ অস্থির হয়ে যাচ্ছে। কেননা একটা শ্বাসকষ্টের মতো হাঁসফাঁস করছে ভেতরটা।

রাসবিহারীর মোড়ে ট্রামের আসনের জানালার ধার ফাঁকা হওয়ায় সে সরে বসল ধার ঘেঁষে। হ হ ক'রে জোলা হাওয়া চোখে মুখে লাগছে। একটা জীবন যখন ভেতর থেকে

আরেকটা জীবনকে ছুঁতে থাকে তখন নাকি ভালোবাসা জন্মায়। যেন বাকবাকি আকাশের অনেক উচুতে ফুরফুরে হাওয়ায় উঠছে মমুরপঙ্খী। তখন কেবল সূতো ছেড়ে যাওয়া। আর যাদের জীবনে ভালবাসা জন্মায় না? কিংবা জন্ম হতে না হতে শেষ হয়ে যায়? একসময় বিধুরা খেয়াল হ'ল—তার দু চোপের কোল বেয়ে জল গড়াচ্ছে। ট্রাম সেইসময় বালিগঞ্জ স্টেশন টার্মিনাসে এসে দাঁড়িয়ে পড়ছে। যাত্রা শেষ।

এরপর তিনদিন কেটে গেল।

তিনদিন পরে সন্ধ্যাবেলায় শিবানী আবার ঘড়ির দোকানের উল্টোদিকের গলির মুখটায় এসে দাঁড়িয়েছে,—তাকে দেখে গনেশ ভিহদার দোকান থেকে নেমে এগিয়ে গেল তার দিকে। যার বিয়ের ঘটকালি করেছিল সেই মেরেকে বাজারী মেরে হয়ে সমীর কর্মস্থলের কয়েকহাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গোড়ায় যে ধাক্কাটা পেয়েছিল গনেশ মামা—এতোদিনে একটু একটু করে তা সামলে নিয়েছে। দিনের পর দিন, রাগে যেমায়, অবস্থিতে ভেতরে ভেতরে ছটফট করেছে গনেশ মামা, আড়চোখে বিধুরা মুখের দিকে তাকিয়েছে কিন্তু একটা দিনের জন্যেও একটা কথা সুধোয়নি বিধুরা। শিবানীর কাছে গিয়ে কথা বলা কল্পনাতেও আনেনি। ভেবেছে শুধু, যার যেমন জীবন, তেমনই বয়ে যায় নিজের খাশে। বছরের পর বছর—বিশ হাত দূরের মানুষ—ওই বিশ হাত দূরেই থেকে যায়।

কিন্তু এই মুহূর্তে আর দূরে থাকল না গনেশ ভিহদার। তাকে এগিয়ে আসতে দেখে সবচেয়ে বেশি অবাক হ'ল শিবানী। অজিত সাধুখাঁ, শঙ্কু হালদাররা দোকানের মধ্যে বসে তখন সেই দিকেই তাকিয়ে আছে।

'তাকে আমার বলার কোনো অধিকার নেই। তবু হাতজোড় করে মনিত জানাতে এলুম।'

সামান্য সামনি এসে গনেশ ভিহদার কথাটা বলতেই শিবানী ভুরু বোঁকে উঠল। বলল, 'আহ—আমোলা যা! হলে! কি? কি তোমার বাড়ীতে ছাই দিলুম গো!'

ঝাঁঝিয়ে উঠল শিবানী। তার কথার ঝাঁঝে আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা সড়কবেশাগুলোও চোখ ফেরালো। রাস্তার ওপরের ফলওয়াল বুড়ো আর প্রাসটিকের জিনিস বেচতে বসা ছোকরাটাও তাকাল।

'বিধুরা খবর শুনেছিস তো?' গনেশ ভিহদার শিবানীর মেকআপ করা মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে।

'কি খবর? আবার বিয়ে করেছে? নাকি অসুখ বাধিয়েছে? পরপর তিন দিন কাজে আসেনি।'

'তুইই বা জানবি কি করে? কেউ তো তা নিয়ে মুখ খোলেনি'

'আসল কথাটা বলে দাওনা বাপু। কেন ধানাই পানাই করেছে? জানো তো এটা আমার রোজগারের সময়।'

গনেশ ভিহদার এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল। তারপর বলল, 'বিধুরা রেললাইনে গলা দিয়ে সুইসাইড করেছে।'

'কি? রেল লাইনে গলা বাড়িয়ে দিয়েছে? কবে?'

'তিনদিন আগে।'

'তিনদিন আগে—সন্ধ্যতে দোকানদে দেখছি।' কেমন একটা দমচাপা গলায় কথাটা বলে

নিজেকে সামাল দেয় শিবানী।

‘হ্যাঁ। রাত আটটার আগে দোকান থেকে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি।’

‘কোথায় কাটা পড়েছিল?’

‘গলা দিয়েছে বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে। বাড়ি না ফিরে উল্টে দিকে চলে গিয়েছিল।’

শিবানী নিখর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

গনেশ ডিহিয়ার বলল, ‘একটা কথা রাখবি? আর তো এখানে দাঁড়িয়ে সেই অপদার্থ বাটা ছেলের ওপর প্রতিশোধ তুলতে পারবি না। তাই এই চতুর্দশ ছেড়ে দিস যদি— না না তার আত্মার শান্তিফান্ডির কথা বলছি না রে, বলছি এই জানো যে বিধু তো আমাদেরই সহকর্মী ছিল, বিয়ের সময় দোকানের সবাই তাতে ছিল। তাই সকলেই বলছিল—এরপরে তোকে এ চতুরে ঘোরাক্ষেপা করতে দেখলে—’

‘কি হবে তোমাদের? শোক উথলে উঠবে? মনে হবে আমার জন্যেই সে সুইসাইড করতে বাধ্য হয়েছে— এই তো?’ শিবানী কঠোর গলায় বলে উঠল কথাগুলো।

‘গনেশ ডিহিয়ার আগের মতোই শান্ত, নামানো গলায় জানাল, ‘না; ঠিক সেভাবে বলছি না রে। সবাই হয়ে কথাটা তোকে একবার বললাম—এই আর কি।’

‘সবাই কি চাঁদা তুলে আমার বাকি জীবনের ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করে দেবে? শোনো গনেশ মামা, যে মরেছে মরেছে—ওইভাবে মরাটা তার ললাটেই লিখন। তার জন্যে আমি আমার রোজগার গুটিয়ে মরতে যাব কেন?’

গুনো হাসি এনে গনেশ ডিহিয়ার বলে, ‘মুখে তুই যতাই বলিস শিবানী, তিন বছর যার সঙ্গে ঘর করেছিস’—কথাটা শেষ করতে না দিয়ে শিবানী গলা চড়িয়ে দিল, ‘তার জন্যে শোকে পাথর হয়ে যাবে? নাকি মড়াকায় কাঁদবে বিধবার মতো? যাও তো গনেশ মামা যাও। তুমি তোমার কাজ করো— আমাকে আমার কাজ করতে দাও। এবার আমি তোমায় হাত জোড় করে বলছি—চলে যাও। চলে যাও তো আমার সামনে থেকে।’—বলতে বলতে মুখ ঘুরিয়ে নিল শিবানী। সে বুঝতে পারল, সে ঝেড়ে ফেলার যতই চেষ্টা করুক, এই মুহূর্তে তার বুকের ভেতর থেকে যে সমকে কামা ঠেলে আসছে—তাতে এক্ষুনি তার চোখের কাজল মুখের দো পান্ডভার সব লেস্টে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আজ আর শরীর টানটান করে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার যাবে না। কাটা ঘুড়ির শিখিলতায় ভাসতে ভাসতে শিবানী চলে গেল।

## এর সঙ্গে মিল, ওর সঙ্গে মিল

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সিট বেল্ট বীধার ঘোষণা শুরু হয়ে গেলে। বিমানটি এবার নিচে নামছে। আওয়াজ শুনেও বোঝা যায় গতি কমে আসছে ক্রমে। শহীদ বললো, এসে গেলাম। ঠিক সাত বছর পর।

তুণা মনে মনে অন্য একটা হিসেব করতে লাগলো।

ওদের দু’বছরের সন্তান গোণো ঘুমিয়ে আছে পাশের সিটে। ওকে কোলে করেই নিতে হবে মনে হয়। শহীদের এক ডাক্তার বন্ধুর পরামর্শে গোণোগেকে আর্থখানা ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দেওয়া হয়েছে। প্লেনে বাছুরা চ্যাচামেচি বা কাদাক্যাচি করলে বিরক্ত হয় অন্য যাত্রীরা।

মাটি স্পর্শ করার সময় বেশ জোরেই বীকুনি লাগলো, তাতেও ঘুম ভাঙলো না গোণোর। উঠে দাঁড়িয়ে শহীদ বললো, একেবারে চোখ মেলে দেখবে, নতুন দেশ, নতুন মানুষ।

তুণা জিজ্ঞেস করলো, ঘোমটা দিতে হয় নাকি?

শহীদ বললো, না।

তুণা বললো, কেউ কেউ যে দিচ্ছে দেখছি। আমিও দিতে পারি।

শহীদ বললো, ধ্যাং, কোনো দরকার নেই।

ছেলেকে বুকে তুলে নিল তুণা, শহীদ হ্যাণ্ডব্যাগ নামাতে লাগলো।

তারপর বাইরে এসে বললো, বাবা? কত বড় বানিয়েছে। এটা নতুন এয়ারপোর্ট, আমি এটা দেখে যাই নি।

তুণা কোনো কথা বললো না। সব এয়ারপোর্ট প্রায় একই রকম দেখায়।

ইমিগ্রেশন কাউন্টারে সামান্য গুণ্ডগোল হলো। দু’জনে একই লাইনে দাঁড়িয়েছিল, অফিসারটি চোখ টারা করে একবার তুণা একবার শহীদের দিকে তাকাতো লাগলেন। তারপর তুণাকে পাশের লাইনটা দেখিয়ে বললেন, আপনি এঁটোতে যান।

শহীদ বললো, ধ্যাং, আমি আমার স্ত্রী

অফিসারটি বললেন, ওনার ইঞ্জিন পাসপোর্ট।

শহীদ আবার জোর দিয়ে বললো, কিন্তু এখন আমার স্ত্রী।

অফিসারটিও জোর দিয়ে বললেন, তা তো অস্বীকার করছি না। কিন্তু ফরেনারদের অন্য লাইন।

শহীদ বললো, ফরেনার মানে?

তুণা বললো, কথা বাড়িয়ে কী হবে? আমি যাচ্ছি ঐ লাইনে, তুমি গোণোগেকে ধরো।

হাত বাড়িয়ে ছেলেকে নিতে গিয়ে শহীদ দু’এক মুহূর্ত থমকে গেল। ছেলের এখনো পাসপোর্ট করা হয়নি। শহীদের পাসপোর্টে নাম জুড়ে দেওয়া হয়েছে। গোণোর জন্ম আমেরিকায়, সে ভবিষ্যতে আমেরিকান নাগরিক হবে। এখন তাকে মায়ের কোল থেকে এ লাইনে নিতে হচ্ছে ভবিষ্যতে সে বাবার সঙ্গে এক লাইনে দাঁড়াতে পারবে না। মজার ব্যাপার।

ঘুমন্ত শিশুটি কিছুই জানে না।

পাসপোর্টে তুণার নাম এখনো তুণা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিউইয়র্কের কুইনসের একটা স্কুলে সে চাকরি করে। সেখানে নাম বদলাবার অসুবিধে আছে।



বাহিরে অপেক্ষা করছে ইমতিয়াজ। সে শহীদের ঢোয়ে দু'বছরের ছোট, কিন্তু এত মোটা হয়ে গেছে যে দেখলে মনে হয় শহীদের বড় ভাই। রেডি মেড পোশাক রপ্তানি করে সে খুব ধনী হয়েছে অল্প দিনে, এখানে সবাই বলে গারমেন্টের ব্যবসায় টাকা আসে উড়তে উড়তে। মস্ত বড় জপানি গাড়ি এনেছে সে। তার দু'জন বন্ধুও এসেছে অন্য গাড়িতে। শহীদকে ভালোভাবে অভ্যর্থনা জানাতে হবে তো! সঙ্গে আবার নববধূ। এবং সন্তান। শহীদের সাত ভাই-বোনের মধ্যে তারই প্রথম ছেলে হয়েছে।

শহীদদের বাড়ি কিন্তু ঢাকায় নয়। দাউদকান্দি। ভাই-বোনরা ছড়িয়ে গেছে অনেক দিকে, ইমতিয়াজ নিউ এক্সটেনশন নতুন বাড়ি বানিয়েছে, কিন্তু শহীদের বাবা রয়ে গেছেন গ্রামের বাড়িতে।

দেশের প্রতি তেমন কিছু টান নেই শহীদের। তার আসতে ইচ্ছে করে না। বন্ধুবান্ধবও অনেকেই ও দেশে। এখানকার কারুর সঙ্গেই হৃদয়ের টান নেই। একমাত্র বাংলা ভাষার টান, তা ওদেশে থাকলেও বজায় রাখা যায়।

বাবার সঙ্গে সহজ সম্পর্ক অনুকর্নিই নেই শহীদের। মা চলে যাবার পর বাবার সঙ্গে সে ভালো করে কথাই বলতে পারতো না। মা মারা যান সাধারণ জুরে, শহীদ তখন ফুটবল খেলতে গিয়েছিল ব্যাংককে। ঠিক সময়ে সে খবরটাও পায় নি। ফিরে এসে তার মনে হয়েছিল, বাবার উদাসীনতাই মাকে খুন করেছে।

মা চিরকালই চুপচাপ থাকতেন, পৃথিবী থেকে চলেও গেলেন নিঃশব্দে। মা চলে যাবার পরই মায়ের অভাব বেশি করে অনুভব করেছিল শহীদ। তার ঠিক দু'বছর পর বেশ অল্পবয়সী সরিকন বিবিকে নিকে কর্তন সুলেমান সাহেব। ছেলে-মেয়েরা কেউ কাছে থাকে না। তিনি জমি-জিরেত সামলাতে সামলাতে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতেন কী করে! শহীদ তখন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পরীক্ষা দিচ্ছে। খবরটা শুনে সে মায়ের কথা মনে করে কেঁদেছিল। বিদেশে চলে যাবার আগে বাবার সঙ্গে দেখা করে নি।

বাবার সঙ্গে সে সম্পর্কটা চুকিয়ে দিয়েছিল। এর মধ্যে একবার দেশে ফিরেও সে দাউদকান্দি যায় নি। সে যখন তুগাকে বিয়ে করে, তখনো জানানায়ি বাবাকে। অনুমতি নেবার তো প্রকই ওঠে না।

তবু খবরটা ঠিকই রটে যায়। শহীদ যে একটি হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করেছে তা সে জানে না?

বাবার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখে নি শহীদ, তবু এবার তাকে আসতে হয়েছে বাবারই একটা চিঠি পেয়ে।

সুলেমান সাহেবকে মৃত্যু রোগে ধরেছে। ক্যানসার। হ'মাসের বেশি আয়ু নেই। তিনি জানেন যে সেজো ছেলে এখন ভালো চাকরি করছে আমেরিকায়, দেশের পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তির পরোয়া করে না। বাবা মৃত্যু শয্যা শুনলেও সে আসবে না। কিন্তু শহীদের ছেলে তো তারই বংশধর। সেই নাতির মুখ তিনি একবার দেখে যেতে চান। শহীদ কি তার এই শেষ আশা পূরণ করবে?

চিঠিটা পেয়েও শহীদ দোনাডোনা করছিল। তার এখন অনেক কাজ। তা ছাড়া বছরের এই সময়টার পুরো বিমান ভাড়া দিতে হয়। গরমকালে শান্তা পাওয়া যায়। কিন্তু তুগা চিঠিটা

দেখতে পেয়ে বলেছিল, তোমার বাবা এত কাতরভাবে লিখেছেন তাও তুমি যাবে না? একদিন আমাদের ছেলেও বড় হবে —

নেটাই আসল কথা। একদিন আমাদের ছেলেও বড় হবে। গোগো জন্মাবার পর শহীদ যখনই ভাবে, সে এখন বাবা হয়ে গেছে, তখনই সে নিজের বাবাকে একটু একটু ক্ষমা করতে শুরু করে।

তুগা কখনো বাংলাদেশে আসে নি। তার জন্ম ব্যাঙ্গালোরে। সেখান থেকে ন'বছর বয়সে লণ্ডনে, তারপর পড়াশুনা আমেরিকায়। বাংলার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই বলতে গেলে, তবু তুগা বাংলা শিখেছে নিজের মায়ের জন্য। মা কখনো তার সঙ্গে ইংরেজিতে একটুও কথা বলতেন না।

তুগাই এখানে আসার জন্য জোর করে।

সুলেমান সাহেবের শরীরের অবস্থা ভালো নয়। সেজসুজি দাউদকান্দিতেই যাওয়া উচিত। কিন্তু ইমতিয়াজ যেতে দেবে কেন? মায়ের সঙ্গে সে টেলিফোনে যোগাযোগ রাখে, একদিন পরে গেলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না। বড় ভাই আসবে বলে সে নিজের বাড়িতে বড় পার্টির ব্যবস্থা করেছে।

ইমতিয়াজের স্ত্রী রুবিই প্রথম বললো, তুগার সঙ্গে নানীর মুখের খুব মিল না?

মা মারা গেছেন অনেক আগে, কিন্তু মায়ের মা বেঁচে ছিলেন গত বছর পর্যন্ত। আশি বছর বয়স পর্যন্ত সুন্দর স্বাস্থ্য, সুন্দর হাসি। সব দাঁত পড়ে নি, সব চুল পাকে নি, মধুর স্বভাবের জন্য নাজমা বিবি ছিলেন পাড়া-প্রতিবেশী সকলের নানী। নিজেই এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে সকলের খবর নিতেন। কারকে জ্বালাতন করেন নি। বেশিদিন ভাঙেন নি। দিবা সুস্থ অবস্থায় একদিন শুতে গেলেন, শেষ নিশ্বাস পড়লো শেষ রাতে।

এ বাড়িতে তাঁর একটা বড় ছবি টাঙানো আছে। ফটোগ্রাফ নয়, পেইন্টিং, একেছে প্রতিমা দাস নামে নতুন এক শিল্পী। সবাই প্রশংসা করে ছবিটির। হাসি মাথা মুখানা যেন জীবন্ত। শহীদ অল্প বয়সে নানীর ন্যাওটা ছিল। কিন্তু তুগাকে বিয়ে করার সময় একবারও তার মনে হয়নি, এ মেয়ের সঙ্গে তার নানীর মুখের মিল আছে।

এখন রুবি বলার পর মনে হলো, সত্যিই তো!

নানীর বড় ছবিটির পাশে তুগাকে দাঁড় করিয়ে রুবি সবাইকে দেখায়। সকলেই বলে, আশ্চর্য মুখের মিল। ঠিক যেন নাজমাবিবি অল্প বয়সের চেহারা নিয়ে ফিরে এসেছেন।

তুগা নিজে কিন্তু কোনো মিল খুঁজে পায় না।

মানুষ অনবরত মিল খোঁজে। দেওয়ালে যে শ্যাওলার ছোপ পড়ে, তাতেও কি ফুটে ওঠে না কোনো পরিচিত মানুষের মুখ?

মেঘের খেলায় ফুটে ওঠে কত দৃশ্য।

নদীর ছলোছলো শব্দে শোনা যায় চেনা সঙ্গীত।

এমনকি বাতাসও অনেক সময় মানুষের গলায় ডাকে।

দু'বছরের ছেলে গোগো, তার সঙ্গেও সুলেমান সাহেবের মিল খুঁজে পেল অনেকে। ঠিক সেই রকম ভুরুর ভঙ্গি। সেই রকম ভাবে হাসে। এ ছেলে রাগীও তাঁর মতন।

শহীদ তা শুনে হাসে। বাজে কথা। তার ছেলের সঙ্গে তার বাবার চেহারার কোনো মিলই নেই। বরং মিল আছে তুগার দাদার সঙ্গে। কথায় বলে না, নরানং মাতুল্য ক্রম।

কিন্তু দায়দকান্ধিতে এসে, বাবার কোলে ছেলেকে বসিয়ে দিয়ে শহীদ বললো, আপনার সঙ্গে আপনার নাতির মুখের খুব মিল।

এটা শুধু একজন মর্মুর্ষ ব্যক্তিকে খুশি করার জন্য। এখন আর রাগ নেই। বরং বাবাকে ছেলোমানুষ মনে হয়। মমতা হয়।

সুলেমান সাহেব দুটি রাণী ভিক্টোরিয়ার আমলের সোনার গিনি বার করে রেখেছেন। নাতি ও পুত্রবধুর মুখ দেখাবেন বলে।

গোগোর মাথায হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন। তাঁর ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগলো। যেন এই দিনটির জন্যই তিনি বেঁচে ছিলেন। এই শিশুটি এই বংশের ধারা বহন করে নিয়ে চলবে।

গোগো একজন অচেনা বৃদ্ধের কোলে বসে থাকবে কেন? সে ছুটফটিয়ে উঠলো। তারপর এক দৌড়ে চলে গেল বাহিরে।

তৃণা এসে প্রণাম করলো শ্বশুরকে।

সুলেমান সাহেব তাকেও গিনি দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

কীর্ণ গলায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের বাড়ি কোথায় ছিল মা?

তৃণা বললো, ব্যাঙ্গালোর। সাউথ ইণ্ডিয়ায়।

সুলেমান সাহেব বললেন, সুন্দর শহর। একবার গেছি আমি।

তারপর অপলক ভাবে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললেন, কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! এমন মিল।

তাঁরও ধারণা, তাঁর শাশুরি যেন পুত্রবধুর রূপ ধরে ফিরে এসেছেন। খানিকবাদে তৃণা ওপরের ঘরে গিয়ে শহীদকে হাসতে হাসতে বলল নানী মানে তো দিদিমা! আমি তোমার দিদিমার মতন দেখতে?

শহীদ তার খুতনিতে আঙুল দিয়ে রসকর বললো, আমি যদি বলি, আমার নানী তোমার চেয়েও সুন্দরী ছিলেন, তাতে কি তোমার রাগ হবে?

তৃণা বললো, মৃত মানুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা?

শহীদ বললো, মৃত্যু মৃত্যু দিয়েই জিতে যায়। যাই হোক, লোকে যে বলছে, তোমার মধ্যে দিয়ে নানী ফিরে এসেছেন, সেটা শুনে খুব ভালো লাগলো। নানীকে এখানে সবাই ভালো বাসতো।

তৃণা মুচকি হেসে বললো, একটা সিগারেট ধরাও না তুমি। আমি দুটো টান দেব।

শহীদ চোখ কপালে তুলে বললো, সর্বনাশ! কেউ দেখে ফেললে, তোমার ইমেজ খান খান হয়ে যাবে।

তৃণা বললো, গোগোর সঙ্গে তোমার বাবার সতি। কিছু মিল আছে? আমি তো বুঝতে পারলাম না।

শহীদ বললো, আগে আমিও লক্ষ করিনি। বাবার কোলে বসার পর, দেখলাম, ঠোঁটের পাশটা, ভ্রুর ভঙ্গি, অনেক মিল। একই জিন তো।

তৃণা বললো, গোগো যে হ্যামবার্গার ভালোবাসে, সেটা তোমার বাবা যদি জানতে পেরে যান?

শহীদ বললো, বোকা মেয়ে! হ্যামবার্গারে হ্যাম থাকে না। এটা সবাই জানে।

তৃণাও কি জানে না? শহীদের চেয়ে সে বেশি বদ্বর আছে পশ্চিমে। তার ছেলের সঙ্গে

একজন ক্যানসার রোগগস্ত শীর্ণ বৃদ্ধের চেহারার মিল, একথাটা তার পছন্দ হয় না।

নাজমা বেগমের ছবি দেখে তার ভালোই লেগেছে।

বেশ সৌমা ধরনের মুশখানা। ভালোমানুষ ছিলেন, বোকাই যায়। তৃণা জানে, সে নিজে ভালো মানুষ নয়। তথাকথিত নীতিবোধ তার নেই। তবু কী করে এ মহিলার সঙ্গে তার মিল থাকতে পারে?

অনেকদিন পরে এসেছে, গ্রাম ঘুরতে বেরোয় শহীদ। ছেলে তার সঙ্গে হাঁট হাঁট পা পা করে।

অনেকেই এখন তাকে চেনে না।

সাধারণ মানুষরা রাস্তায় তাকে দেখে সমীহ করে সেলাম জানায়।

সে বিদেশে থাকে, সবাই জেনে গেছে। যেন সে প্রতিগাল সান।

শহীদ আর কোনো দিন এখানে আসবে না ভেবেছিল। মেঘনা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে দিগন্ত-বিস্তৃত আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বুকাটা টন টন করে ওঠে তার। সে ভেবেছিল, এখানকার এই প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। আসলে তো যায় নি!

তার ছেলেও কি এই নদী, এই আকাশ, এই ধানের ক্ষেতে বাতাসের হিঙ্গোল দেখবে না? বাবার জনাই আসতে হলো। বাবা বলে চলে গেলেও সে মাঝে মাঝে আসবে বউ ছেলে নিয়ে। এখানে এসে থেকে থাকে যাবে কিছুদিন করে।

বাবাকে চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর পাঠাবার সব ব্যবস্থা করে ফেলেছে শহীদ। ইমতিয়াজই কি এটা করতে পারতো না? ঢাকায় ডাক্তার ইমতিয়াজকে বলছে, টার্মিনাল কেস, আর কোনো চিকিৎসাতেই লাভ নেই। তা জেনে শুনেও এই ব্যবস্থা করছে শহীদ। সে বিদেশে থাকে, বাবার চিকিৎসার জন্য কিছু টাকা খরচ না করলে লোকে বলবে কী?

গোগো একেবারেই সুলেমান সাহেবের কাছে যেতে চান না। জোর করে কোলে বসাতে গেলে কান্নাকাটি করে। তবু নাতির দিকে তাকিয়ে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে হাসেন সুলেমান সাহেব। এখন তাঁর প্রাণ গোল্ডে ক্ষতি নেই। বংশের ধারা প্রবাহিত থাকবে। গোগো আবার কী রহস্য নাম? ওর নাম তিনি রাখবেন শোভান। তাঁর দাদার নাম ছিল শোভানুল্লা। অতি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন।

ফেরার পথে আবার দু'দিন ঢাকায় থাকা।

নাজমা বেগমের বড় পোট্রেটের সামনে দাঁড়িয়ে তৃণা কৌতুক বোধ করে। এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে তার চেহারার মিল? একে বেশ ভালোই দেখতে, কিন্তু মিল কোথায়? এর গালে টোল! সারা দিনে একটাও সিগারেট না টানলে যেন দমবন্ধ ভাব লাগে। এখানে খুব সাবধানে থাকতে হয়। জিনিস বা স্কাট-ব্রাউজ পরার তো প্রশংসা ওঠে না। রোজ শাড়ি।

দরজা বন্ধ করে তৃণা একটা সিগারেট ধরালো।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো নিজেকে। নাজমা বেগম? ব্রাউজের একটা বোতাম খুলতেই দেখা গেল ডান স্তনে একটা লাল রঙের তিল। বাচ্চা বয়েসে মা বলতেন, তাঁর মা, অর্থাৎ দিদিমার সঙ্গে তৃণার খুব মিল।

এখানেই যেন কোথায় ছিল দিদিমার বাড়ি। নোয়াখালি জেলায় না? মায়ের কাছে শোনা, অনেক আগে, ভালো মনে নেই। দেশ ভাগ হলো, তারপর কী সব দাঙ্গাটান্ডা, মহাত্মা গান্ধী এসেছিলেন দাঙ্গা থামাতে। তাই কিছু পরেই, মায়ের মা, অর্থাৎ মায়ের বাপের বাড়ির সবাই



চলে যান কলকাতায়। খুব খারাপ সময় ছিল, অনেকটা রাস্তা পায়ের হেঁটে, তারপর নৌকায়, সে সব গল্পের মতন, দিদিমা তখন প্রেগনেন্ট, তাঁর পেটে মা।

এটা তৃণার দেশ নয়। তার মা-ই জন্মেছেন দক্ষিণেশ্বরে। বাবার বাড়ি পানায়। তারপর ব্যাঙ্গালোর। দিদিমার সঙ্গেই তৃণার মিল। দিদিমা এখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পায়ের হেঁটে। এতদিন পর তিনি আবার ফিরে এসেছেন। তৃণার রূপ ধরে। যে তৃণার সঙ্গে নাজমা বেগমের খুব মিল।

দিদিমার সঙ্গে নাজমা বেগমের দেখা হলে কেমন হতো?

এই ভেবে হাসি ঝিলমিল করতে লাগলো তৃণার চোটে।

## কাঠের পা

উদয় ভাদুড়ী

এমন নয় যে কালীতলা বালক সংঘ এই প্রথম একটা সোস্যাল ওয়ার্ক করতে যাচ্ছে — বেলভাঙ্গা ব্লক অফিস তো বটেই গোটা সদর মহকুমাই জানে প্রত্যেক বছরই উমোপাড়া পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত এই ক্লাবটি কিছ্র না কিছ্র সোস্যাল ওয়ার্ক করে থাকে। সরকারি নথিপত্রেও বালক সংঘের সোস্যাল ওয়ার্কের অনেক রেকর্ড বছরের পর বছর ধরে জমা করা আছে। আর তিনবছর পরেই কালীতলা বালক সংঘের গোপ্তেন জুবিলি। সারা জেলায় সে বছর একটা সাড়া ফেলে দেওয়ার বিষয় নিয়ে এখন থেকেই ক্লাবের কার্যনির্বাহী সদস্যরা মাথা ঘামাতে শুরু করেছেন। বালক সংঘের সাধারণ সম্পাদক জীবনকৃষ্ণ পালের সঙ্গে কথা বললে, বালক সংঘের আগামী তিনবছরের কর্মসূচী সম্পর্কে আরও অনেক তথ্যই জানা যাবে। তবে এবছরের কালীপূজো সম্পর্কে বেলভাঙ্গা ব্লক অফিসে যে প্রেস কনফারেন্স ডাকা হয়েছিল এবং সেখানে জীবনকৃষ্ণ বা বলেছিল, বেলভাঙ্গা বার্ডা সেটা তাদের সাপ্তাহিক কাগজের প্রথম পৃষ্ঠাতে ছেপেই ক্ষান্ত হয়নি — বর্তবোর সঙ্গে জীবনকৃষ্ণ এবং স্থানীয় এক সংসদ সদস্যর ছবিও ছেপে দিয়েছে। বলাই বাহুল্য এতে শুধু কালীতলা বালক সংঘেরই যে একটু নাম ডাক হয়েছে তাই নয় — গোটা উমোপাড়া পঞ্চায়েতে আগামী কালীপূজো নিয়ে রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

খবরের মূলসূত্র — বালকসংঘ এবছরে তাদের কালীপ্রতিমার হাইট বার হাত থেকে মাত্র সাড়ে তিন হাতে নামিয়ে আনবে বলে ঘোষণা করেছে। এতে বারোহাত কালী ঠাকুরের মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হবে কিনা, বা চল্লিশ বছরের প্রচলিত পূজোবিধি লঙ্ঘিত হবে কিনা, এ নিয়েও যথেষ্ট নরম গরম আলোচনা হাটে-বাজারে, লোকানে, বারোয়ারি তলায় প্রায়শই শোনা যাচ্ছে।

(২)

সবচেয়ে বড় আপত্তি এসেছে জীবনকৃষ্ণের কমিউনিটি থেকে। তাদের বংশের আদিপুরুষ বংশানুক্রমে মাটির কাজই করে এসেছে। মাটির হাড়ি কলসী চায়ের ভাঁড় থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি তৈরি করা এই পাল্লার বংশানুক্রমিক পেশা। তিনপুরুষ আগেই জীবনকৃষ্ণদের শিকড় ছিল কৃষ্ণনগর শহরের কাছেই ঘূর্ণীতে। শোনা যায়, জীবনকৃষ্ণের ঠাকুরদার পিতা ঘূর্ণী থেকে দুকোণ দূরের এক গ্রামা পুরোহিতের স্বপ্নাদেশে মা নীতলার একটি মূর্তি তৈরি করতে স্বীকৃত হন। পুরোহিতের প্রথম স্ত্রী মানদা নাকি প্রাণদা দেবি ধর্মগ্রাম মহিলা ছিলেন। মায়ের দয়ায় একমাস জলবসন্তে ভোগার পর তার চোখদুটো অন্ধ হয়েছিল। সারা শরীরে বসন্তরোগের দগদগে ক্ষতচিহ্ন দেখা দিয়েছিল।

তা যতটুকু জানা যায়, বলরাম ভট্টাচার্য যথেষ্ট প্রতিপক্ষিণী পুরোহিত ছিলেন। কৃষ্ণনগর রাজপরিবারের দয়ায় তার বিশেষ দশকে দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল। বাড়িতে ন্যায়শাস্ত্র পড়াতো একটা টোল ছিল কুষ্টিয়ার দু'আরির জমিদারদের তিনিই ছিলেন কুলগুরু। গ্রাম এবং আয়তলাংশে নীতলার বোধনের দুটি কারণ ছিল শোনা যায়। গ্রাম থেকে কলেরা বসন্তর প্রাদুর্ভাব কমানোর একটা মতলব তো ছিলই — তাছাড়া প্রথম স্ত্রী মানদার দুচোখ অন্ধ হয়ে যাওয়ায় সংসার অচল হয়ে পড়েছিল। মুখময় বসন্তরোগের ক্ষত নিয়ে মানদা, যখন বলরাম ভট্টাচার্যের সামনে

এসে দাঁড়াতে, তখন তিনি সেদিকে তাকাতেই পারতেন না। গ্রামস্থ কুলীন ব্রাহ্মণ রামগোপাল মুখুটির ঘরে বসানো তিন তিনটি বিবাহযোগ্য মেয়ে। ছোট্টটির এগার, মেজটির বছর তের চোদ্দ — আর বড়টির ষোলো বছর বয়েস। রামগোপালের কোনো পুত্রসন্তান ছিল না, ঘূমের মধ্যে তিনি মাঝে মাঝে পুত্রাম নরকের স্বপ্ন দেখতেন। মরার পর ছেলের হাতের আঙুন না গেলে, ছেলের হাতের পিণ্ড না গেলে, নাকি নরক অনিবার্য।

তো সেই রামগোপাল, সম্ভানেই হোক, আফিমের নেশাতেই হোক গলায় ঝোলানো উপবীত দিয়ে বলরাম ভট্টাচার্যর হাত জড়িয়ে ধরেছিলেন। মানদা সেদিনই বাইরে বেরিয়েছে, একুশ দিন পর নিম্ন হুলদ মেসো মান করে, কুলুঙ্গি হাতড়ে একটখানি মেটে সিঁদুর সিঁথিতে আর কপালে লেপট দিয়ে হাতড়ে হাতেই উঠানো বামে দাঁয়েছিল। উঠানের একপাশে টোলে জনপাচেক শিষ্য তখন পতঞ্জলি সূত্রের টিকাভাষ্য শুনতে বাস্ত। বলরামের সামনে খোলা তালপাতার পুঁথি। রামগোপাল সেখানে এসেই হাউমউট করে বলরাম ভট্টাচার্যের হাত জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, মেজমেয়ের উপর মায়ের দয়া হয়েছে। ওর তো গতি হবে না — আমি বলেছি, ব্রাহ্মণীও বলেছেন গলায় দড়ি দিতে। আমার যজমানীরা অবস্থাও তো তুমি জানো। শান্তিপুরে এক শাসালো শিষ্য পেলাম। বৈশ্য সাহা — দেবদ্বিজ ভক্তি আছে, নবদ্বীপে বাড়ি আছে। বেশ বদিন যাওয়াত করণ। বলল যজমানী পাকা, মাসে দশ টাকা, বছরে তিরিশ মন ধান, পুজোর সিঁধে সব ঠিক আছে — নবদ্বীপে একটা বাড়িও লেখাপড়া করে দেবে — কিন্তু হারামজাদার সাহস দাখ — সে আমায় বড়টা মানে ওঁর মেনকাকে রাখতে চায়। আফিমের ঘোরে রামগোপাল মাটির দাওয়ায় মাথা ঠুকতে লাগলেন, বললেন, এসব শোনার আগে হা ভগবান, হা কৃষ্ণ — আমার মরণ হল না কেন? পেঁতেটা আরেক প্রস্থ হাতে জড়িয়ে নিয়ে বললেন — তুমি ছোটটিগকে চাইলে, তাকেই নাও, এখনও রক্তধালা হয়নি। আমাকে গৌরী দানের পূণ্য থেকে বঞ্চিত কোরো না বলরাম। আর যদি চাও, মেনকাকার বয়স অবশ্য ষোলো, বাস্তব গড়ন — পঞ্চগব্য মুখে নিয়ে আমি প্রায়শ্চিত্ত করব। গৌরীদানের পূণ্য হয়ত হবে না। তবে কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করে তুমি অশেষ পুণ্য অর্জন করবে। ওই বাড়ন্ত গড়নেই তো সর্বনাশ — ব্রাহ্মণীকে দেবনাও ওর দশটিই যদি সন্তান হয় কন্যাসন্তান হবে। তুমি দয়া করলে আমারও গতি হয়। আমি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করতে পারি। কন্যাসম্প্রদান করেই আমি চলে যাব। কালনাথ যেয়ে ঠিক করাই আছে। রাশি, নক্ষত্র, ঠিকুজি, কোষ্ঠী বলছে — বংশরক্ষা হবেই হবে। যদিও বয়স হয়েছে, তবে শাস্ত্র তো আর মিথ্যা বলে না। একবছরের মধ্যে আমি ছেলের মুখ দেখি।

বলরাম ভট্টাচার্য তখন পঞ্চাশ পেরিয়েছেন। বলেই ফেললেন, চৈত্র সংক্রান্তিতে তিনি গ্রামের জনা মা শীতলার পুজার ব্যবস্থা করবেন। বৈশাখে মেনকাকার পাণিগ্রহণ। সেই হিসেবে আবাচনা শুক্রপক্ষ বসন্তী তিথী প্রকৃত সময়। ভাদ্রে গর্ভধানের সন্তান। এমনকি সারমেয়কুলও তখন জাতুর তপিলে অস্থির হয়ে ডাকে — আকাশে মেঘের ঝাবকে চান দেবে কাদে।

(৩)

বসন্ত রোগে মানদা, বলরাম ভট্টাচার্যর প্রথমা স্ত্রীর চোখ গিয়েছিল বটে — কিন্তু শ্রুতি প্রথন ছিল। এক ইন্দ্রিয় বলরাম অবশ্য ইন্দ্রিয় প্রথন হয়ে ওঠে — অসুস্থও তিরিশ হাত দূরে মানদা নিম্নগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে, নিম্নপাতার আর নিম্নকুণ্ডের গন্ধ বুক ভরে নিতে নিতে সবই শুনেছিল। একটা বুকাচা দীর্ঘদ্বাক্ষ বেরিয়ে এসেছিল তার বুক থেকে। তিনিদন পরে,

কেউ দেখেনি, কখন কিভাবে বসন্ত রোগে অন্ধ ব্রাহ্মণী গলায় শাড়ির উঠানের একপাশে টোলের সেই কানায় নিম্নগাছের ডাল থেকে ঝুলে পড়েছিল।

বলাই বাহুল্য নিম্নগাছটি, হয়ত পঞ্চাশ, একশো বা তারও বেশি সময়ের, কাটা পড়ে। আর যেদিন নিম্নগাছটির গায়ে প্রথম কুড়লের ঘা পড়ে — সেদিন ভরদুপুরেই বলরাম ভট্টাচার্য স্বপ্নাদেশ পান। মানদার শোকে খানিকটা সকাল সকালই শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন করে তিনি জামবাণি ভটা একবাটি ঘন ক্ষিরের সঙ্গে সোনামা আফিম সেবন করেছিলেন শোনা যায় — আর সেই দুপুরেই তিনি সেই ভয়াবহ স্বপ্নটি দেখেন।

গাধার পিঠে দুদিকে পা ছড়িয়ে বসেছেন মা শীতলা। আকাশপথে উড়েয়েতে যেতে যেন একবার ফিরে তাকালেন বলরাম ভট্টাচার্যর দিকে — ঘোড়শী, মসলিনের স্বচ্ছ বাস হাওয়ার গতিতে পতপত করে বিপরীত দিকে উড়ে উড়ে যাচ্ছে। কলাগাছের সবুজাভ কাণ্ডের মত দাবনা, অর্ধক্ষুট স্তনবিভাজিকায় গজমোতির হার — নাভিতে হীরকদৃতি। ডানহাতে রক্তাক্ত সম্মাজনী — ধাতব হাতল সম্ভবত তামার, নাকি সোনার, ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ছে আকাশে। ডান চিবুকের নিচে বাদামী তিল, ক্ষুরিত গধর রক্তলালা, একবার ঘুরে তাকাতেই মনে হল এ তো রামগোপালের কন্যা ঘোড়শী মেনকা।

পরক্ষণেই বাহন গর্ভদ্বার দিকে চোখ আটকে গেল বলরামের। এমন গাধা তিনি এদিকদলের ধোপাপাড়ায় দেখেননি। স্বর্গীয় গাধার ব্যাপারই আলাদা। গাধা — কিন্তু একে ঘোড়া বলেও চালাতো যায়। তার গণনভেদী নাদে দুই নাসারক্ত থেকে যেন আঙনের ফুলকি নির্গত হচ্ছে। দুটি কান আশ্চর্যভাবে ঝাড়া। মহিমাময়ী শীতলা বামহাতে আলগাভাবে গর্ভভর লাগাম ধরে আছেন — ডানহাতের তর্জনী যেন ছায়াপথের নক্ষত্র মণ্ডলীকে ষোটিয়ে একজায়গায় করতে উদ্ভাত। এসব ছাড়িয়ে বলরামের যেটি নজরে পড়ে সেটি গর্ভবাহনের উচ্ছ্রিত লিঙ্গ — রক্তাভ, ভেদসিক্ত — উর্ধ্বমুখ উন্মুক্ত বল্লম যেন বা।

এরপর যা হওয়ার তাহাই হয়েছিল। বৈশাখেই রামগোপালের প্রথমা কন্যা মেনকাকার পাণিগ্রহণ করেছিল বলরাম ভট্টাচার্য, সম্পূর্ণ কুলীনকুলবিধি মেনে। প্রথমা স্ত্রীর অপযাচ মৃত্যুতে এক বছরের কালাশৌচ সম্পূর্ণ বিধান দিয়েছিলেন নবদ্বীপের শ্রী বীরমানন্দ সরস্বতী। শোনা যায় — সাতবছর কঠোর বাণপ্রস্থর পর রামগোপালের কন্যা মেনকাকে প্রথম দেখার পর তার রেতঃস্থলন হয়েছিল। তখন বিরামানন্দ প্রায় অন্তর্জলি যাত্রার পথে। গঙ্গাযাত্রার পথে ওইটিই বিরামানন্দর শেষ বিধান ছিল। ফাল্গুনে রামগোপাল কালনাথ সেই কন্যাটির দায়গ্রহ কুলীনা পিতাকে দায়মুক্ত করার জন্য দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন। মাতা বা প্রতিশ্রুতিমত মা শীতলার মানতের পূজা হয়েছিল সে বছরের শেষে চৈত্র সংক্রান্তিতে।

(৪)

কালীতলা বালক সংঘের সাধারণ সম্পাদক জীবনকৃষ্ণ পাল তার ঠাকুরদাদার বাবা সম্পর্কিত যেটুকু গল্পভ্রম পেয়েছিল — তা তার আপন ঠাকুরদার মুখ থেকেই। জীবনকৃষ্ণর পিতা হরেকৃষ্ণ পাল, তস্যা পিতা রাধাকৃষ্ণ পাল — আর রাধাকৃষ্ণের পিতা ছিল বটকৃষ্ণ পাল।

শাস্ত্রীয় মতে মূর্তি তৈরির ব্যাপারে বটকৃষ্ণর নাম ডাক ছিল। ঠাকুরদা বলেছিলেন, এখন তো চলি উঠে গেছে। মাটির মূর্তি হলে হবে কী — তার মাপজোখ একেবারে নিয়মে বাঁধা। কপালের বিস্তার যদি এক বিঘৎ তবে টিকলে। নাকটি হবে চার খেনে চার খেনে চার আঙুল



বড়জোড়। আঙুলের মাপ হাতের মাপ, মূর্তির যাবতীয় সব ছিল ওই হিসেবের মধ্যে বীধা। একলা এদিক ওদিক হওয়ার ভোগ নেই।

দুদিন বাদেই পূজো — কী যে দুর্মতি হল আমার বাপের, ভরসাক্কেবোলায় দোমেট্ট শেষ করে হাত ধুয়ে ফেলেছিলেন। একটু তফাতে এসে পড়তো পড় — নভর গিয়ে পড়ল গাধার ইয়ের ওপর।

নয় কিংবা দশ বছর বয়স তখন জীবনকৃষ্ণর। কিন্তু এখনও স্পষ্ট সব মনে আছে — চলা ইজেরের মধ্য দিয়ে হাত চালিয়ে, খপ করে তার পুরুষাঙ্গ চেপে থাকে ঠাকুরদা বলেছিল, গাধার এই শুকুটার ওপর।

জীবনকৃষ্ণ বলেছিল যাঃ তাও আবার হয় নাকি! ঠাকুরদা বলেছিল ওই যে বললাম সব মাপে বীধা। অমন জবরদস্ত গাধা — মা শীতলার বাহন, সে তো আর আমাদের তল্লাটের হাড় জিরজিরে খোপার গাধা হতে পারে না। বড় বড় করে শ্বাস নিচ্ছে — নাকের পাটা ফুলে উঠেছে, নাক দিয়ে যেন আঙন ঠিকরে বেরোচ্ছে। দুটো কান বাড়ি, আকাশমুখো, পায়ের খুরে ধূলা উড়ছে, মহামারীর পথের ধূলা। সামনে থেকে দ্যাখ — দাবনার পেশি ফেটে বেরোচ্ছে — উক্কত ঘাড়। এমন গাধার শুকুটিও তো মানানসই হতে হবে। আঙল দিয়ে মাপছেন — বাঁশের চাটড় দিয়ে মাপছেন, একবার মাপছেন, একবার পিঠিয়ে সরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। হঠাৎই প্রতিমার পেছন দিকে আবছা অন্ধকারে বলরাম ভট্টাচার্যর বাগানের গাণবাগছতলা থেকে খিলখিল করে হাসি। বাপ তাকালেন, শুধু অস্পষ্ট ছায়া একটা, বাপ নিশ্চিত বুঝেছিলেন, মোয়েমানুষ।

জীবনকৃষ্ণ বড় বড় চোখ করে বলেছিল পরী? ঠাকুরদা বললেন, গাধা কোথাকার। জীবনকৃষ্ণ এই গল্পের শেষ অংশটি ঠাকুরদাকে অনেক, অনেকবার, “তারপর কী হল বলি না ঠাকুরবাপ” জিজ্ঞেস করেও পড়েছে পারে নি। আসলে সবটুকু জানার হয়াত বয়স বহন তখনও জীবনকৃষ্ণর। জেনেছিল আরও বছর সাত পরে — তখন জীবনকৃষ্ণের শয়নে, দগ্ধে জাগরণে, প্রতিমা।

কো এডুকেশন ইন্সট্রলার ক্লাস টেনের ছাত্রী, সহপাঠিনী। শীতলাপূজো নয়, সরস্বতীপূজো, শীতের সকালের সোনালি রোদ এসে পড়েছে পূজো মণ্ডপের সামনের চত্বরে। বাসতীরঙা শাড়ি আর ব্রাউজের সোনালি রঙ নিমেষে আরও গাঢ় হয়। জীবনকৃষ্ণ প্রতিমাকে আবিষ্কার করে। ঠাকুরদা, তখন বিধবা পইপই করে বলেছিল, বামুনের ঘরের মোয়ে, ওদিকে তাকাননা।

জীবনকৃষ্ণ বলেছিল, না তাকিয়ে আমি পারছি না, আমি তো ঘোষ বৃজে প্রতিমাকেই দেখি। আমি ওকে বিয়ে করব ঠাকুরদা। তুমি বাবা মাকে বল। আর যদি তুমি কিছুই না কর — প্রতিমাকে নিয়ে আমি পালিয়ে যাব।

প্রতিমার সঙ্গে বস্তুতঃ জীবনকৃষ্ণর প্রেম ওই চোখাচোখি পর্যন্ত। একটা প্রেমপ্রবের সবড়া করতে গিয়ে কালযাম ছুটে গেল জীবনকৃষ্ণর। একা, একাভে — বনে বাদড়ে অভিমান দগ্ধে বিভোর জীবনকৃষ্ণ শুধু ইন্দ্রিয়ের দরজায় করাতাঘ করে করে ক্রান্ত হয়ে পড়ল। তার চোয়ের কাছে কালি — গোটা মুখে বিনাম রাবার সুস্পষ্ট দুসর ছাপ।

সেসময়ই কোন এক সন্ধ্যায় ঠাকুরদাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আচ্ছা ঠাকুরা, ঠাকুরদার বাবা সেদিন কার পেছনে ছুটেছিল, শীতলা মূর্তির পিছনে গাণবাগছের দুয়ারে কী খিলখিল করে হেসেছিল — মেনকা? সেই যে বলরাম ভট্টাচার্য যাকে বিয়ে করবে কথা দিয়েছিল সে?

কাঁথায় সূঁচের ফাঁড় তুলতে তুলতে ঠাকুরদা মাথা নাড়ল। জীবনকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করেছিল, তারপর — তারপর কী হল ঠাকুরা।

ঠাকুরা বলল, আমার তখন বয়েস আট না-বছর। ওনারই এক জ্ঞাতি ভাই মাঝ-রাত্রির ইপাতে — ইপাতে এসে বললে, পালানো। কিছু একটা হয়েছে — রাতে আমাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেবে।

প্রাণ হাতে করে জলদী নদীর সোঁতা বেয়ে গঙ্গায় — তারপর ভাটীর চানে নৌকোয়। সকালে যখন রোদ উঠিউঠি তখন নামলাম আখাটায়, কোথায় এখন আর মনে নেই।

বয়সকালে জীবনকৃষ্ণ যখনই বুঝেছিল — তার ঠাকুরদার বাবা বটকৃষ্ণ সেদিন সন্ধ্যায় গাণবাগছতলায় যার অস্পষ্ট ছায়া দেখেছিলেন, যার অশরীরী খিলখিল হাসি শুনেছিলেন সে আর কেউ নয় বলরাম ভট্টাচার্যর দ্বিতীয় স্ত্রী — বাগদাতা মেনকা।

বলরাম ভট্টাচার্যর গায়েই তার দূর সম্পর্কের পিসার বাড়ি। দপাদিষ্ট বলরাম ভট্টাচার্য প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকতেই মেনকার পাণিগ্রহণে সম্মত হয়েছিলেন। তামা তুলসী হাতে নিয়ে মেনকার পিতৃদেহ কুলীনকুলতিলক সূর্যসাক্ষী রেখে অঙ্গীকার করেছিলেন, তার প্রথমা কন্যা মেনকাকে তিনি বলরাম ভট্টাচার্যর হাতেই, তুলে দেবেন। মানতের পূজো শেষ না করে বলরাম বিয়ের রিতিতে বসতে চান নি। দেবীর রোষে ঘোড়শ্রী মেনকাও যদি বসন্ত রোগে অক্রান্ত হয়, এমন একটা আশঙ্কা ছিল সম্ভবতঃ। প্রথমা স্ত্রী মানদা যথেষ্ট পতিপ্রাণা ছিলেন, নিষ্ঠাবতী হিন্দু এয়েজী হিসেবে তিনি যথার্থই ব্রাহ্মণী। নেহাৎই অদৃষ্ট রামগোপালের, হবু শ্বশুরকে বলরাম বলেছিলেন, না হলে তিরিশ বছরের দাম্পত্যে অমন নিষ্ঠাবতীর গর্ভাধান হয় না। দু দ্বারার যা হয় মনে হল — সে তো গর্ভভার। প্রথমা স্ত্রী জীবিত থাকলে আর দ্বিতীয়া নয়, এমন একটা আদর্শ ভাবনা, বলরামের মধ্যে যে ছিল না তায়, কিন্তু একদিনই শান্তিপূরের এক যজমান বাড়ি থেকে ফেরার পরে রামগোপালের বাড়ির সামনের সড়ক পার্শ্বের সপথে কন্যাকে দেখেছিলেন, সিঁড়বসনা এক কিশোরীকে, লক্ষ্মীপায়ের জলভেজা ছাপ ফেলে ফেলে পরমাসুন্দরী কন্যা পুরুষিণীর ঘাট থেকে রাস্তা পার হয়ে আলের পথ ধরলো। ছোট্ট একটা মাঠের ওপারেই বামনপাড়, রামগোপালের পৈতৃক ভিটে। কোথা দিয়ে যে কী ঘটে যায় মানুষের ভাগ্যে। সময়ের তাপে দুটো বছর গলে গেছে। প্রথমা স্ত্রী মানদার দুটো চোখই কাল বসন্তে গলে গেল, মানদা অন্ধ হয়ে গেল। রাগামাধবের ধ্যানে প্রাণায়ামে সেই সিঁড় বসনার বয়সও দুবছর বেড়ে গেছে — অশ্রুতে বলরাম ভট্টাচার্য ঘুমের আচ্ছন্নতার মধ্যেও বলে উঠতেন রাহিকিশোরী।

ভর দূপ্তে শীতলার গর্দভবাহিনী যে মাড়ুমূর্তি দেখলেন, তা যে ওই রাহি-কিশোরীর, এটা আশীর্বাদের দিন কন্যার মুখ দেখে প্রত্যয় হল।

(৫)

অন্ধ মানদা কী ভাবে উঠাঠোনের এককোণে খড়ের চেনা দেওয়া টোলের দাওয়া পেরিয়ে নিমগাছের সাত আট হাত উঁচু ডালটি পর্যন্ত পৌছতে পেরেছিল এবং পরনের শাড়ির ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়েছিল — বলরাম অনেক ভেবেও তার কিয়ার করে উঠতে পারে না। হাজার হলেও অপঘাত মৃত্যু তো বটে। মানদা প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়েছে। রামগোপালের মোয়েকে ঘরে আনার অজ্ঞা মানদার পুত্রের একটা বাবুনা না করে পালায়ে বধি পাঠিয়েছেন না। কিন্তু গয়ায় গিয়ে পিণ্ডদান সে কী সোজা ব্যাপার। মৃত্যিশাস্ত্রে এর বিধান আছে কি না



জানার জন্যই — তার নবম্বীরে ভুবনবিখ্যাত পণ্ডিত বিরামানন্দ সরস্বতীর কাছে যাওয়া। আর ওই সুযোগে মেনকার লক্ষণ বিচার করিয়ে নেওয়াও বলরাম ভট্টাচার্য্যর আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল।

বিরামানন্দর অর্ধেক শরীর তখন জলে, অর্ধেক ভাসায়। ঘড়ঘড় শব্দে বিরামানন্দ নিঃশ্বাস টানছেন, হাপারের মত তার পাঁজরসর্ব্বথ বুক ওঠানামা করছে — প্রবল নামসংকীর্ণন চলছে। মেনকা জলে নেমে বিরামানন্দর পাদস্পর্শ করেন। বিরামানন্দ চোখ মেলে তাকালে, নিম্পলক তাকিয়ে রইলেন মেনকার দিকে। ভাতা চোয়ালে মৃদু কুশির একটা টোল পড়ল যেন। বলরাম কানের কাছে মুখ নিয়ে বিধান চাইছিলেন, বিরামানন্দর কিছুই কানে যাচ্ছিল না। কিন্তু রোড়শীর আঙুলের স্পর্শে বিরামানন্দর চোয়ালভাড়া ফোকালা মুখে যে নিঃশব্দ খুশি ছড়িয়ে পড়ল, বলরাম ভট্টাচার্য্য তার মধ্যেই স্থিতির বিন্যাসের সুস্পষ্ট বিধান দেখলেন।

ওই রাইকিশোরীর স্পর্শে কিনা বলা শব্দ, স্মার্ত বিরামানন্দ সরস্বতী প্রথম চৈত্রের ঝড় জল উপেক্ষা করে আরও সাতদিন বেঁচে ছিলেন। দুর্জনরা বলে, রমণীর স্পর্শে অন্তর্জলি যাত্রার সময়ে বিরামানন্দর যৌন উত্তেজনা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা গেছে।

তো গাবগাছতলায় সেই নারীশরীরের ছায়া, সেই আর্পাখিব হাসি যে রামগোপালের প্রথমা কন্যা, মেনকারই কার্যকারণ সূত্রে তা সহজেই নির্ণয় করা যায়।

রামগোপাল তো প্রথমা কন্যার বিয়ের ব্যবস্থা করে শেষ ফাশুনে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করলেন, পুত্রার্থে। রাগে, ক্ষোভে, আর খানিকটা কৌতুহলবশেই মেনকা এসে উঠল বিধবা জ্ঞাতি পিসীর ভিট্টে। নিত্য রাধামাধবের পজো আছে — মাঝেমাঝে নবদ্বীপে গঙ্গান্নান আছে, নেই নেই করে পিসীর বিধে পাঁচকে সালি জমি আছে — দুই ছেলেই কৃষনগরের মহারাজের সেরেস্তায় খাটা লেখে। বলরাম ভট্টাচার্য্যকে ইতিমধ্যে বেশ কবার দেখেছে মেনকা। ভ্রমসন্ধ্যাবেলায় নিমগাছটার দিকে তাকালে গা ছমছম করতে মেনকার। প্রত্যেকদিন প্রাপ্ত সপত্নীকে যেন সারাবাড়িতে, উঠানে আবছা দেখতে পেত মেনকা, — অনুভব করত। এরই ফাঁকে দিন পনের ধরে বটকুফর সঙ্গে টুকরো টাকরা দুচারটে কথাবার্তা হয়ে থাকলেও, থাকতে পারে। টোলের দু একজন পোড়ো নাকি দেখেছেও, তবে বলরাম ভট্টাচার্য্য এসবের বিদূর্বিসর্গও টের পাননি। নেহাথৈ সঙ্গে উল্লসে গেলেনও, মেনকা যখন ঘরে ফিরল না, টোকো গঙ্গাজল পড়ল না — তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বলল না, শাখো ফুঁ পড়ল না তখনই পিসীর টনক নড়ল। মেনকা মেনকা করে তার আঙা টাংকরা অনেকেই কানে গিয়েছিল। ঘরে দুই ছেলেরা বৌরা, নতি-পুতি কেউ নেই — মেনকা ঠাকুরবি এসেছে বলে, দুজনই গেছে বাপের বাড়ি। ভরমেন চড়ক পুজো, শিবগঞ্জে কিংবা কুষ্টিয়ার মেহেরপুর, দুজায়গাতেই বিরাট গাজনের মেলা বসে।

রামগোপালের মুখে পিসী সবই শুনেছিলেন। একবার মনে হল শান্তিপুরের সেই সাহার পুত — কাপড়ের ব্যবসা করে দুটো টাকা করেছে, মেনকাকে শাড়িপূরে আলাদা ঘর করে রাখতে চেয়েছিল, পাঁচশ টাকা, বিশেষ দুয়েক দিলে দিয়ে চেয়েছিল — হয়ত সেই ফুসলিয়ে নিয়ে গেছে।

একেকবার বলরামের টোলের রোগাপাতলা ছোঁড়া সদানন্দর কথাও মনে হয়েছিল। টোলে যাতায়াতের পক্ষে কেমন চোখে যেন পিসীর বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকত। মেনকা আমার আগে তো তাকাত না — বাড়ির সামনে পাড়াত না। সদানন্দকে তার বাড়িতে পাওয়া গেল।

অনুমান নিম্পলক ঘটনাও ঘট। প্রমাণ হিসেবে প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে অনুমান বা পরোক্ষ প্রমাণের চেয়েও প্রকট, মহতর সত্য, রক্তহৃত সর্পলম, রক্তহৃত স্ববির — দুই হাতে তালি দাও সর্পিল গতিতে সাপ তোমার পথ ছেড়ে দেবে — ন্যায়শাস্ত্রে তো এমনই বলেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলরাম ভট্টাচার্য্য মেনকাকে ফুলশয্যার রাত্রিতে একথাই বলেছিলেন। আপোমুখ মেনকা সে রাত্রিতে মুখ ভুলে বলরামের গুপের দিকে তাকাতো পারেনি।

পিসীর চিংকার টোমেচিত্তে শুধু বামনপাড়া নয়, মালোপাড়া, কয়েতপাড়া এমনকি নিকারী মুসলমান পাড়া থেকে কচি কাঁচা জোয়ানবুড়ো সব পথে বেরিয়ে পড়ে। এক ক্রোশ বিদ্রুত পথ ঘাট তোলপাড় — কিরির ডাক তাঁর থেকে তীব্রতর হয়। তেলে ভেজানো মশালের ওপর লক্ষ লক্ষ জনাকি সোঁপিয়ে পড়ে।

জলদীর শুকনো ঝাঁপের আশেপাশে শিয়ালরা জমা হয় ফুটিক্ষেতে — ফুটির ভারি গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে থাকে। শিয়ালেরা ডাকতে ভুলে যায়।

(৬)

রাত্রির প্রথম প্রহর শেষ হওয়ার আগেই বটকুফর আর মেনকা প্রায় চোরের মতই ধরা পড়ে, অর্ধগন্ধ আলিঙ্গনাবদ্ধ — বলরাম ভট্টাচার্য্যেরই টোলের উত্তরদিকে খড়ের মাচানের নীচে।

বটকুফর পালাতে থাকে — তাড়া খাওয়া ভীত সন্ত্রস্ত জন্তুর মত পালাতে থাকে। স্থানীয় ভূগোল তার অজানা — শেষতম প্রতিবন্ধক বাঁশের ঝাঁপার আর রাঙচিতার বেড়া লাফিয়ে টপকে যাওয়ার সময়ই মোক্ষম কোপটি পড়ে। সেই মুহূর্তেই ঈশান কোণে তিনটি বিদ্রুতের ঝিলিক — কড়কড় শব্দে বাজ পড়ে। আঘাটায় দুটি তালগাছের মাথায় সহজেই আঙুন জ্বলে ওঠে। আর তারপরই শৌ শৌ শব্দে চৈত্রশেষে দিগন্তজোড়া মাঠে কালীবেশাণী। বটকুফর তার পায়ের ইট্টির নীচ থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত যেন একটা সুতোয় ঝুলতে থাকে। শেষপর্যন্ত কীভাবে বটকুফর বেঁচে ওঠে। এক শা হারিয়ে — একটা শিশুকাঠের ক্রান্তে ভর দিয়ে বেলডান্ডার উমোপাড়ায় — তার নিজের ভিটে, ছেলের ভিট্টে এসে দাঁড়ায় — অনুমানের বিষয়।

(৭)

কালীতলা বালক সংখের সাধারণ সম্পাদক জীবনকুফর পাল তার ঠাকুরদার বাবা সম্পর্কিত ইতি-উতি, টুকরো টাকরা যা জেনেছিল, শুনেছিল, সব জোড়া দিলে এমনই দাঁড়ায়। বটকুফর পাল উমোপাড়ার এই বাড়ির উঠানে শিশুকাঠের একটা ক্রান্তে ভর দিয়ে আছে, চোখ বুঁজে দেখতে পেত জীবনকুফর। এখন জীবনকুফর বয়স হয়েছে — নিজের স্ত্রী সংসার ছানাপোনা সবই হয়েছে। তবুও মাঝেমাঝে তার বিবাণী হয়ে যেতে ইচ্ছে হয়। কোনো কোনো নিজস্বীন রাতে তার প্রতিমার কথা মনে পড়ে। ইকুলের একক্লাসে সহপাঠিনী প্রতিমা। ঠাকুরমার কথা মনে পড়ে — পিরীত এমনই জিনিষ দায়ে, আমার শ্বশুরমশাই তো বিবাণীই হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। ওই কাঠের পায়ের ভর দিয়ে বেলডান্ডা থেকে কখনও চলে যেত ভগবানগোলা, ফরাঙ্কা, কখনও নবদ্বীপ শান্তিপুুর। মেনকার মত মেয়েছেলে তো ঘর করার মেয়েছেলে নয়। বলরাম ভট্টাচার্য্য, পুরোহিত মশাই এত কাণ্ডের পর চৈত্রসংক্রান্তিতে শীতলা পুজোর পরপরই মেনকাকে বিয়ে করেছিলেন — গ্রামের লোকেরা, গোটা বামন সমাজ বলরাম ভট্টাচার্য্যকে একদমের করে জীবনকুফর। মেনকার কথা কী আর বলব, একমাস পেরোতে না পেরোতেই সে আবার কার না কার হাত ধরে দেশ গাঁ ছেড়ে পালাল।



তো আমার শব্দরমশাইয়ের তখন শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ। রাজরোগ গুণেছিল তার — হবে না, অত বড় একটা শরীরের আধাখানা না হয় রক্তমাংসের পায়ের ওপর তৈলে — বাকি আধাখানা তো কাঠের পায়ের ওপর। সেসময় শান্তিপুর রাসের মেলায় একবার মেনকার সঙ্গে বোধহয় তার দেখা হয়েছিল। সেই একবারই দেখা — শেষেদ্যা — শিশুকাঠের ক্রাচ বগলে নিয়ে কোনামতে এয়েছিলেন শান্তিপুর থেকে মালবোঝাই নৌকো চেপে। কোন আখাটায় নেমেছিলেন কে জানে। তখনও জোয়ার ভাঁটা খেলত গঙ্গার যে সোঁতাটা উমোপাড়ার গা ঘেঁষে এককোশ দূরে গিয়ে গঙ্গায় মিলেছে — সেখানও জোয়ার ভাঁটা টের পাওয়া যেত। মানুষটা যে ওই কালানন্দীর সোঁতায় এসে মুখ গুঁজরে মরে পড়ে থাকবে, কে জানবে বল বাছা? নেহাৎ এটেল মাটির কায়দা একবার ঢুকে, কেতেরানদের ক্রাশকারী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল শিশুকাঠের ক্রাচটা, ঠাকুরমা বলেছিল জীবনকৃষ্ণকে — সব গুণগোলের মূলে ওই মিয়া ছেলে।

চ

প্রতিমাকে নিয়েও গুণগোল বাধল। গোটা বেলডাঙ্গা থানা তোলপাড়। কর্দন কেটে গেছে তারপর। তখন কি এত পাটি পলিটিশ ছিল — সবে ইণ্ডিয়া-পাকিস্তান যুদ্ধ শেষ হয়েছে। শহরে শহরে নিষ্প্রদীপ অন্ধকারের মহড়া তখনও লসছে — প্রতিমা পালাল। আর কাউকে নিয়ে নয় — নিকারীপাড়ার গৌর শেখের হাত ধরে সে ডেমকালের বাসে উঠেছিল বেলডাঙ্গার বাস স্টপেজ থেকে। বোরখা পরা প্রতিমাকে রাত নটার বাসে চেনা যে কারও পক্ষেই দুঃসাধ্য ছিল। তবুও কী করে যে রাতেভোর হতেই উমোপাড়া, কায়তপাড়া থেকে মালোপাড়া, নিকারীপাড়া, গোটা বেলডাঙ্গা থানা জুড়ে রটে গেল হিঁদুর মেয়ে ভাগিয়ে নেয়া গেছে নিকারীপাড়ার গৌর শেখ। ডেমকাল থেকে কয়েক ক্রেশ পায়ে হেঁটে তারা কোথায় কোথায়? পূর্ব পাকিস্তানের কোন্ অজ্ঞাত প্রান্তে? কলমা পড়ে প্রতিমা যেন ফতিমা হয়ে গেল জীবনকৃষ্ণ মনে করতে পারে না। দুঃস্বপ্নবাদ কানদের মুখে চাউড় হয়।

ছেয়টির প্রথম দিক। হায়া বসন্তে দূরে ভাগীরথীর সোঁতায় এক ভাঁটির টান দিনমান লেগে থাকে। সদায়া এক অবসর বিবলতা গোটা উমোপাড়া বেলডাঙ্গাকে ঘিরে রাখে। জীবনকৃষ্ণের বয়ঃসন্ধিতে সেই বিবলতা বড় ভার হয়ে নিরালস্য ঝুলে থাকে।

উনিশশো ছেয়টির এগারই মার্চ উমোপাড়ার দাসা লাগে। নিহত তিন — আহত সতের। সংবাদপত্রে যাতে ধর্মনিরপেক্ষতা যথায় রাখে, এমত নির্দেশ ছিল। সুতরাং ঘটনার বিবরণ থেকে বুঝে নিতে হয় দাসায় নিহত তিনজনের কয়জন হিন্দু — কয়জন মুসলমান, নিতান্তই পরোক্ষ প্রমাণে, অনুমানে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলে, কেরোসিন তেলে চোবানো গোটা সাতেক মশাল জ্বালিয়ে জীবন — হ্যা জীবনকৃষ্ণই ছিল (হেট একটা জমায়েতের সামনে। প্রথম আঙুন লাগে গৌর শেখের খড়ের আটচালায়। নিকারীপাড়া থেকে আঙুন ক্রমে দাবানলের রূপ নেয় — গোটা বেলডাঙ্গা জ্বলতে থাকে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সেই মহাযজ্ঞের একপাশে নুরুল চৌধুরীর উত্থান, অন্যদিকে জীবনকৃষ্ণ পালেন।

জীবনকৃষ্ণ পাল মাটি ছানার কাছ ইন্দুল জীবনেই ছেড়ে দিয়েছিল। এখন সে মানুষ ছানতে শুরু করল এবং অবিলম্বে বামপন্থী হল। উমোপাড়ার বালক সংখ্য থেকে শুরু করে উমোপাড়া জুনিয়র হাইস্কুল পড়তে সর্বত্রই কাকবর্ধী সম্প্রদায়ের চোয়ার ভাঙল করার পথ কুসুমাদুর্ভাগ্য ছিল না মোটেই। অজয় প্রান্তর, কটকাকীর্ণ পথ পেরিয়ে জীবনকৃষ্ণ যেখানে সোঁছাল সেখান সে এক

ঘোরতম গ্রামীণ সংঘর্ষের, শ্রেণী বা জাত-পাত সংঘর্ষের বৃত্তান্ত। আসলে দেশভাগের সময় যে দাসা হয়েছিল, তার তুলনায় উমোপাড়ার এই দাঙ্গার ব্যাপ্তি কম হলেও, এটা থেকে গেল — এই দাঙ্গার বীজ, কখনও জমি দখলের লড়াইয়ে, কখনও বেলডাঙ্গা বাজারে তোলা তোলবার ব্যাপারে কেন্দ্রাতিগ করে শক্তি হিসেবে দাঙ্গার বীজ প্রায় চিরস্থায়ী থেকে গেল। নুরুল চৌধুরী কিংবা জীবনকৃষ্ণ এই দাঙ্গাকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হিসাবে দেখেনা। কারণ উনিশশো সাতসত্তির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দাঙ্গার বিষয়টা আর সাম্প্রদায়িক থাকে না।

সেসময়ই উমোপাড়ার বালক সংখের বারোহাত কালী সম্পর্কে একটা রাজনৈতিক সমাধান সূত্র খুঁজে বের করার তাগিদ দেখা দেয়।

আসলে মা কালীর উচ্চতার সঙ্গে আনুপাতিক হারে তাভিয়ার উচ্চতা বেড়েছে। স্থানীয় ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার এর মধ্যে এক গুচ সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পেলেও, উনিশশো সাতসত্তিতে তিনি বলেছিলেন, ক্লাস ক্যারেকটারটা দেখুন — গরীব ভূমিহীন মুসলমান নিকারী সম্প্রদায়ের লোকেরা যদি মরহমের তাভিয়ার হাট দুহাত বাড়িয়ে দেয়, সোঁটা কী কেবল কমানাল পয়েন্ট থেকে দেখা ঠিক। ওই তাভিয়ার উচ্চতাহেই নিপীড়িত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ দেখতে হবে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আনতে হবে। ব্লক অফিসারটা যে অতীব প্রগতিশীল এটা তার অতিবড় মূলোচ্চক, বেলডাঙ্গা সমচার্য কিংবা মুরশিদাবাদ বার্তাদুট্ট কাগজই স্বীকার করে। কালীর উচ্চতা এবং তাভিয়ার উচ্চতা ধর্মীয় অন্ধতাকে এই প্রগতিশীল ভাবনার আড়ালে রেখে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে। শশানতলার একশো বছরের পুরনো বটগাছের ডালে তাভিয়ার চড়ে আটকে গেলে ওই সাভয়িত্তিতে বটগাছের ডাল কাটা নিয়ে নড়ুন দাঙ্গা দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। তাভিয়া এক হাত ছোঁতো হলে, কালী প্রতিমাকেও এক হাত ছোট হতে হবে — এমন একটা জেদের লড়াই আবার রাজনৈতিক মাত্রা পায় এবং প্রায় সত্তর সাল পর্যন্ত কখনও তা সাম্প্রদায়িক, কখনও রাজনৈতিক শ্রেণী সংঘর্ষের রূপ নেয়। উমোপাড়া বালক সংখের বারোহাত কালীমূর্তি এবং নামোপাড়া অথবা নিকারীপাড়ায় তাভিয়ার বিশ ফুট উচ্চতাই প্রতিবর্ষী সময়ের এতমঞ্চলের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বিক বিকাশের মূলসূত্র হিসেবে গণ্য হলেও প্রতীমা-জীবনকৃষ্ণের কিশোর প্রেম একদিকে অন্যদিকে ফতিমা - গৌর শেখের পূর্ব পাকিস্তানের সংসার — এই দুয়ের দ্বন্দ্বও দীর্ঘকাল বেলডাঙ্গা সমচার্য বা বহরমপুর বাতায় জেগে থাকে।

বেলডাঙ্গা সমচার্য লিখল প্রতিমাকে কি হাজারদুয়ারি বা সৈদ্যদর্পে দেখা গেছে? খবরে প্রকাশ, গৌর শেখ, অজ্ঞাত পরিচয় অন্য এক মুসলমান যুবকের সঙ্গে উমোপাড়ার প্রতিমা, বর্তমানে সন্তুভবৎ ফতিমা বিবিকে হাজারদুয়ারি চত্বরে দেখা গিয়েছে। বহরমপুর বার্তা লিখল, প্রতিমা নিখোঁজ হয়েছে, আজ তিনবছর। অকর্মণ্য পুলিশ ও প্রশাসন এখনও তাকে খুঁজে পাওয়ার কোনো ব্যবস্থাই নেয় নি। শুধু তাই নয় প্রতিমা জীবিত না মৃত সে সম্পর্কেও কোনো খবর নেই।

জীবনকৃষ্ণের সমাজবিরোধী ও জননেতা হওয়া অনিবার্য ছিল — নুরুল চৌধুরী জীবনের চেয়েও বছর দশকের বড়, চুরি ভাকাতি ছাড়াও, আরববন্দে মেয়ে পাচারের অপরাধে সে বিভিন্ন সময়ে ধরাও পড়ছে, আইনানুগ জামিনও পেয়েছে — নতুন অপরাধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের আগেই নুরুল চৌধুরী ও জীবনের এলাকা বিস্তৃত ও নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বেলডাঙ্গা থেকে পলাশী পনসু হাইওয়ে জীবনের জিম্মায়, আর বেলডাঙ্গা



থেকে প্রায় বহরমপুর শহরের সীমান্ত থেকে প্রায় বহরমপুর শহরের সীমান্ত পর্যন্ত নুরুল চৌধুরীর এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল।

শ্রীশ্রী পরিচয়ে ডুমিহীন গৌর শেখ ছিল নুরুল চৌধুরীর ভাগনে — আপন যুফাত দিদির ছোট ছেলে। চাষবাস গৌর শেখের বড় একটা আসত না। নুরুল চৌধুরী তাকে ধানভানা কলে হিসেব রাখার কাজ দিয়েছিল রোজ মজুরীতে। রোজ এককিলো চাল, পাঁচটা করে টাকা। ধান ভানার কাজের বাইরে আলকাপের দলে গান বাঁধত। চলতি বাংলা বা হিন্দি গানের সুরে সেসব গানে সুর দিত। তার গলার সঙ্গে আখতারি বাই বা বেগম আখতারের গলার খুব মিল ছিল লোকের বলত। চলনে বলনে খানিকটা মেয়েলি ভাবও তার মনে অনেকই লক্ষ করে থাকবে। একবার কলকাতায় গিয়ে পড়তে পারলে গৌর যে একজন নামীদামী গায়ক হবে, মসজিদের খোদ মৌলবী সৈয়দ হরকতউল্লাহ নিজে একদিন সন্ধ্যার আজান শেষে মন্তব্য করেছিল।

গৌরের মেয়েলি চেহারা তার সম্পর্কিত মামা নুরুল চৌধুরীকেও টানত। তার বড়দিদির ওপর তো একসময় নুরুল চৌধুরীর নজর পড়েছিল। তর দিদিরে না পাই তরে তো পেইছি, বলে নুরুল চৌধুরী একদিন ভরদুপুরে গৌরের লুঙ্গির বকি ধরে টান দিয়েছিল। তিনদিন গৌর ভাল করে ইঁটতে পারেনি। সেই গৌর শেখ প্রতিমাকে কলমা পড়িয়ে ফতিমা করল, তাকে বিয়ে করল — কীভাবে জীবনকৃষ্ণ আজও তার থই পায় না। বিয়ে হওয়ার আগে পর্যন্ত পলাশী পর্যন্ত বিস্তৃত তার জমিদারীতে পাঁচ বা দশ টাকার নেট দেখিয়ে জীবনকৃষ্ণ অনেক কিশোরী, বিবাহিত যুবতীকে ধানক্ষেত, পাটক্ষেতে চেনে নিয়ে গিয়েছে — ধর্মনিরপেক্ষভাবে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে। বন্ধুবান্ধবের সে বলত, মিয়াহেলের আবার জাত হয় কি? ওদের জাত তো শরীলে।

নুরুল চৌধুরীর এম.এল.এ হওয়া অথবা জীবনকৃষ্ণর জুনিয়র হাইস্কুলের সাধারণ সম্পাদক হওয়া ক্ষমতা দখলের একই রাস্তা ধরে।

(৯)

ইতিহাস ভিন্ন রাস্তায় মোড় নিলে পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ হয়। সেসময় সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় হিন্দু-মুসলমান মেত্রী এক স্বর্গীয় রূপ য়ে, শ্রীশ্রী বা সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব অস্ত্রতঃ উমাপাড়া, নামোপাড়ায় কিছুকাল স্থগিত থাকে। বারোহাত কালীপ্রতিমা সে বছরের দশহাতে নেমে আসে। তাজিয়াও এমন হয়, যাতে তার চূড়া শশানতলার পবিত্র বটগাছ না স্পর্শ করে।

বাহাতর সালের জুন মাসে গৌর শেখ ফিরে আসে। একটা কাঠের পায়ের ভর করে সে উমাপাড়া বালক সংঘের উঠানে এসে দাঁড়ায়।

খবর পেয়ে জীবনকৃষ্ণ তার সর্বকল্পের সঙ্গী পিস্তলটা নিয়ে ছুটে যায়। কিন্তু ওই পর্যন্তই, একটা কাঠের পায়ের ভর দেওয়া গৌর শেখকে দেখে সে চিত্তার্পিত, দাঁড়িয়ে যায়। কি চেহারা হয়েছে গৌরের, একমুখা চুল দাড়ি, গায়ে তাল্পি দেওয়া খাকি সার্ট — পরনের লুঙ্গিটা প্রায় শতচ্ছিন্ন, ডান পায়ের ইটের নীচ থেকে শূন্যস্থানে নীল শব্দ মেরুন ডোরার ছেঁড়াখোঁড়া লুঙ্গিটা হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে। ডান বগলে ক্রাচ।

মুক্তিযুদ্ধে গৌরের সংগ্রামী ভূমিকা নিয়ে কয়েকদিন গোটা বেলডাঙ্গা গরম হয়ে থাকল — নুরুল চৌধুরী, জীবনকৃষ্ণর বালক সংঘ যৌথভাবে সম্বন্ধীয়া দিল গৌর শেখকে। এরই

মায়ে জীবনকৃষ্ণ শুনল প্রতিমা বা ফতিমা আর নেই। শেষ যেটুকু গৌর শেখ জানে, তাতে করে সে জোর দিয়ে বলতে পারে না, ফতিমা বেঁচে আছে না মরে গেছে।

খান সেনাদের বিরাট একটা বাহিনী ঘিরে ফেলেছে। হাতিতলার দু-দুটো সাজেয়া গাড়ি। মাঝরাতে ফায়ারিং আরম্ভ হল। প্রাণ হাতে করে যে যেদিকে পারল পালান। কাছেই একটা ডোবায় গল্যা পর্যন্ত ডুবে ঘন চাপা অন্ধকার রাতে ফতিমাকে খুঁজতে চাইছিল গৌর শেখ। পরে যেটুকু লোকমুখে শোনা গেছে গুরু ছাগলের মত গ্রামেই তাবৎ কিশোরী, যুবতী কন্যাদের টানতে টানতে জলপাইরগা গাড়ির মধ্যে তুলে নিয়ে গেছে খান সেনারা — গন্তব্য কাছেই মফস্বল শহর করগদিঘীর সেনা ছাউনি।

(১০)

সমাজ রাজনীতির যে রাস্তা ধরে নুরুল চৌধুরী বা জীবনকৃষ্ণ ইঁটতে শুরু করেছিল — সে রাস্তার দখল নিয়েছে পরবর্তী প্রজন্ম। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাতাবিক নিয়মেই ঘটেছে — শ্রীশ্রীদ্বন্দ্ব হিসেবে সেটাকে বোঝাবার বা বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে। বাহাতরের বগদিঘীর জায়গায় সাতাত্তর সালের বগদিঘার এসেছে — সাতাত্তরের জায়গায় সাতাশির। গ্রামে রাস্তাঘাট হয়েছে — উমাপাড়ায় তিন-তিনটি টিউবওয়েল হয়েছে। জীবনকৃষ্ণর ছোটোভাই প্রাণকৃষ্ণ ভোটে দাঁড়িয়ে পঞ্চায়েত সমিতির সেক্সার হয়েছে। খুন, জবাম — রাহাজানি কোনো না কোনোভাবে থেকে গেছে।

নুরুল চৌধুরী গতবছর হজ সেরে এসে রাজনীতিই ছেড়ে দেবে বলেছে। জীবনও প্রায় পঁচিশ বছর আগলে রাখা বালক সংঘের সম্পাদক পদ ছেড়ে দেবার অঙ্গীকার করেছে। সেই হিসেবে উমাপাড়ার এই কালীপূজো, জীবনকৃষ্ণর মনেই আছে, বালক সংঘে তার শেষ কালী পূজো।

পালোদের কয়েকঘর যারা মূর্তি বানায় বলেছে তাদের রজি রোজগারের কথা। গ্রামের অকলাপের আশঙ্কাও কেউ কেউ প্রকাশ করেছে। জীবনকৃষ্ণ অনাড়ম্বর মূর্তি দু'হাত থেকে চার হাতের বেশি করা চলবে না। অনাড়ম্বর পূজো হবে এবার, দীপাবলীতে শুধু মাটির প্রদীপ জ্বলবে। গতবার আমরা পঁচছাড়ার এক টাকা মুখামস্তার ত্রাণ তহবিলে দিয়েছি। এবার কার্গিল ফাণ্ডে দেব।

প্রতিবছর আমরা কিছু না কিছু সমাজকল্যাণ করি বন্ধুগণ, এবারও করব। কার্যকরী সমিতির মিটিঙে জীবনকৃষ্ণ ঘোষণা করল, সম্পাদক হিসেবে ধরে নিন এটাই বালক সংঘে আমরা শেষ কালীপূজা। হলেই বা এবারের সাল অনেক পিছনে, হলেই বা যুদ্ধটা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ। আমাদের গ্রামের গৌর শেখ কি সেই যুদ্ধে লড়েনি। এবারের পূজোয় আমরা বোলডাঙ্গা থানা তো বটেই প্রাণপাশের আরও পাঁচটা থানার সমস্ত বিকলাঙ্গকে বয়স, জাতি ধর্মনির্বিশেষে কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে সহায়তা করব। যার হাত নেই তাকে হাত দেব — যার পা নেই তাকে কাঠের পা দেব।

সৈন্যি রাতে স্বপ্নে ঠাকুরদার বাবা বটকৃষ্ণ পালকে উঠেনের পাশে এসে দাঁড়াতে দেখল জীবনকৃষ্ণ। তাকে তো কোনোদিন চোখে দেখেনি জীবনকৃষ্ণ। তবু বাপের মুখের আদলে, আর শিশুকণ্ঠের ক্রোড়ে ভর দেওয়া মানুষটা যে বটকৃষ্ণ পালই, নিশ্চিত হতে এক লমহাও লাগে না জীবনকৃষ্ণর।

খুঁট খুঁট শব্দ তুলে স্বপ্নের আঁজিনায় কখন যে গৌর শেখ এসে দাঁড়িয়েছে জীবনকৃষ্ণ



বুঝতেও পারেনি।

এখন লালগোলা প্যাসেঞ্জারে পীরের গান গেয়ে ক্রাচ বগলে গৌর শেখ ভিক্ষে করে।  
সংসারে আর থিতু হতে চায়নি — মায়ে সীমানা পেরিয়ে বেশ কবার ঘুরে এসেছে বাংলাদেশে।  
হাত প্রতীমার সন্ধানে — অথবা এমনিই, আউল বাড়ল কখন কোথায় যায়, তার কী কোন  
ঠিক থাকে।

(১১)

নির্দিষ্ট দিনে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এলেন। নুরুল চৌধুরী এবং পাড়ার আরও  
আরও গণ্যমান্যরা এলেন। রাজস্থানের সেই ভুবন বিখ্যাত উৎপাদন কেন্দ্রে থেকে আর্টিফিসিয়াল  
লিফা বা কৃত্রিম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এসে গেছে। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে বেলডান্সা স্টেশন থেকে গৌর  
শেখকে ধরে আনা গেছে।

জীবনকৃষ্ণ সভাপতির চেয়ারের পাশেই বসেছিল। গৌর শেখকে দেখতে পেয়ে তার  
পাশে গেল — হাত ধরে তাকে তুলে নিয়ে এসে সামনের বেঞ্চিতে বসাল। আবেগে জনতা  
হৈ দিল — হাততালি দিল। বক্তৃতা চলছে, বালক সংঘের বার্ষিক বিবরণী পড়ে শোনাও পাঁচু  
শেখ, সমিতির সহ সম্পাদক, সম্পর্কে গৌর শেখের ভাইপো।

জীবনকৃষ্ণ নকল পা-টি তুলে আনল, গৌরের হাতে দিল — বলল, দাখ ফিট করে কিনা।  
তুমি তো মাপ দিতেই চাইছিলে না। কাঁচাপাকা গৌফ দাঁড়ির মধ্যে গৌরের বিষয় হাসি ফুটে  
উঠল। একজনের বক্তৃতা শেষ হল, এখন সভাপতি বলছেন। কার্গিলের কথা, ভারতের বীর  
সেনানীদের কথা, আজাদ হিন্দ ফৌজের কথা — গৌর শেখের কথা।

অস্থূটে গৌর বলল, জীবন এখন কী তাকে তোমার মনে পড়ে। হাঁটুর নীচে কৃত্রিম পাটা  
লাগিয়ে — দুটি আড়াআড়ি কোমর সমান বেস্ট বাঁধতে বাঁধতে জীবনকৃষ্ণ বলল, দুদিন  
প্রাকটিক কর — দেখবে তুমি কেমন স্বাভাবিক হাঁটতে পার।

গভীর স্নেহে, প্রায় তার শরীরের চামড়ার মত নরম কৃত্রিম পাটিতে হাত বোলাচ্ছিল  
গৌর। জীবনের কানের কাছে মুখ এনে বলল, চিমাটি কেটে দেখছি লাগে কিনা।

জীবন হেসে ফেলল, বলল — দুদিন বাদে তাও লাগবে।

গৌর শেখ বলল, ক্রাচটা, আমার কাঠের পা-টার কী হবে?

জীবন বলল, ওটা আমরা বালক সংঘের লাইব্রেরী ঘরে রেখে দেব তোমার স্মৃতি হিসেবে।

গৌর শেখের নাম ডাকা হল। কাঠের ক্রাচটা জীবনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াতে  
দাঁড়াতে গৌর বলল, যত্নমা যদি একবার দেখত, একবার এমন সুন্দর পায়ের হাত বুলিয়ে  
দিত। জীবনের কাঁধ খামচে উঠে দাঁড়াল গৌর শেখ, বলল, আমার এই পায়ের ও রক্ত চলাচল  
করত, যত্নতার স্পর্শে সুড়সুড়ি লাগত।

একটু দূরে দূরে গৌর শেখ সামনের দিকে, মস্তকের দিকে এগিয়ে গেল।

## আখ্যায়িকা

## ধনপতির সিংহলযাত্রা

রামকুমার মুখোপাধ্যায়

কনক পিতার নাম মাতা রামাদ্দ।  
বসতি গেলিয়া গ্রাম বাঁকুড়ার অঙ্গ।।  
বাস্তবদেবতা গৃহে শ্রীশ্রী সীতারাম।  
তঁাহারে স্মরণ করি রামকুমার নাম।।  
সম্প্রতি বাস মোর কলিকাতা নগরে।  
একদিন দূত এক এল মোর দ্বারে।।  
আখ্যান রচিতে হবে এই অনুরোধ।  
সম্মান-দক্ষিণা পাব দিয়াছেন প্রবোধ।।  
কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার।  
যথা যায় তথা সম্মান মাত্র সার।।  
মাতাপিতা আশীর্বাদে চণ্ডী আজ্ঞা দান।  
সম্পাদক ইচ্ছেয় রচি এ ক্ষুদ্র আখ্যান।।

ধনপতি সদাগর বড় লহনাকে নিয়ে ভালই ছিল। একদিন পায়রা ওড়াতে গিয়ে দেখে ফেলে খুল্লনাকে। তার রূপে মুগ্ধ হল সাধু। বিয়ে করে তুলল। দু-সতীনে ঋগড়া বাঁধে। একবার সদাগর যখন ভিন দেশে সদাগরের নামে মিথ্যা পত্র লিখে খুল্লনাকে বনে ছাগল চরাতে পাঠালো লহনা। বড়ই দুর্ভোগে কটল ছোট বউয়ের। বনের ভেতর মা চণ্ডীর দেখা পেল বলে মেয়েটার রক্ষে। না হলে চোর-ডাকাতে, বাঘ-সিংহে ছিড়ে যেতো।

সদাগর ফিরে এসে উচিৎ সাজা দিল লহনাকে। তার কদিন পরেই বাবার বাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিন। নানা জায়গা থেকে ভায়দ সদাগররা এল। কিন্তু তারা অন্নগ্রহণে রাজি হ'ল না। খুল্লনা বনে ছাগ চরিয়েছে তাই তার চরিত্র নিয়ে তাদের চিন্তা। শেষে হাজার পরীক্ষা দিতে হল তাকে। জ্বলন্ত গালাগৃহে ঢুকতে হল। মা চণ্ডী সব কিছু থেকেই তাকে বাঁচল। সদাগর মহাদেবের ভক্ত কিন্তু দু-চোখে দেখতে পারে না চণ্ডীকে। স্ত্রী-লিঙ্গ দেবতা পূজায় তার বড় আপত্তি। কে তাকে বোঝায় অভয়ার কল্যাণেই শত বিপদে খুল্লনা রক্ষা পায়। খুল্লনার গালাগৃহ পরীক্ষার পর জ্ঞাতি-বন্ধুদের বিদায় দিয়ে ধনপতি গেল রাজার কাছে। বিপদ সাগর থেকে উদ্ধার পেয়েছে, একবার রাজদর্শন দরকার। ভেট নিয়ে প্রভাতকালে রাজসভায় হাজির হল সাধু। তখন নরপতি পুরাণ শুনছিলেন।

|| ১ ||

পাঠকে পুরাণ কহে জোঠের মহিমা।  
জোঠেতে চন্দন দান সুকৃতির সীমা।।  
যেইজন চন্দনে করয়ে শিবপূজা।  
সপ্তধীনা অবনীতে সেই জন রাজা।।  
শিবের মন্দিরে যেবা করে শঙ্খধ্বনি।  
অভিপ্রায় বুঝি তারে তুঙ্গ শূলপানি।।



চামর ঢুলায় যেবা হরি সমিধানো।  
স্বর্ণলোকে যায় সেই চাপিয়া বিমানো।  
অখায়ন সমাধান দ্বিজে বাধে পৃথি।  
ভাণ্ডারি চন্দন আন, বলে নরপতি।।

ভাণ্ডারি দু-চারটে যা চন্দন কাঠ ছিল নিয়ে এল। তারপর করজোড়ে বলল—আর এক তোলাও নাই। না থাকারই কথা, নগরে যত সদাগর ছিল সবাই অবস্থা ফিরে গেছে। সবাই নিজ ধনে মত্ত। বিশ বছর আগে গত হয়েছে রমুপতি দত্ত। সে মরেছে, চন্দন কাঠ আনাও বন্ধ হয়েছে। শুধু কি চন্দন কাঠ, ভাণ্ডারের লবঙ্গ নাই। জোড়া জোড়া হাতি মরছে। সৈন্ধব লবণ বিহনে নিত্য জোড়া জোড়া মোড়া মরছে। শঙ্খ নাই, পূজাকালে দেবালয় নির্বাক। ভাণ্ডারে নীলা নাই, পান্না নাই, কস্তিপাথর নাই। সব বাড়ন্ত—মানিক, রক্ত প্রবাল, মতি, পলা। চামরগুলো পুরনো হতে হতে শিমূল তুলো মতোন ওড়ে। সূচিবস্ত্র, কঞ্চল, পশমি বস্ত্র, হস্তির আবরণ কোনো কিছু নাই নরপতি। শঙ্খের অলঙ্কারের অভাবে রামাগণ হাতে পিতলের অলঙ্কার পরছে।

ভাণ্ডারির কথা শুনে কিণ্ডু রাজা ধনপতিকে পানের খিলি দিতে যায়। ধনপতি মাঝ-দরিয়ায় পড়ে।

নৃপবরে ধনপতি করে নিবেদন।  
এবার সফরেতে পাঠাও অনাজন।  
এ সাত পুরুষ মোর গেল বৃহিতালে।  
সেই সব ডিঙা আছে ভ্রমরার জালে।।  
জলভেদি ডিঙা মোর হইল পুরাতন।  
যাইতে না পারি রাজা সিংহল পতন।।

পাত্রমিত্রবা বলে, সাধু বিবাদ করতে নাই। রাজার রাজত্ব থাকলে রাজার কথা মানতে হয়। সদাগর করজোড়ে দ-সতীনের মনোমালিন্যের কথা শোনায়। খুন্নার ছাগল চরানোর বৃত্তান্ত বলে। সাধু পানের খিলি নিতে চায় না। রাজার চোখ দুটি লাল বর্ণ ধারণ করে। নিক্রপায় সাধু পান নেয়। রাজার আপন শরীরের শালটি ধনপতির গায়ে চড়িয়ে দেন। চড়বার জন্যে ঘোড়া দেন। কবচ, প্রসাদ, অস্ত্র দেন। এক লক্ষ টাকা দেন। সাধু গৃহমুখে যাত্রা করে।

।। ২।।

সিংহলে যাইতে সাধু পায় অনুমতি।  
লহনা লোকের মুখে শুনিল ভারতী।।  
সূর্য্য মুখে হিয়া সূর্য্যে কহে মনের কথা।।  
বাঁজি চারি-পাঁচ ডাকি তাকে মনকাথা।।  
সিংহলে যাবেন সাধু সাজায়েছে ডিঙা।  
পাইকের কুল কুল ঘন বাজে শিঙা।।

লহনা নিজের দুখের কথা শোনায়। সাধুর সঙ্গে খুন্নার দেখা হলে চোখে চোখে হাজার

কথা হয়। তার চোখে চোখ পড়লে সাধু মাথা নামিয়ে ফেলে। নতুন বউয়ের সোহাগ-ধনের গর্বে সাধুর অহঙ্কারের সীমা নাই। তার দিকে ফিরেও তাকায় না। স্বামীর এমন অবহেলায় তার বুক দুখের সাগর বইছে। স্বামী ফিরে না তাকালে কিইবা থাকল আর। এখন শুধু দিনগত পাপক্ষয়।

লহনা বলে, সবই নজরে ছিল ভগবানের। তিনি আমার শোকতাপের সব দুশাই দেখেছেন। ঘরে বউ থাকতে আর একটি বউ এনে সংসারে তুলল। সোনা দিয়ে আমাকে ভুলাতে চাইল। স্বামীর সোহাগ আর সোনা একঃ আমার মনের কথা ভগবান জেনেছেন। তিনি দেখেছেন কচি বউয়ের চানে সদাগর কি হতছেদা না করছে আমাকে। শান্তিও দিলেন তাই। সুয়ো দুয়ো এবার সমান হল। রাজা চিরকাল বেঁচে থাকুন। ভগবান তাকে দিয়ে উচিত-কর্মই করিয়েছেন। ভগবান আর একটি কাজ করলেই আমার মন-বাসনা পূর্ণ হবে।

তোমার চরণে দুর্গা মাগি এই বর।  
পুনরপি সাধু যেন না-আইলে ঘর।।  
এই বর মাগি দুর্গা তোমার চরণ।  
দ্বাদশ বৎসর কর সাধুর বন্ধন।।  
জীয়ন্ত পতিতে যার কিছু নাহি সূখ।  
যে-জন মরিলে তার কিবা হয় দুখ।।  
হেলন সেলন তার কে সহিতে পারে।  
ভালো হইল যাবে সাধু সিংহল নগরে।।  
উহার হাতে রাস্তা শীখা ওই বরণে গৌরী।  
ওই সে জানে স্ত্রীর কলা মোহন চাতুরী।।  
হাতে পান মুখে গুয়া ফিরে পাটি পাটি।  
পাড়াপড়শি বলে জাতি না রাখিবে টাটি।।  
নিষেধ না মানে ঝুড়ি না মানে দোহাই।  
ঝাঁড় চাইয়া বলে যেন বাধানিয়া গাই।।  
ছলেতে দেখায় রূপ যৌবন সম্পদ।  
দড় স্বামী হইলে আজি নাকে দিত পদ।।

মলিন মুখে সদাগরকে গৃহে ফিরতে দেখে খুন্না রাজদয়ারের কথা জানতে চায়। নৃপতি সাধুকে সিংহলযাত্রার নির্দেশ দিয়েছে শুনে খুন্নার মাথায় বাজ পড়ে। সে বলে—প্রাণনাথ সিংহলে গমনে কাজ নাই। ঘরে যত চন্দন, শঙ্খ, মণিমাণিকা আছে সব রাজাকে দিয়ে এস। পিঞ্জর গড়াতে গিয়ে একটি বছর তোমার বিদেশ-বিড়িয়ে কেটে গেলে। আর এদিকে সতীন আমাকে কি যাতনাই দিল। সে-সব কথা বলতে গেলে বুক ফাটবে। এবার আবার সিংহল যাওয়া। সে-দেশে গেলে, বলাই যাট, ঘরের মানুষের ঘরে ফেরার আশ নাই।

জলে কুস্তীরের ভয়

দুই খণ্ড শত শত পথে।

যে যায় সিংহল দেশ

সে পায় অনেক ক্রেশ

কহিয়াছে মোর পিতা তত্তে।।

যাবে সে সাগর বাইয়া  
পরাণ সফট নোনা-বায়।  
কহিতে পরাণ ফাটে  
ধিক ধিক সিংহল-উপায়।।  
বহু তিমিসিল আছে  
তনু যার শতক যোজন।  
কি করে টমক শিঙ্গা  
সেই দেশে সফট জীবন।।  
কি দিব কচ্ছপ তুলা  
জলৌকা কুঞ্জর শুণ্ডাকার।  
রাজা বড় পাপ চিত্ত  
ছলে হরে লয় বিত্ত

সে পথে না জীব নাইয়া  
মকরে মানুষ কাটে  
প্রাণবধ সিল মাছে  
পক্ষে ছুঁয়া লয় ডিঙা  
শশা হেন মশাওলা  
ছলে হরে লয় বিত্ত

শুনেছি দেশের দুর্য্যচার।।

লহনা ছোখের মিথ্যা জল ফেলতে ফেলতে এসে হাজির হয়। বলে পিঞ্জর গড়াতে গিয়ে কতদিন পরবাসে কেটে গেল। তবে সাধুকে সে সিংহলে যেতে নিষেধ করে না। উল্টে বলে—দুখ করতে নাই; বুকে বল আন। রাজা তোমার উপকারই করেছে। সিংহলে গিয়ে ঘরে ফিরার তাড়া কোরনি। সাত নাও ভর্তি করে তবে ফির। শ্বশুরের কি টান হল অর্থের, তা তো আমি দেখেছি। শেষে সাত নাও চন্দন কাঠ আর শাখ এনে বিচল। তাতে ধন হল। প্রতি হাটে টাকা দরকার আর ঘরের ঢাকায় বসে খেলে কুবের ধনও ফতুর হয়ে যায়। আমার কথা শোন—আয় বিনা বায় করলে নদীর বালিও ফুরিয়ে যায়।

সদাগর হাসে। দৈবজ্ঞকে খবর দিতে বলে। ওঠে লহনা। তার ইচ্ছে পূর্ণ হল। ওদিকে বিরাণ বদনে খুন্না এসে হাজির হয়।

সিংহলে যাইবে প্রভু দীর্ঘ পরবাস।  
লজ্জা খেয়ে বলি মোর গর্ভ ছয় মাস।।  
মোর মনে লয় তথা হবে বন্দকাল।  
তোমার বান্দর জন ঝিমল করাল।।  
শততা করিয়া তারা যদি করে ছল।  
সেই কালে কেবা মোর হবে অনুবল।।  
শুনহে প্রাণের নাথ বলি হে তোমারে।  
পরীক্ষা লইতে কত পারি বারে বারে।।

খুন্নার কথা শুনে সাধু সন্দেহ-ভঞ্জন-পত্র লিখবার ব্যবস্থা করল। তাতে লেখা হল—  
যখন তোমার গর্ভ ছয়মাস, নৃপাদেশ আমি পরবাসে চলিলাম। কন্যাসন্তান হইলে তাহার নাম রাখিও শশীকলা। উত্তম বংশ দেখিয়া বিয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করিও। পুত্র সন্তান হইলে তাহার নাম রাখিও শ্রীপতি। পড়াইয়া শুনাইয়া তাহাকে সুমতি করিও। দ্বাদশ বৎসরের ভিতর আমার আগমন না হইলে তাকে দক্ষিণ বসতিতে প্রেরণ করিও।

ধনপতির আমল ভিন্ন ছিল। তখন নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। বর্তমান যুগে কন্যাদেরও শিক্ষার প্রয়োজন আছে। শিক্ষা ব্যতীত ভালো বর মেলা কঠিন।

ধনপতি নিজের তিনখানি নিদর্শন দিল—বেনিয়ার বাল্য, সুমত অদ্ভুরি আর গায়ের উত্তরায়। পত্রখানিও খুন্নার হাতে তুলে দিল। ‘স্তুতি’ ‘স্তুতি’ বলে মাথায় তুলল খুন্না। তারপর নিজ নিবাসের দিকে চলে গেল। তারপর দৈবজ্ঞ খড়ি বজ্র খাঁ এসে হাজির হল। পাঁজি খুলে দিন বিচারে বসল।

।। ৩ ।।

পাঁজি বিচারে দ্বিজ ভাবিয়া লক্ষণে।  
শ্রবণাফল্গুন যাত্রা না যাই দক্ষিণে।।  
অষ্টমী নহিল ভালো তিথি ব্যতিপাত।  
নিষেধ তরণীযাত্রা পতি প্রেতনাথ।।  
কিন্তুকা নবমী যোগ নহে যাত্রা ভালো।  
তিমি ত্রিংশপর্শ হইল দশমীর কাল।।  
দ্বাদশী বিফল যাত্রা ত্রয়োদশী নয়।  
তিমি চতুদশী রিঙা ভালো নাহি কয়।।  
অতপর উয়া যাত্রা নাহি আশুভাব।  
এমন যাত্রায় গেলে নাহি হয় লাভ।।  
কহিনু পঞ্জিকা সাধু শুন খড়ি সন্ধি।  
এমন যাত্রায় গেলে লোক হয় বন্ধি।।

ওঝার কথা শুনে সাধু মুখখানি বঁকাল। তারপর নফরকে বলল, ‘ধাক্কা মেরে বের করে দে’। অভিষাপ দিতে দিতে ওঝা চলে গেল। সাধু গোপালী সময়ে নদীর দিকে যাত্রা করল। যাতে জল-দেবতার পূজা করল। তারপর দুজন ডুবুরি জলে গিয়ে নামল। প্রথমে তারা তুলল মধুকর ডিঙাখানি। তার বৈঠক-ঘরখানি সোনা দিয়ে তৈরি। আর একখানি ডিঙা উঠল—দুর্গাবর নাম তার। ওইখানিতেই সদাগর চড়ে। পরের ডিঙাখানির নাম শঙ্খচূড়। সে দু-পাশে আশি গজ ভাঙে। ডুবুরিরা চন্দ্রপাল ডিঙা তুলল। তাতে মাল তুললে দুই কুলে আলো ফোটে। পরের ডিঙা হল পটুমুটি। সেই নায়ের বাহান দাঁড়। ডিঙাটিতে চাল বহন হয়। পরের ডিঙার নাম নাটশালা। তাতে বসে সারি, গায়ক, মাঝিরা। মোম, ধুনে দিয়ে বরণ হল। তারপর লোহার শিকল দিয়ে গাঙ্গে সাত ডিঙা বেঁধে দিল।

অবিলম্বে সদাগর আইল নিকেতন।  
ভাণ্ডার ভিতর সাধু দিল দরশন।।  
গালার মোহর তার গালা উতরিয়া।  
কাঠায় করিয়া ধন নিলে মাপিয়া।  
নানা দ্রব্য সদাগর নিল রাশি রাশি।  
ভ্রমরার যাতে যায় হয়ে অভিলাশী।।  
সাধু করে যাত্রা দিন না করে বিচার।  
খুন্নার দশদিক হইল অন্ধকার।।  
ষোড় শোণাগরে চণ্ডী পূজেন খুন্না।  
সদাগরে বাতা দিতে চলিল লহনা।।



সাধু সন্নিধানে রামা দিল দরশন।

অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকল্পণ।

লহনা সাধুকে গিয়ে বলে—শোন গো সদাগর, তোমাকে একটি গোপন কথা বলি। তোমার মোহিনী-বালা খুল্লনা ভাইনি-কলা শিক্ষা করে। দুখানি ঘণ্টের মাথায় আমপল্লব আর দুর্বা ঘাস দেয়। তারপর সিঁদুর, চন্দন, চুয়া, কুমকুম, কস্তুরি, সুগুণি দিয়ে ফি মঙ্গলবার পূজো করে। আমাম, দই, ফলমূল, অণুরূ, চন্দা, ধূপধূনা দিয়ে পূজো করে একা। শঙ্খধ্বনি দেয়। লাল কাপড়ে এলো চুলে ঘণ্টের চারপাশ ঘোরে উলু দিতে দিতে। বিড় বিড় করে কাউর-কামিয়ার মস্ত বলে, লাল জবার অঞ্জলি দেয়। পাড়াপড়শির কাঁচ কথা বলছে এই পূজো নে। মঙ্গলবার অষ্টমী তিথি আর নবমী চতুর্দশীতে সারাতা দিন উপাস করে রাতে পূজো করে। সংসারের আচারভঙ্গ করছে খুল্লনা। তুমি নিজে এর বিহিত কর। শেষে বাপু আমাকে রাগ দেখিওনি। আমি যদি মিথো বলি আমার নাক কেটে দিও, জীবনে আমার মুখদর্শন কোরনি।

লহনার বচন শুনিয়া ধনপতি।

কেশ নাহি বাঁধে সাধু ধায় লঘুগতি।।

দেখিয়া সাধুর কোপ হাসয়ে লহনা।

আজি বিধি পূরহিল আমার কামনা।।

স্বামীর সোহাগে তার গর্ব গেল বাড়ি।

দেখিব সোহাগের কিল ভূমে গড়াগড়ি।।

সাধু আগি চলিল লহনা নারী জন।

পশ্চাতে চলিল সাধু বেনের নন্দন।।

পূজা-গৃহে উপনীত হৈল ধনপতি।

জয় দিয়া পূজে চণ্ডী বুল্লনা যুবতী।।

রোষযুত ধনপতি দেখি সন্নিধানে।

ঘট ছাড়ি পদ্যসহ রহিলা গগনে।।

দেখি ধনপতি দন্ত জ্বলে কোপানলে।

ধর্ম সাক্ষী করি ধরে খুল্লনার চুলে।।

ধনপতির মাথায় আগুন। কপাল যার পুড়ে তার মাথায় আগুন ধরবেই। ধনপতি বলে—হায়রে, আমার কপালে এমন পাপিনী যুবতী দেখা ছিল। বরের পথ ছেড়ে এ-তুই কার পূজো করিস। এই সব দেখে জ্ঞাতি কিংবা রাজা যদি আবার ছল ধরে, কতবার তোর পরীক্ষার ব্যর্থ করব? কারো ঘরে তোর মতেন পাপ বউ নাই। তুই আমার জাত-কুলের মান ডুবালি। বা পা দিয়ে, কি বলি বেনের পোয়ের মতিভ্রম, মায়ের পূজার ঘটখানি ঠেলে দিল। ঘট গড়াগড়ি যায়। সাধু খুল্লনাকে আবার সোঁখানি দেয়—ঘটবারি দিয়ে কীসের পূজো করিস? ঐগ্লিঙ্গ দেবতার পূজো ধনপতি সদাগর করবেন। তার একটা মান আছে। তার বউও করবেন। মেয়েছেলে থাকবে মেয়েছেলের মতেন।

ধনপতি খুল্লনার চুলের মুঠি ধরে বার কয়েক পাক দিয়ে ছেড়ে দিল। ঢাল থেয়ে মাটিতে ধপ করে বসে পড়ল খুল্লনা। তারপর অঞ্জলি করে সাধুকে মা চণ্ডীর কথা নিবেদন করে।

শুন নাথ পূজার সন্ধান।

রোগ শোক দুঃখ খণ্ডী

অনুদিন পূজি চণ্ডী

ইচ্ছা করি তোমার কল্যাণ।।

তুমি যাও পরবাস

আমার হৃদয়ে ত্রাস

শূন্য হবে মোর জীবলোক।

হয়ে সমাহিত মতি

পূজা করি হৈমবতী

তুমি যেন নাহি পাও শোক।।

যত দেখ মহাজান

সবাকার প্রয়োজন

সন্তোষে পূজেন মহামায়া।

হইলে পরে প্রতিকূল

কেবল দুঃখের মূল

কেহ তারে নাহি করে দয়া।।

ভারাবতারণ আশে

আইলা বসুদেব-বাসে

ইচ্ছাময় পূর্ণ ভগবান।

দৈবকী আছিল্লা বন্দি

বুঝিয়া কার্যের সন্ধি

নন্দগৃহে হৈলা অধিষ্ঠান।।

দারুণ কংসের ভয়

বসুদেব স্থির নয়

খুইলে কুষ্ণের নন্দের মন্দিরে।।

আসি বসুদেব সাথ

ছাড়িয়া কংসের হাত

ভয় খণ্ডি উড়িয়া অথরে।।

খুল্লনা সরল মেয়েমানুষ।

চণ্ডীপূজার মাধ্যম্য বোঝাতে গিয়ে রামের রাবণ বাঘের

কথায় ঢুকে পড়েছে। তাতেও না থেমে শুরু করেছে সীতা উদ্ধারের কথা। তেলে-বেতনে

জ্বলে ওঠে ধনপতি। বলে, তুই আমার সহচরী না। তুই কুলের কালি। মেয়ে-দেবতার পূজো

এ ভিড়েতে হবেনি—আমার এই ব্রত তুই ভেঙে দিলি? তুই আমার শত্রু। আরো হাজার

গালমন্দ করে পা-দিয়ে দেবীর জলপাত্র ঠেলে দিয়ে চলে গেল সদাগর।

।। ৪ ।।

এত পাপ হুজুম হয়? পথে বেরনো মাত্র মাথার ওপর ডোমচিল গুড়। সমুখপানে

তাকিয়ে দেখে কাঠের বোঝা নিয়ে মানুষ হাঁটছে।

ওদিকে দেবী চণ্ডী ধনপতির প্রতি ক্রোধে খরখর করে কাঁপছে। মুখখানি নব সূর্যের

মতো উত্তপ্ত। মাথা থেকে কাপড় গেছে যেন, চুল উড়ছে থই থই। চোখদুটি যেন লাল

পদ্ম। বেনে ধনপতির জ্ঞান নাই দেবী চণ্ডী কে। রণজয়া চণ্ডী অষ্টভুজা হলেন, প্রতিটি হাতে

একখানি করে অস্ত্র। পদাবতীকে হাঁক দিয়ে চণ্ডী হাতিয়ার অনাতে বললেন।

দেহ গো নিশান শিঙা

ডুবাও সাধুর ডিঙা

ধনেপ্রাণে মরুক ধনপতি,

নিশচয় বধিব আজ

সাধিব আপন কাজ

যেমন রাখিবে পশুপতি।।

মোর ঘট পায়ো ঢৌলি

দিয়া যায় গালাগালি

সহে কেবা এত অপমান।	ধনপতি দন্তে বধ
আমার বচন সাধ	উহার শোণিতে করি স্নান।।
ডাকি আন যত দানা	লিঙায় দিউক হানা
লউক উহার যত ধন।	সকলি করহ হত
ডিঙার কাণ্ডার যত	সাধহ আমার প্রয়োজন।
আমা সনে করে হঠ	চরণে লঙঘ্যে ঘট
হইল বোটা এত অহঙ্কারী।।	মোর ঘাটে মারে লাথি
কোন ছার বেশে জাতি	জীবে কি আমার হয়ে অরি।।
আছুক পূজার কাজ	সুরপুরে হইল লাজ
যা যাব শঙ্কর সন্নিধানে।।	পদ্মাবতী বলে বাণী
চণ্ডীর বচন শুনি	শ্রীকবিকল্প রস ভনে।।

পদ্মাবতী বলে, 'মা ভগবতী, রেগে লাভ নাই। রাগে বৃদ্ধি নাহ। বৃদ্ধি নাশ হলে কেমন করে পূজার প্রকাশ হবে মা? আর পূজোই যদি না পেলে কেনই বা রত্নমালাকে মর্তে আনা, কেনই বা মালাধর কুমারের গর্ভবাস? ধনপতিকে মেরনি মা। নিজের দেশ ছেড়ে বিদেশের জলে পড়ক, তারপর সাধুকে দুখ-সাগরে ভাসিয়ে দুরে। ছট ডিঙি রসাতলে পাঠাব, সবে-ধন নীলমণি মধুকর চড়ে ধনপতি যাবে রাজসকাশে। কৌশল করে সেখানে তাকে বন্দি করাব। মা ভগবতী, কলিতে তোমার পূজার ব্যবস্থা হোক। সে পূজো ধনপতি মরলে কে করবে?'

পদ্মার কথা শুনে রাগ পড়ল ভগবতীর, ওদিকে খুল্লনা ভক্তিভাবে দেবীর ঘট তুলল। বলল—মাগো, আমার পতির বোধবুদ্ধি নাই। আমাকে দেখে আমার নাথকে তোমার পাদপদ্মে রেখ। অপরাধ ক্ষমা কর কৃপাময়ী নারায়ণী। তুমি প্রসন্ন হও।

মাথায় সোনার বারি নিয়ে খুল্লনা সুন্দরী নাচে। মুখে দেয় জয়ধ্বনি। করতালি দেয় দুই হাতে ভক্তিরে দেবীর পদযুগলে সুগন্ধি পুষ্প অঞ্জলি দেয়।

আদ্যা সনাতনী	শঙ্কর-ঘরগী
শক্তিনী শুলিনী	শক্তিরূপা তিন দেবে।
ধাত্রী শাকম্ভরী	কপাল-মালিনী
তিন লোকে তোমা সেবে।।	গৌরী দিপদ্বরী
জয়ন্তী কালী মঙ্গলা।	সেবে পূণ্যশালী
তুমি ভক্তকালী	হরতনু হেমকলা।।
দক্ষ-মুখহারা	ভব-দুঃখ-পারা
মহাকালিকা ভীমা।	

ব্রহ্মা পূর্বদর	সেবে নিরন্তর
দিতে নারে তব সীমা।।	নন্দগোপসূতা
যাদব-সেবিতা	শুভ-নিশুভনাশিনী।
যাশোদানন্দিনী	মহিষমর্দিনী
শিব দুর্গা ফমা	চণ্ডী চণ্ডভীমা
শিব দুর্গা ভারতী	বাণী বসুমতী
কৌশিকী কুমারী	সংসার দুঃখতারিণী।।
উগ্রচণ্ডা চণ্ডী	রোগ-শোকহরি
	বারাহী বিদ্যাবাসিনী।
	চণ্ড-মুণ্ড-দণ্ডী
	রক্তবীজ-বিনাসিনী।।

ধনপতি বিনিময়ে দ্রব্য জোগাড় করে। গরুরগাড়ি আসে চারদিক থেকে মালপত্র নিয়ে।

হরিণ দিলে ঘোড়া পাবে, নারিকেল দিলে শাঁখ—যার যা আছে বদলে নাও। ভেষজ বিড়স দিলে লবঙ্গ মিলবে, গুঠের শিকড় দিলে সোহাগা—যার যা আছে বদল কর। বঁদুর দিলে মাতঙ্গ পাবে, পায়রা দিলে গুরুপাখি—যার যা আছে বদল হবে। গাচফল দিলে জায়ফল পাবে, বয়ড়া দিলে সুপুরি—যার যা লাগে নিয়ে যাও। পাটসোন দিলে ধবল চামর পাবে, কাঁচর দিলে নীলা—যার যা আছে নিয়ে এস। লবণ দিলে সৈন্ধব পাবে, জোয়ানি দিলে আম পাবে, হরিতাল দিলে হীরা—কার কি লাগে নিয়ে যাও। চিনির বদলে দানা-কর্পুর, আলতার বদলে নিচা ফল, পশমের কাপড় আর ছুঁচের কাজের কঞ্চল পাবে যদি তোমাদের ঘরে পাতায় বোনা মাদুর থাকে।

সদাগর গো-যানে মাল বোঝাই করে—মাষ, মসুরি, চাউল, মৌরি, বরবটি, মটরফলিই, চিনেবাদাম, তেল, ঘি। আরো মালপত্র ওঠে—গোধূম, খড়িয়া শাক, সরিষা, মুগ, তিল, মাড়য়া, ছোলা। নুনের গোলা বসিয়ে মাল কেনে সদাগর। এরপর যাত্রার ব্যবস্থা।

ঘর হইতে ধনপতি করিল গমন।  
উচ্চসরে খুল্লনা যে জুড়িল জন্মন।।  
পথে যাইতে সদাগর লাগিল উচোটা।  
নোতের আঁলে লাগে সোঁয়াকুল কাটা।  
যাত্রার সময় ডোমচিল উড়ে মাথে।  
কাঠুরে কাঠুরে ভার লয়ে যায় পথে।  
শুকনো ডালেতে বসি কু-বেলায় কাউ।  
যোগিনী মাগয়ে ভিক্ষা আখ্যানি লাউ।।  
কচ্ছপ লইয়া পথে বীবার চলি যায়।  
তৈল লবে তৈল লবে তেলিয়া বেড়ায়।।



চলিলেক সদাগর মনে কুতূহলী।

বামে ভূঙ্গদম দেখে দক্ষিণে শূণালী।।

ধনপতি বাণিজ্যে যায়। ধনপতি সাগর-যাত্রা করে। পেছনে পড়ে থাকে দুই নারী—  
যৌবন-বাড়ন্ত লহনা আর ভুলুগিত খুন্না। সঙ্গে চলে ভৃত্যের রমণী— পদাঘাতে বায়ুবাসী  
স্নানদেবতা চণ্ডী।

।। ৫।।

অমরার ঘাটে সাধু দিল দর্শন।

কাঞ্চরী বলয়ে আর কেন বলিষন।।

সবাকারে সংসার-ঘর করি সমর্পণ,

নায়েতে চড়িল করি শিবের স্মরণ।।

সেব দ্বিজ গুরুজনে করি নমস্কার।

হরি হরি বলি ডিঙ্গা বাহে কর্ণধার।।

নৌকা চলে তরতর। ডানদিকে ললিতপুর, বাঁয়ে ইন্দ্রানী। সদাগর জল-পুষ্প দিয়ে ইন্দ্রেশ্বরের  
পূজা করল। আরো খানিক পেরিয়ে বাঁদিকে নবদ্বীপ আর ডাইনে পাড়পুর। আর কতইবা  
পথ শান্তিপুর যেতে? নাইয়ের পাইক কৌতুক-গীত গায়। ঐ ডাইনে আশ্রয়ামূলক দেখা  
যায়। দাঁড় পড়ে ঘনঘন, শব্দ ওঠে ছপাং ছপাং। ডানে গুপ্তিপাড়া। নাইয়ের লম্বা ছিয়েতে  
এক যোজন পথ পিছনে গড়িয়ে যায়। ডানে চণ্ডীগঞ্জ কোলসিয়ার ঘাট। আর খানিক জল  
সরে যেতেই বাঁয়ে হালিশহর আর ডানে ত্রিবেণী। দু-কুলের কোলাহলে কানে কিছুই ঢোকে  
না। লক্ষ লক্ষ লোক একসঙ্গে স্নান করছে। কেউ সুগন্ধি, কেউ সোনা, কেউ তিল, কেউবা  
ধেনু দান করছে। কেউ কেউ নদীর জলের ধারে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করছে, বারিকালে কোনো  
মানুষ ধূপ-লীপ দিচ্ছে। রূপোর কেশ্যকুশিতে তর্পণ করে ঐ কারা। নদী গর্ভে একেজন  
মাথামুণ্ডন করছে। কেউ আবার দুখানি বাছ উর্দ্ধে তুলে গঙ্গা নারায়ণকে স্মরণ করে।

রাঢ় মশো সুপুগ্রাম অতি অনুপম।

দিন দই সাধু তথা করিল বিস্রাম।।

কিনে বিচে নানা ধন ন্যায় দিল ভরা।

বাহ বাহ বলি ঘন নায়ে হইল দুরা।।

নাও চলতে শুরু করে। দাঁড় জল কাটে। ডান দিকে ঢোখে পড়ে নিমাইতীর্থ নবদ্বীপ।  
ক্রান্ত দাঁড় পড়ে জলে সশব্দে। দাঁড়ের তাড়ালগঠিতে এক যোজন পথ এগিয়ে যায়। বামদিকে  
বাড়দহ। সে পুরী পেরিয়ে কোলগর। সেখানে মুন্ডিকা দিয়ে শঙ্করের মূর্তি গড়ে পূজা করে  
সদাগর। বায়ুর বেগে সব ডিঙি জড়ো হয়ে গেল। বাঁদিকে ছত্রভোগ আর ডাইনে হাত্যাগার।  
নদীর শরীর বদলায়। জলের গলা থেকে ফেনা ওঠে। ডাইনে মেনদামল আর বাঁয়ে বিরখানা  
পড়ে। দূর থেকে কানে আসে মগরার জলের গর্জন। আষাঢ়ের পাটভাঙা নতুন মেয়ের  
কাঁধ সে গঙ্গার স্বরে। ওদিকে সদাগরের পদাঘাতে লুপ্তা অভয়া গঙ্গাতীরে হাজির। সে  
তো আর লহনা-খুন্না নয় যে ভাত দাও বলে তাকে লাগ দেবে!

।। ৬।।

পদ্মাবতী সঙ্গে যুক্ত করিয়া অভয়া।

ধনপতি ছলিবারে পতিতলে ময়া।।

চণ্ডীর আদেশে ধায় নদনদীগণ।

মগরী নদীর সঙ্গে করিতে মিলন।।

অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত্ত।

শ্রীকবিকল্প গান মধুর সঙ্গীত।।

অভয়ার আদেশে নদনদীগণ চলেন মগরী নদীর সঙ্গে মিলতে। মন্দাকিনী আকাশ ছেড়ে  
মাটিতে নামেন। ভোগবতী মকরজালকে সঙ্গে নিয়ে পাতাল ছেড়ে ওপরে আসেন। তরঙ্গে  
তরঙ্গে উথালপাথাল গঙ্গা বয়ে চলেন মগরার পথে। ভৈরব আর কর্মনাশা পেছন পেছন  
হাঁটেন। মহানদের দাঁড়ানোর সময় নাই হাতে। তিনি রণপায়ে ছোটেন। বাহাদুর আর বিপাশা  
ধেয়ে আসেন। আমোদর, দামোদর, দারকেশ্বর, শিলাই আর চন্দ্রভাগার স্রোত গাঁ-গঞ্জ  
পেরায়। বোনাই আর কৈপাই দুটি ভাই চলেন, তাঁদেরই পিছন পিছন বগাড়ির বগা খালও  
এগান। দাপাদাপি করতে করতে খুমঝুমি ধেয়ে আসেন ফাঁরাই মুণ্ডাইয়ের সঙ্গে। তারাগুলি  
চলেছেন। অবাধ হয়ে পুঙ্কর দেখেন। ওদিকে রঙ্গে মাতোয়ারা রত্নার থামার সময় নাই।  
লহরীর পায়ের নীচে সর্বে। তাঁর পাশাপাশি গোদাবরী আর কানা দামোদর মগরায় চলেন।  
বুড়া মণ্ডেশ্বর বসে থাকেন কেমন করে? খালি জুলির সঙ্গে রঙ্গরসিকতা করতে করতে  
তিনিও ঠুকঠুক হাঁটেন। ধেয়ে আসেন বরুণা, গঙ্গা, যমুনা, অজয়, সরস্বতী, কুন্তী। গোমতী  
চলেন শরীরের মুদ্রা বদলাতে বদলাতে। ওদিকে চরণধ্বনি শুনি সরযু, কংসাবতী, কাঁদাই,  
মহানন্দা, বিড়াই, স্বরস্রোতা বামনার-খানার। চারদিক থেকে ঢেউয়ের পাহাড় এসে ভেঙ্গে  
পড়ে মগরায়। শোভা উঠছে মগরার মুখ জুড়ে। বারের ডাক উঠছে বুক কাঁপিয়ে। দিঙি  
বাজিয়ে মাকড়া চণ্ডী এলেন। জল থৈ থৈ চারপাশ। কোনোদিকে কুল না দেখি। ওদিকে  
আবার কালাঘাই হাজির। একা রক্ষা নাই, সঙ্গে আর সাত ভাই। দেখতে না দেখতে সুবর্ণরেখা  
তাঁদেরই পায়ে পায়ে হাজির। ওদিকে মা চণ্ডীর অনুমতি পেয়ে ব্রহ্মপুত্র কুল ছাপিয়ে উপস্থিত  
হলেন। নীচে যখন নদী জুড়তে জুড়তে সমুদ্রের, আকাশে মা চণ্ডীর আর এক কৌতুক।

ঈশানে উড়িল মেঘ সঘনে চিকুর।

উত্তর পবনে মেঘ ডাকে দুর্দুর্দ।।

নিমিষেকে জোড়ে মেঘ গগনমণ্ডল।

চারি মেঘ বরষে মুঘলধারে জল।।

নদী খালে বৃষ্টি জলে উথলে মগরায়।

কুল জুড়ে বয়ে জল একাকার ধারা।।

চারি মেঘে জল দেয় অগ্নি গজগার।

সঘনে চিকুর পড়ে বেদতড়কা বাজ।।

আবিশ্রান্ত নাই সন্ধ্যা দিস রমনী।

নায়ের যতক লোক স্মরিয়ে জৈমুনি।।

ছেঁঘরে পড়ে শিলা বিদারিয়া ঢাল।

ভাদ্রপদ মাসে যেন পড়ে পাকা তাল।।

ওদিকে চণ্ডীর আদেশে পবনপুত্র হনুমান ডিঙির ছাউনি ভেঙে খানখান করে। ডিঙিতে ডিঙিতে মাথা ঠুকে দেয়। সিংহরহস্যে বাসে মজা দেখেন অভয়া। এবার বুকু ক সদাগর কোন ঘাটের জল কতদূর গড়ায়।

সদাগর বলে — ও কাণ্ডারী ভাই, যেখানে পারো ডিঙা রাখে। দেবরাজ শত্রুতা করছেন তাই আকাশ ভেঙে পড়ছে মাথার ওপর। মুঘলধারে বৃষ্টি পড়ে, বাজ পড়ে গুমগুমিয়ে। ডিঙা পাক খায় চাকার মতো। দিন কি রাত বুঝতে নারি। বাড়ে কাত হয়ে যাচ্ছে ডিঙা। বলকে বলকে জল ঢুকছে ডিঙার ভেতর। গ্রাহের ফল কি জানিনা। এ যাত্রায় প্রাণটি বাঁচাও কাণ্ডারী।

গুলির মতো শব্দ করে শিল পড়ে। মাথার খুলি যেন ভেঙে যায়। তীরের মত ছুটে আসে জল। সে জলের দেসার হয়েছে বাড়। দাঁড়ীদের হাত থেকে দাঁড় খসে যায়। বেয়াড়া বাড়ি গাছ উপড়ে যায়। দু-কূল জুড়ে ফেনা বইছে। ভাঙা নৌকা আর কতক্ষণ জলে ভাসবে?

সদাগর আকুল হয়ে বলে — ও ভাই কর্ণধার, কোনো প্রতিকার যে চোখে পড়ে না। ডিঙার গায়ে বিকট-দর্শন কুমীর হাঙর আর শতশত সাপ যোরে। তরী ডুবুড়ুবু। দৈবের বশে মায়াজালে বন্দী হলুম। পশুপতি বিনে আর গীত নাই। ফানে পড়ে 'মহেশ' 'মহেশ' বলে ধনপতি কঁাদতে থাকে দুই বাহ ওপরে ডুলে।

ওদিকে চণ্ডী অন্য এক চিন্তায় আক্ষেপ করেন।

পদ্মা, কেনবা অনিন্দ নদ নদী

ডুবাইলে সাধুর নায়

শঙ্কর ধরিব দায়

তখন করিব কোন বুদ্ধি।।

ইহা সাধু গুহ্মমতি

নিভা গুজে পশুপতি

একভাবে সেবক বৎসলে।

সাধু সনে কেনু বাদ

হইল বড় পরমাদ

কেন বা ডুবাই ডিঙা জলে।।

গুনৈছি শঙ্কর স্থানে

দেবগণ বিদ্যামানে

আগে ধনপতির গণনা।

বাজবৃষ্টি শিলা পড়ে

সাধু যদি মরে বাড়ে

দূর হবে আমার মাননা।।

যত নদনদীগণ

মেখে দেহ-বিসর্জন

মন্দিরে চলুক হনুমান।

শিব-পদে দিয়া মতি

সুখে থাক ধনপতি

শ্রীকবিরঞ্জন রস গান।।

মা চণ্ডীর বাণী শুনে পদ্মাবতী বলেন—আগে জলের ভেতর সদাগরের ছয় ডিঙা সমর্পণ কর, তারপর পশুপতির কথার জবাব দেওয়া যাবে। শ্রীমাম-সুদাম আদি গোপ-বালকদের প্রজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন। সেই রকম নায়ের মাশি-মাল্লাদের তুমি বাচিয়ে রাখো। ওদের বার বৎসরের জন্য ক্ষুধা ও তৃষ্ণা থেকে মুক্তি দিও।

বরুণকে ডাক দিলেন অভয়া। তিনি এসে দুখানি ডিঙা অতল জলে পাঠিয়ে দিলেন। এমন সময় হনুমানের স্মরণ নিলেন দেবী, হাজির হতেই পান দিয়ে তাকে মান দিলেন। চণ্ডীর আদেশ পেয়ে দুখানি ডিঙি পা দিয়ে ডুবিয়ে দিলেন। চারটি ডিঙি ডুবে যাবার পর ধনপতি বলে—“মগরার জল আর আমার কি করবে? বাকি তিন ডিঙি নিয়ে আমি সিংহলে যাব। সে কথা শুনে হনুমান এক লাখিতে আর দুখানি ডিঙা ডুবিয়ে দেয়। অথৈ জলের নীচে সব ডুবে যায় শুধু হাঁস ডিমের মতন মধুকরটি ভাসে। তার গায়ে জল বলকে বলকে গঠে। ঘূর্ণিঝড়ে ডিঙি পাক খায়, যেন কুমোরে ঘুরে চাকা। ছয় ডিঙা ডুবে যেতে দেখে সদাগরের বুক ভেঙে যায়। শোকে-তাগে, শিবকে স্মরণ করে, সদাগর জলে বাঁপ দেয়। আকাশে মহামায়া খলখল করে হাসেন। চণ্ডীর কৃপায় নদী শুকিয়ে হাটুজল। তাকে হাত ধরে তোলে কাঙাল বন্দন। নানা উপদেশ দিয়ে তার শোক নিবারণ করে। কূলে জলনাই কিন্তু কানে ঢোকে কুলকুল শব্দ। সদাগরের চোখে পড়ে কিছু দূরে মাধবের মন্দির। সেখানে ডিঙা করে গিয়ে পূজা দিল, ওখানে গিয়ে চোখে পড়ে সাগরসদম।

পূজা কবি স্নেহেতমাধরে প্রদক্ষিণ।

শোকাবুল সদাগর চলে রাত্রিদিন।।

কোথাও রন্ধন কোথা চিড়া নাহুঁ দধি।

দিবানিশি বাহে সাধু লবণ জলধি।।

ডানিভাগে বন্দনা করিয়া নীলাঢলে।

উত্তরিল সদাগর সমুদ্রের কূলে।।

লোচন ভরিয়া সবে দেখে জগন্নাথ।

অবনী লুটিয়া স্তুতি হইল প্রণিপাত।।

কিনিয়া প্রসাদ অম করিল ভোজন।।

দিবানিশি চলে সাধু অন্য নাহি মান।।

বাঁয়ে পড়ে চড়ই গুহা। নাও গড়িয়ে চলে তরতর। কলধৌতপূর আসে। তারপর চন্দ্রসিদ্ধ দ্বীপটি বাঁয়ে ফেলে ডিঙা পৌছলো জৌক-দহে। হাতির শুঁড়ের মতন লকলক করে তারা। সেখানে চুনজল ফেলে দিল সদাগর। যুগ্মগ্রহ দ্বীপটি বাঁয়ে ফেলে রেখে শঙ্খদহে ডিঙা পৌছলো। সেখানে একদিন বিশ্রাম নিয়ে আবার জলযাত্রা, রমনক দ্বীপখানি দক্ষিণে রেখে ডিঙা সপদহে গিয়ে পড়ে। চাঁড়-ইয়ের মূল বুদ্ধিবলে নাওয়ে বেঁধে সাধু সাপ-দহ পার হয়। বাদিকে তাকিয়ে দেখে দূরে যেন লক্ষা দেখা যায়, রামের বাঁধা সেতু পেরোয়। সীতাকুলীর সরু জলপথ পরিয়ে যক্ষ-রাজার দেশ চন্দ্রচূড় বাটে ডিঙা ঢোকে। মানুষজনকে জিজ্ঞেস করে সিংহল আর কত পথ। আবার অঠৈ সাগরে ভাসতে ভাসতে হাদ্যাদহে হাজির হল। ডিঙার ভাগে ধারালো করাত বেঁধে, জলের গর, লতাপাতা দুপাশে সরিয়ে, ডিঙা চলে। দিনরাতের আর দাঁড়ানোর সময় নাই। দেখতে দেখতে সদাগর হাজির হল কালীদহে।

।। ৮ ।।

ওদিকে দেবী অভয়া সদাগরকে ছলনার জন্য মায়ার জাল পাতলেন।

আপনি করিল মায়ী হরের বনিতা।

চোখটি যোগিনী হইল কমলের পাতা।



আমলা কমল হইল পদ্মা হস্তিকর।  
হাসিতে লাগিলা শতদলের উপর।।  
পুষ্পের ধনুকে মাতা পুরিয়া সন্ধান।  
সাধুর হৃদয়ে মারিলা পঙ্কবাণ।।  
জ্ঞান গেল ধনপতি নায়ের উপর।  
চেতন করাল তারে নায়ের গাবর।।  
রাজপদ্মিনী দেখি কমলের বনে।  
কন্যারে ধরিয়া আনি রাখে কোন জনে।।

সাধুর কথা তো পাঁচজনাত্তেই জানে — সে বড় কামিনীকাতর। প্রথম পক্ষ লহনার শরীর আলগা হতেই দ্বিতীয় পক্ষ খুন্নায়েক বিয়ে করে আনল। সে দু-জনাত্তে শাখ-করাতের সম্পর্ক। সাধু না থাকলে দু-সতীনের মুরগী-লড়াই বেঁধে যায়। সাধুর অবশ্য সে-সব তেমন গায়ে লাগে না। বিদেশে বিভূর্ত্তে গেলে সে নিজের সুখ খুঁজে নেয় বারবনিতাদের সংসারে। এহেন সাধুর কমলের বনে রাজপদ্মিনী দেখে সাধু জ্ঞান হারায়। গলুইয়ের মাখি জ্ঞান ফেরালেও যোর কাটেনা সন্দিগ্ধের, কন্যাটিরে ধরে আনতে পারলে তবে তার মনের শান্তি।

কর্ণধার বলে— একটু থিতু হয়ে বস দেখি। চোখে-মুখে খানিক জল দাও। দেখতে দেখতে ঘুমের ঘোর কেটে যাবে। স্বপ্ন মিলিয়ে যাবে।  
সাধু বলে— স্বপ্ন? চোখে এক রঙি ঘুমও ছিল না হে। সাদা চোখে দেখলুম। এই তোমাকে যেমন দেখছি তেমনই। এতো এখনও দেখি।  
কর্ণধার বলে— অবধ হও না সদাগর। কোথাও পদ্ম নাই, কামিনী নাই, হস্তি নাই।  
সিংহলে এসেছ, মাথা ঠাণ্ডা করে বস। এখানের রাজা সালবান বড়ই বেয়াড়া মানুষ।  
ধনসম্পত্তি কেড়ে নেবে, রক্ষা পাবে না পরগাও।

সে-সব কথাই কান নেই সদাগরের। সে কমলে-কামিনীর রূপের বর্ণনা দেয়।

অপরূপ হের আর	দেখ ভাই কর্ণধার
ধরি রামা বাম করে	উগরয়ে করিবরে
কমল-কলক-কুচি	স্বাধা স্বধা কিবা শচী
সরহস্তী কিবা রমা	চিরালেখা তিলোত্তমা
সত্যভামা রত্না অরুন্ধতী।।	

সদাগর বলে— কেমন করে সুন্দরীর আন রূপের কথা বলি গো? রাজহংসের মতন তার গায়ের বরণ। তার চরণে নৃপের ধ্বনি বাজে। দপটি বাজে যেন দশখানি চাঁদ উঠেছে। তার লাল হাত দু-খানি দেখলে লাল পদ্মকে ফিকে লাগে। আর আঙুল? আঁহা, চাঁপা ফুল গো, অধরখানি যেন পাকা তেলকুটার ফল, বদনীত শরতের চাঁদ, নয়ান দুখানিতে হরিণের চোখ কেটে বসানো। ও নয়ন দুটি থেকে চোখ সরাতে নারি। খন্ডন পক্ষীর টানা টানা অক্ষি

কে গেঁথে দিয়েছে কামিনীর বদনে? কপালেদের সিঁদুরে ফেঁটাটিতে ভোরের সূর্য দেবতাকে দেখি। বালার ছিপছিপে দেহখানির আলোতে ভুবন হাসে। কামিনীর তনুটি কুশ কিস্ত বুক দুখানি ভারী। বুকের সঙ্গে মিলিয়ে পাছা দুটিও চোখে পড়ার মতন। মুখখানি খানিক ফাঁক করে সুন্দরী একটি গোটা হস্তি গেলে আর ওগরায়। মনে হচ্ছে আমি জেগে স্বপন দেখি। কামিনী হাসে। সে দৃশ্য কেমন করে বর্ণনা করি গো? আকাশে যেন সান্দ্রাৎ বিদ্যুৎ চমকায়। আর মুখের পদ্ম-গন্ধ কামদাচ্য পুষ্পরসকেও হার মানায়। দেখ, দেখ, এই দেখ সে সুগন্ধে মাতাল হয়ে কত শত মৌমাছি ছুটে আসে। আমার শশিমুখীর রূপে-গন্ধে জগৎ মাতাল হল গো। আমি কেমন করে সে রূপের কথা পাঁচজনাকে শোনাই?

সাধুর বচন শুনি	কর্ণধার বলে বাণী
অশেষ গুণের সিদ্ধ	তুমি ধন্য দিব্যগায়ন।
দেখি সাধু শশিমুখী	সকল বিদ্যার বদ্ধ
করি-পদ্ম-শশিমুখী	আমি অন্ধ থাকিতে নয়ান।।
	কর্ণধারে করে সাক্ষী
	কর্ণধার করে নিবেদন।
	আমি কিছু নাহি দেখি
	বিরচিতল শ্রীকবিকল্পণ।।

সদাগর বলেন— এখন আর এক দৃশ্য দেখি যে কাঞ্চার ভাই। আমি যখন রাজার কাছে এসব কথা বর্ণনা করব, তোমরা সবাই সাক্ষী থাকো।

যোজন বিস্তৃত এই অগাধ জলে পদ্ম ফুটল কেমন করে হে? হাওয়ার সামলে কেমন করে তির তির করে জল বয়? এর ওপর কেমন করেইবা অবলা হির বসে থাকে?

ব্যাঙের ভার সহিতে পারে না পদ্মখানি। জলে চেটে ওঠে, যে ডেউয়ে কন্যা ধরখর কাঁপে। পদ্মের ওপর বসে সে একখানি হস্তি হাতে ধরে আছে। হরি, হরি— পদ্ম সে ভার কেমন করে বহন করে গো?

আর ঐ কামিনী কেমন হেলায় একখানা গোটা হস্তি ওগরায়। হস্তি পালাতে যায়, তাকে বাঁ হাত দিয়ে ধরে ফেলে। তাকে আবার গিলে দেয়। এ-দৃশ্য দেখে আমার বুক কাঁপে। আমার বুক কাঁপলে কি হয় কামিনীর বুকে এতটুকু লাজ নাই। আমরা এতজন পুরুষ মানুষ বসে আছি সে দিকে তেয়াক্ষা নাই তার। মনের আনন্দে সে হস্তি গেলে আর ওগরায়। পান-খয়েরের রঙ যেমনটি তেমন খুঁটোটেতে। চোয়াল না নেড়েই হস্তিখানি গিলে দেয় কমলে-কামিনী।

অগাধ সলিলে বিচিত্র সব পুষ্প-লতা ভাসে। মৌমাছি মধুর স্বরে পঙ্কম গায়। কোকিল ডাকে কুহ কুহ। মধু পাগল হুমর ক্ষণক্ষণে ওড়ে আর বসে। পরাগরেণুতে লতাপাতার রঙ ধূসর ঠেকে। কুঞ্জবনে মালতি, দামিনী, মরগা ফুল ফুটেছে। আঁহা কত যে ফুলের মেলা— মাধবীলতা, পলাশ, কাঞ্চন, কুন্দ, রসন। সে সব ফুলের ওপর চাঁদের আলো পড়েছে। শুদিকে জ্যোৎস্নায় জলজ্বল করে নেত সুতোয় পতাকা আর শেতচামর। পাটের বিমূর্নিতে মুক্তার মালা ঝোলে। সে মালার মাঝে মাঝে বিচিত্র বর্ণের প্রবাল গাথা।

তারই মাঝে কমলকাননে বসে কামিনী গজ নিয়ে খেলা করে। মত্ত হস্তিটিকে উগরিয়ে

আবার বাঁ হাতে দিয়ে ধরে। তারপর ঈষৎ হেসে চারদিকে একবার তাকায়। ক্ষণে ক্ষণে কামিনী দু-হাত তুলে নৃত্য করে। রাগ-রাগিণীর সুরে পঞ্চম গায়। নানা বাদ্য বাজে। রবাবের তারের মিহি সুর শুনি। পাখোয়াজ নাকি সরুজ বাজে। তার সঙ্গে তাল দেয় খঞ্জনি। বিদ্যাসহীর্ষণ কামিনীকে ঘিরে শরীর নাচায়।

কিবা রমা কিবা উষা কিবা অরুন্ধতী।

ভবানী ভেরবী কিবা লক্ষ্মী সরস্বতী।

ডাকিনী হাকিনী কিবা মল্লিকা যোগিনী।

কামের কামিনী কিবা ইন্দ্রনীলী।

সদাগর ভেবে থৈ পায় না কে এক কামিনী, এক কোনো মায়ায় ছল নয় তো? পদ্ম, হাতি, বন সবই সাধুর চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে অথচ নায়ের লোকজন কেউ দেখে না। সে ভাবতে বসে। পুরাণ হাতড়ায়। কোথায় যেন এমন ঘটনা ঘটেছিল। তার মনে পড়ে কৃষ্ণের কথা।

যেই কালে ইহলা প্রভু যশোদানন্দন।

শিঙলীলা কইরা করে মুক্তিকা ভঞ্জন।

যশোদার ঠাঁয়ে রাম করিল নিবেদন।

যশোদা ধরিয় কৃষ্ণে করেন ভৎসন।

কুবুদ্ধি করয়ে কেন মুক্তিকা ভঞ্জন।

না বাই মুক্তিকা গালি দেহ অকারণ।

বলি মিথ্যা হয় তবে মেলিবে বনন।

যশোদা কৃষ্ণের মুখে দেখে ত্রিভুবন।

বলি বিস্তারিত মুখ করিল চক্রপাণি।

বিশ্বরূপ বদনে দেখিল নন্দরানী।

সশৈল কানন সিদ্ধ ধরবী মণ্ডল।

যশোদা কৃষ্ণের মুখে দেখিল সকল।

দেবতারাই এমন রূপ দেখায়ে পারে, না হলে মানুষ হাতি গিলবে কেমন করে? সিংহলের রাজসভার মানুষজন নিশ্চয় এর কারণ জানবে। একথা ভেবে মসীপত্রে কমলেকামিনীর বিবরণ লেখে সাধু। ওদিকে তরী তীরে এসেছে। দেবাদিদেব শিবকে স্মরণ করে তট্টে ওঠে। রত্নমালার ঘাটে ডিঙি বেঁধে সদাগরের লোকজন সিংহল নগরে পদাণুণ করে।

॥ ৯ ॥

কূলে উঠে নাইয়ের পাইক বাজনা বাজায়। সে বাদির শপে সিংহল নগরীর ঘরে ঘরে সর্বজন চমকে ওঠে। দম দম দামামা বাজে। বন্দুকধারী গুলির আওয়াজ তোলে। বীরচাকের ঘন বাজনার তালে তালে পাইক উড়োপাক দেয়। শিঙ্গা, ভেরী, দোসারী, মোহরির, বীরকালী বাজে। তার সঙ্গে কড়া-পড়ার গলা জুড়েছে। কান পাতে কণ্ঠ সাধি? ডিমি ডিমি ডুবুর বাজে, জগ-বাম্প বাজে, সাধন-বেদীর শব্দ জুড়ে সিংহলে কম্প ওঠে। পাইক লাঠি খেলে, খাঁড়া-ফণা-বিজুলি নাচায়। মাটিতে কেউবা রেজা পোতে। লেটেলেরা দল বেঁধে মাটিতে বর্শা পোতে। তার খাটিয়ে সদাগর নদীর কূলে বসে। পরিজনরা গাছের তলায় আশ্রয় নেয়।

দামা আর হাউইয়ের দমা-দম ধ্বনি ওঠে। সিংহল কীপে ধরথর। দুপুর গড়িয়ে যাবার পর সিংহলের রাজা সালবান সাধুর আগমনের খবর পায়। আগন্তুক পরিচয় জানতে না পেরে রাজার মাথায় রক্ত ওঠে। রত্নমালার ঘাটে দামামার ধ্বনি শুনে সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। কোটালকে ডাক দেয় :

কোটাল কোটাল ডাক পড়ে ঘন ঘন।

আসিয়া কোটাল বুপে দিল দরশন।

দেশ লুটে খাও বেটা দেশের বিধাতা।

ভাল মন্দ নাহি দেহ দেশের ভারতা।

রত্নমালার ঘাটে গুনি কিসের বাজন।

বারতা জানিয়া শীঘ্র কর নিবেদন।

ঘর দল হয় যদি আন মোর পুর।

পর দল হয় যদি মেরে কর দূর।

বৈদেশিক হয় যদি আন মোর ঠাই।

মেরে কর দূর যদি না মানে দোহাই।

কোটাল কালু দত্ত কীপে লৌহশালাকা নিয়ে ছুটে যায়। নদীকূলে উঠে রাজার নাম নিয়ে বলে— তুমি শত্রু কি বান্ধব জানিনে। তুমি আমাদের রাজার রাজভ্রাতা দামামা বাজাও কেন হে?

ধনপতি বলে— ঘরদল বা পরদল আমি কিছুই না। বিদেশী সদাগর আমি। তোমাদের ভাল ব্যবহার পেলে থাকব, নয়তো যেমন এসেছি তেমন ভাসতে ভাসতে চলে যাব।

কালু দত্ত গলা চড়িয়ে বলে— চুরি-ডাকাতি হলে আমার মাথার দিবি। এখন আমার পাওনা পঞ্চাশ কাহন মেটাও দিকি।

সাধু চটে বলে— তোমার দেশে এসে আমি জল পর্যন্ত ছুঁনি, চোখ পাকাস কি কারণে? কোটাল গলা চড়ায়— সাধু নও হে, তুমি চোর। তোমার গুসব নাইয়ের মালপত্রের গন্ধ মিথ্যা। রাজ্যে ঢুক ডাকাতি করবে। আমি, পারা, তোমার মতি বুঝতে পারিনি? সাধু বলে— যে বেটা নিজে চোর সে অন্যকে চোর ঠাওরায়। চোর তো নিজের মতই অন্যকে ভাববে।

কর্ণধার এগিয়ে এসে মিষ্টি কথায় কোটালকে ঠাণ্ডা করে। তার দাবী মতন ইনামও দেয়।

॥ ১০ ॥

বন্ধুর সঙ্গে যুক্তি করে সদাগর রাজদর্শনে যাবার ব্যবস্থা করে। নানা হান থেকে ভেট-দ্রব্য সংগ্রহ চলে। সে সব বস্তু ভান্ডারে তোলা হয়। সেই ভেটে কত যে মনোহারী বস্তু!

কলা নিল মর্তমান

দো-সালের গুয়াপান

আশ কাঠাল নারিকেল।

ফুল মধু খাসা দধি

শালি চাউল গাছ বান্দি

বাতাসা চিনি নাড়ু গম্বাজল।

বারমেসে পাকা তাল

কর্ণগা কমলা ভাল

পিস্তাখেলুর দেবিতে সুন্দর।



রাজহংস পুরীখাচা

চাম ঠুল ঢাকি আখি

ছাগ খাসী যোদ্ধা-ভেড়া

হরিণ লইল কালসার।।

সিংহ ব্যাঘ্র শিকারি কুকুর।

পৃথিবীতে নাহি পড়ে ক্ষুর।।

জোড়ে জোড়ে পায়রার ছা

লইল সয়চান পাখি

জিন নসে তাজি ঘোড়া

শুধু কি এই—কত কিছুই নিয়ে চলে সাধুর লোকজন। একখানি ছাতা যায়, তারই অঙ্গে কত রূপ। মমুরের পালকে শোভা দিচ্ছে সে ছাতার চারপাশে। সে ছাতার রাস্তা লাঠিতে মনিমুক্তা গাঁথা, নয় নয় করে একশ পঞ্চাশ ভেট। কামান, কুপাণ, রাস্তা লাঠিও আছে। নদীতীরের বাগিচার লোকজন সে দৃশ্য অব্যবচোখে দেখে। আটবালা, কানে সোনা পরে পাইকরা পিছন পিছন চলে।

পিছনে চলে সদাগর। হঠাৎই বাধা পড়ে তার ডানে-বামে। সদের লোক ভাবে কপালে কি লেখা আছে কে জানে!

রাজসভায় পৌছে বেনের ছেলে রাজাকে সম্ভাষণ জানায়। তারপর একে একে উপহার সামগ্রী রাখে।

রাজা বলে—এস এস হে সদাগর। তা বল কোন দেশে তোমার ঘর, কে তোমাদের রাজা।

সাধু বলে—আমার বাস গৌড়ে। বিক্রমকেশরী সাত তরী সাজিয়ে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। চামর, চন্দন, শঙ্খ ইত্যাদি দ্রব্য রাজভাণ্ডারে ফুরিয়ে গেছে। রাজার আজ্ঞা পেয়ে, সিদ্ধ বেয়ে, আমার এই সফর। জাতিতে আমি গন্ধবনে। থাকি উজ্জয়িনীতে। দরকুলে আমার জন্ম। এবার শুনি রাজার বৃত্তান্ত।

রাজা মহাশয়

প্রত্যপে অসীম

পণ্ডিত সংকবি

সুমতি সুস্থির

প্রজার পালনে রাম।

দস্যু চোরে সব বান।।

নারদ সমান গানে।

কল্পতরু সম দানে।।

চাপে ধনঞ্জয়

মদ্রে যেন ভীম

তেজে যেন রবি

সত্যে যুধিষ্ঠির

রাজা রঘুনাথের কথা শেষ হতে সালবান রাজা বলে কী কী দ্রব্য এনেছো। বল দিকি। কোন মালের বদলে কী কী নেবে?

।। ১১ ।।

ধনপতি বলে—বদলের সামগ্রী নিয়ে তোমাদের দেশে এসেছি। কী দিলে কী জিনিস মিলবে মন দিয়ে শোন। হরিণের বদলে ঘোড়া দেবে, নারিকেলের বদলে শাখ। আমি উদরের বায়ুনাশক বিড়ঙ্গ ফল দেব তোমাদের, বদলে লবঙ্গ দিও তোমরা। শুকনো আদা মিলবে আমার নায়ে। সোহাগার বিনিময়ে পাবে। আকন্দের বদলে আম, চন্দন, আমলকী দিও, পায়রার

বদলে শুক-পাখি। আমি গাছ-ফল দেব তোমাদের, তোমরা আমায় জায়ফল দিও। সুপুরি দিলে আমার কাছে বয়ড়া মিলবে। সিদ্ধুর বদলে হিং লাগবে, গুঞ্জর বদলে প্রবাল। পাট-শন এনেছি তোমাদের জন্যে। সাদা চামর পেলে দিয়ে দিই। কাচ আছে আমার কাছে, নীলা পেলে সে কাচ মিলবে।

আর যে-সব বদল হবে তা হল লবঙ্গের সঙ্গে সেন্দ্রব, সুলপো শাকের সঙ্গে জিরা, ব্যাঙের সঙ্গে পাখি, হরিতালের সঙ্গে হীরা, সুবাস আতরের সঙ্গে চন্দন, পাণ্ডুর সঙ্গে ধান কাপড়, গুঞ্জর সঙ্গে মূল্য, ভেড়ার সঙ্গে ঘোড়া।

সাধু বলে—কত কি মালপত্র কিনে গরুর গাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে তুলেছি আমি। মাষ, মুসুর, চাল, মৌরি, বরবটি, মটর কলাই, বাদাম, তেল, ঘি—সব মিলবে আমার কাছে।

রাজা বিনিময়ে রাজি হল। কুটুস্তি করে পঞ্চাশ টাকা দিল রায়াবান্নার জন্যে। সাধুকে রাজা চন্দন-ভুষণে সম্মান দিল। রায়-খাওয়ার জন্যে সাধু রাজার কাছে অনুমতি নিয়ে সভা ছাড়ে।

অগ্নিশর্মা নামে দ্বিজ রাজপুরোহিত।

রাজার সভায় আসি হইল উপনীত।।

আশীর্বাদ করি দ্বিজ বসিল কদম্বলে।

হাস পরিহাস কথা কহে কুতূহলে।।

চারিদিকে দেখিয়া ভেটের আয়োজন।

সহাস বদনে দ্বিজ নৃপ জিজ্ঞাসন।।

অজি ভেট-বস্ত্র রায় দেখি চারি ভিতে।

মনোহর নানা দ্রব্য পাইলে কোথাতে।।

রাজা বলে—গৌড় থেকে ধনপতি নামে এক সদাগর এসেছে। সেই এসব ধন দিয়ে আমায় প্রণতি জানিয়েছে।

রাজার কথা শুনে ব্রাহ্মণ রেগে অগ্নিশর্মা। কীপতে কীপতে বলে—এমন দেশে ব্রাহ্মণের বসবাসে কি লাভ? নিত্যদিনের পক্ষে আচার্য্যর সময় আমার ডাক পড়ে, আর দানের গ্রহণের বেলায় আমি নাই। সবারই ভেট দেখি, আমারটি ছাড়া। আমি চললুম!

পঞ্চপাত্রসমেত রাজার মাথা হেঁট। অনেক কষ্টে ব্রাহ্মণকে থামায় পায়ে ধরে। রাজার আদেশে কালু আবার ডেকে আনে ধনপতিকে। ব্রাহ্মণ ধনপতিকে জিজ্ঞেস করে—কোথায় দেশ গো তোমার? কেমন করে জল কেটে এলে আমাদের দেশে?

সাধু শোনায় সে বৃত্তান্ত। রাজার নির্দেশে সাত ডিঙা নিয়ে জলে নামি। নদনদী পার হতে হতে চলি। কত দেশের কথা বলব? তারপর মগরায় জল-ঝড়ে ছটা নাও ডুবে গেল। একটি নিয়ে পাড়ি দিলুম।

কেবল দুখের পদ

সুধন্য সিংহল দেশ

কালীদহের জলে

উপনীত হইন্ সিংহলে।

জল আচ্ছাদিত শতদলে।।

বাহি নায় নানা হৃদ

কালীদহে পরবেশ

কুমারী কমল-দলে

গজ গিলে উগরে অঙ্গনা। মত্ত গজ লইয়া লীলা  
অতি কুশদরী বালা শশিমুখী খণ্ডন-লোনা।।

সাধুর কথা শুনে রাজা রেগে আওন। মহাপাত্রের দিকে ফিরে তাকান। রাজার হৃদিতে  
পাত্রের সাধুকে উপহাস করে। তার বলে—‘বিশেষ এসে ভয় পেয়ে গেলে সদাগর? ভাগ্যের  
কি পরিহাস তোমার ডিঙিটি জল-অতলে ডুবল না।’

সাধু বলে—‘নিজেরের জয়গা বলে আমায় উপহাস কর। আমাকে খানিক সময় দাও,  
আমি বেঁধে আনব গজ-কন্যাকে। আগেই আনতুম কিন্তু তোমার ভয়ে পারিনি রাজা। এখন  
অনুমতি দাও তোমার ঘর পদাফুলে ঢেকে দিই।’

রাজা বলে—‘ভণ্ড সদাগর এই রাজসভার যোগা নয়। তোমার উচিত শাস্তি হবে।’

সাধু বলে—‘দেশের প্রভু বলে তুমি আমায় ভণ্ড বল। যদি সত্যে বিশ্বাস কর তবে  
বাকি ধরে কালিদহে চল। আমার কথা মিথ্যে হলে নাওয়ের সব দ্রব্য লুটে নিও। বার বছরের  
জনে কারাগারে নিষ্কেপ করো আমায়।’

রাজা বলে—‘তোমার কথা সত্যি হলে অর্ধেক রাজা আর অর্ধেক সিংহাসন দেব।’

দুজনে প্রতিজ্ঞা করার পর পাকা পত্রে দু-জন্যার দস্তখত হল। কালিদহে যাবার পালা  
এবার।

অপরূপ কথা শুনি সালবান নৃপমণি  
সাজ বলি দিলেক ঘোষণা।

কমলে কামিনী বইসে হস্তিরে উগরি গ্রাসে  
শুনি পুরে ধায় সর্বজন।।

শুদ্র শব্দ উচ্চরালে কত বাজে ঢাক ঢোল  
কাড়া পড়া মৃদঙ্গ করতাল।

ডঙ্ক মুহুরি বাজে বীরকলি তাহে সাজে  
নানা বাদ্য বাজয়ে বিশাল।

রাজার মামা সাজে। গাণ্ডে সিঁদুর মাখে। তার জন্যে হাতি হাজির। হাতির পিঠে দামামা  
বাজে। ধবল চামর নাড়ে। ঘুঙুর, মাথর, ঘণ্টা বাজে। হাতির পিঠে রাজা চড়ে, মাথার ওপর  
সাদা ছাতা। চারপাশে পাত্রমিত্র বেশি সৈন্যসামন্ত। রথের সঙ্গে রথীর গায়েও সাজ, বীরবর  
সেনাপতি তৈরী। রথের মাথায় সোনার কলসির মতো চড়ে। সেখানে নেতের কাপড়ের  
পতাকা ওড়ে, সাদা চামর নাড়ে। রথের আগে বাঁশের ভগ্নে নিশান বেঁধে পদাতিক যোদ্ধারা  
চলে। ভূঁইয়া রাজা ঘোড়ার পিঠে যখন, কিরাত, শক, তুর্কীর উজবক, পারস্যের থোরাসানি,  
মোগল, পাঠান সেনা নিয়ে চলে। ‘সাজ’ ‘সাজ’ রব শুনে ধনুকধারী যোদ্ধারা ধনুকে ছিঁলা  
লাগিয়ে ছুটে গেল। গায়ে রাঙা জামা পরে ক্ষুরবার টপি নিয়ে নয় শত সৈন্য কালের  
মতন চলে। সোনার নৃপর পায়ে বেয়ে আসে পাইকরা। তাদের মাথায় সোনার টোপার,  
হাতে ঝকঝকে ফলা দেওয়া লাঠি। লাঠির ভগ্নে চামর দোলে। পাইকদের সঙ্গে নিয়ে কাল  
দস্ত চলে। অষ্টশত মাত্র যোদ্ধাও চলেছে সাথে সাথে। রাজার সঙ্গে বিবাদ তাই সবাই যুদ্ধ-  
সাজে এগোয়, তাদের পায়ের ধুলোয় সূর্য চাকে।

ওদিকে রাজার মা ‘সাজ’ ‘সাজ’ ডাক দেয়। সেও কালিদহে কমল আর কামিনী দেখতে  
যাবে। দাসদাসীগণ পরম হর্ষে তৈরী হয়। সোনার ঘাগর দেওয়া দাঁড় টানতে টানতে মাশি  
তাদের কালিদহে নিয়ে যাবে। রাজার শত নারীও যাবে। রাজার অনুমতি নিয়ে লীলাবতী  
এবং অন্যান্য রমণীরা পর্দা ঢাকা ষাটলীতে চড়ে। লাঠি হাতে তাদের সঙ্গে চলে পাইকরা।  
নদীকূলে মানুষের ঢেউ এসে থাকে। রাজা নায়ে চড়ে কালিদহে গজ, কমল আর কামিনী  
দেখতে যায়।

কালীদহে উপনিত হইলা নরপতি।  
পক্ষপাত্র পরিবার করিয়া সংহতি।।  
ধনপতি সদাগরে বলে নৃপবর।  
দেখাহ কামিনী কোথা কমল কুঞ্জর।।  
হাসিয়া সিন্ধুত করে সাধু ধনপতি।  
ধর্ম-অবতার তুমি রাজা মহামতি।।  
দেখিল যতেক আমি এক মিথ্যা নয়।  
যা ছিল কমল তা ঢাকিত তব নায়।।  
জোয়ার আসুক ভাটি টুটে যাক জল।  
দিন দুই তিন থাকে দেখাব কমল।।  
আমার বচনে রায় কর অবধান।  
কাণ্ডার আমার সাধী আছেয়ে প্রমাণ।।

রাজা কাণ্ডারকে কেঁকে বলে—সত্য বল দিকি তুমি পক্ষ, কামিনী আর হস্তি দেখেছো?  
সত্য বললে মানুষ স্বর্ণে যায়, মিথ্যে হলে রক্ষা নাই। মিথ্যে বড় পাপ নাই। তীর্থে যজ  
করলে, দানদান করলে পিতার উদ্ধার ঘটে। মিথ্যাবাক্যে পিতার নরকবাস হবেই। পড়াশোনা  
করে পুত্র সুপুরুষ হয়। সে গয়ায় তিল-কুশ ধরে পিতার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করে। সেই পুণ্য  
লাভ করে যে সত্যবাদী বলে— একথা পুরাণে মহামুনি ব্যাস বলেছেন। সত্যের মতো  
বাণীধর্ম শ্রবণে শুনি না। অসত্যের মতন পাপ ত্রিভুবনে নাই। অবনী বলে—কী বলে?  
অবনী বলেছে আমি সব ভাষা বইতে পারি কিন্তু মিথ্যাবাদীর বোকা বইতে নারি। এই যে  
রাজ-শরীর দেখছো তাতে ইন্দ্র, অগ্নি, দণ্ডধর, নৈরিত, অরুণ কত দেবতার বাস। যে লোক  
রাজার সঙ্গে ভণ্ডামি করে বিধাতার হাত থেকে তার ছাড়ান নাই। জলে দাঁড়িয়ে পুং মূখ  
করে দাঁড়াও। সামনে তোমার একাশ পুরুষ। এবার বল। মিথ্যে বললে যতদিন চন্দ্র-নিবাকর  
ততদিন তোমার একাশ পুরুষ নরকে পচবে।

সাধুর কথা শুনে কর্ণধার বলে— আমি হেতায় গজ, কামিনী, কমল কিছুই দেখিনি।  
রাজা বলে— ধর্মে মতি রেখে সাধী সত্য বলেছে। আপন সাধীতেই সাধু হেরে গেছে।  
মানুষজনকে সাধী রেখে রাজা সদাগরকে বাঁধে। ওদিকে রাজার কথায় কোটাল মধুকর  
লুট করে।

আনিয়া নায়ের দড়া

সাধের বাঁধে পিছমোড়া

কোটালে গছায় নৃপবর।

ঝাঁপ দিয়া পড়ে জলে

তেজি দণ্ড দাঁড়িয়ালে



নাহিয়া পাইক পরাণে কাতর।।	সজনে বাজায় শিঙা
বাজেয়াণ্ড হইল ডিঙা	রণভেরী দুন্দুভি বাজন।
রাজার প্রধান দেখে	ভাঙারে কায়স্থ লিখে
যে জন পলাইয়া যায়	বলদ-শকটে বাহে ধন।।
ধরিয়া সাধুর সাথি	তাড়াতাড়ি ধরে তায়
	বলে লয় ভূষণ চন্দন।
যত পায় তত লয় ধন।।	বিক্রপ করিয়া তথি

সদাগরের সব অলঙ্কার কেড়ে নেয়। কর্ণপূর, অঙ্গুরি, বালা, সোনার কঞ্চমালা লুটে নেয় কোটাল। তাকে কারাগারে নিয়ে যায়। ধাক্কা দিয়ে কারাগ্রহরী তাকে ভেতরে ঢেলে দেয়। কাঠ-কলে পা ঝেঁপে তার মাথা মুগুন করে। চারপাশে বদ্ধজন কেহ নাই। শয্যা হল খুলো, সঙ্গী হল চামচিকে। ছাবাপোকার কামড়ে ঘুম টুটে যায়। দৈবোর কি লীলা! ধনপতি সদাগরের কানে মশা গীত গায়, চারপাশে ইদুরে কীর্তন করে। কখনো দুহুখে সদাগর কাঁদে, কখনো রাজার ওপর রেগে গালমন্দ করে।

অভয়া সবই জানলেন। স্বপ্নে সদাগরের মাথার কাছে এসে বসলেন। মা বললেন তিনি সাধুকে সব ধন ফিরিয়ে দেবেন।

স্মরণ করিবে যবে, ভবানী ভবানী।  
কালীদেহে দেখাইব কমলে কামিনী।।  
তুলি দিব মগরায় ডুব ছায়া নয়।  
তথা ভরি দিব সাধু যত ধন চায়।।  
মণি মুক্তা প্রবালে পুরিব মধুকর।  
চাকর করিয়া দিব সিংহল-ঈশ্বর।।  
বিবাদে ডুবিল সাত তরবার ধন।  
আমারে পুজিলে তোমা রাখিব এখন।।  
নির্বিকি সাধুরে কত বুঝাব বিশেষ।  
বরাব ধবল ছাতা বাট্যা দিব দেশ।।

স্বপ্ন দেখে উঠে বসে ধনপতি। বলে, 'ভাকিনী এখনো আমাকে দুর্গতির ভয় দেখায়?' সে কথা শুনে লজ্জায় মরে যান ভবানী। মুখে আঁচল চেপে উঠে দাঁড়ান। তিনি চলেন খুল্লনার কাছে।

ওদিকে লহনা-খুল্লনার ভাড়ার খালি। খুল্লনাকে লহনা বলে—লাজ করিস নে। কি খেতে মন চায় বল। তোকে আমার হাতে সৈপে দিয়ে প্রাণনাশ দূরে চলে গেছে। বোন, তোরে আমার বড় ভয়। দু-চারদিনের ভেতর সদাগর ফিরবে। বড় ভাবনায় আছি রে, এসে কি গালাগালি না দেয়। তুই পোখম পোয়াতি। দিন-রাত হাই উঠছে তোরা। দিনে দিনে বল কমছে। একটুকুতেই ঠাঁফ ধরে। না-জানি কফ-পিত্তির কি হাল। দুইলাকে সঙ্গে নিয়ে নদীতে

যা। চুলে আমলকির তেল দিয়ে চান কর। পেটে অন্ন-মূল গেলে প্রসবে বল পাবি। দিনে দিনে তোকে বড় রুগ্ন লাগে।

লহনা বলে গর্ভের কারণে তার বৃথা পরাণ যায়। মা-বাবা দূরে, বামী দেশান্তরে—লহনা ছাড়া কেইবা তাকে দেখার আছে! পেটের ভারে উঠে দাঁড়াতে পারে না। যদি মাটি ধরে উঠে দাঁড়ায়, দশ-বিশ পা না ফেলতে সারা গা কাঁপে। একটুও বল নাই শরীরে।

গর্ভের দেখিয়া ভর মনে বড় লাগে ডর

কুধা তুষণ নাহি এক মাস।

আপনার যার মন যদি পাই সে ব্যঞ্জন

তবে খাই দুই-চারি গ্রাস।।

লতাপাতা বন শাক খর ছালে করি পাক

সান্তোলি লবণ তথি নাস্তোলিবে জোয়ানি ফোড়ঙ্গ দিয়া।

বহিনেরে যদি কর দয়া।।

নি-ধান করিয়া খই দিয়া হিং জিরা মেথি

আমড়া সংযোগে রাসা শাক।

যদি কিছু পাই সুখ তাহাতে মহিষা দই

আমশীতে প্রাণ পাই রাখ।।

আমি যেন পাই সোনা আশ্র মসুরের সুপ

হরিদ্রা-রঞ্জিত কঁজি শাক-কুল মংসের পোনা

বন-শাকে বড়ই পিরিতি।।

দুয়া বার হাত শাড়ীকে দু-পালটা করে পরে। তারপর রঙিন চুপড়ি কাঁখে শাক তুলতে

বেরোয়। নটে, রাসা, পাট, পালং, লগিতা তোলে। পলতার তেতো উগার সঙ্গে পটোলও

তোলে। চুপড়িতে রেখে আবার শাক তুলতে তুলতে চলে—সাঁজতা, বনতা, বন-পুই,

ভদ্রপলা, হিজলী, কলমী, ডানিকলা। ফেতে ফেতে ঘুরে নটিয়া, বেথুয়া, যহরী, গুলফা,

ধন্যা, ক্ষীরপাই, বেতের পাতা ছেঁড়ে। হাত নাড়তে নাড়তে লোকের বাড়িতে ঢোকে। ছোট

বউয়ের মুখ-অরুচির কথা শোনায়। তারপর ডগা দেখে দেখে পুই, পুনাকো, কাঁচড়া কাটে।

কাঁকড় গাছের আগা, লাউয়ের ডগাও কাটে। করলা নেয় খানিক। নরম দেখে যান কয়েক

সর্ষের উঁটা তোলে। বলা শাকও দুমুঠো চুপড়িতে ভরে।

ঘরে ফেরে দুয়া। শাক, সবজি, মাছ নিয়ে পুকুরঘাটে ধুয়ে আসে। আগে শাক রাসা

সারে লহনা। ঘণ্টা রেখে পাথরের বাটিতে আজাড় করে। তাড়াতাড়ি কড়ায় নালিতার শাক

চড়ায়। ঘিয়ে জবজবে করে ভেজে বাথুয়া-শাক চড়ায়। সর্ষের তেলে শাক ভাজা সেয়ে

চিতলের পেটি ছাঁকে কড়ায়। তারপর আলু, বড়ি, কুমড়া দিয়ে রুইয়ের ঝোল করে। কুল

দিয়ে শোল মাছের অঞ্চল করে, আম দিয়ে মুসুরীর ডাল। পন দুই সরেস পুটি মাছ ভাজে।

খুল্লনার জন্যে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রাখল লহনা। থালা ভরে ভাত দিল, বাটিতে বাটিতে তরকারী।

খুল্লনা সাধ খায়।

প্রভাতে উঠিয়া বলে খুন্দনা সুন্দরী।  
বেদনায় জানহত হইয়া বৃষ্টি মরি।।  
হেনকালে লহনা কহিল দুবলারে।  
ধাইকে ডাকিয়া আন চলহ নগারে।।  
সূতিকা ভবনে নিল খুন্দনার তরে।  
এয়ো-স্ত্রী অমাত্য আইল তার পরে।।  
বাথায় আকুল রামা ভবানীরে স্মরে।  
প্রাণরক্ষা কর মাতা বলে বায়ে বায়ে।।

সূতিকা ভবনে এসে নারায়নী খুন্দনার মাথায় হাত রাখলেন। আশীর্বাদ দিলেন। ব্রাহ্মণীর বেশে এলেও তাঁকে চিনতে অসুবিধে হল না খুন্দনার। দেবীর পা-দুটি ভড়িয়ে ধরে বলে—  
'এ-বিপদে রক্ষা কর মা।' গোপনে দেবী গুপথ্য বাটলেন। সে গুপথে খুন্দনার বিপদ কাটল।  
খুন্দনার হ্রসব-বেদনা ওঠে। ভক্তরা ধর্মঠাকুরকে স্মরণ করে যেমন শূলে চড়ে খুন্দনা তেমন অভয়ায় স্মরণ করে বেগ দিল। গর্ভের ফুলটি মাটিতে পড়ে।

ক্ষিতি তলে পড়ি শিশু করে ওড়া ওড়া।  
কনকরুচির রূপ কি দিব উপমা।।  
নব শশী জিনি মুখ পদ্মজ লোচন।  
ছুতোরের কুন্দে যেন অভিন্ন মদন।।

দুয়া আনন্দে ছুটে বহিরে আসে। দুয়ারে জাল, বেত আর জুতো ঝোলায়। চালের খড় ছিড়ে আগুন জ্বালে আঁতড় ঘরের সামনে। গো-মুণ্ড এনে দরজার সামনে রাখে।  
ছেলে-খাকি রাক্ষসী যষ্টাবুড়ি গোরুর মাথা খেয়ে তুষ্ট হোক। আমাদের ছেলেয় যেন চোখ না পড়ে। উলুধ্বনি দিল পাড়াপড়শি বউ-ঝিরা। নাড়ি কাটল থাই-মা।  
তৃতীয় দিনে লহনা পথা ও পাচন খেল।

।। সপ্তম দিবস দিবা পর্ব সমাপ্ত ।।

[ আখ্যানটির আদি অংশ 'নন্দনা' পত্রিকার ১৯৯৮ শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল — সম্পাদক ]

## বনফুল জন্মশতবর্ষ স্মরণে বিশেষ ক্রোড়পত্র

এখনো মরণকাল প্রবাহিত হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না।

বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না।

বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না।

বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না।

বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না।

বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না।

বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না।

বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না।

বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না।

বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না। বনফুল জন্মের শতবর্ষ হইল না।



## শ্যামল চিত্রশাস্ত্র

### প্রাকশিত বনফুল

## অপ্রকাশিত বনফুল

ড: সরোজ মোহন মিত্র

জীবন যত দীর্ঘই হোক না কেন হঠাৎ যখন তার দীপ নিভে যায় তখন তাঁর অপ্রকাশিত কিছু থাকেই। লেখক বনফুলেরও দীর্ঘ আশি বছরের জীবনে প্রকাশিত সৃষ্টির পরিমাণ বিপুল হলেও তাঁরও কিছু অপ্রকাশিত রচনা অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পরে অনেক কিছু প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থাকারে ছাড়াও তা হয়েছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়।

এখানে অপ্রকাশিত বলতে আমার প্রকাশ করছি তাঁর বেশ কিছু দিনলিপি এবং একটি ভাষণ। দিনলিপি আছে তাঁর হাতের লেখায় আর ভাষণটি মুদ্রিত আকারে সভায় পঠিত এবং বিতরিত হয়েছিল।

বনফুলের সুদীর্ঘ লেখকজীবনে দিনলিপির সন্ধান পাওয়া যায় জীবনের শেষ আট বৎসরে। এ ছাড়া, তিনি সারাজীবনে প্রকৃতপক্ষে দিনলিপি লেখার অবসরও পান নি। তাঁর জীবনের বেশীর ভাগ সময় কেটেছে বিহারের ভাগলপুরে। সেখানে তাঁর লৌকিক পরিচয় ডাক্তার হিসেবে আর বৃহত্তর পরিচয় সাহিত্যিক হিসেবে। নানা পত্র-পত্রিকা এবং প্রকাশকের তাগিদে তাঁকে তাঁর প্রতিটি অবসরমুহুর্ত লেখার জন্য ব্যয় করতে হতো। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে তিনি তাঁর 'পঞ্চাৎপট' গ্রন্থে লিখেছেন, "ভাগলপুরে আমি ১৯৬৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ছিলাম এবং সেখানে আমার জীবনধারণ প্রায় একই গতিতে প্রবাহিত হইতেছিল।" ডাক্তারি, সাহিত্য এবং নিজের খেয়াল-খুশি লইয়া থাকিতাম। রোগীর চাপে ডাক্তারি করিতাম এবং প্রকাশকদের চাপে লিখিতাম। অনেক প্রকাশক আমাকে অগ্রিম টাকা দিতেন। সসে শর্ত থাকিত পরবর্তী লিখিলে তাহাদের দিব। ইহার বেশী কোন শর্তে আমি আবদ্ধ হই নাই। বেঙ্গল পাবলিশার্স আমার দুই ছেলের পড়ার খরচ মাসে মাসে দিতেন। তাহারা প্রেসিডেন্সি কলেজে B.Sc পড়িয়াছিল। তাহার পর একজন মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়ে, ইহার নাম অসীম। আমার ছোট ছেলে চিরন্তন শিবপুর কলেজে B.E পড়িবার জন্য ভর্তি হয়। ইহাদের পড়ার খরচ বেঙ্গল পাবলিশার্স দিয়াছিল এবং সে সব টাকা বই লিখিয়া শোধ করিয়াছিল। ডি. এম লাইব্রেরীর গোপালদাও আমাকে অনেক টাকা অগ্রিম দিয়া আমার অনেক উপকার করিয়াছেন। আমার দুই মেয়ে কেয়া আর করবী। তাহাদের বিবাহ কলিকাতাতেই দিয়াছিল। তাহাদের বিবাহের খরচের অনেক টাকা গোপালদা দিয়াছিলেন। তাহাকেও বই দিয়াই সব টাকা শোধ করিয়াছি। টাকা শোধ করিতে হইবে এ চাপ যদি না থাকিত তাহা হইলে হয়তো আমি এত বই লিখিতাম না। ওনিয়াছি বিখ্যাত ইংরেজী উপন্যাস লেখক রুটও অধিক খণের চাপে পড়িয়া বই লিখিয়াছিলেন। তাগিদ না থাকিলে কখনও বেশী লেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথকেও অর্থের তাগিদে বই লিখিতে হইয়াছে। আমি অবশ্য যা তা আর্বোল তাবোল লিখিয়া আমার ঋণশোধ করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা আমি করি নাই। আমি প্রতিটি বইতে নতুন স্বাদ পরিবেশন করিয়া ভালো বই লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি" (পৃ: ৩০৯)।

এই বই লেখার চাপে কখনো দিনলিপির কথা হয়তো ভাবতে পারেন নি। তারপর ১৯৬৮ সালেই তিনি ভাগলপুরের বাড়ি বিক্রী করে দিয়ে পাকাপাকি কোলকাতায় এসে বাস করতে লাগলেন। ১৯৭১ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে তিনি দিনলিপি লিখতে শুরু করেন। অবশ্য

তিনি তাকে দিনলিপি বা বলে নতুন নাম দিলেন ‘মর্জিমহল’। এই নামটিও অদ্ভুত। বনফুলের চরিত্রের সঙ্গে এর সুন্দর মিল আছে। বনফুলের নিত্যকার জীবনযাপন অনেকটা রাত্নিনী বাঁধা। ডাক্তারি আর সাহিত্য চর্চা। কিন্তু তার মধ্যেও তার খোয়াল-খুশিই বড়। গতানুগতিকতার পাখে চলতে তিনি অভ্যস্ত নন। জীবিকার তাগিদে তাকে নিয়ম মেনে লাথরেটরিতে যেতে হয়েছে। প্রকাশকের ধার শোধ করতে রাত্নিনী মেনে লিখতে বসতে হয়েছে। তবু তিনি মেতে থাকতেন তার খোয়াল-খুশি বা মর্জি নিয়ে। ইচ্ছে হলে পাখি শিকারে বেরিয়ে পড়তেন। নানা পাখি জন্তু পুষতে লাগলেন। ছাত্র-জীবনে যখন সকলে নানা রোমাটিক আবেগ নিয়ে কবিতা লেখে তখন বনফুল লিখলেন ‘বিরোধের ব্যাকরণ’, ‘ছাত্রপেখা’ প্রভৃতি কবিতা। মেডিকেল কলেজে পড়ার সময় যখন বন্ধু শিবদাসের সঙ্গে স্টেশনের কোয়ার্টারে ছিলেন তখন একদিন চন্দ্রগ্রহণের সময় ছাদে বসে গ্রহণ দেখতে দেখতে ভাত খেলেন। ব্যক্তিজীবনে ভীষণ খামখোয়ালী ছিলেন এবং নিজের মর্জিমতে চলতেই ভালোবাসতেন।

নিজের এই খোয়ালী স্বভাব সম্পর্কে বনফুল তার পঞ্চাংগট গ্রন্থে লিখেছেন, “আমার একটা স্বভাব, আমি একঘেয়ে ব্যাপার বেশীদিন বরদাস্ত করিতে পারি না। উপর্যাপর একই রকম তরকারি খাইতে পারি না। আমার আহারের বেচিছোর জন্য লীলাবতীকেও নানারূপ নতুন রান্না শিখিতে হইয়াছে। আমি নিজের মাঝে মাঝে রান্নাঘরে ঢুকিয়া নতুন ধরনের কিছু রান্নাবান্না চেষ্টা করিতাম। ডিম-বেগুন, ব্রেন-বর্টি, লাউয়ের স্ট্রা প্রভৃতি নানারকম experiment করিয়াছি। মাংসেরও রোস্ট, স্ট্রা, শিককাবার প্রভৃতি করিয়াছি।

লিখিবার বেলাতেও আমার এই স্বভাব ক্রমশঃ নিজেকে জাহির করিতে থাকিল। কিছুদিন বাদ্দ কবিতা লিখিবার পরই ব্যঙ্গকবিতা লেখায় আর রুচি রহিল না। আমি তখন একদিন ‘তুলুখণ্ড’ নাম দিয়া একটি গদ্য-পদ্য মিশ্রিত গল্প লিখিয়া ফেলিলাম। পরে শুনিয়াছি, ইহাকেই সংস্কৃতে নারিক ‘চম্পুকাব্য’ বলে।’ (পৃ ২২৭)।

আবার উপন্যাস লিখতে লিখতে নাটক লিখে ফেলেছেন, আবার নাটক লিখতে লিখতে গল্প, গল্প লিখতে লিখতে নাটক। আবার সময় সময় প্রবন্ধ, কার্টুন। নানা আঙ্গিকে তিনি লিখেছেন। তিনি লিখেছেন “মনে যখন একটা গল্পের গট আসে তখন যে আঙ্গিকে লিখিলে তাহা সর্বোৎকৃষ্টতারে বলা যায় আমি সেই আঙ্গিকেই লিখিয়াছি। এতনা আমার অনেক গল্প নাটকের আঙ্গিকে লেখা” (পৃ ৩০৮, পঞ্চাংগট)।

তিনি যে খোয়ালী মানুষ একথা তিনি নিজেরই বহু জায়গায় স্বীকার করেছেন। “আমি ঢাকা রোজগার করিতাম এবং নিজের নানারকম খোয়াল লইয়া থাকিতাম। লেখা ছাড়া, ছবি আঁকা, মাঝে মাঝে নৃতন স্বাদের রান্না করা, গোলাপ ফুলের বাগান করা, বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্ৰণ করিয়া খাওয়ানো, দিনে পাখি দেখা, রাতে আকাশচর্চা করা। অর্থাৎ আমি আমাকে লইয়া এবং আমার খোয়াল লইয়া দিনরাত ব্যস্ত থাকিতাম।” (পঞ্চাংগট পৃ ৩৬১)।

এই খোয়ালী মনের ছবিই পাওয়া যাবে মর্জিমহলে। দীর্ঘ আট বছর ধরে তিনি এই মর্জিমহল লিখেছেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, “১৯৭১ সালের ১লা জানুয়ারি হইতে মর্জিমহল লিখিতে শুরু করিলাম। এক খণ্ড ‘মর্জিমহল’ গ্রন্থাকারে বাহির হইয়াছে। ‘সন্নিমধ’ পত্রিকায় ‘কিত্যি খণ্ড’ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছে। এই ‘মর্জিমহল’ বর্তমান জীবনের পটভূমিকায় আমার নানা মেজাজ, নানা আমেজ, নানা খুশী, অখুশী, নানা খামখোয়ালির অলেখ্য। এই হিসাবে এটা আমার জীবন চরিত্রের একটা অংশ, যদিও তাহা ভিন্ন আঙ্গিকে লেখা। এগুলি পুথুকাব্যের

এখনও প্রকাশিত হয় নাই।” (য: বনফুল রচনাবলী, ২৪ খণ্ড পৃ ৩৮৭ — সম্পাদক ড: সরোজমোহন মিত্র)।

মর্জিমহলের প্রথম খণ্ড বনফুল রচনাবলীর ২৪ তম খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে। বাকী খণ্ডগুলো এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। আমরা এখানে সময় অনূযায়ী বিধিভাবে বনফুলের মর্জিমহলের বাকী খণ্ডগুলোর কিছু পরিচয় উপস্থিত করছি। তার মধ্য দিয়েই আমরা বনফুল চরিত্রের নানা মেজাজ এবং গুণী-মানুষটার বৈশিষ্ট্য অনুভব করতে পারব। বনফুল দীর্ঘদিন ধরে যে সাহিত্য সাধনা করেছেন এই লেখার মধ্যে তারও পরিচয় পাওয়া যাবে। আমরা ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত তিনি যে মর্জিমহল লিখেছেন তার অনুলিপি উপস্থিত করছি। এর মধ্যে আমরা দেখতে পার বনফুলের বাঙালির সাহিত্য সংস্কৃতি এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য আন্তরিক গর্বোবোধ, সাম্প্রতিক কালের সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর মতামত, স্বাধীনতা উত্তর ভারতীয় রাজনীতি এবং তার হাল হকিকৎ সম্পর্কে উদ্বেগ এবং সর্বোপরি তাঁর কৌতুক এবং রসবোধ।

### বাঙালি সম্পর্কে :

বনফুল বার বার জোর দিয়ে বলতেন, “পালিটিয়ে আমি ঢুকি নাই, কিন্তু তবু পলিটিকাল খবর মনকে বিচলিত করিত।” মনে মনে তিনি কংগ্রেসীই ছিলেন, মহাত্মা গান্ধীর উপর তাঁর খুব শ্রদ্ধা ছিল কিন্তু নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে যখন কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করা হলে তখন তিনি খুব বড় আঘাত পেয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

“তখন, কেমন যেন আবছাভাবে মনে হইল, মহাত্মাজী একটি অব্যঞ্জালী দলের নেতা এবং সে দলের বাঙালীদের প্রভুত্ব চলিবে না। গান্ধীজীর এই দলটিই পরে ভারতকে দুই ভাগ করিয়া ইংরেজদের নিকট হইতে স্বাধীনতা ভিক্ষা লইয়াছিলেন। এই দলই পরে গদিতে বসিয়া সীতাত্যাক প্রভৃতিকে দিয়া যে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহাতে বাঙালী শহীদদের সম্মানের স্থান নাই। স্বাধীন গভর্নমেন্টের অর্থনৈতিক্যে যে সরকারী ইতিহাস লেখা হইয়াছে, তাহাতেও অগ্রযুগের সমাজজনক বিবরণ নাই।” (পৃ ২৪৪) স্বদেশীযুগের উদ্দামতার প্রতি বনফুলের একটা পক্ষপাতিত্ব ছিল। তাঁর অগ্নীশ্বর উপন্যাসে তার পরিচয় আছে। গোটা উপন্যাসটিই স্বদেশীযুগের উদ্দামতার লেখা। সন্ত্রাসবাদের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় তখন বহু যুবক দেশোদ্ধারের কার্যে আত্মোৎসর্গ করেছিল। এই উপন্যাসের কথকণ্ড এই বোমার দলে যোগ দিয়েছিলেন।

সন্ত্রাসবাদী উত্তেজনার উত্তাপ এবং নিভীক দেশপ্রবণতা দিয়ে এই উপন্যাসের গুরু। শেষেও হয়েছে স্বাধীন ভারতবর্ষে নতুন সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে। বিদ্রোহ বাঙালির মজাগত। “স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে বাঙালি একদিন ইংরেজের সঙ্গে লড়েছিল এইবার তার দুর্নীতির সঙ্গে লড়া উচিত। যদি দরকার হয় তার জন্য প্রাণ দিক।” এই মনোভাব নিয়েই তিনি অগ্নীশ্বর উপন্যাসে ডাঃ অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়ের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন।

বাঙালি জাতি সম্পর্কে তাঁর উদ্বেগের কথা তিনি পঞ্চাংগটেও লিখেছেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পাওয়ার পরে বাঙালি জাতির আদর্শহীন দুরবস্থার কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, “সেকালের কথা ভাবিতে গিয়া এবং সেকালের সহিত একালের তুলনা করিতে গিয়া একটা কথাই মনে হইতেছে। চাকুরিজীবী এবং চাকুরিসর্বশ্ব বাঙালি আজ বড় দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে।







সমর্থন করতে পারেন নি। তা ছাড়া সাহিত্যিকদেরও যথেষ্ট অবনমন ঘটেছে। তারা নানা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বা বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানের স্বাক্ষরতা করে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করে ফেলেছেন। ফলে শারদীয়া পত্র পত্রিকায় যা প্রকাশিত হয় সেগুলো সব সময় ঘরে রাখার যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। তুলনায় লিটল ম্যাগাজিনগুলোর মান অনেক ভাল। এমনি নানা মন্তব্য, বনফুলের নানা উদ্বেগ, যন্ত্রণা এবং ভাবনার কথা এগুলোর মধ্যে পাওয়া যায়।

সংবাদপত্র : ৭২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ৭৩ সালের ২৯ মার্চ এবং ৭৮ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি এবং ২৯ আগস্ট তারিখের লেখায় সংবাদপত্র সম্পর্কে বনফুলের নানা মন্তব্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য শিক্ষা, সাহিত্য ও সাহিত্যিক পর্বেও এই সম্পর্কে তিনি কিছু মন্তব্য করেছেন।

সংবাদপত্রের প্রধান দায়িত্ব বিভিন্ন সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে জনমত তৈরি করা কিন্তু বর্তমানে আমাদের সংবাদপত্রে বিশেষ করে বাংলা সংবাদপত্রে তার একান্ত অভাব। তিনি লিখেছেন, “আজকাল নিরপেক্ষ কাগজ কদাচিৎ দেখতে পাই। প্রত্যেক কাগজকে কেন্দ্র করে একটা ব্যবসা আর সেই কাগজের সর্বোদয়ে সেই ব্যবসায়ীদের প্রচলিত বইয়ের প্রশংসা লিপ্ত বিজ্ঞাপন।” তিনি আরও লিখেছেন আমাদের জনপ্রিয় বাংলা কাগজগুলি আমাদের চরিত্রের দর্শন। সত্য মিথ্যা যাই হোক এতে থাকবে খুন, ডাকাতি, নারী ধর্ষণ, রাজনৈতিক হত্যা বা রাজনৈতিক নেতাদের কেহ প্রভৃতি নানা উত্তেজক খবর আর থাকবে কর্মখালি, বিবাহের বিজ্ঞাপন, নিরুদ্দেশ আর জোড়িঘাটা—আপনার দিনটি কেমন যাবে ইত্যাদি। তিনি মনে করতেন খবরের কাগজ পড়াতা যুগপৎ পয়সা আর সময় নষ্ট।

স্বাধীনতা, সুবিধাবাদী রাজনীতি, সরকারী প্রশাসন : বনফুলের অধিকাংশ লেখাই এই সব বিষয়ের উপর। এগুলোর বিস্তৃত তরির উদ্বেগের কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। ভারতের স্বাধীনতা পাওয়ার পরে তিনি দীর্ঘ ব্রিষ বসন্তের উপর বেঁচেছিলেন। স্বাধীনতা লাভ এবং তারপরে রাজনৈতিক নেতাদের কার্যকলাপ এবং সরকারী প্রশাসন সম্পর্কে তিনি একদিনও নিজেদের সন্তুষ্ট বোধ করতে পারেন নি।

যেভাবে আমাদের স্বাধীনতা এসেছে তাহলে তিনি মনে নিতে পারেন নি। এই স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে যে নিদারুণ ক্যালকাতা কলিহ হয়ে গেল তার পরিপ্রেক্ষিতে বনফুল ‘স্বপ্নসত্ত্ব’ নামে একটি উপন্যাস লিখেছেন। এই উপন্যাসে বনফুলের মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তারপর আমরা যে স্বাধীনতা পেলাম সে সম্পর্কে বনফুল তাঁর পঞ্চাংগুটি গ্রন্থে লিখেছেন, “১৯৪৭ সালে ১৫ই আগস্ট আমরা স্বাধীনতা পাইলাম। ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া সর্বত্র বাঙালীর সর্বনাশের বীজ বপন করিয়া ইংরেজরা চলিয়া গেল। ইংরেজকে ভারতবর্ষ হইতে ত্যাগ করিবার আন্দোলন বাঙালীরাই প্রথমে করিয়াছিল। ইংরেজ তাহার শোধ লইয়া গেল। স্বাধীন ভারতে বাঙালীর গৌরবের স্থান কোথাও রহিল না। স্বাধীনতার পরই দেশে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা আরম্ভ হইয়া গেল। পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ হিন্দু-মুসলমানের রক্তে ভিজিয়া গেল। পাঞ্জাব হইতে দলে দলে লোক এদেশে আসিতে লাগিল। এ দেশ হইতে অনেক মুসলমান পাঞ্জাবী পশ্চিম পাঞ্জাবে চলিয়া গেল। ভারত গর্ভমন্ডে অর্ধ দিয়া তাহাদের সাহায্য করিলেন। উদ্ভাস্ত পাঞ্জাবীরা এখানে ভালোভাবেই নিজেদের স্থান করিয়া লইল। তাহারা দেশে যে সম্পত্তি ফেলিয়া আসিয়াছিল, তাহার মূল্য পাতিল, কিন্তু হিন্দু বাঙালীদের বেলা

গভর্ণমেন্ট কিছু করিলেন না। করিলেন কেবল উদ্ভাস্ত ক্যাম্প। সেখানে বাঙালী হিন্দুরা ভিগারী মত বাস করিতে লাগিলেন। স্বাধীন ভারতেও বাঙালীদের প্রতি এই নিমাত্মসুলভ আচরণ দেখিয়া মনটা বড়ই দমিয়া গেল। মনে হইল, এখনও আমরা, হিন্দু-বাঙালীরা, পরাধীন আছি। এয়াবৎ কেবল, আমাদের আগেকার প্রভুরা ইংরেজ-ভাষাভাষী। ছিলেন, এখনকার প্রভুরা হিন্দু-ভাষাভাষী। হিন্দু-বাঙালীরা সংখ্যা-লব্ধি, তাই শাসনব্যাপারে তাহাদের কোন হাত রহিল না।”

তারপরে মহাত্মা গান্ধী নিহত হলেন। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা টালমাটাল। বনফুলের ‘ব্রিবার্ণ’ উপন্যাসে তাঁর মনোভাবের রূপাঙ্কন ঘটিয়েছেন। এই উপন্যাসে তাঁর গভীর অনুভবেরই ফসল। পাঠক পড়তে পড়তে উপলব্ধি করতে পারবেন উদ্ভাস্ত সমস্যার কী মর্মমুগ্ধা। (দ্র : বনফুল—সাহিত্য জীবন : ৬৩ সেরাজ মোহন মিত্র) বনফুল অন্তর থেকেই এই দেশ বিভাগকে মনে নিতে পারেন নি।

যাঁকে জাতির জনক আখ্যা দিয়ে প্রতি বছর লোক দেখানো শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় তাঁকেই এ দেশে হত্যা করেছে। যে কংগ্রেস দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল স্বাধীনতা পাওয়ার পরে সেই দল ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। দেশে দুর্নীতি, চোরাবাজারি প্রাধান্য পেয়েছে। অবশেষে সেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে জয়প্রকাশ গণআন্দোলন করলেন। সেই জয়প্রকাশের সভা কলকাতায় হৈ হুটগোল এবং গালাগালি দিয়ে ভঙুল করা হয়েছে। বনফুল তাঁর পঞ্চাংগুটি লিখেছেন, “ভোট শিকারী, চোরাবাজারী, এবং কৌশলী বেনিয়ারা আজ দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। বাঙালীরা আজ তাঁহাদের মোসাহেবী করিতে ব্যস্ত। প্রকৃত গুণী এবং ভদ্রলোকেরা আত্মগোপন করিয়া কোনক্রমে আড়ালে আবডালে ঢুকিয়া আছে মাত্র। এই হতভাগ্য সমাজে ‘পল্লুরা’ হইবার জন্য অধিকাংশ সাহিত্যিক সাহিত্য-রচনা করিতেছেন। প্রতিদিন দামামা বাজাইয়া অলিতে গলিতে সাহিত্য-সভা হইতেছে। কিন্তু এ যুগে মহৎ সাহিত্য কতটুকু হইয়াছে তাহার বিচার ভবিষ্যৎ যুগের সাহিত্যরসিকেরা বিচার করিয়া হতশই হইবেন সম্ভবত।”

এর মধ্যেই বনফুলের মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। অপ্রকাশিত বনফুলের বিস্তৃত লেখার সঙ্গে পরিচিত হয়ে পাঠক নিজেই তা উপলব্ধি করতে পারবেন। আমরা আমাদের দেশকে একটা বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ বলে গর্ব করে থাকি কিন্তু বনফুল বলেন, “যে দেশে এত চোর এত লোভী সে দেশে গণতন্ত্র কি সম্ভব? টাকা ফেললেই ভোটেরা সেদিকে ছড়মুড় করে চলে যাবে। সেই ভোটের জোরে যারা মন্ত্রী হয়ে দেশ শাসন করছেন টাকা কি সত্যি জনগণের প্রতিনিধি? নিশ্চয়ই না। আমরা মুখে যত বড় কথাই বলি না কেন সবই ফাঁকা। কথার সঙ্গে কাজের কোন মিল নেই। শাসন ক্ষমতা তো ব্যবসায়ী আর কালোবাজারীদের হাতে। তাহাই দেশ চালায়। কারণ তাদের টাকা না হলে নির্বাচনে জেতা যায় না। যারা টাকা দিয়ে নির্বাচন চালায় প্রকৃত ক্ষমতা তাদের টাকার হাতে।

তাই তিনি এর পরিবর্তন চান। তবে কীভাবে এই পরিবর্তন আসবে তা তিনি জানেন না। ৭৪ সালের ২০ জানুয়ারি তারিখে তিনি লিখেছেন, “আমাদের আজ বড় দুঃখ। স্বাধীনতা টেকে আমাদের হরদম খ্যালালছে। সব চুরমার হয়ে গেল। কারো মনে আশঙ্কা নেই। আর একটা যে জিনিস চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে বিশ্বাস। কারো উপর কারো বিশ্বাস নেই। সবাই সবাইকে মনে করছে চোর, মতলববাজ, ভণ্ড, স্বার্থপর। জীবনযাত্রায় ‘বিশ্বাস’ একটা



মস্ত মূলধন। এ জিনিস না থাকলে হালহীন নৌকার মতো অবস্থা হয় মানুষের। পুরাণে পড়েছি হিরণ্যকশিপুর রাজত্বকালে এ রকম অবস্থা হয়েছিল। স্তম্ভ বিধীর্ণ করে নুসিৎ অবতার অবির্ত হ হয়েছিলেন ধ্বংস করবার জন্য। ভাবছি এমনি একেই ব্যাপার এ কালে হবে কি?”

বনফুলের এ লেখা মর্জিমহল হলেও যেহেতু দিনলিপি সেজন্য এর মধ্যে তৎকালীন ঘটনার একটা বিশস্ত পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলো আসলে ইতিহাসের উপাদান। অবশ্যই বনফুলের দৃষ্টিতে। এর মধ্যে আমরা দেখতে পাব বনফুল ব্যক্তিগতভাবে কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত ছিলেন না এমন কি কোন বিশেষ মতদর্শন প্রকাশ করেন না। তিনি সবসময় একটা সুস্থ মানবিকবোধ থেকে সবকিছুকে পর্যালোচনা করতেন। সেজন্য একদিকে যেমন তিনি বলেন তিনি মহাশয়গান্ধী এবং ইন্দিরা গান্ধীকে পছন্দ করেন তেমনি অনাদিকে সূচাচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বিতাড়নের জন্য তাঁর সমালোচনা করেন, তাঁকে অবাঙালির নেতা বলে সম্বোধন করেন। ইন্দিরা গান্ধীর ‘গরীবী হটাও’ শ্লোগানের সমালোচনা করেন, জরুরী অবস্থা চালু করার নিন্দা করেন, সঞ্জয় গান্ধীকে নিয়ে বাড়বাড়ি সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন। কংগ্রেসী ওগুদের সম্পর্কে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

তিনি রাশিয়ার সাম্যবাদের গ্রহণ রূপকার না কারণ প্রকৃত সাম্যবাদ নাকি ভারতবর্ষেই ছিল। আবার চীনের অন্যতম রূপকার চৌ-এন-লাই-এর মত্ম সংবাদ পড়ে তিনি অভিভূত হয়ে যান। তিনি লেখেন, “যে চীনকে বিদেশী দস্যুরা লুটপাট করে যাচ্ছিল সেই চীনকে তিনি শত্রুমুদ করে শুধু মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন নি তাকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে মহিমায়িত করেছেন। তাঁর চীন লাল চীন। মার্কসিস্ট ছিলেন তিনি। ... ধর্মের নামে, শাসনের নামে, অকথা অত্যাচার হয়েছে গরীবদের উপর, স্বাধীনচেতা ব্যক্তিদের উপর কমিউনিজম তারই প্রতিবাদ। এদের প্রতিশ্রুতি সমগ্র মানবজাতির প্রত্যেকের সর্বপ্রকার উন্নতি।” তখন কী মনে হয় বনফুল কমিউনিজমের বিরোধী!

এখানেই বনফুলের মহত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব। তিনি একজন বুদ্ধিজীবী বিজ্ঞানী, কবি এবং লেখক। তাঁর বিবেকবোধ পরিচ্ছন্ন। তাই তিনি নির্ভীকভাবে যে কোন বিষয়ে মতামত দিতে পারেন। যে কোন অন্যায এবং অবিচার যে কেউ করুক না কেন তিনি অকপটে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারতেন।

**ব্যক্তিগত অনুভব :** অপ্রকাশিত বনফুলের মর্জিমহল যেহেতু তাঁর দিনলিপি সেজন্য এখানে তাঁর ব্যক্তিগত অনুভব, চিন্তা ও চ্যতনার কথা স্বাভাবিকভাবেই প্রাধান্য পাবে। সেখানে তিনি তাঁর একান্ত মতও ব্যক্ত করে রাখেন। নিজেকে নিয়ে কৌতুক করেন, আত্মসমালোচনা করেন। এ সব লেখা পাওয়া যাবে ৭৩ সালের ৭ আগস্ট, ৭৫ সালের ১৩, ২১ ও ২৬ জানুয়ারি। ৭৭ সালের ১২ মার্চ, ১৭ মে, ১ জুন, ২৭ জুলাই, ১২ ও ১৩ নভেম্বর, ৮ ডিসেম্বর, এবং ৭৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২৫ মে ও ৩ অক্টোবর তারিখের দিনলিপিতে।

বনফুলের পক্ষ সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তীতে রামমোহন লাইব্রেরী হলে তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জানানো হয়। আড়াই ঘণ্টা ধরে চলে এই সম্বর্ধনা। অনেক মানপত্র, ফুল এবং বস্ত্রাদি উপহার পেয়েছেন কিন্তু বাড়ি গিয়ে দিনলিপিতে লিখলেন:

পূর্ণকিত হল মন রোমান্ডিত তনু

মনে মনে ভারিলাম আমি একি হনু।

সামান্য বনফুল বনে যে ছিলাম

আমারে লইয়া আজ কি তুলকাম।

ওরে মন হালটাকে ধরে থাক ঠিক

ঝড় ও ঝাপটায় যেন হারায় না দিক।

এখানেও বনফুল স্বস্ত্য নিজেকে নিয়েই নিজে কৌতুক করতে পারতেন। তিনি মূলত ছিলেন কবি। আমরা এই মর্জিমহলের অনেক জায়গাই তার কাব্যরূপের পরিচয় পাই। তিনি ছিলেন খোয়ালি লেখক। লিখতে লিখতে যখন যে আঙ্গিক তার ভালো লাগত তিনি সেই আঙ্গিকেই লিখে ফেলতেন। সেজন্য আমরা তার উপন্যাসে দেখি তিনি গদ্য পদ্য নাটকে একটি উপন্যাস লিখছেন। (৫২ মুগুয়া) আবার গল্প লিখতে লিখতেই নান্য আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন। অপ্রকাশিত বনফুলেও আমরা তার কিছুটা পরিচয় পাব।

বনফুল জানিয়েছেন তাঁর ছিল সুখের সংসার। প্তী-পূর্ণ-কন্যা নিয়ে তিনি আনন্দেই জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু মৃত্যুর প্রায় তিন বৎসর পূর্বে তাঁর স্ত্রী লীলাবতীর মৃত্যু হয়। এই মৃত্যু তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড়ো আঘাত। তাঁর লেখক-জীবনে তাঁর স্ত্রী লীলাবতী সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছেন। তিনি ছিলেন বনফুলের অরিকান্ধ পাণ্ডুলিপির প্রথম পাঠিকা। তাঁর মনোহা মন হলে বনফুল লেখা ছাপতে দিতেন না। তাঁর অবর্তমানে বনফুল বিরাট একশূন্যতা অনুভব করলেন। পরে তাকে কেন্দ্র করে তিনি ‘লী’ নামে একটি উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর মৃত্যুর যতদিন বনফুল মর্জিমহল লিখেছেন ততদিন দিনলিপির পাতায় প্রথম ‘লী’ লিখে পরে যেন তাঁকেই উদ্দেশ্য করে মর্জিমহল লিখতেন।

এই পর্যায়ে দুটি বিশেষ দিকের উল্লেখ করেছি। প্রথমটি হোল ‘ভ্রাতৃত্বীয়া’ সম্পর্কে বনফুল একটি নতুন বাখ্যা দিলেন। এর মধ্যে আমরা বনফুলের দার্শনিক মনের পরিচয় পাই। আর দ্বিতীয়টি হোল কবিতা সম্পর্কে তাঁর মতামত। জীবনে তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন। স্বাভাবিকভাবেই আমরা কবিতা সম্পর্কে তাঁর মতামত জানবার জন্য কৌতুহলী হয়ে উঠি।

সর্বশেষে ‘অপ্রকাশিত বনফুলে’ তিনি কতটা সার্থক হলেন সেটা নির্ভর করে পাঠকদের ব্যক্তিগত মতামতের উপর। কিন্তু মানুষ বনফুল, ব্যক্তি বনফুল এবং লেখক বনফুলের একটি আন্তরিক পরিচয় এর মধ্যে নিহিত আছে।

১৯৭২

**১০ জানুয়ারি** — “আজ শেখ মুজিবর রহমান সকালে দিল্লীতে এসে পৌঁছলেন। রেডিওতে ধারা বিবরণী শুণলাম। চোখে জল এসে গেল। মনে পড়ল আখিয়ারের বীরদের, মনে পড়ল নেতাজীকে। তারা তাঁদের প্রাণা সন্ধান পাননি, একজন বীরকেও যে আমরা তাঁর প্রাণা সন্ধান দিতে পারলাম, এতেই মন ভরে উঠেছে।”

**১৪ ফেব্রুয়ারি** — “প. ব. সরকার সাহিত্যিকদের ইজ্ঞত দেয় না। মুজিবর রহমানের সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের সাক্ষাতের যে নিমন্ত্রণ করেছেন তাকে নামজালা সাহিত্যিক একজনও নেই—সাহিত্যিকরা কি বুদ্ধিজীবী? বুদ্ধি থাকলে কেউ কি সাহিত্যিক হয় এ দেশে? যে দেশে প্রকাশকরা অসাপু, পাঠক পাঠিকারা বৈদিক, যে দেশে সিনেমা সাহিত্যই পপুলার—সে দেশে সাহিত্যিক হওয়াটা কি বুদ্ধির পরিচয়?”

১০ জুলাই — “এই নড়বড়ে গভর্নমেন্ট ধাপ্পা আর ভাঁওতার জোরে কতদিন চলবে? ছাত্ররা বলছে টোকটুকি করতে দিতে হবে এই আমাদের দাবী। গভর্নমেন্টের তরফ থেকে এর প্রাচল সক্রিয় প্রতিবাদ নেই, কর্মচারীরা বলছে, আমরা কাজ করবো না।— ছেলেরা সব পাটিবাজ, নেতারা বক্তৃতাবাজ। এক নিম্নোন্নত ‘উত্তম’ ছাড়া এ দেশে আর কোন প্রকৃত উত্তমের স্থান নেই”।

২৫ সেপ্টেম্বর — “কাগজ খুলেই অনেকগুলি চোর বদমাইসের খবর পেলাম। পয়সা খসড়া করে এসব সংবাদ শোনিবার দরকার কি। .... খবরের কাগজ পড়টা যুগপৎ পয়সা আর সময় নষ্ট।”

২৮ নভেম্বর — কেন্দ্র বাংলাদেশকে তার নাথ্য প্রাপ্তা দিচ্ছেনা বলে কাগজে মাঝে মাঝে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। এ কথা সত্য হলে খুবই অনায়াস, সম্ভব নেই। কিন্তু যে টাকটা আমাদের রাজা সরকার পাচ্ছেন, সে টাকটা কি সুবিধাত হচ্ছে? ... চোরদের পেটেই সব যাচ্ছে। উদ্ভূত বাজার দর আজও উদ্ভূত। যে কালোবাজারিরা ইলেকশন লড়তে টাকা দিয়েছিল তারাই আজ হর্তাকতা বিধাত।

স্বাধীনতা চেয়েছিলাম — পাইনি  
যা পেয়েছি তা আমরা চাইনি  
শয়তানদের স্বাধীনতা হায়রে  
ভদ্রলোকের প্রার্থনা যে যায়ে।

২২ ডিসেম্বর — (“বাঙালী বৈশিষ্ট্য” প্রবন্ধের উল্লেখ) — বাঙালীদের চটিয়ে কোনরাজাই নিজদের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে পারেননি। সকলের উন্নতির মূলেই আছে বাঙালীদের প্রচেষ্টা — অশান্ত বেপারোয়া শিল্পীর জাত বাঙালীরা।

১৯৭৩

৬ ফেব্রুয়ারি — “আসামে যখন বাঙালী নির্যাতন চলছে তখন বঙ্গদেশে আমরা বাঙালীরা ক্রিকেট নিয়ে হৈ চৈ করেছি... পরন্তুকার, সুবিধাবাদী, শক্তিশীলনের দল কিলবিল করছে চার দিকে।

৯ মার্চ — স্বাধীনতার পর যে কাটি আকাজেদিম মার্কী প্রতিষ্ঠান হয়েছে সবগুলি বোটবাজ তেলির অভ্যাস। সাহিত্যিকেরা ব্রাহ্মণ।

৭ আগস্ট — রামজাহান লাইব্রেরী হলে আড়াই ঘণ্টা ধরে সমর্থনা। পঞ্চম সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তী — অনেক ফুলের মালা এবং অনেক উপহার, দুটো বাঁধানো মানপত্র, প্রশস্তি প্রচুর।

— কাপড়, চাদর, পাঞ্জাবীর কাপড়।  
পুলকিত হল মন রোমান্সিত তনু  
মনে মনে ভাবিলাম একি হনু।

সামান্য বনফুল বনে যে ছিলাম  
আমারে লইয়া আজ কি তুলকালাম।

ওরে মন হালটাকে ধরে থাক ঠিক  
বাড় ও কাপড়টায় যেন হারায় না দিক।

২২ আগস্ট — যে দেশে এত চোর, এত লোভী সে দেশে গণতন্ত্র কি সম্ভব? টাকা ফেললেই ভোটদাররা সেদিকে ঠুসে দেয়। সেই ভোটের জোরে যাঁরা মন্ত্রী হয়ে দেশ

শাসন করছেন তাঁরা কি সত্যি জনগণের প্রতিনিধি? নিশ্চয়ই না। তারা শ্লোগান হিসাবে যদিও আউড়ে যাচ্ছেন ‘গরীবী হটাৎ’ কিন্তু গরীবী এবং তার সঙ্গে চুরি হটছে না—বেড়ে যাচ্ছে। গরীব থাকলেই চুরি হবে, আর লোভী থাকলেই গরীব থাকবে।

৩ সেপ্টেম্বর — নীলরতন হাসপাতালে গুণ্ডার দল একটি মড়াকে হাসপাতালে ‘ভর্তি’ না করায় সব তছনছ করেছে। ভারতের যৌনবান্ধির সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। চোর ডাকাতির সংখ্যাও বর্ধমান। বাজারে খাওয়ার দুর্শ্বা।

১০ সেপ্টেম্বর —  
চুরি আর অলসতা প্রাস অযোগ্যতা  
এ তিনের সমন্বয়ে যেই স্বাধীনতা

ভোগ করিতেছে মোরা তা শুধু দুর্ভোগ  
সেখায় সুযোগ নাই কেবলি দুর্যোগ

যুধিষ্ঠির সেজে সেখা যত দুর্যোগ  
দখল করিয়া আছে গোটা সিংহাসন

মুখোশ খুলিয়া যায় কিছু পরে ভাই  
আর এক মুখোশধারী লয় তার ঠাই।

মুখোশের চাকটিকা চক্ষু করে জ্বালা  
মুখোশের বক্তৃতায় কান ঝালাপালা।

১৩ সেপ্টেম্বর — সমাজে একদল লোক আছে যাদের ভদ্রীতা বিদ্রোহী ধরনের — কিন্তু আসলে তারা সুবিধাবাদী অপদার্থ।

২৯ সেপ্টেম্বর — আজকাল নিরপেক্ষ কাগজ কদাচিৎ দেখতে পাই। প্রত্যেক কাগজকে কেন্দ্র করেই একটা ব্যবসা আর সেই কাগজের সর্বদেই সেই ব্যবসায়ীদের প্রচলিত বইয়ের প্রশংসালিপি বিজ্ঞাপন।

২৪ সেপ্টেম্বর — মম্মথের অনুরোধে বারবধু দেখলাম—বিশ্ভূক শূকর শূকরীর অভাব নেই দেশে। এরা বিস্তার ব্যবসা খুলেছেন। রোজাই হাউসফুল হচ্ছে। অসীম কেষ্টকীর অভাবই ভালো। পয়সা রোজগার করবার জন্য এদের এতো নীচে নামতে হয়েছে দেখে দুঃখ হল। আমরা আবার সংস্কৃতির বড়ই করি।

৩১ অক্টোবর — ডি. এম. কে অটোনিমি চাইছে। কেন্দ্র নামের বজ্জতি সেই সেকালের মুসলমান শাসকদের মতোই আচরণ করছেন। লোকের অসন্তোষ তো জাগবেই। বাংলাদেশও কেন্দ্রের নেকনজরে নেই। তাই তারা নানাভাবে বিধবৃত্ত হচ্ছে। তাদের শিল্পোন্নয়ন হচ্ছে না। তাদের ছেলে মেয়েরা চাকরি পাচ্ছে না, গঙ্গার জল নিয়ে টানটানি চলছে।

১০ নভেম্বর — যারা চলতি সমাজের বাস্তব চিত্র একে কাব্য সৃষ্টি করেন তাদের কাব্য খবরের কাগজের মতো স্বল্পায়ু। মানুষ সাহিত্যের ভিতর দিয়ে সুন্দরের মহত্বের স্বপ্ন দেখতে চায়, ... কাব্যে কল্পনা চাই, প্রেরণা দেবার মতো রস থাকা চাই, চিত্রস্নান ফুথার সুখ চাই।

৫ ডিসেম্বর — আমাদের চরিত্র না বদলালে দেশ মরবে — বিদেশীদের সাহায্যের ঠেকানো দিয়ে যে ক’দিন দাঁড়িয়ে থাকা যায়।

১৯৭৪

১২ জানুয়ারি — শোনা যায় আমাদের এই গণতন্ত্র কালোবাজারীদের কৃপা ভিত্তির উপর



হাপিত। সে ভিত্তি নড়ালে আমাদের গণতন্ত্র হয়তো ছড়মুড়িয়ে পড়ে যাবে।

যাদের শিল যাদের নোড়া  
তাদের বিষ-দাঁতের গোড়া  
সেই শিল নোড়া দিয়ে ভাঙা খুব শক্ত  
তবু আমরা ভান করছি ভাঙবো ভাঙবো।  
খিঁচোটির কায়াগুলো মোদের খুব রপ্ত  
শিরায় শিরায় বইছে পচা জল  
একটুও নেই রক্ত।

(এ বছরের প্রথম থেকেই তিনি কাগজে পড়ছেন নানা দুর্নীতি, কংগ্রেসের মধ্যেই মারামারি, হিন্দীরাষ্ট্রের সভায় জুতো ছোড়াছড়ি, তিনি কোন আশার আলো দেখছেন না।)

১৩ জানুয়ারি — আমাদের আজ বড় দুঃখ। স্বাধীনতার চৈকি আমাদের হরদম ধাতলাচ্ছে। সব চরমার হয়ে গেল। কারো মনে আনন্দ নেই। আর একটা যে জিনিস চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে বিশ্বাস। কারো উপর কারো বিশ্বাস নেই। সবাই সবাইকে মনে করছে চোর, মতলববাজ, ভণ্ড স্বার্থপর। জীবনযাত্রায় 'বিশ্বাস' একটা মস্ত মূলধন। এ জিনিস না থাকলে হালধী নৌকার মতো অবস্থা হয় মানুষের। পুরাণে পড়েছি হিরণ্যকশিপুর রাজত্বকালে এ রকম অবস্থা হয়েছিল। স্তম্ভ বিদীর্ণ করে নৃসিংহ অবতার আবির্ভূত হয়েছিলেন ধ্বংস করার জন্য। ভাবছি এ সব সেকেন্দ্রে ব্যাপার একালে হবে কি?

২৬ জানুয়ারি — গুজরাটে বন্দুক, কীদুনে গ্যাস অরিয়াক। রাষ্ট্রপতি বলেছেন কালোবাজারী ও মজুদারদের শাস্তি চাই। আমাদের এ দাবী তো অনেক দিনের। ...কিন্তু ভাবছি বিচারক হয়ং যখন বলেন বিচার চাই, তখন আমরা কোথা যাই।

৪ ফেব্রুয়ারি — সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার। গণকমেট পুরস্কার বিতরণের ছুতোয় সাহিত্যিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চান। মনে হয় তারা সাহিত্যিকদের চট্টকার করবারও প্রয়াস পাচ্ছেন। ...এই পুরস্কার উঠে যাওয়া উচিত।

সত্যিকার পুরস্কার দেন পাঠক-পাঠিকারা।

১ মার্চ — নব কংগ্রেসী এবার তিনটি উপনির্বাচনে গুণ্ডার সাহায্যে ভোট আদায় করেছেন। গুণ্ডার সাহায্যে ভোট নিয়ে, কালোবাজারীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে যেখানে গণতন্ত্র হয় সেখানে এর চেয়ে ভালো শাসন আশা করা বুধা। আগে আমরা একটা সভ্যজাতির পরাধীন ছিলাম। এখন গুণ্ডাদের পরাধীনতা স্বীকার করছি।

১৫ জুন — জয়প্রকাশের আন্দোলন জোরদার। কিন্তু মনুষ্যোচিত শত্রু সমর্থ চরিত্রের লোকের খুব অভাব।

২২ জুলাই — জয়প্রকাশ ছাত্রদের ভিত্তিগত মোহ ত্যাগ করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনে আন্দোলনের যোগ দিতে আহ্বান করেছেন। কিন্তু চরিত্রবল?

২৫ জুলাই — খোসলা কমিশনের রায় বসেছে নেতাজী প্লেন দুর্ঘটনাত্তেই মারা গেছেন, তবে এই রায় নেহরুর এত গুণকীর্তনে সন্দেহ হচ্ছে।

— মনে হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রা হয়েছে। বর্তমান উপাচার্য কেম্বের হাতে বিশ্ববিদ্যালয়টি তুলে দিতে চায়। (তখন উপাচার্য নরেন্দ্র সেন)।

৩০ সেপ্টেম্বর — জয়প্রকাশ কলকাতায় — যে দেশে 'বারবধূ'র মতো এবং 'আসামী হাজির' এর মতো নাটক দিনের পর দিন চলে সে দেশের বারটা অনেকদিন আগেই বেজে গেছে।

৯ অক্টোবর —

বর্তমান শাসন মানে শোষণ

নিজের লোক পোষণ

শক্তিমানকে ত্যাগণ।

ক্ষমতা নেই জনগণের হাতে

ধনী নেতা ক্ষমতা সব কিনছে

জনগণ দিনে এবং রাত্রে

হয়ে যাচ্ছে হা-হারে হা-ভাতে

ভোটারের পর কে তাদের চিনছে।

ইদুরদের দুঃখ মোচন

করছে এসে বিপ্লি

বাঙালীর দুঃখের খবর

নিচ্ছে এসে দিল্লী

গ্রামের শাসন গ্রামবাসীরা

যতদিন না করবে

ততদিন তারা গুণ্ড

বেঘোরোতেই মরবে।

থাকবে না অন্নব্রহ্ম

থাকবে না শিক্ষা

করতে হবে হাফকার

করতে হবে শিক্ষা

এখন যেটা বোঝছি তা ভাই

স্বাধীনতার বেনামীতে পরাধীনতাই।

১২ অক্টোবর — জয়প্রকাশ নারায়ণের দিকে আমরা সাগ্রহে চেয়ে আছি। তার পারালাল গভর্ণমেন্ট এবং নো-টার্স কাম্পেন খুব মোক্ষম ব্রহ্মাস্ত্র।

২৫ নভেম্বর — আগে এই রাজনীতি ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে। ইংরেজ চলে গেছে এখন রাজনীতি লড়ছে সংস্কারকের বিরুদ্ধে। তার মুখে মিথ্যার মুখোশ, হাতে শাসনযন্ত্রের শক্তি। ভদ্রলোকগুলোকে মুড়িয়ে খেয়ে ফেলল। আজ একমাত্র লক্ষ্য — টাকা চাই, টাকা চাই, গদি চাই, গদি চাই।

১৯৭৫

১লা জানুয়ারি — মণিহারীতে ক'দিন ভারী সুখে কাটিয়ে আজই কলকাতায় যাবো। অপটু এবং অসাধু রাজা-শাসকদের জন্য দেশটা শেন ক্রমশই অধঃপতনের দিকে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে জয়প্রকাশ নারায়ণের। কিন্তু এও আশংকা হচ্ছে তার দলে যে সব লোক জুটছে তারা আদর্শবাদী তো?

২ জানুয়ারি — তখন ললিত নারায়ণ রেলমন্ত্রী। তার নাম বগদ নারায়ণ। (কাটিহার থেকে ফাস্ট ক্লাসে এসেছেন) গাড়ির অবস্থা খুব খারাপ। টেবিল ভাঙ্গা, গদি কাটা, আলো নেই, জলের ট্যাঙ্ক ফুটো অথচ ভাড়া গলা কাটা, ট্রেন ৫% ঘণ্টা লেট।

৩ জানুয়ারি — গণতন্ত্র এখন জঘন্যতন্ত্র। ললিত নারায়ণের সভায় বোমা। ললিত নিহত।

১৩ জানুয়ারি — আমাদের মতো সাধারণ লোকেরা রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাই না। আমাদের এই অতি কষ্টের জীবনযাত্রাও যখন পদে পদে বিদ্রিষ্ট হয় তখনই আমরা মাথা ঘামাতে বাধ্য হই।

২১ জানুয়ারি — (বি আর গুপ্ত — পদ্মশ্রীর জন্য বনফুলের সম্মতি নিয়ে গেলেন।) বিনয়বাবুকে আমি শ্রদ্ধা করি, না করতে পারলাম না। ওঁরা আমাদেরও পদ্মবনের যাত্রী বানিয়ে দিল। মনটা অবশ্য আমার পদ্মপত্রের মতো, কোন ভূষণই সেখানে দাঁড়ায় না।

২৬ জানুয়ারি — ‘সকালের কাগজে পদ্মভূষণ পাওয়ার খবর’ বেরিয়েছে। আমাদের দেশের সরকার আমার সাহিত্য সাধনার জন্য আমাকে সম্মানিত করলেন এর একটি আমাদের দিক আছে নিশ্চয়ই। এটা আরও আমাদের এই জন্য যে আমি সরকারের কোনও অনায়েবর সঙ্গে কোনও আপোষ করিনি। তীর প্রতিবাদ করেছি। বাদ করেছি। তা সত্ত্বেও সরকার যে আমার উপর বিক্রপ হননি এটাইই আশ্চর্য।

১৩ ফেব্রুয়ারি — বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চুরি মাওয়া বিষয়মূর্তিটি আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছে। প্রাক্তন কর্মীদের বড়বাড়িই মূর্তিটি চুরি গিয়েছিল।

২৭ ফেব্রুয়ারি — ব্যক্তিহত্যাকে বিসর্জন না দিতে পারলে রাজনৈতিক হওয়া যায় না। প্রত্যেক পাড়িতেই কিছু কিছু ওড়া থাকে। তাদের লক্ষ্য ব্যক্তিহত্যাকে চূর্ণ করা। নিজের কোলের দিকে কোলটানাই সেখানে একমাত্র লক্ষ্য। এই রাজনীতির পান্নায় পড়ে মহাত্মা গান্ধীর মতো লোকের মাহাত্ম্যও ক্ষয় হয়েছিল।

৪ মার্চ — আমাদের দেশে আমরা ক্রমশঃ অনুভব করছি যে ইলেকশনই যত অনর্থ ও পাপের মূল। ইলেকশন লড়বার জন্য নেতারা টাকা ভোগাড় করেন যে সব বড় বড় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সেই ব্যবসায়ীরাই শেষে আমাদের শাসক হয়ে পড়েন। তাদের শাসক না বলে শোষক বলাই উচিত। গণতন্ত্র এ দেশে শোষণতন্ত্র, লেবলম্যান শাসকরা তাদের হাতে ক্লীড়াক মাত্র।

৩ এপ্রিল — কাল কংগ্রেসীদের সি. পি. আই ও গুণ্ডারা হৈ হুলা করে, ইউ টুডে, গালাগাল দিয়ে জয়প্রকাশ নারায়ণকে ইউনিভার্সিটি ইনসিটিউটে বন্দুত্ব দিয়েছেন। বাংলা দেশের মুখ আরও পুড়ে গেল। পুলিশ দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। কারণ, সিদ্ধার্থপরশুর হোম মিনিস্টার-আর সুরতাবা প্রসেসনের পুরোভাগে ছিলেন।

২৮ মে — পশ্চিমবঙ্গের সর্বোত্তম শহর কলিকাতায় জল পাওয়া যায় না, ইলেকট্রিসিটি গায়েব, বাজারে পচা মাছ, রাস্তায় ভীড়, প্রতিটি রাস্তা ঘোঁড়া, সর্বত্র স্তূপাকৃত জঞ্জাল, যাদের ফেনন আছে তাদের ফেননও অচল, এখানকার মাসিকপত্র, থিয়েটার আর সিনেমার ক্রমাগত হানুসের কামকে উত্তেজিত করছে। যে আন্দোলনের পরিকা একদিন দেশকে দেশপ্রসে উদ্ভুদ্ধ করেছিল সেই পত্রিকার আপিস থেকে ‘আন্দোলন’কে বেরিয়ে সকলকে কামে উদ্ভুদ্ধ করছে। এই কলিকাতা শহরেই ‘স্কুলে কলেজে শিক্ষক শিক্ষিকাদের অপমান করা হচ্ছে, গভর্নমেন্ট সে

বিষয়ে উদাসীন। অনেকে বলছেন গভর্নমেন্টই ওদের উদ্বাসিত দিয়েছেন। অর্থাৎ অনেকের মতে গভর্নমেন্ট দেশকে হচ্ছে করে আমানুষ পশু করে দিতে চায়। কারণ, দেশের সবাই মানুষ হলে তাদের জারিজুরি ভেঙে যাবে।

৬ অক্টোবর — নবকল্লোল প্রকাশিত — ‘ঐশ্বরী’ বইটি অভিনয় করার প্রস্তাব এসেছে। আমার কোন বইটি আজ পর্যন্ত নির্ণতভাবে অভিনয় করতে পারেনি কেউ।

১৮ অক্টোবর — নতুন অর্ডিন্যান্স জারি হয়েছে — মিসায় যাদের স্বাধীনতা হরণ করা হচ্ছে তাদের কেন অটাকানো হচ্ছে তার কোন কারণ দেখানো হবে না।

১৭ ডিসেম্বর — পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিকে বাংলা ভাষা আবশ্যিক হল। এ বর পড়ে খুশী হলাম। ১৯৭৯ থেকে বাংলা না পড়ে কেউ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে পারবে না।

২৮ ডিসেম্বর — ধানবাসে কয়লাখনিতে বিধেঘরণ ও প্রাবন হয়ে প্রায় চারশ লোক (৩৭২) বনি গর্ভে জলময় হয়েছে। সমাজের প্রয়োজন মোটানোর জন্য এতগুলো লোক প্রাণ দিল।

৩১ ডিসেম্বর — ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের প্রধান খবর — প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজীর জয়যকার।

আর আমাদের খবর সেই খোড় - বড়ি - খাড়া।

১৯৭৬

২ জানুয়ারি — চাযনালা, ধানবাসের মর্মাস্তিক বনি দুর্ঘটনায় রাশিয়া, আমেরিকা, চীন ও পাকিস্তানও পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

৫ জানুয়ারি — যে সমাজে শিক্ষিত লোকেরা

দুশরিত্র ধনীর কাছে

মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়।

হয়ে গেছে সে সমাজে সর্বস্থানে সর্বনাশের সর্বোদয় —

সে সমাজের ভালো করা কারো বাবার-সখা নয়।

৮ জানুয়ারি — বিনা হালে নৌকা জাহাজ তৈরী হয়না। কিন্তু আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের জীবনতরী ঘরা গড়েন নাগেন তারা সে তরীতে হাল দেন না। সে কর্ণধারহীন তরীর চালক হয় ছেলেমেয়েদের অনিয়ন্ত্রিত খোয়ালখুশি, তরী যখন ডোবে তখন আমরা ছেলেমেয়েদেরই গাল দি। জীবন-তরীর হাল হচ্ছে বিবেক, আমাদের ছেলেমেয়েদের বিবেক নেই। সহজাত যে বুদ্ধি আছে, তাকে স্বার্থের দীপকেই চালিত করে কেবল। তাই তারা ভগবানকে পূজা করে না, টাকাকে পূজা করে। ওণীকে সম্মান দেয় না, ধনীকে দেয়। তাই সমস্ত জাটো লালায়িত কুকুরের মতো ধনীদেব ঘরে ঘরে ঘুরছে যদি কেউ একটুকরো রুটি দেয়। তাদের জীবনে ধর্ম নেই, বিশ্বাস নেই, আছে কেবল লোভ আর পরশীকাতরতা। দেখ ছেলেমেয়েদের নয়, দেখ শিক্ষার। যে নৌকায় হাল নেই যে ডুববেই।

৯ জানুয়ারি — চীনের কীর্তমান নেতা চু-এন-লাইয়ের মৃত্যুসংবাদ আজ কাগজে বেরিয়েছে। যে চীনকে বিদেশী দস্যুরা লুটপাট করে খাচ্ছিল সেই চীনকে তিনি শত্রুমুক্ত করে শুধু মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিতই করেননি তাকে পৃথিবীর অন্যতম ঐশ্বর্যে শক্তিরূপে মহিমায়িত করেছেন। তাঁর চীন লাল চীন। মার্কসিষ্ট ছিলেন তিনি। সব দেশেরই শ্রাচীন ধর্মওলিতে ন্যায় ধর্ম, দয়াধর্ম, প্রভৃতির কথা বারবার বলা হয়েছে, কিন্তু তা কারো পরিণত হয়নি। যর্মের নামে, শাসনের



নামে, অকথা অত্যাচার হয়েছে গরীবদের উপর, স্বাধীনচেতা ব্যক্তিদের উপর, কমিউনিজম তারিফ প্রতিবাদ। এদের প্রতিশ্রুতি সমগ্র মানবজাতির প্রত্যেকের সর্বপ্রকার উন্নতি। সব ধর্মই তা প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজে তা করে না। কমিউনিজম ভবিষ্যতে কি রূপ নেবে তা জানি না। কিন্তু তার আদর্শ যে মহৎ তাতে সন্দেহ নেই। চু-এন-লাই এই আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে শুধু চীনই নয় সমগ্র মানবজাতিই এখন বড় নেতাকে হারাল।

৩ ফেব্রুয়ারি— (অপসংস্কৃতি সম্পর্কে) এ দেশে আলী সিনেমা থিয়েটার ক্যাবারে নাচ দেখিয়ে যে অর্থোপার্জন হয় আমাদের সরকার তার থেকে অর্ধেক নেন। সুতরাং ধরে নিতে হবে তারাও এর পুষ্টপোষক। ..... যেখানে বহু মাদরাসা লোকনা খোলা, যেখানে বহু দূষণগ্রস্ত নারী গর্ভপাত করাবার আইনসম্পত্ত অনুমতি পায়— সে দেশে অপসংস্কৃতি থাকবেই।

৪ ফেব্রুয়ারি— বার্ষিক বর্ষ বিলাতি শায়ি যত অশান্তির মূল। এক ভদ্রলোক তার ছেলেমেয়েদের মাঠে লেখাপড়া শেখানি, তার কথা মনে পড়ল।

১২ ফেব্রুয়ারি— কিছুদিন আগেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ পুড়ে গিয়ে সেটা একটা টোকটিকির আলয় এবং নেপাটিজমের আড্ডায় পরিণত হয়েছিল। ওটা আর বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না পরিণত হয়েছিল ভড়ীতে।

কালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের বাড়িটাও পুড়ে গিয়েছে।

১৩ ফেব্রুয়ারি— প্রধানমন্ত্রীর পুত্র সঞ্জয় গান্ধী কলকাতায় আসছে বলে সবাই শশব্যস্ত, বহু তোরণ হচ্ছে—রাজতন্ত্রে এসব হতে পারে কিন্তু জনতান্ত্র্যে?

৩ মার্চ— ইন্দিরা গান্ধী কলকাতায়—তিনি লেখকদের বিশ্রামে এখন নিরাশা নয় আশার কথা শোনান—অসম্ভব চিন্তে আশার কথা শোনানো যায় কি?

৭ মার্চ— ইন্দিরাজীভূত—বর্তমান education system antiquated ঠিক কথা। কিন্তু education যতই modern হচ্ছে ততই ডুসিমালা বেয়েছে।

... সে যুগে ছাত্রছাত্রীরা 'শিক্ষা চাইতে' এখন চায় সার্টিফিকেট।

৮ মার্চ— বিশ দফা কাজে বরেন্দ্রের বরাদ্দ ১১৬১ কোটি টাকা। এই টাকা থেকে যে কত লোকের পাড়ি হবে, কত লোকের বাড়ি হবে, কত আঙ্গুর যে ফুলে কল্যাণ হবে— সে সব খবর বেরোয়নি।

২৫ মার্চ— বাংলা ভাষা প্রচার ও প্রসারের জন্য আমরা কিছু করি না। বাংলাদেশের বড়লোকেরা ছেলেমেয়েদের english medium স্কুলে পড়ায়।

৭ এপ্রিল— বর্তমানে যে বাংলা জীবিত তাকে দেখলে এইটুকুই শুধু বোঝা যায় যে দীর্ঘকাল চাকরি করার ফলে একটা সজীব আন্দোলন জাতি কি করে নির্জীব চাকরিলোলুপ ভিখারি হয়ে যেতে পারে। বর্তমান বাংলা ইংরেজ শাসনের শেষ ফল।

১২ এপ্রিল— আজকাল শিক্ষা মানে ডিগ্রি সংগ্রহ করা— তা সে চুরি করে, টুকে মুখস্থ করে যেমন করে হোক।

৬ জুন— সাহিত্যকে যারা ব্যবসায় করেছেন তারা ব্যবসায় হয়তো লাভবান হতে পারেন। হচ্ছেনও তো দেখছি। তাঁরা best seller হন, প্রাইজ পান, নানা পার্টির শীর্ষে অবস্থান করেন, নানা সভায় বক্তৃতা করেন, খবরের কাগজে বারবার নাম বেরোয়, হাতখালির আশু থাকে না। কিন্তু কিছু দিন পর দেখা যায়, সরস্বতীর বর তাঁরা পান নি। অমরত্ব লাভ করেননি তারা সাহিত্য জগতে।... পামোরা গ্রন্থাবলী আজকাল সের দরও কিনতে পাওয়া

যায় না।

৭ জুলাই— কলকাতা ভারতবর্ষের ছাট। এখানে বাবসা করা যায়। সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। তাই কলকাতাবাসী (মহিলকলে ছাট) লোকেরা সাংবাদিক হতে পেরেছেন। চূটকি লেখা লিখেছেন, বৃহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন নি।

৮ জুলাই— প্রত্যেক জিনিসের যেমন একটা স্বাভাবিক রূপ আছে সাহিত্যের বিশেষত্ব রস সাহিত্যের, নানা স্তরের তেমননি বিশিষ্ট রূপ আছে। ছোটগল্প, বড়গল্প, উপন্যাস তিনটি আলাদা হাতের জিনিষ। আমরা সাধারণকে উপন্যাস বলে যা পড়ি তা টেনে হিচড়ে লম্বা করা ছোটগল্প বা বড় গল্প। উই চিরিয়ে হিমালয় করা যায় না। করবার চেষ্টা করা হাস্যকর। বর্তমান সাহিত্যে আমরা এই হাস্যকর গাওই করছি। প্রবন্ধে লেখকের নিজস্ব চিন্তার যোগ্যতা থাকা চাই। তা কিন্তু প্রায় থাকে না।... আজকাল কবিতা পড়তে মনে হয় কবি আমাকে লেদি মারবার চেষ্টা করছেন, কবিতাটা দুর্বোধ্য বা ভঙ্গীসর্বক নয়। মনে সুর জাগে না। সাময়িক সাহিত্য তাই আজকাল পড়ি না।

৯ জুলাই— ইংরেজ আমাদের অর্থ শোষণ করে স্বদেশে নিয়ে গেছে, কিন্তু সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছে তারা আমাদের চরিত্র নষ্ট করে। সে যুগের ইয়ং বেঙ্গলরা যা অমৃত বলে পান করেছিল এখন দেখা যাচ্ছে তা বিষ। আমরা আমাদের ঐতিহ্য হারিয়ে একদল চাকর হয়ে গেছি। সে এখন পাণ্ডিত্যকামী নয়, ডিগ্রি লোলুপ। ইয়ং বেঙ্গলদের মতো বিদ্যা সে অর্জন করতে পারে না, শুধু মদ্যপ আর লম্পট হয়েছে। চরিত্রহীন, চোং পাস্ট করা জুলফিদের, চালিয়াত মাতালরাই ইংরেজ রাজত্বের শেষ ফল এবং বিবক্ষণ।

২০ জুলাই— (আজ ৪ঠা শ্রাবণ, বনফুল ৭৮ বছরে পড়লেন।) আমরা বাংলা তারিখ অনুসারেই জন্মতিথি করি।... অনেক বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন মারা গেছে, নিঃসঙ্গ হয়েছি। লীলা শয্যাপায়িতা। দেশ চোর থাকতে ভরে গেল। সবাই প্রায় ভণ্ড। আত্মরিকতা খুব কম লোকের মধ্যে দেখি। সবাই হয়ে থিয়েটারে পার্ট করছে। সাহিত্যের পবিত্র মন্দিরে, নানা মতলবের শয়তান নানা লেবল কপালে এঁটে ঘুরছে। সং সাহিত্যিকদের নাম শোনা যায় না, ধন্দলাবাজ সাহিত্যিকদের আত্মবিজ্ঞাপনের চাকে কান ঝালাপালা। এ দুর্ভোগ আর কত দিন ভুগতে হবে জানে।

১৯৭৭

৫ জানুয়ারি— কাগজে দেখলাম ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন যে ইমার্জেঞ্চি এখনও চলবে। ইমার্জেঞ্চি তোলবার সময় এখনও হয়নি। কখনও হবে কি? নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন যে স্বাধীনতা পাওয়ার পর ইমার্জেঞ্চি বেনেভোলান্ট ডিকটেটরশিপ হওয়া দরকার এ দেশে। এ দেশ এখনও গণতন্ত্রের উপভূক্ত হয়নি। দেখা যাচ্ছে হয়নি। তাই কি ইন্দিরাজী ইমার্জেঞ্চি চালু করেছেন। অনেক দুষ্ট লোক কিন্তু বলছে তাঁর উদ্দেশ্য সঞ্জয়কে রাজনীতিক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। তাই তিনি ইমার্জেঞ্চি চালু করে শত্রুদের দমন করছেন। দুষ্ট লোকেরা সব সময়ই অশিষ্ট আচরণ করে। তাদের কথা সব সময়ই বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু ইদানীং রেডিওতে সঞ্জয় গান্ধীর নাম বারবার উচ্চারিত হচ্ছে। খবরের কাগজে তাঁর পাঁচ দফা নিয়ে পাঁচ বার আলোচনা হয়েছে। এর মূলে যাই থাক ব্যাপারটা শোভনভার সীমা অতিক্রম করছে নাকি?— মন জুড়ে আছে লীলাবতী, প্রতিদিনই তাকে মনে করে কিছু না কিছু চিখি।



**১২ জানুয়ারী**— আজ আমি বিবেকানন্দের জন্মদিন।..... ভারতের বাণীকে আমেরিকায় প্রচার করে বিবেকানন্দ জগদ্বিখ্যাত। ভারতের বাণীকে কাব্যরূপ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ জগদ্বিখ্যাত। ভারতের বাণীর মাথাই শাশ্বত শান্তি লাভের উপায় নিহিত আছে। কিন্তু ভারতবাসীরা সে বাণীকে শোনবার কান হারিয়েছে। সে বাণী উৎকর্ষ হয়ে শুনছে পাশ্চাত্য দেশবাসীরা। সে দেশে যত নিষ্ঠাবান বিবেকানন্দ-ভক্ত আছেন এ দেশে তত নেই।... আমরা খালি সভায় সভায় বক্তৃতা করি আর কিছু করি না।

**১৭ জানুয়ারী**— আমাদের দেশের সব ভালো জিনিস বিদেশে চলে যাচ্ছে। সোনা, রূপা, তামা, লোহা, কয়লা, তুলা, রেশম, ডালা মাছ, ভালো খাবার—সব বিদেশে চলে যাচ্ছে আমাদের 'ফরেন ম্যানি' উপার্জন করতে। আমাদের দেশের বুদ্ধিমান এবং প্রতিভাবান ছেলেমেয়েরাও যাচ্ছে। ও দেশ থেকে এ দেশে আসছেন সোনা রকম নেশার জিনিস, ও দেশের বদমাশিহির কায়দাকানুনওলা, কুৎসিত সাহিত্য আর Sexy সিনেমাওলা। ও দেশ থেকে আসছে T.V। থিয়েটারের অর্থ উলঙ্গ মেয়েদের নাচ হচ্ছে ওদের নকলে। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের চরিত্র গড়ে উঠছে না। স্কুল কলেজে লেখাপড়া হচ্ছে না— খালি বাড়ছে বইয়ের হুপ; আর পরীক্ষার সময় টোকটুকি। ফলে দেশের চুরি হচ্ছে/ ধরছে না। কেউ কারোটা। ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং / বাড়ছে দেশের বারোটা।

**২১ জানুয়ারী**— আবার ইলেকশন নিয়ে মাতামাতি শুরু হয়েছে। যে চালে আমাদের দেশে গণতন্ত্র চলছে, তা অনেকটা গুণ্ডা-তন্ত্র প্লাস কৌশল-তন্ত্র। এ ধরনের গণতন্ত্রে সাফল্য লাভ করতে হলেও একটা চাই। আমাদের একটা নেই। গুণ্ডাদের মতোও একটা থাকে। আমরা সেই ১৯০৭-৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন স্বদেশী আন্দোলনের উদ্যোগ করেছিলাম বোমা বন্দুক নিয়ে তখনই নরেন গোসাঁই দেখা দিয়েছিলেন। তাকে কানাইলাল খতম করেছিলেন বাটে কিন্তু তারপর এদেশে বন্ধ নরেন গোসাঁই এর জন্ম হয়েছে।... জনতার সোহাই দিয়ে এ দেশে চোরেরাও চুরি করে শাসকরাও শাসন করে।

**১১ ফেব্রুয়ারি**— আমরা মন হয় সব নেতারাই গণতন্ত্রের বুলি আউড়ে গদিতো চড়েন এবং গদিতো চড়লেই ধৈর্যতাপ্তির হয়ে যান। গণতন্ত্র অনেকটা ডিমের মত। ডিম চিরকাল ডিম থাকে না। ক্রমশ তা থেকে পাখি, না হয় চিকিটিকি, না হয় কুমীর, না হয় কচ্ছপ, না হয় সাপ আদ্যপ্রকার করে। সারা পৃথিবী ভুড়েই এই কাণ্ড চলছে।

**১৯ ফেব্রুয়ারি**— একায়বর্তী পরিবার চিরকাল একায়বর্তী থাকে না... রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। একদিন যে ছিল, 'ভাই ভাই' পরে সে হয় 'দূর ছাই'। একদিন যারা পরপর পরিত্যেজিছিল বকুল, পরে তারা হয় অধি- নকুল... আমরা অনেক ভালো ভালো কথা পড়ি, ভালো ভালো কথা শুনি, ভালো ভালো কথা শিখিও। কিন্তু কাজের বেলা যড়রিপুর ভেলায় চড়ে হাবুডুপ খাই। একাজ আমরা সবাই করি। কিন্তু বড় বড় লোকেরা তা করলেই ইতিহাস হয়ে যায়। হরি স্যাকরা পাঁচ মোড়লকে খুন করে তার সুন্দরী বউটিকে নিয়ে পালিয়েছিল। এ কথা ইতিহাসে লেখা নেই। কিন্তু ভাড়াদা নরজারামের কথাটি উজ্জ্বলবার্ণে লেখা আছে।

**৩ মার্চ**— আগে এ দেশে কবির লড়াই প্রচলিত ছিল। এখন সেটা নেই। কিন্তু সেই আনন্দ আমরা উপভোগ করছি ইলেকশনের লড়াইয়ে, খবরের কাগজের মারামর্মে, দুপকের চাপন এবং উত্তার রোজই ছাপা হচ্ছে। কিন্তু কবিয়ালাদের পানে যে রস ও সুর থাকত তা এতে নেই।

**৪ মার্চ**— কাটোয়য় Indian Medical Association এর সভার প্যান্ডেল নাকি যুব কংগ্রেসের ছেলেরা পুড়িয়ে দিয়েছে। শুনে অবাক হয়ে গেলুম। যুব কংগ্রেসে ভালো লোকও আছে কিন্তু একদল গুণ্ডাও যে আছে তার প্রমাণ নানা জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে। ইন্দিরা-পুত্র সঞ্জয় এই যুব কংগ্রেসের একজন প্রধান পাণ্ডা। একটি মূল্য প্রসব করে যদুবংশ ধ্বংস হয়েছিল। তারই পুনরাভিযয় হবে নাকি আবার।

ব্যক্তিগত আমার ইন্দিরাজী সম্পর্কে দ্বির্বলতা আছে।

**১২ মার্চ**— আমার যতটুকু সামর্থ্য তা সাহিত্য এবং ছবি আঁকতে নিয়োগ করতে চাই এবং অবসর সময়ে চাই তোমাকে নিয়ে থাকতে। কিন্তু কোলকাতা শহরের ভীড় ক্রমাগত ধাক্কা মারছে আমার চারিদিকে। — বদীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি করতে চাইছে।

**২৫ মার্চ**— মোরারজী দেশাই, প্রধানমন্ত্রী হলেন। এই পদটি লাভ করবার জন্য বহুদিন ধরে বথ কৃষ্ণসাধন করছেন তিনি। ইলেকশনে যিনি তাঁর প্রধান সহায় ছিলেন সেই জগজীবনরাম কিন্তু এখন সরে দাঁড়িয়েছেন। নতুন গভর্নমেন্টের শরিক হননি। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতও তাঁর দলে যোগ দিয়েছেন। এগুলি দুর্লভ। মোরারজীর জনতা পাটিতে আছেন সি. পি. এম. এবং জনসংঘ। তাদের স্বরূপ এখনও জানা যায় নি। এদের প্রত্যেকেই যদি 'সিংহভাগ' দাবী করেন তাহলেই মুশকিলে পড়বেন দেশাইজী। শ্রীমুক্ত অতুল ঘোষ লিখেছেন— মোরারজী নাকি তাস খেলতে ভালবাসেন। এবারে তো ভাল হাত পেয়েছেন, দেখা যাক শেষরক্ষা করতে পারেন কি না। সব প্রধানমন্ত্রী গদিতো আরোহন করে যে সব কথা বলেন মোরারজীও তাই বলছেন। কষ্ট থাকবে না একদম/ শিষ্টের বন্ধু আমি দুষ্টের যম/ দ্রব্যমূল্য রাতারাতি হয়ে যাবে কম/ বেকাররা কাজ পাবে রবে না অকম/ থাকবে না পীড়ন — থাকবে নাশো ভয়/ বলো সবাই ডেমোক্রাসির জয়।

**১৭ এপ্রিল**— আমাদের স্বাধীনতা লাভের গোড়াতেই ফমতা পাবার লোভে আমাদের নেতারা আদর্শকে হিন্দু করে গদিতো উঠেছিলেন। ভারতমাতাকে টুকটাক করে রাজা হয়েছিলেন তারা। অসংখ্য হিন্দু-মুসলমানের রক্ত সিক্ত হয়েছিল ভারতভূমি—সে রক্তের স্নেহ মিশেছিল মহাত্মা গান্ধীর রক্তের ধারা। এ পাণের প্রায়শ্চিত্ত আমাদের করতে হবে। গ্রীক নাট্যকার এন্স কাইলসের বিখ্যাত তিনটি নাটকে পূর্বপুরুষ Atrous কৃত মহাপাপের যে বীভৎস প্রায়শ্চিত্তের বর্ণনা আছে তারই হয়তো পুনরাভিযয় হচ্ছে আমাদের দেশে। নতুন নতুন দল তৈরি করে আমরা বাঁচতে পারব না। পাকিস্তানেও আঙুন লেগেছে, বাংলা দেশেও।

**৯ মে**— কাল ঢুলবাড়িতে। একজন নতুন producer 'সীতারবরের পুনর্জন্ম' বইটি ফিল্ম করবেন বলে কিনলেন।

লেখক যদি স্বাধীনচেতা না হয় বড় সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। আজকাল সাহিত্যচর্চা গোটা দুই দিন সাপ্তাহিক মাসিকে সীমাবদ্ধ। সে সব পত্রিকার মালিকরা সাহিত্যিক নন। তাঁরা মাইনে করা কতকগুলি লোক রেখেছেন কাগজকে পূর্ণাঙ্গ করে বিক্রি বাড়াবার জন্য। তাই সাহিত্য পত্রিকায় এত sex, এত সিনেমা, এত রাজনীতি, এত উলঙ্গ নরনারীর আবির্ভাব। অপেকার বড় সাহিত্যিকদের নিজেদের কাগজ ছিল। বঙ্কিমের, রবীন্দ্রনাথের, প্রমথ চৌধুরীর নিজেদের কাগজে লিখতেন প্রথমে। এখন সে রামও নেই, সে অঘোষাও নেই। কিম্বদ্বার হনুমানও নেই— আছে কতকগুলো মনি বদাদের হপখটি।



১১ মে — সাত বছর ধরে আমার মস্তিষ্কলিখিত, কিন্তু প্রাণথুলে একদিনও বোধহয় আমাদের স্বাধীন গর্ভমন্টে প্রকাশ্য করতে পারিনি। কালোকে সাদা বলতে পারিনা... স্বাধীন ভারতবর্ষের শাসকরা যদি স্বদেশ প্রেমিক হতেন তাহলে তাদের প্রথম কর্তব্য হতয়া উচিত ছিল দেশে প্রকৃত মানুষ তৈরি করার ব্যবস্থা করা। তা তাঁরা করেননি। স্বাধীনতার পর শিক্ষা-দপ্তরের হস্তায় নিয়ে আলোচনা করলে বোঝা যায় যে অদূরদর্শিতা, অপরিতা এবং স্বার্থপরতা সেখানে প্রধান। কতকগুলো লোক আজ কংগ্রেস, কাল নবকংগ্রেস, পরন্তু সি. পি. এম. তার পরদিন জনতার মুখোশ পরে গদিকে বসছে। পুরানো লোকেরাই নতুন মুখোশ পরছে। আমাদের ভিমির গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে, জানি না কবে সূর্য উঠবে। যখন উঠবে তখন আমি থাকবো না। সূর্য কিন্তু উঠবেই।

১৭ মে — সভায় যাওয়া কন্মিয়ে দিয়েছি, ছবিও আঁকিনি, লিখতেও তেমন ইচ্ছা করে না। তুমি চলে যাবার পর থেকে কিছুই ভালো লাগে না আর।

১ জুন — বোম্বের এক প্রভিউসার হিন্দী সিনেমায় অর্জুন মণ্ডল গজটা অর্জুন পণ্ডিত নাম দিয়ে করেছেন। বইটি best picture হয়েছে, filmfare Awards গল্পটিকে এ বছরের শ্রেষ্ঠ গল্প বলে সমানিত করেছে (বনমল্যকে এরচলো ৫০০০ টাকা দেবে)।

২৮ জুন — দেশের মদল হবে বলেই আমরা স্বাধীনতা চেয়েছিলাম। এই স্বাধীনতা পাবার জন্য অনেক যুদ্ধ, অনেক প্রাণ বিসর্জন করেছি — একটা খণ্ডিত স্বাধীনতা পেয়েছি — কিন্তু দেশের মদল এখনও বন্ধুদে। কতকগুলি চূড়ান্ত স্বার্থপর লোক আমাদের স্বাধীনতা নিয়ে ছিনমিনি খেলছে।

২৭ জুলাই — আমি যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছি তা লোকের ভালো লাগেছে কি না জানি না। কিন্তু তারা যে আমাকে ভালোবাসে এর প্রমাণ রোজই পাই, এতেই আমি কৃতার্থ। আমার নৌকা খুব ছোট, সমুদ্র অতি বৃহৎ, কিন্তু আমার ভয় নেই, যে সমুদ্র ভালোবাসার সমুদ্র, সে আমাকে ভোবাবে না, ভাসিয়ে রাখবে, ঠিক পথে ওপারে পৌঁছে দেবে।

২১ আগস্ট — সরকার বারবধু বন্ধ করে দিয়েছেন — বুদ্ধদেব উভয়টি মহাশয়কে ধন্যবাদ।

২২ অক্টোবর — পূজো ফুরিয়ে গেল। কতকগুলো মোটা মোটা এবং রাবিশভরা শারদীয়া সংখ্যা রেখে গেল। ... যে সব কাগজ নামজাদা, সেগুলো সব হারামজাদা। এত অশ্লীল লেখা ছেপেছে যে তাদের বাড়িতে স্থান দেওয়াই মুশকিল। পড়িয়ে ফেলতে হবে, কিনা অবিলম্বে সের দরে বিক্রি করে ফেলতে হবে। যেসব লেখক ওসব লেখা লিখেছে তাদের ন্যাটো করে থামে বৈধে চাবকে লিঙ্গ-কর্তন করে দেওয়া উচিত। ... লিটল ম্যাগাজিনও অনেক বেরিয়েছে। সেগুলো তবু পড়া যায়। ... শারদীয়া দৈনিক বসন্তটিও ভালো লাগল।

১২ নভেম্বর — আমার একটা কথা মনে হচ্ছে — ঠিক কালীপূজার পরই বাড়ুড়িতীয়া কেন? কালীপূজা এক বিশ্বেদ্বিহীন নারী শক্তির পূজা, বিশ্বেদ্বিহীন পুরুষদের বিরুদ্ধে। যে নরমণ্ডের মতো মা কালীর গলায় দোলে তাতে স্ত্রী মুণ্ড দেখিনি। এই ভয়ানক পুরুষ নিধনের পরই তাই বোলায়। বোধহয় তাদের ভাইদের (খোজ করবো এবং খোজ নিয়ে ফেঁটা দিয়ে খাবার খাইয়ে আপ্যায়িত করেন। এ ছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যা তো আমার মাথায় আসছে না আপাতত।

১৪ নভেম্বর — সাহিত্য তীর্থে ওদের প্রথম তীর্থপতি করণানিধান বন্দোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী সভা — বনফুল বললেন, যারা মনে করেন কবি করণানিধান — উপনিষৎ শতাব্দীতে জন্মেছিলেন বলে outdated হয়ে গেছেন তারা ভুলে যান যে সুন্দর জিনিসের

কদের তারিখ অনুসারে হয়না। ছোট ভূই ফুলের আদর আজও কমেনি। আধুনিক কবিদের লেখা হৈয়ালির মতো, দুর্ভাষা। কিন্তু একটা জিনিস তা সত্ত্বেও বোঝা যায় যে ওরা — ক্ষুধার্ত, বঞ্চিত, লোলুপ এবং কবিতার ওদের কবিতার আসন্দর্ভ-লিপ্সার অন্তরালে আছে সৌন্দর্য্য-ভোগের কামনা। সে সৌন্দর্য্য ওরা নাগালের মধ্যে পাচ্ছেনা বলে যে আত্নানন্দ করছে সে আত্নানন্দ শিল্পগুণায়িত হয়নি এখনও। তাই তো কবিতা হয়ে ওঠেনি।

১৫ নভেম্বর — ইন্দিরার বিরুদ্ধে শা-কমিশন বসেছে। মানুষ ভাল না হলে সুখী হয় না আমাদের গর্ভমন্টে মানুষকে ভালো করে চেনা কঠিন না। ক্ষুদ্র কলেজগুলো ও গুণ্ডা আর মন্তান তৈরির কারখানা হয়েছে। গর্ভমন্টে বাজে কাজ নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের করপাল।

১৬ নভেম্বর — আমাদের জীবনের একটা প্রধান অভাব মনোমত সঙ্গীর অভাব। তাই আমরা সিনেমায়, ক্লাবে, সভায়, খেলার মাঠে, থিয়েটারে ঘুরে বেড়াই। তবু তৃপ্তি হয়না।

৮ ডিসেম্বর — সুখ দুঃখ — দৈহিক ও মানসিক। দৈহিক সুখের জন্য চাই ভোগের উপকরণ আর মানসিক সুখের জন্য চাই নিম্নলব্ধ বিবেক। নিম্নলব্ধ বিবেক না থাকলে ভোগের উপকরণও সুখী করতে পারবে না। অনেক ধনী দেখেছি তারা ভোগের শিখরে বসে আছেন, কিন্তু মনে সুখ নেই। কারণ তাঁদের বিবেক অমলিন নয়। যাঁর বিবেক মলিন নয়, যিনি আদর্শবান বিবেকী, তিনি যদি দৈহিক বা আর্থিক কষ্ট ভোগ করেন — তখন তিনিও অসুখী হন। কিন্তু তাঁর মনে একটা সাত্বনা থাকে আমি আদর্শবিশিষ্ট ইহনি। হ'লে হয়তো অনেককিছু পেতাম কিন্তু ইহনি। এ সাত্বনা তাকে সুখী করে। আর একরকম সুখ আছে, যা অল্প সংখ্যক লোকেরা পান। যাঁরা শ্রমী, যাঁরা আবিষ্কারক, যাঁরা তপস্বী, যাঁরা উদ্ভাবক, তাঁরা এমন এক আনন্দলোকে বাস করেন যা অবর্ণনীয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে নিম্নম পরিচ্ছন্ন বিবেকই সুখের উৎস। ভাগ্য কষ্টও তখন তাঁরা সুখ ভোগ করতে পারেন। উপনিষদের 'তজ্জেন ভূজিত্য' কথাটা মিথ্যা নয়।

৩১ ডিসেম্বর — এ বছরের প্রধান ঘটনা ইন্দিরার পতন। সে পতনের কারণ তার পুত্র সঞ্জয়। যারা ইন্দিরার ক্যাবিনেটে ছিলেন সবাই খোসামুদে এবং অত্যন্ত ভীত।

১৯৭৮

৭ জানুয়ারি — ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী এসে বলেছে — মেনে নিজে বাড়ি এসেছি। সত্যি কথাই বলেছেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন তাঁরা ভারত ভাগ করে একটা লোক দেখনো স্বাধীনতা আমাদের দিয়ে দিলেন, তখন থেকে আমরা বেশী ইংরেজ-ভক্ত হয়েছি। ইংরেজদের নকল করাটাই এখন আমাদের সভ্যতা।

১৬ জানুয়ারি — বিখ্যাত সাহিত্যিকদের জন্মজয়ন্তী বা মৃত্যুবার্ষিকী একটা কাশানে পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে আন্তরিকতা আর নেই। একই কথার চর্চিতচর্চণ কতদিন আর ভালো লাগে। ভালো লাগত যদি আমরা তাঁদের সমসাময়িক কত বিখ্যাত প্রায়-বিখ্যাত সাহিত্যিকদের নিয়ে আলোচনা করতাম।

(আজ শরৎচন্দ্রে মৃত্যুবার্ষিকী-দিবস সভায় গেলেন না।)

২৯ জানুয়ারি — (রবীন্দ্রসদনে, বিখ্যাত গায়িকা হীরাবাই-এর সর্ষনা সভায় সভাপতি। বনফুল বললেন), সব দিল্লীরা সুন্দরের বশবাক। শিল্পের মাধ্যমে তাঁরা চিরসুন্দরের সান্নিধ্য লাভ করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু গলা, কবিতা বা চিত্রের মাধ্যমে যে সান্নিধ্য — ততটা নিবিড় হয়না, সুরের মাধ্যমে যতটা হয়। আমার মনে হয় মীরাবাই গানের ভিতর দিয়ে পরা পিকার



পাদস্পর্শ করেছিলেন তাই তিনি এত বিখ্যাত। তাছাড়া তিনি মহারাক্ষি-কন্যা। মহারাক্ষির সঙ্গে আমাদের মনের অনেক মিল আছে। শিবাজী একদা আমাদের জাতীয় চেতনাকে উদ্ভুদ্ধ করেছিলেন। মহামানা তিলক আজও আমাদের নমস্কা। মহারাক্ষীয় ব্রাহ্মণ চার্পেকার আভূষণ স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম শহীদ তিমজনা। এদের প্রেরণা আমাদের উদ্ভুদ্ধ করেছিল। সেই মহারাক্ষি দেশের কন্যা মীরাবাই। তাঁকে আমি প্রণাম করছি। আপনারাও করুন।

১৮ ফেব্রুয়ারি—পাতিয়া প্যারিজার মুখ্য হয়েছেন। খবরের কাগজের হকর-রূপে জীবন আরাভ করে নিজের কর্মদক্ষতায় খবরের কাগজের বিক্রয় নিয়ন্ত্রক হয়েছিলেন। তাঁর আদর্শের দিকে আমাদের দেশের বেকার যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

২৪ ফেব্রুয়ারি—জীবনে অনেক কবিতা লিখেছি। বিভিন্ন সময়ে মনে যে ভাবের ফুল ফুটেছে সেগুলিকে ভাষায় ও ছন্দে গেঁথে রাখবার চেষ্টা করেছি। কবিতা কাকে বলে এর উত্তর রসাত্মক বাক্য মাত্রই কবিতা। রসও আবার এক রকম নয়—ন রকম (৯)। আমার মনে হয় যা পড়ে রসিক চিত্ত আনন্দিত হয় তাই কবিতা। আমার অনেক কবিতা হারিয়ে গেছে। কিছু পুস্তক আকারে ছাপা হয়েছে, এখনও একগাদা কবিতা পড়ে আছে। নানা রঙের এবং নানা রসের কবিতা। আমি ভাবছি, 'কবিতার জাবদখাতা' এই অদ্ভুত নাম দিয়ে সব কবিতাগুলোই একসঙ্গে ছাপিয়ে দেব। নানা রসের খিচড়ি গোছ হয়ে একটা কিছু।

একজন প্রকাশক ছাপতে রাজি হয়েছেন। কবিতা নির্বাচন করে অনেকেই বই ছাপেন। নির্বাচন করতে গিয়ে কিন্তু অনেক সময় ভালো কবিতা বাদ পড়ে যায়। তাছাড়া একজনের যে কবিতা ভালো লাগে, আর একজনের সেটা লাগে না। নানা রুচির পাঠক আছে। সবগুলো ছেপে দেওয়াই ভালো।

২৭ ফেব্রুয়ারি—ভিয়েতনামের সঙ্গে আমাদের ব্যবসায়িক এবং সাংস্কৃতিক বন্ধুত্ব হল। আশা করি এ বন্ধুত্ব টিকে থাকবে। ভিয়েতনামের স্বাধীনতার সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতার তফাৎ আছে। আমাদের স্বাধীন হাজার হাজার লোকের রক্ত দিয়ে সে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। ভিয়েতনাম হাজার হাজার লোকের রক্ত দিয়ে সে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এবং ওদের ভাস্কর দেশ আবার জোড়া লাগেছে।

২১ মার্চ—চীনরা সত্য প্রাচীন জাতি। মানব সভ্যতায় তাঁদের অবদান অনেক। তাঁদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব বহু শতাব্দীর। স্বাধীনতার সময় দুই দেশের সীমারেখা নিয়ে কলহ হয়েছিল। সে কলহ আপোষে মিটিয়ে ফেলা উচিত।

শাসকবর্গ করল অত্যাচার

কয়েকবিধা ভূমির চেয়ে

বন্ধুত্ব বেশী মূল্যবান।

পুরাকালে ভারতবর্ষ

চীনের কাছে চায়নি কিছু

বুদ্ধদেবের পৃথগাধী

করেছিল দান

আজও তারা প্রেমই চায়

চায়না গুলি কামান।

৩০ এপ্রিল—সুকাণ্ড ভট্টাচার্য্য সুকবি ছিলেন এবং কমিউনিস্ট ছিলেন। এখন পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট সরকার। তারা সুকাণ্ড ভট্টাচার্য্যের একটি মূর্তি স্থাপন করেছেন। বেশ করেছেন। এতে কারো আপত্তি নেই। আপত্তি সেইখানে যেখানে অসাহিত্যিক ম্যুম্মস্ত্রী মূর্তির আবরণ উদঘাটন করতে গিয়ে সাহিত্যিক সাজতে গেছেন। তিনি বলেছেন সুকাণ্ডই এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। তারপর নাম করেছেন নজরুলের (না করলে মুসলমানদের ভেট পাবেন না), সর্বশেষে বলেছেন রবীন্দ্রনাথের নাম, মনে হল একটা খিঁচা ভরে এবং কঁকিয়ে।

৪ মে—সভ্য মানব সমাজে যা স্বাধীনতা বলে স্বীকৃত তা যে উচ্ছৃঙ্খলতা নয় তা সর্বাবধি-সম্মত। সভ্য নাগরিকদের আর্শ ও নিয়ম মেনে স্বাধীনতা ভোগ করতে হয়। কিন্তু আদর্শের বিষয় আমরা প্রায়ই তা করি না। উচ্ছৃঙ্খল না হয়ে আমরা যেন স্বাধীনতার আনন্দ ভোগ করতে পারি না। আমাদের সেই আদিম — 'যা খুশী করব' ভাবটা এখনও পৃথিবীর সব তথাকথিত সভ্য সমাজে বলবৎ রয়েছে। তাই এত পুলিশ, আদালত, এত মিলিটারি এবং এত অস্ত্রশস্ত্র।

২৫ মে—৬ মে এবং ২০ মে তারিখের দুটো Behar Herald এসেছে। তাতে খবর আছে 'মানসপুর' বইটির জন্যই বনফুল জ্ঞানপীঠ পachtিলেন কিন্তু দুজন বাঙালির ষড়যন্ত্রে তাঁদের মধ্যেই একটা এম. পি. এবং আর একজন গভর্ণমেন্টের বড় চাকুরে নাকি আমার নাম কেটে আশাপূর্ণ্য নাম বসানো হয়েছে।

এটা জানি বিনা তদ্বিরে প্রাইজ পাওয়া যায়না। তার সঙ্গে তৈল এবং যুগও দিতে হয় অনেক সময়। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথকেও অনেক তদ্বির করতে হয়েছিল।

১৯ জুন—১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট আমরা এ স্বাধীনতা পেয়েছিলাম—আজ ১৯শে জুন ১৯৭৮। এই দ্বিশ বছরের অভিজ্ঞতা ভয়াবহ। এই দ্বিশ বছরে আমরা বুঝেছি বিদেশী রাজা আর স্বদেশী গণতন্ত্রে বিশেষ কোনও তফাৎ নেই। আমাদের দুঃখ কমেনি, বেড়েছে কারণ আমাদেরও মনুষ্যত্ব ক্রমশ লোপ পাচ্ছে, আমরা আর মানুষ নেই, গরুছাগলের পর্যায়ে নেমে গেছি।

৩১ জুলাই—দিল্লীতে এক হাজার মহিলারা প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির সামনে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছেন। তারা একটা কথ্য জানেন কি? যারা দাম বাড়ছে তারাই গভর্ণমেন্ট চালাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী তাদের হাতে ক্রীড়নক। আনন্দবাজারের খবর—ময়ে চুরি বাড়ছে, বিহারে বন্যা, মহারাষ্ট্রে ঔরঙ্গাবাদে দাঙ্গা, কার্ঘ্য, স্টেশনে আগুন।

২৯ আগস্ট—আমাদের বাংলা খবরের কাগজগুলি দেখলে বোকা যায়—আমরা বাঙালিরা কি চরিত্রের লোক। আমাদের জনপ্রিয় বাংলা কাগজগুলি যেন আমাদের চরিত্রের দর্শন। সত্য মিথ্যা যাইহোক একটা উত্তেজক খবর—খুন, ডাকাতি, নারী ধর্ষণ, রাজনৈতিক হত্যা, রাজনৈতিক নোতাদের বা তাদের পুত্রদের কেহু খুব প্রিয় খবর। আর একটা জিনিস যা প্রত্যেক কাগজে থাকবেই—সেটা হচ্ছে জ্যোতিষ চর্চা—'আপনার দিনটি কেমন যাবে'—জাতীয় লেখা সব কাগজের অঙ্গ ভূষণ। কর্মখালি, বিবাহের বিজ্ঞাপন, নিরুদ্দেশ—এ জাতীয় খবরও থাকবে। কোন ছুতোয় একটি যুবতী মেয়ের ছবি ছাপতে পারলেও আমাদের কাগজগুলো বর্তে যান। বলিষ্ঠ জনমত তৈরি করা কাগজের প্রধান কাজ। আমাদের কাগজগুলো প্রায়ই তা করতে পারে না। প্রত্যেক কাগজই গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে বিজ্ঞাপন পাবার লোভে গভর্ণমেন্টের শোশামোদ করেন। ... কাগজগুলোর নৈতিক মেরুদণ্ড নেই।



৩ অক্টোবর— কাল সিঁড়িতে পা ছিলে পড়ে গিয়ে পায়ে চোট লেগেছে। বিছানায় শুয়ে আছি। কুমারেশ লিখছে মফিজুল।

—জীবনে প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে বার বার পড়তে হয়েছে। সে সব দুঃখের সময় তুমি ছিলে সদ্দিনী। আজ তুমি নেই। আমাদের জীবনে যে রাজনৈতিক বিপর্যয় বার বার হতো, সেটা হচ্ছে হিন্দু-মুসলমান রায়ট, এবং সেই সব রায়ট বাধলে সবার জীবন একবারে বিপর্যয় হয়ে যেত।

দোকান পাট সব বন্ধ। রাস্তায় লোক চলাচলও বন্ধ। প্রচণ্ড ঝড়ুন্টির সম্মুখীনও হয়েছি অনেকবার। বিহারের ১৯৩৪ (খ্রীষ্টাব্দ) ভূমিকম্পে আমাদের বাড়ি সম্পূর্ণ ভেঙে গেছিল। আমার বাড়ি ছেলে অসীমের বয়স তখন প্রায় দু'বছর। আমরা সে সময় শীতকালে ৫ ও হাওয়ায় মধ্যে কাঁকা মাঠে শুয়ে দিনের পর দিন কাটিয়েছি। এবং খাওয়া দাওয়া যা পেয়েছি তাই খেয়েছি। একবার মনে আছে একটি লোক মোচা ফেরি করতে আসত। আমরা তার সব মোচাই কিনে নিতাম এবং তাই দিয়েই দিনকতক কাটিয়েছিলাম। তারপর ৪২ এর আগস্ট মুভমেন্ট একটা বিরাট বিপর্যয় এসেছিল বিহারের সকলেরই জীবনে।

রেললাইন সব উপড়ান। বাইরের থেকে সব যোগাযোগ বন্ধ। ব্যান্ড বন্ধ। পোস্টাফিস বন্ধ। সেই সময় বেহালী যুবকরা আমাদের খুব সাহায্য করত। ইলেকট্রিসিটি বন্ধ হামি, আমার ইলেকট্রিসিটির ভালো রেডিও ছিল একটা, সেটির মারফত আমরা বাইরের খবর পেতাম। কিন্তু তখন ইংরেজদের সঙ্গে জাপান ইতালী এবং জার্মানীর (হিটলার) ঘোর যুদ্ধ চলেছে।

আমাদের নেতাজী বর্মা থেকে খুব ভালো বক্তৃতা দিতেন। তাঁর বক্তৃতার মূল বক্তব্য ছিল আমরা দিল্লী গিয়ে ইংরেজদের দূর করব। আমরা দিল্লী যাচ্ছি। আপনারা সহায়তা দেবার জন্য প্রস্তুত থাকুন। হঠাৎ আমাদের ডাগলপুর জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব অর্ডার দিলেন কেউ আর রেডিও বাজাতে পারবে না। প্রত্যেকে যেন নিজের রেডিওরো গভর্ণমেন্ট অফিস এসে জমা দেয়। আমরা সে আদেশ পালন করেছিলাম। কিন্তু সে সময় আমরা অনেক বাজে আজগুবি খবর হাতে লিখে যেখানে সেখানে, স্টেশনে, পোস্টঅফিসে লাগিয়ে দিতাম। একটা খবর, সে খবর আমিই লিখতাম ইংরেজিতে রাত্রি ১২ টার সময় এবং বিহারী ছেলেরা সেগুলি নিয়ে গিয়ে হিন্দীতে অনুবাদ করত। একটা খবর লিখেছিলাম, এখনও মনে পড়ছে উইনস্টন চার্চিল শট ডেড।

এ রকম সব আব্দুত খবর প্রচার করা হত চারদিকে।..... আমাদের এ রকম খবর প্রচারের ফলে গভর্ণমেন্ট আমাদের রেডিওর আবার সব ফেরৎ দিয়েছিলেন।

..... কিন্তু আজ যে বিপর্যয় সম্মুখীন হয়েছি তা অন্য নয়, তা আমাদের অসাধুতা ও চরিত্রহীনতা। মনে হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

৭ অক্টোবর— নার্তিন রয়েছে ততই মনে হচ্ছে অন্যথারে অত্যাচারে অবিচারে কতকগুলি কালোবাজারী জানোয়ারের হাতে আমরা শেষ হয়ে যাব। যে পাপ দেশ ভাগ করে ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগস্ট রাত্রি ১২ টার সময় আমাদের মহান নেতারা করেছিলেন তারই এই প্রায়শ্চিত্ত।... নেতারা মহাস্থাে আছেন।

৮ নভেম্বর— চিকমগালুরে (কর্ণাটক) ইন্দ্রা গান্ধী জিতেছে। ইন্দ্রার এই জয় লাভে অনেকেই খুশী হয়েছে। এ দেশে কংগ্রেসই মূল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সেই কংগ্রেস শেষের

দিকে ডুবে গিয়েছিল।

অনেক ভণ্ড কংগ্রেসী ও মেকী গান্ধীবাদী কংগ্রেসের জনপ্রিয়তাকে নষ্ট করেছিলেন। সেই কংগ্রেসকে আবার পুনর্গঠন করলেন ইন্দ্রা নব কংগ্রেস নাম দিয়ে। সেটাও টিকল না, ইন্দ্রার অধঃপতন হল। ইন্দ্রা কিন্তু 'কংগ্রেস' নামটি ছাড়েননি, আবার যে পার্টি গড়লেন, তার নাম দিয়েছেন কংগ্রেস (ই)। তারপর থেকে সব ইলেকশনে তিনি জিতছেন। মনে হচ্ছে তাঁর ভাগ্য তারকা আবার উদয়ের পথে অগ্রসর হচ্ছে।

২৩ নভেম্বর — দেশের প্রতিটি লোক দেশপ্রেমিক না হলে স্বাধীনতা পেয়েও সে দেশ উন্নতি করতে পারে না। আমাদের দেশই তার উদাহরণ। এ দেশে বিকশিত হল মতলববাজ— শাসকদের পেয়ারের লোকেরা।

প্রশ্ন পায় গুণ্ডা আর খোশামুদেরা। দেশকে কেউ ভালোবাসেনা। পার্টি-প্রেম এ দেশে প্রবল, সেখানেও দলাদলি। তাই চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি, নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা।

৬ ডিসেম্বর — ফতেপুরেও ইন্দ্রার পার্টি হেরে গেল। এর আগে সমষ্টিপুরে হেরেছে — রাজনীতি আজকাল ব্যবসাতে পরিণত হয়েছে। জনগণের হিতের সঙ্গে ওর প্রাণের যোগ নেই। এই ছতোর ওরা নিজেরা টাকা রোজকার করে রাজারহালে থাকে। এই জনাই ওরা ইলেকশনের সময় লাখ লাখ টাকা ব্যয় করে, যেমন ব্যবসায়ীরা লাখ লাখ টাকা ব্যবসাতে খাটায়। কখনও লাভ হয়, কখনও লোকশান হয়।

১৪ ডিসেম্বর — সিপাই বিদ্রোহের আগে হিন্দু-মুসলমানে তেমন ঝগড়া ছিল না। সিপাই বিদ্রোহে হিন্দু-মুসলমান একত্রে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াইছিল। সিপাই বিদ্রোহকে দমন করে ইংরেজ শাসনকর্তা ভেদনীর প্রবর্তন করলেন।... জনতা সরকার হরিজনদের প্রতি বেশী পক্ষপাত প্রদর্শন করে অহরিজনদের অপ্রীতিভাজন হয়েছেন।

১৯৭৯

১৫ জানুয়ারি — কাগজের খবর ৬ লক্ষ লোক গঙ্গাসাগরে কাল মান করেছে।— যারা গঙ্গাসাগরে যান তারা সবাই ধার্মিক নন, তাঁদের মধ্যে চোর, বদমাইস, পাপী, পাঞ্জি অনেক আছে—তবু তাঁরা যান কেন। কিছু সংস্কার, কিছু হজুগ, কিছু ভ্রমণপ্রীতি, কিছু আমাদের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা— সব মিশে আছে এর মধ্যে। কিন্তু ধর্মের আবহাওয়াটি বেশী।

২৯ জানুয়ারি — দেশে সর্বত্রই অশান্তি। রাজনৈতিক অশান্তি, জনতা পার্টি, কংগ্রেস, সি. পি. এন সবার ভেতর থেকেই ঘোঁষা বেরকছে।

৩১ জানুয়ারি — (সর্বশেষ লেখা) নেতাজীকে নিয়ে হজুগ।

৮২ বছরের বুড়ো নেতাজী বেঁচে আছেন কিনা তাই নিয়ে আমরা উন্মত্ত। আর তিনি যখন বেঁচে ছিলেন, আমাদের মধ্যে ছিলেন তাঁর একটি কথাও শুনিনি আমরা।... আজ তাঁকে নিয়ে একটা হজুগ করবার সুযোগ পেয়েছি আমরা। হতভাগাদের কিছু সময় কাটবে।

(এরপর আর ডায়েরীতে লেখা নেই — ৯ ফেব্রুয়ারি মৃত্যু)

## বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

## নবম অধিবেশন

মূল সভাপতি

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের

## অভিভাষণ

(অপ্রকাশিত)

রেঙ্গুন, ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭



সাহিত্যিক  
সাহিত্যিক তীক্ষ্ণ ও তত্ত্বাবধায়ক  
সাহিত্যিক

ব্রহ্মদেশীয় বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

নবম অধিবেশন

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,  
আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। বঙ্গভারতীর সামান্য সেবক আমি, সুদূর  
প্রবাসে অনুষ্ঠিত এই উৎসবে আমাকে আহ্বান করিয়া আপনারা যে সৌজন্য ও আত্মীয়তা  
প্রকাশ করিয়াছেন তজ্জনা আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। বহুদিন পূর্বে, ব্রিটিশ  
আমলে, ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙালীরা আমাকে একবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, নানা কারণে তখন  
আসা সম্ভবপর হয় নাই। আজ আপনাদের আহ্বানে সাড়া দিতে পারিয়াছি বলিয়া সত্যি আমি  
আনন্দিত।

কিছুদিন পূর্বেই বঙ্গ-সাহিত্যসংসার হইতে কয়েকজন কৃতী সাধকের তিরোধান ঘটিয়াছে।  
কবি করুণানিধান বন্দোপাধ্যায়, কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কবি জীবনানন্দ দাশ এবং  
ঔপন্যাসিক মানিক বন্দোপাধ্যায় আর আমাদের মধ্যে নাই। সর্বাগ্রে ইহাদের উদ্দেশে আমার  
শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।

মানবজাতির সুদীর্ঘ ইতিহাসে কবি এবং সাহিত্যিকের আবির্ভাব কবে ঘটিয়াছিল তাহা  
নিঃসন্দেহে জানিবার উপায় নাই। যখনই ঘটিয়া থাকুক, তাঁহারা ই যে মানবসভ্যতার সম্ভাবনা  
সূচিত করিয়া গিয়াছেন সে বিষয়ে ইতিহাসের নির্দেশ আজ সুস্পষ্ট। কবি ভাবাপন্ন মানব-  
শিল্পীদের কিছু কিছু ইতিহাস গৃহাগারে চিত্ররূপে আজও উৎকীর্ণ আছে। প্রস্তরযুগের সেইসব  
গুহাচিত্রগুলি হইতে আমরা তাহাদের জীবনযাত্রার, তাহাদের জীবনদর্শনের কিছু কিছু আভাস  
আজও পাই। প্রস্তরের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া তাহারা বন্যপশু শিকার করিত কেবল এই খবরটুকুই  
আমরা পাই না। তাহাদের মৃতদেহ সংস্কারের প্রথা হইতে জানিতে পারি যে, মৃত্যুকে তাহারা  
জীবনের অবসান বলিয়া স্বীকার করে নাই, তাহারা মৃত্যুকে দীর্ঘ রহস্যাবৃত নবজীবনের  
আরম্ভমাত্র মনে করিত। তাই তাহারা ভূ-প্রাণিত শবের সহিত বাদা, অস্ত্রশস্ত্র, অলঙ্কার দিত,  
তাহাকে বিবিধ বর্ণসজ্জার সজ্জিত করিত। সেই সুদূর অতীতের বর্ণচিত্রাঙ্ক, সুদূর অতীতের  
সেই কবি-শিল্পীদের কীর্তি গুহাগারে আজও অস্মান হইয়া আছে। মনে হয় পরবর্তী যুগের  
আর্যক্ষমিরা যে আশ্বাসভরে প্রার্থনা করিয়াছিলেন— 'তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ', কবি গায়টে  
যে বিশ্বাসভরে বলিয়াছিলেন — 'Life is but the childhood of Immortality' (আমাদের  
ইহজীবন অনন্তজীবনের শৈশবমাত্র) — সুদূর অতীতের সেই আদিম মানবদের মনেও হয়তো  
সেই একই আশ্বাস-বিশ্বাস অঙ্কুরিত হইয়াছিল। গুহাগারে খোদিত এই সব চিত্রই পরবর্তী  
যুগে চিত্রাঙ্কর সৃষ্টি করিয়াছে। প্রস্তরগারে উৎকীর্ণ এই চিত্রাঙ্করের সাহায্যেই আমরা মানবজাতির  
প্রাচীন ইতিহাস আজ জানিতে পারিয়াছি। মিশর, উর, ব্যাবিলন, চীন এবং আরও অনেক  
দেশের ইতিহাস এই চিত্রাঙ্করে লিপিবদ্ধ আছে। মহেঞ্জোদাড়ো, হড়প্পায় যে সব চিত্রাঙ্কর  
পাওয়া গিয়াছে তাহার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার এখনও হয় নাই, হইলে আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের  
অনেক লুপ্ত তথ্য আমরা জানিতে পারিব।

মানবজাতির ইতিহাসে কতবার কত দুর্ঘোষ ঘনাইয়া আসিয়াছে, হিমালীপ্রবাহে, রনয়ায়, ঝঙ্কাবতে, দাবানলে প্রাচীন মানবসমাজ বারম্বার বিভীষিত হইয়াছে, পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিয়া কত রাজ্য কত জাতি নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু তাহাদের সহিত আমাদের যোগসূত্র সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয় নাই, তাহার কারণ তাহাদের শিল্পীরা একদা পর্বতগারে ছবি আঁকিয়াছিল, যে ছবি কালক্রমে বিবিধ বর্ণমালায় রূপায়িত হইয়াছে। এই বর্ণমালার মূর্ত্য নাই, তাই বোধ হয় আমাদের দেশের জ্ঞানীরা ইহাকে 'অক্ষর' অর্থাৎ ব্রহ্ম নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই অক্ষরেই মানব-সভ্যতার ইতিহাস বিধৃত হইয়া আছে। মুণ্ডক উপনিষদের ঋষি এই অক্ষর সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

অণু হৈত অণুতর যিনি দীপ্তিমান  
সর্বলোক, লোকবাসী যার মাঝে লীন,  
যিনি মৃত্যুহীন,

যিনি বাকা, যিনি মন-প্রাণ,  
তারেই অক্ষর বলি জান বার বারে

তিনি সত্য, তিনি লক্ষ্য, ওহে সৌম্য ভেদ কর তাঁরে।

এই অক্ষরকে এবং এই অক্ষরের বাণী-মূর্তি দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া এইবার আমার বক্তব্য নিবেদন করি।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কথা বলিবার আগে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই-চারি কথা বলা বাঞ্ছনীয়, কারণ বর্তমান বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকার জনাই তাহা প্রয়োজন।

পণ্ডিতেরা মনে করেন, খ্রীষ্টীয় দশম শতকের কোনও সময়ে পুরাতন বাংলা ভাষার জন্ম হয়। প্রাচীনতম বাংলার নমুনা আমরা পাই কয়েকটি শিলা ও ধাতু-লেখ্যে, বাঙালী পণ্ডিত সর্বানন্দকৃত অমরকোষের টীকায় এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপালে আবিষ্কৃত বৌদ্ধগান ও দৌহার্য। ইহার পরই আমরা পাই চণ্ডীদাসকৃত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও রমাই পণ্ডিতের শূনাপুরাণের উল্লেখ। এগুলি চতুর্দশ হইতে ষোড়শ শতকের মধ্যে রচিত। শিখদের আদিগ্রন্থের দুইটি পদ অনেকে জয়দেবের কর্তৃক প্রাচীন বাংলায় রচিত বলিয়া মনে করেন। অনেকের ইহাও বিশ্বাস যে, জয়দেবের গীতাগোবিন্দ প্রথমে প্রাচীন বাংলায় রচিত হইয়াছিল, পরে তাহা সংস্কৃতের রূপান্তরিত হয়। কবি জয়দেব ছিলেন খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের লোক।

১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলা ভাষা পৌরুষের আসন লাভ করিয়াছে এবং ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইহা পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়াছে, ইহাই পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত।

এই নয় শত বৎসরের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কিন্তু বাংলা গদ্যের স্থান নাই।

বাংলা সাহিত্যের শৈশবে, অর্থাৎ সাহিত্য যখন কেবল কবিতাতেই নিবদ্ধ ছিল তখন সে সাহিত্যের বিষয়-বস্তু ছিল প্রধানত দেবদেবীর মাহাত্ম্য-কীর্তন। ঐতিহাসিকের বিচারে বাংলা ভাষার জন্ম দশম শতাব্দীতে হইলেও, উল্লেখযোগ্য বাংলা কাব্যের সন্ধান আমরা পাই পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষেপে তুর্কিরা বাংলা দেশ আক্রমণ করে এবং সেইজন্যই সম্ভবত বাঙালীর সাহিত্যসাধনা স্বত্বকাল ব্যাহত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙালী-প্রতিভা পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই শতকে যেসব কবির দেখা আমরা পাই,

তাহাদের প্রভাবে বাংলা সাহিত্য আধুনিক যুগ পর্যন্ত প্রভাবিত। এই যুগের কবি রামায়ণকার কৃত্তবাস ওবা এবং পদরচয়িতা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকার কবি চণ্ডীদাস। এই যুগের অন্য উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচয়িতা মালাধর বসু। এই কালেই খিখিয়ায় মহাকবি বিদ্যাপতির অভ্যুদয়। পরবর্তী কালে কবিশেখর, কবিবল্লভ এবং গোবিন্দদাস কবিরাজ বিদ্যাপতির প্রতিভায় প্রভাবিত হইয়া অনেক উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি নামে হোসেন শাহের জমিদার কর্মচারীও অনেক পদ রচনা করিয়া দ্বিতীয় বিদ্যাপতি নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। আদি মনসামঙ্গল পাঁচালিও এই সময় রচিত হইয়াছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। এই মহাপুরুষের আবির্ভাব তদানীন্তন বঙ্গসমাজের যে রাজনৈতিক ও পারমাণবিক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল তাহার বিবরণ সুধী-সমাজে অবদিত নাই। তাহার প্রতিভা-দীপ্তি শুধু বঙ্গের নয়, বঙ্গের বাহিরেও দিব্যজ্যোতি বিকিরণ করিয়াছিল, আজও করিতেছে। তাহার বিদ্যুত আলোচনা এক্ষেত্রে অবান্তর। বাংলা সাহিত্যের সহিত তাহার সম্পর্কটুকু কেবল সংক্ষেপে বলিতেছি। শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাহার 'শ্রীচৈতন্যদেব' পুস্তকের এক স্থানে বলিয়াছেন — "নব বসন্তের প্রফুল্ল প্রভাতের প্রাকালে পিক-পক্ষীর অস্পষ্ট কাকলীর ন্যায় মধুর কেমলকান্ত পদাবলীর বঞ্চনায় শ্রীজয়দেব, শ্রীগুণরাজ খান ব্রহ্মভূতি অতিমর্ত্য সাহিত্যিকগণ শ্রীগৌরচন্দ্রের আগমনী-গীতি গান করিবার জন্য সাহিত্য-রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন।" গুনরাজ খান মালাধর বসুর উপাধি। এই সঙ্গে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির নামও তিনি করিতে পারিতেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিল। কবিরাই মহাপুরুষদের এবং মহাবিপ্লবের ক্ষেত্র সর্বদেশে প্রস্তুত করিয়াছেন, বাংলাদেশেও তাহার অনাথা হয় নাই। এই শতাব্দীতে আর একটি নূতন ধরনের সাহিত্য-কীর্তির প্রবর্তন বাংলা সাহিত্যে হয়, —সমসাময়িক মনুষ্যের চরিত্র ও মহিমা লইয়া কাব্য-রচনা। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন-কাহিনী ও তাহার প্রবর্তিত ধর্মের বৈশিষ্ট্য লইয়া অনেক বিখ্যাত পুস্তক সে সময়ে রচিত হইয়াছিল। মুরারি গুপ্ত, বৃন্দাবনদাস, গোচানন্দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, জয়ানন্দ, পরমানন্দ গুপ্ত, গোবিন্দদাস প্রভৃতি এই সময়ের বিখ্যাত লেখক। বৈষ্ণব গীতিকাব্যের বহুলপ্রচার এবং কাব্য-গানে ব্রজবুলির প্রচলনও এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য। এই সময় হইতেই বৈষ্ণব কবিতা বাংলা সাহিত্যের কাব্যে প্রাণসঞ্চার করিল। এই শতাব্দীর আর একটি স্মরণীয় সাহিত্য-কীর্তি — চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। মানিন্দ দত্ত, মাধব আচার্য, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কবিকল্পণ সকলেই চণ্ডীমঙ্গল লিখিয়াছিলেন; মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত, ইনি প্রাচীন বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যেও অন্যতম। মুকুন্দরাম কবিতায় নিজের আত্মকাহিনীও লিখিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাঠান মোগলের সংঘর্ষে বাংলাদেশে তখন যের অরাজকতা চলিতেছে। এই অরাজকতার বিশদ মর্মস্পর্শী বর্ণনা পাই কবিকল্পণের আত্মকাহিনীতে। অত্যাচারের ফলে মুকুন্দরামকে দেশ ছাড়িয়া পলাহিতে হইয়াছিল, তিনিও একদিন 'রেখিউড়ি' হইয়াছিলেন — এসবের বিস্তারিত বাস্তবধর্মী চিত্র তাহার কাব্যে তিনি অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। তাহার কাব্যেই আমরা প্রথমে বাস্তবধর্মী অর্থাৎ realistic রচনার আশ্রয় পাই। পরে এ বিষয়ে তাহাকে অনেকে নকল করিয়াছেন। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্যও ষোড়শ শতাব্দীতে



লেখা হয়ইছিল। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, শাসনকর্তা মুসলমানেরা সে সময় কবিদের উৎসাহ দিতেন। লক্ষ্য পরাগল খানের উৎসাহে কবীন্দ্র পরমেশ্বর পাণ্ডববিজয় কাব্য লেখেন, পরাগলের পুত্র ছুটি খানের আদেশে শ্রীকর নন্দী অধমেশ পর্ব রচনা করেন। কোচবিহারের রাজারাও মহাভারতের পর্বগুলিকে পাঁচালি রূপ দেওয়াইয়াছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে মোগল রাজত্ব শুরু হয়। বাঙালী কবিদের কল্পনা কিন্তু এই গুরুতর রাজনৈতিক পরিবর্তনে তেমন বিচলিত হয় নাই। তাঁহাদের কল্পনা তখনও বৈষ্ণব গীতিকাব্যের ভাবসরে আস্থিত। বৈষ্ণবপদাবলী, বৈষ্ণবজীবনী এবং কৃষ্ণলীলাই তখন বাঙালী কবিদের প্রধান প্রেরণা এবং বাংলা কাব্যের প্রধান অবলম্বন। এই সময় শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ প্রভৃতি বহু পদকর্তার নাম পাওয়া যায়; আপনাদের ঘোঁড়াচিতির ভয়ে তাঁহাদের নামের তালিকা আর দিলাম না। এই শতাব্দীর আর একটি কবির নাম কিন্তু না করিলে চলিবে না, তিনি মহাভারতকার কাশীরাম দাস। তাঁহার আসল পদবী দেব, জাতিতে তিনি কায়স্থ ছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন তিনি মহাভারতের চারিটি পর্ব—আদি, সভা, বন ও বিরাট পাঁচালি-মুদ্রে লিখিয়াছিলেন; পরবর্তী পর্বগুলি পরে অন্য কেহ লিখিয়া থাকিবেন। কিন্তু পরবর্তী গবেষকেরা বলেন, মহাভারতটিই কাশীরাম দাসের রচনা। সপ্তদশ শতাব্দীতে রামায়ণ কবীরাও দুই-একখানি কাব্য রচিত হয়ইছিল। তাহার মধ্যে উত্তরবঙ্গ সমাদৃত অদ্ভুতচাচ্যের কাব্যটি উল্লেখযোগ্য। অদ্ভুতচাচ্যের আসল নাম নিত্যানন্দ।

দেবী মনসা, চণ্ডী এবং শিবচাঁকুর তখনও বাঙালী কবিদের কল্পনার ধোরাক জোগাইতেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে মনসামঙ্গল, দেবীমঙ্গল এবং শিবায়ন কাব্য রচিত হয়ইছিল। অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যই হুগলদেশে রচিত বলিয়া কবিরা বর্ণনা করিয়াছেন। কবি কেমানন্দ বা ক্ষমানন্দের মনসামঙ্গলই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত। মুকুন্দরামের অনুকরণে ইনিও আত্মপরিচয় ও তৎকালিক অরাজকতার বর্ণনা করিয়াছেন। সে সময়ে রাঢ়দেশীয় কাব্যরচয়িতারা অনেকই এই বিশেষ রীতির অনুকরণ করিতেন। রাজনৈতিক পরাধীনতার প্রাণি তখন এই মঙ্গলকাব্যগুলির ভিতর দিয়াও ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই সব মঙ্গলকাব্যের মধ্যে একটি নতুন ধরনের স্বাদ মেলে কৃষ্ণরামের রামমঙ্গল কাব্যে। ব্যাঘ্র-দেবতা দক্ষিণরায় এই কাব্যের নায়ক। কৃত্তীর-দেবতা কালুরায়ের কাহিনী এবং পীর বড়গা গাভির কাহিনীও ইহাতে আছে। জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে বেবড় আরোপ করিয়া তাহারের পূজা করার রীতি পৃথিবীর আদিম মানবসমাজে সর্বত্র আছে। আমাদের রামায়ণের হনুমান জাম্বুবান ও পূজনীয় দেবতা। কিন্তু ব্যাঘ্র ও কৃত্তীরকে কাকে স্থান আর কেহ বোধ হয় দেন নাই। সেই হিসাবে এই মঙ্গলকাব্যটি নতুনত্বের দাবী রাখে।

পূর্বেই বলিয়াছি, সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্যিক ভাবধারার প্রধান উৎস বৈষ্ণব-গীতিকাব্য; বৈষ্ণব ভাবধারার উচ্ছলিত প্রেম-বরষে তখন বাঙ্গালীর চিত্ত অবগাহন করিতেছে। যে বিদেশী মুসলমানগণ শাসকরূপে বাংলায় আগিয়াছিলেন তাঁহারাও কালক্রমে বাঙালী হইয়া গিয়াছিলেন, তাহারাও এই বৈষ্ণবীয় প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। এই সময় কয়েকজন মুসলমান পদকর্তার নাম পাওয়া যায়—নসীর মামুদ, সৈয়দ সুলতান, সৈয়দ মজুজ, আলিরেজা এবং আলাওল। আরাকানের রাজসভাতেও এই সময় বাংলা সাহিত্যের সমাদর

ও প্রতিষ্ঠা হয়ইছিল। এই প্রসঙ্গে আমরা দৌলত কাজি ও আলাওলের নাম পাই। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয় তাঁহার ‘কবি দৌলত কাজির সত্য ময়না ও লোর চন্দ্রানন্দী’ নামক পুস্তকে বলিতেছেন, “বঙ্গসাহিত্যে এই যে একটানা নিছক ধর্মের সুব এতদিন চলিয়া আসিতেছিল তাহা বদলিয়া নতুন ধরনে অবিমিশ্র প্রেমকাহিনী লইয়া কাব্য রচনার সম্মান মুসলমান কবিদেরই প্রাপ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। এই মুসলমান কবিরা শুধু যে নিছক ধর্মাব্যাক কাব্য রচনার দ্বারা পরিবর্তন করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন তাহা নহে, ফার্সি ও প্রাচীন হিন্দী-সাহিত্য হইতে অজ্ঞাত অভিব্যক্তি কাহিনীসমূহ অনিয়া বাংলা সাহিত্যে এক নবমুগের সৃষ্টি করিলেন।” অধ্যাপক মহাশয় যুক্তি প্রয়োগ করিয়া তাঁহার উক্তির যথার্থ্য প্রমাণ করিয়াছেন। রাজনীতিক্ষেত্রে যাহাদের সাহিত্য আমাদের এত বিরোধ, সাহিত্যের উদার ক্ষেত্রে তাহারা আমাদের কত আপন। এই সেদিনও পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য মুসলমান ছেলেমেয়েরা পুলিশের হস্তে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্যিকর্মের ইতিহাস শেষ করিবার পূর্বে ধর্ম-চাকুরের ছড়া ও ধর্মপূরণ-কাহিনীর কথা উল্লেখ করা উচিত। অনেকের মতে ধর্ম-চাকুরের নামে বুদ্ধপূজাই বাংলা দেশে প্রবর্তিত হয়ইছিল। এই আদিবঙ্গ ধর্মের মাহাত্ম্য-কীর্তন করিয়া কিছু মঙ্গলকাব্যও লেখা হয়ইছিল। এগুলি প্রকৃতই কাব্য এবং এগুলি সেকালের রায়চুর্মির যে চিত্র অঙ্কিত আছে, লাউসেনের বীরহৃদে ও অভয়ানুগলিতে যাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা তখনকার বাঙালী-মনের ও বাঙালী-সংস্কৃতির পরিচায়ক। অধ্যাপক সুকুমার সেন ধর্মমঙ্গলকে রায়ের জাতীয় কাব্য বলিয়াছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে বাংলা গদ্যের জন্ম। ছন্দোবদ্ধ কবিতার গভী উত্তীর্ণ হইয়া বাংলা সাহিত্য এবার প্রশস্ততর সৃষ্টির ক্ষেত্র আবিষ্কার করিল। কিন্তু সে সৃষ্টির মহিমা বিকশিত হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীতে। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও পূর্বের মত পদাবলী সংগ্রহ, রামায়ণ ও মহাভারতকে অবলম্বন করিয়া বিবিধ কাব্য-রচনা, কিছু কিছু মঙ্গলকাব্য, শিবায়ন এবং সত্যনারায়ণের পাঁচালী প্রভৃতি সাহিত্যিকর্মের পূর্বানুগৃহীত চলিতেছিল, কিন্তু এ যুগের শ্রেষ্ঠ গৌরব—এ যুগে ভারতচন্দ্র জগমুগ্রহ করিয়াছিলেন, যে ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে সাহিত্যরসিক প্রমথ চৌধুরী মহাশয় একটি প্রবন্ধের উপসংহারে বলিয়াছেন, “এদেশে ইংরেজের শুভাগমনের পূর্বে বাংলা দেশ বৈলে যে একটা দেশ ছিল, আর সে দেশে যে মানুষ ছিল আর সে মানুষের মুখে যে ভাষা ছিল তাহা সে ভাষায় যে ভাষায় রচিত হ’ত এই সত্য স্মরণ করিয়া দেখাই এই নাতিভ্রূষ প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য। কেন না ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এ সত্য বিমূর্ত হওয়া সহজ, যেহেতু আমাদের শিক্ষাওকদের মতে বাঙালী জাতির জন্মতাত্ত্বিক হচ্ছে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ...”

এই অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমরা শক্তিসাধক কবিরঞ্জন রামপ্রসাদকেও পাইয়াছি। ইনিও একখানি কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান ভক্তিমূলক শ্যামা সঙ্গীতগুলি।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শেষ বিদ্বানদিগের কিছু গাথাও বিরচিত হইয়াছিল। মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা এবং কানুপা এই চারিজন বিদ্বান মহাশয় কীর্তনই সেসব গাথা ও কাহিনীর উদ্দেশ্য।



ইহার পরই ইংরেজের আগমন এবং তাঁহাদের চেষ্টাতেই বাংলা গদ্যের জন্ম। এই সম্পর্কে খ্রীস্জনীকান্ত দাস মহাশয় তাঁহার 'বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ' নামক পুস্তকে বলিয়াছেন, "বর্তমানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বলিয়া যাহা খ্যাত, অষ্টাদশ শতাব্দীর নীহারিকা অংশই হইতে তাঁহাদের (অর্থাৎ তৎকালীন ইংরেজ পণ্ডিতদের) সম্মিলিত চেষ্টাতেই তাহা প্রথম নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করে। এ বিষয়ে বাংলা দেশ ও বাঙালীজাতি সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের কাছেই ঋণী। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে বাঙালীর দান নাই বলিলেই হয়। যে একজন মাত্র বাঙালীর নাম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে পাই, তিনি ইহাদের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত, ইহাদের উৎসাহ ও অঙ্গে প্রতিপাতিত; স্বধীনভাবে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে ইহার কোন কীটই নাই। এই একক বাঙালীর নাম রামরাম বসু।..."

খৃষ্টীয় ১৭৪৩ অব্দে পূর্ণিগালেব্ লিসবন নগরে প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ 'কৃপার শাস্ত্রে অর্থভেদ' রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হয়। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর, কারণ এই বৎসর হুগলী শাহর হেন-কটা বাংলা হরফে প্রথম বাংলা মুদ্রণ আরম্ভ হয়। বাংলা হরফ প্রথমে যথেষ্ট প্রস্তুত করনে উইলকিন্স সাহেব। পঞ্চদশ কর্মকার পরে তাঁহার নিকট ইহা শিক্ষা করে।

উক্ত গ্রন্থে সজনীকান্ত এই প্রসঙ্গে আরও লিখিয়াছেন, "১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে যাহার সূত্রপাত, ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাহার একশ বৎসরের ইতিহাস খুব বিরাট ও বিচিত্র ইহবার কথা নয়, কিন্তু তথাপি সেইগুলি গোড়ার কথা এবং সত্য ও কৃতজ্ঞতার খাতিরে এই ইতিহাস আমাদের জানিতেই হইবে। সত্য বটে কোন মৌলিক রচনা এইকালে রচিত হয় নাই, সত্য বটে লেখক ও সংগ্রাহক মাঝেই বৈদেশিক, তথাপি এ কথা আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে ইহাদের সমবেত চেষ্টাতেই বাংলা লিখিত-গদ্য একটা রূপ ধারণ করিতেছিল—যাহা বাঙালী লেখকের লেখনীমুখে সর্বপ্রথম 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'রূপে আদ্য প্রকাশ করিয়া রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিম পণ্ডিত লাভ করিয়াছে।" এই একশ বৎসরের ইতিহাসে যে ছয়জন বৈদেশিক কর্মী বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে ব্যাকরণ, অভিধান ও শব্দশিক্ষা প্রণয়ন করিয়া, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের "দুর্নিম দুরারোগ্য ভূষণ্ড ব্যাকরণ অভিধানের খাচা কোলাল চালাইয়া" একটা পথ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম—নাথানিয়াল ব্রাসি হালহেড, জোনাথান ডানকান, এন. বি. এডমন্সটোন, হেনরি পিট্‌স্ ফরস্টার, এ. আপজন্স এবং জন মিলার। সর্বশেষ—উইলিয়াম কেরীর নাম সর্বজনবিদিত।

ইহাদের নিকট আমরা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ, কিন্তু একথাও ইতিহাসে সুবিচিত্র যে তাঁহারা বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্যই এতটা পরিশ্রম করেন নাই, করিয়াছিলেন নিজাদের প্রয়োজনে, বিলাত হইতে আগত ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের বাংলা শিক্ষার জন্য। বাংলাভাষায় বাহিবেল-ধর্ম প্রচার করিবার তাগিদও বড় কম ছিল না। তবুও একথা আমরা কৃতজ্ঞতার সহিতই স্বীকার করিব যে বাংলা গদ্যের সেই প্রথম যুগে ওয়ারেন হেস্টিংসের মত লোকের দৃষ্টিও ভারতীয় সাহিত্য-সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তাঁদের ও তাঁহার সহকর্মীদের চেষ্টায় নাই—গ্রন্থগুলি বাংলা ভাষায় অনূদিত হইয়া বাংলা গদ্যকে সমৃদ্ধ করে। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' মুদ্রিত হইবার পর চণ্ডীদারগ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস', রাজীবলোচন

মুখোপাধ্যায়ের "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স চরিত্রম্" এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন' প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সেই সময়কার শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক। শুদ্ধ এবং কথ্য গদ্যের সূত্র প্রকাশভঙ্গী তাঁহার রচনাতেই আমরা প্রথম দেখিতে পাই।

কেরী, মার্শম্যান এবং অন্যান্য ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের চেষ্টায় বহু বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। তাঁহাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া সম্রাট যে সব বাঙালী ইহাতে যোগ দিলেন তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী রাজা রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব এবং রাজা কালীকৃষ্ণ দেব। রামমোহন লিখিয়াছিলেন বেদান্ত দর্শন, শাস্ত্রবিচার বিষয়ক কয়েকটি উৎকৃষ্ট গদ্যগ্রন্থ, একটি উৎকৃষ্ট বাংলা ব্যাকরণ এবং ব্রহ্মসংলাপ। সংস্কৃত অভিধান শব্দকল্পদ্রুমের সম্বলন করিয়াছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব। ইহা তাঁহার মহতী কীর্তি। এই যুগের অধিকাংশ গদ্যরচনাই সংস্কৃত, ফারসী বা ইংরেজীর অনুবাদ। মৌলিক রচনা তেমন কিছু নাই। বহু স্থান হইতে বিবিধ উপকরণ সংগ্রহ করিয়া সে যুগের মনীষীরা তখন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি পত্তন করিতেছিলেন। সে সময়ে সাধারণ লোকের রসপিপাসা তৃপ্ত হইত কবিতালাদের গীত ও যাত্রায়, অর্থাৎ ভরজা খেউড় কবিগান পাঁচালি ও হাফ-আখড়াইয়ের মাধ্যমে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আধুনিক পদ্ধতির পাঁচালি রচনায় কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন দাশবন্দী রায়। তাঁহার রচনায় সেকালের রঙ্গ-রসিকতা, শব্দবিন্যাসের চাতুর্য এবং সেকালের বাঙালী-মানবের একটা পরিচয় আমরা পাই।

ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় সাময়িক পত্রের আবির্ভাব। 'সমাচার দর্পণ' এবং 'বঙ্গদাদা গেজেট' প্রকাশিত হইল। সাময়িক পত্রের মারফৎ বাঙালী জনসাধারণ বাংলা গদ্যের রসসাধন করিল। ক্রমশ 'সংবাদ কৌমুদী', 'সমাচার চন্দ্রিকা' এবং 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশিত হইল। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকগুলি পুস্তকও লিখিয়াছিলেন। 'নববাবুবিলাস' তাঁহার একটি উল্লেখযোগ্য কৌতুক-রচনা। 'সংবাদ-প্রভাকর'র সম্পাদক কবি ঈশ্বর গুপ্ত। বাংলার রসসাহিত্যে তাঁহার আসল কোথায় তাহা আপনারা সকলেই জানেন। এই 'সংবাদ প্রভাকর'ই কবিতা লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সাহিত্যসাধনা আরম্ভ করেন।

ইহার পরই বাংলার নবযুগ—ইয়ৎ-বেদলদের যুগ। এই যুগের যাহারা যুগন্ধর তাঁহাদের প্রথম কৃতিত্ব বাংলা সাহিত্যের সদ্য-নির্মিত ভিত্তিকে আরও দৃঢ় করা। শুণ্ড তাহাই নহে, বাঙালীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পাশ্চাত্য আধুনিকতার, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঘাঁচে ঢালিয়া তাহাকে নব-রূপে মূর্ত করিবার বিবিধ চেষ্টাও ইহারা করিয়াছেন। যে আধ্যাত্মিকতা, সমাজের যে সব প্রাচীন নিয়মাবলী প্রাণহীন হইয়া কুৎসিত তামসিকতায় পরিণত হইয়াছিল, সে সবার বিনাশ সাধন করিয়া সাহিত্যে ও সমাজে সুস্থ, প্রাণবান, যুক্তিযুক্ত পাশ্চাত্য আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ইহারা যত্নবান হইয়াছিলেন। সে যুগে ইহারা ছিলেন বিদ্রোহী, সর্ববিধ সংস্কারের অগ্রদূত। অধ্যাপক ডিরোজিও ছিলেন ইহাদের গুরু। এই ডিরোজিও-শিষ্যগণের মধ্যে রোডা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধাকান্ত শিকদার বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে যাহা আমরা অধিকার করিয়া আনি। ইহাদের সঙ্গে তারাচাঁদ চক্রবর্তী, অক্ষয়কুমার রায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য। ইহাদের প্রত্যেকেই কৃতি পুণ্ড্র, কিন্তু ইহাদের বিস্তৃততর পরিচয় দেওয়া এ প্রবন্ধে সম্ভব নহে,



তাই তাঁহাদের নামও লিউল্লেক্সমাত্র করিলাম। বৈষম্য করণ যেনম স্মিচেতনোর আবির্ভাবের ক্ষেত্রে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এই সব মনসী তেমনী কেহ বক্তৃতা দিয়া, কেহ প্রবন্ধ লিখিয়া, কেহ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করিয়া, কেহ কেহ বা স্বীয় নিতীক আচরণ দ্বারা পরবর্তী যুগের প্রতিভাবান কবি ও লেখকদের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিন্যাসাগর এবং মাইকেল মধুসূদনের যুগ তাইই আসিয়াছে। ইহার মধ্যে বাংলায় স্কুল, কলেজ, নানাবিধ এসোসিয়েশন বাৎসরিক নাটকমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছে, ক্রিশ্চন ধর্মকে রোধ করিবার জন্য সদা-স্থাপিত ব্রাহ্ম সমাজ আদর্শ হিন্দু সমাজ সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইতেছে। শ্রীমাকৃষ্ণ, বহ্মিচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ জগৎগ্রহণ করিয়াছেন। গুপ্ত ইংল্যান্ড নহেন, ভবিষ্যতে যাহারা ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব বিভাগেই নেতৃত্ব করিবেন, তাহারাও ভূমিস্তি হইয়াছেন। যে উর্বর ক্ষেত্র প্রেরণা-বাহিরে অভাবে এককাল পূর্ণ-ফলপ্রসূ হইতে পারে নাই, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রেরণায় সে ক্ষেত্রে সোনার ফসল ফলিল। এই সব অলোকসামান্য প্রতিভাধরের নেতৃত্বে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের যে গৌরবযুগ যুগ আরম্ভ হইয়াছিল তাহার সমারোহ আজও অব্যাহত আছে। স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার অমর গ্রন্থ 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'য় এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সাহিত্যিক 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে। এখন ১৯৫৭। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বয়স সবে এক শত বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। এই স্বকালের মধ্যে বাঙালীর সাহিত্যপ্রতিভা বদভারতীকে যে ঐশ্বর্যসম্ভারে মণ্ডিত করিয়াছে তাহার তুলনা পৃথিবীর আর কোনও সাহিত্যে নাই। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সাধকদের সমাক পরিচয় দিবার সুযোগ এ প্রবন্ধে নাই। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র এই সেদিন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে ছিলেন, তাঁহাদের অন্ত-কিরণ-ছটা বাংলার সাহিত্যাকাশকে এখনও রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহাদের এবং তাঁহাদের সমকালীন কবি ও সাহিত্যিকদের সহিত কিছু পরিচয়ও আপনাদের নিশ্চয় আছে, সুতরাং তাহা লইয়া আমি কালক্ষেপ করিব না। রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের পরে যে সব সাহিত্য-সাধক বঙ্গবাসীর সেব্যায় নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের সৃষ্টির গতি-প্রকৃতির সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব। এই সব সাহিত্য-সাধকের সাধনা এখনও শেষ হয় নাই, সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কোন শেষকথা বলিবার সময় ইহা নয়। তবে একটা কথা অসম্ভোচে বলা যায় যে, অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অঙ্গপক্ষপাত বিচার করিলে প্রকাশ হইতে হইবে না। সমাজে একদল লোক সর্বস্বার্থ থাকেন যাহারা বর্তমানের মধ্যে ভাল কিছু দেখিতে পান না, যাহাদের মন অতীতকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত হইতে ভালবাসে। এ ধরনের হতাশাবাদী সমালোচক মধুসূদন, বহ্মি, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের মতোও ছিলেন এবং নান্দা কুপিত করিয়া বলিয়াছিলেন, 'কিছুই হচ্ছে না, যা হচ্ছে সব বাজে।' কিন্তু 'কিছু' যে হইয়াছে তাহার অকটা প্রমাণ আজ আমরা পাইছি। অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কিছু হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পরও বাংলার সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যে নূতন সুর বাজিয়াছে, নূতন রঙ ফুটিয়াছে। আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে, ভাবার স্বচ্ছতা ও সাঙ্গীল্যতায় অতি-আধুনিক উপন্যাস ও গল্পসাহিত্য গুপ্ত বাংলার নয়, গুপ্ত ভারতের নয়, বিশ্বের দরবারে সম্মান পাইবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। তাহার। নূতন

পথের সন্ধান দিয়েছে, নূতন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছে। প্রবন্ধ এবং ভ্রমণ-কাহিনীও অতি-আধুনিক রূপকদের লেখনীতে অনবদ্য কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। অতি-আধুনিক গল্প-সাহিত্যে বৈশী সমৃদ্ধ, কবিতা বা নাটক তদুপ নহে। অতি-আধুনিক গল্প-উপন্যাসের ধারাকে বিরোধ করিবার চেষ্টা করিলে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের অব্যবহিত পরবর্তী একদল লেখক তাঁহাদের সৃষ্টিতে ভারতের আদর্শকেই জয়যুক্ত করিতে চাহিয়াছেন। বাঙালীর যে চরিত্র তাহার প্রেমে, আত্মত্যাগে, ক্ষমায়, বীরত্বে, বাঙালীর যে সংস্কৃতি তাহার গ্রামের ঘাটে মাঠে হালে মেলিয়া নৃত্যে গীতে পটে পুড়ুলে জীবন্ত হইয়া আছে, যে সামাজিক সীতেনে রাজনৈতিক অত্যাচারে ইহার। বিপর্য, সেই সবেরই শিখাভিত্তি রূপ ইহাদের রচনায় পরিস্ফুট। ইহার পর দ্বিতীয় আর একদল লেখকের আবির্ভাব ঘটয়াছে, যাহারা লিগত মহাযুদ্ধের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাহারা নিজেরা প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ করেন নাই, যুদ্ধজনিত দুর্দশাও ভোগ করেন নাই, কিন্তু ইউরোপের যে সব লেখক ও কবি যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফলভাগী হইয়া, সভ্যতার ছদ্মবেশের অন্তরালে ঘৃণ্যতম পাশবিকতার রূপ দেখিয়া সভ্যতা আভিজাত্য ও মনুষ্যত্বের সম্বন্ধেই আহ্বান হইয়া পড়িয়াছেন এবং সেইজন্যই যাহাদের লেখনায় নাস্তিক্যবাদ হতভাগ্য এবং যথেষ্টাচারের সুর স্বাভাবিক ভাবেই বাজিয়াছে, এই দ্বিতীয় দলের লেখকেরা তাঁহাদের অনুকরণে বাংলাসাহিত্যেও সেই মিল আদান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ-দেশের এই-জাতীয় লেখকদের সম্বন্ধে ভার্জিনিয়া উলফ তাহার 'স্মিনিং টাওয়ার' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে যাহারা সাহিত্যপ্রস্তুতি ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই পিতৃঘন শিকলান্ড করিয়া পিতৃবিদ্বে নিরর্ভরা হইয়া আভিজাত্যের উচ্চ মীনারে আরোহণ করিয়াছিলেন, এবং সেই উচ্চ মীনার হইতে তাঁহাদের দৃষ্টি ও কল্পনা অসম্মান করিবার সুযোগ যে রূপ প্রত্যক্ষ করিত তাহাই প্রধানত তাহাদের সৃষ্টির মূলধন ছিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাস পর্যন্ত এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু যুদ্ধ বাধিতেই সেই মীনারের ভিত্তিতে আঘাত লাগিল, ফলে মীনারটি আর সোজা দাঁড়াইয়া রহিল না, ক্রমশ হেলিয়া পড়িতে লাগিল। এই হেলিয়া-পড়া মীনার-চূড়ায় যে সব লেখক-লেখিকা বসিয়া আছেন তাহাদের মনে সাহিত্য হইতেও ন্যমিতও পারিতেছেন না, কিন্তু সেখানে বসিয়া যত্নিতও পাইতেছেন না, তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গীও ক্রমশ বক্র হইয়া যাইতেছে, সহজভাবে তাহারা আর কিছু দেখিতে পারিতেছেন না। গুপ্ত তাই নয়, যে ধনতান্ত্রিক সভ্যতা এই যুদ্ধের জনক, তাহারা নিজেরাও সেই ধনতান্ত্রিক সভ্যতার ফল। তাই আত্মবিশ্বাসেও তাঁহাদের চিত্ত পরিপূর্ণ, আত্মবিশ্বাসও তাঁহাদের আর নাই। সুতরাং সত্য-শিব-সুন্দর, প্রেম-ক্ষমা-ত্যাগ কোন কিছুতেই আর তাহারা আত্মা রাখিতে পারিতেছেন না। গুপ্ত ইহাদের নিজে অর্থহীন। তাঁহাদের বিপর্যন্ত বিকৃত মনের পরিচয় তাই তাঁহাদের রচনাতেও বর্তমান। তাহাদের লেখা কবিতাতে ছন্দ-মিলের কোমল বাল্য নাই, অর্থও নাই।' যুদ্ধোত্তর বিশেষী সাহিত্যিকদের এই বিভ্রান্তি এই দ্বিতীয় দলের লেখকদের মনে সঞ্চারিত হইয়াছে। তাহার ফলে নাস্তিক্যবাদ, অর্থহীন গদ্য-কবিতা, মনুষ্যত্বের প্রতি অবিশ্বাস, মহৎকে বৃহৎকে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা, নিছক পণ্ডিত্যকেই নয় করিয়া প্রকাশ করিবার আগ্রহ এইসব লেখকের রচনায় দেখা গিয়াছে। বিদেশী লেখকেরা যুদ্ধের কবলে পড়িয়া অপ্রকৃতিত হইয়াছিলেন, ইহার। তাঁহাদের রচনা করিয়া পাণলমির ভান করিতেছেন। ইহাতে বিমল হইবার কিছু নাই। মিলটন হোমার টাসো মাইকেল



মধুসূদনকে, স্কট বঙ্কিমকে এবং বায়রন নবীনচন্দ্রকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিলেন, অতি-আধুনিক কবিরা ইহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন—বিশেষতঃ প্রাচীন-আধুনিক কবিদের প্রেরণা লেখক নূতন প্রেরণার জন্য ধরনা দিয়া থাকেন। এই অতি-আধুনিক বিদেশী কবিদের প্রেরণা যদি মিলটন হোমার টাঙ্গো স্কট বায়রনের প্রেরণার মতো সুস্থ হয়ত তাহা হইলে বঙ্গসাহিত্যে একটা নূতন সুর বাজিত, কিন্তু এখন যাহা বাজিতেছে তাহা বেসুরা, কারণ যাহার অনুকরণ করা হইতেছে তাহাই যে সুর-হীন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, এই লেখকরা অনেকেই শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন এবং ইহাদের মধ্যে অনেকে এখন বৃত্তিতেও পারিয়াছেন যে, বিদেশী ‘কারি পাউডার’ দিয়া স্বদেশী বাঙ্কনের তিক স্বাদটি আনা যায় না। দুই-একজন একেবারে মত ও পথ পরিবর্তনও করিয়াছেন।

বাংলার গল্প-সাহিত্যে তৃতীয় যে ধারাটি লক্ষ্য করা যায় সেটির উৎস বিদেশী রাজনীতি, প্রধানত কমুনিজম্। সাম্যবাদ ভারতবর্ষেরও প্রাচীন আদর্শ, কিন্তু রুশীয় কমুনিজম্ এবং ভারতীয় সাম্যবাদে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ভারতীয় সাম্যবাদ আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত, রুশীয় কমিউনিজমের ভিত্তি বিষয়-বাসনা। দীন-দরিদ্র চাষী-মজুর নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা হর্ষ-বেদনা লইয়া কাব্যরচনা বাংলা সাহিত্যে নূতন নৈবেদ্য, মঙ্গলকাব্য-গুলিকেও একাবাসর আমরা উপভোগ করিয়াছি, শরৎচন্দ্রের অমর শ্রমিকদের কথাই চিত্রিত করিয়াছে। কিন্তু মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বা শরৎচন্দ্রের লেখা পড়িলে মনে হয় যে, দেশের মাটির সহিত সে সব কাব্যের যোগ আছে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের পরে যে সব লেখক শ্রমিকদের লইয়া কাব্যরচনায়া ব্যপৃত রহিয়াছেন তাহাদের লেখা পড়িয়া মনে হয় না যে, তাঁহারা এই শ্রমিকদের সুখদুঃখের অংশীদার। বরং মনে হয়, গল্প বলিবার ছলে তাহারা যেন শ্রমিকদের স্বপক্ষে ওকালতি করিতেছেন। সেই জন্য অনেক ক্ষেত্রেই কাব্যের সুরটা ঠিক জমে নাই। এ গেষ্টার মধ্যেও অনেক শক্তিমান লেখক আছেন, অনেকের মনীষা এবং বিদ্যাবত্তাও সম্মানযোগ্য, কিন্তু ইহাদের লেখায় সৃষ্টিধর্মী কাব্যের সুর তেমন জমে নাই। অর্থাৎ আমাদের সাহিত্যে গোঁকি বা শলোকভের দেখা আমরা এখনও পাই নাই।

সম্প্রতি আর একদল নবীন লেখকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে যাহারা প্রথমেই দলের মতো ভারতবর্ষের আদর্শে বিশ্বাসবান, দেশের জল মাটি মানুষকেই যাহারা কাব্যের উপকরণ করিয়াছেন, কোন ‘ইজম্’ বা ঢং ইহাদের প্রভাবিত করে নাই। ইহারাও সাহিত্যক্ষেত্রে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছেন।

সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যে বাংলা কবিতা ও নাটকের মান কিন্তু অনেক নামিয়া গিয়াছে। গদ্য-কবিতা বলিয়া যাহা মাসিকের পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করে তাহা কবিতা নয়, অদ্ভুত হৈয়ালি মাছ। তবে সুস্নেহ বিষয়, তাহার ক্রমশ বিলীন হইতেছেন, তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছে প্রকৃত কবিতা। কয়েকজন শক্তিশালী তরুণ কবির দেখা আমরা পাইয়াছি, কিন্তু এখনও কিছুদিন না গেলে তাঁহাদের সমগ্র নিশ্চিন্তরূপে কিছু দখা যায় না।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ভাল নাটকেরও খুব অভাব আছে। ইহার কারণ, পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলির সহিত কোনও প্রতিভাবান নাট্যকার সংশ্লিষ্ট নাই। পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান, তাহাদের লক্ষ্য অর্থোপার্জন, দর্শকদের রুচির মান উন্নীত করা নয়। জাতীয়

নাট্যশালা না হইলে এবং সে নাট্যশালায় প্রতিভাবান নাট্যকারদের সম্মানের স্থান না দিলে আমাদের নাট্যসাহিত্যের উন্নতির আশা নাই।

মোটামুটি ইহাই বর্তমান সৃষ্টিধর্মী বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের আর একটা বড় দিক গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহার উল্লেখ না করিলে আমরা বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিবে। সে দিকটি উপকরণ-সংগ্রহের দিক। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশে অনেক সাধক ও গবেষক ইতিহাস, ব্যাকরণ, অভিধান ও পরিভাষা বিষয়ে মূল্যবান গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। উচ্চতর শিক্ষার জন্য সাহিত্য-সমালোচনা, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি বিষয়েও পুস্তক রচিত হইয়াছে। সম্প্রতি আমাদের জীবনী-সাহিত্যও বেশ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অনেক বিলুপ্ত-প্রায় পুস্তক প্রকাশ করিয়া সেগুলিকে আবার সাধারণের গোচরে আনিয়াছেন। স্বর্ণীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে পথে অগ্রণী ছিলেন সে পথে এখন অনেক যোগ্য সাধকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগে আমরা দেখিয়াছি যে, সে যুগে বাঙালী মণীষীরা প্রধানত উপকরণ-সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন এবং সেই উপকরণের ভিত্তির উপরই আধুনিক সাহিত্যের হর্ম্য নির্মিত হইয়াছে। বর্তমান যুগের সাহিত্য-সাধকরা যে সব মূল্যবান উপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন তাহাও যে ভবিষ্যৎ সাহিত্য-স্রষ্টাদের সৃষ্টিকর্মে সহায়তা করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুসারে ভাষা ও সাহিত্যের বয়স প্রায় এক হাজার বৎসর। ইহার মধ্যে আমরা নয় শত বৎসর কাটিয়াছি কবিতা লইয়া এবং সে কবিতার প্রধান বিষয় দেব-দেবীর মাহাত্ম্যকীর্তন, সর্প-ব্যাঘ-কুঞ্জীরের মধ্যেও দেবত্ব আরোপ করিয়া আমাদের প্রাচীন কবিরা কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। বাংলা পদ্যযুগ আরম্ভ হইবার পর ইহাতেই, অর্থাৎ পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত সংঘর্ষের পর ইহাতেই আমাদের কাব্যলোক হইতে দেবদেবীরা নিবাসিত হইয়াছেন এবং আমাদের মনে ইহাতেই আমরা কুৎসন্ত্রাস বর্জন করিয়া যুক্তিবাদী হইয়াছি; এখন মানুষই আমাদের কাব্যের একমাত্র আশ্রয়। ইহার স্বপক্ষে আমরা প্রায়ই এই কবিতাটি উদ্ধৃত করি—

“শুনহ মানুষ ভাই,

সবার উপরে মানুষ সত্য

তাহার উপরে নাই।”

বড়ু দ্বিজ, দীন চণ্ডীদাস যিনিই এ কবিতার রচয়িতা হউন তিনি নিজেই ছিলেন একজন দেব-দেবী-মাহাত্ম্য-কীর্তনকারী কবি। মনে প্রাশ্ন জাগে, তবে তিনি হঠাৎ এমনভাবে মানব-বন্দনা করিলেন কেন? ইহার উত্তর, কবিরা চিরকালই শক্তির উপাসক, সে শক্তি দেব-দেবী বা মানব-মানবী যে রূপেই আত্মপ্রকাশ করুক না কেন, কবির প্রশস্তি সে লাভ করিবেই। শক্তিময়ী রজনকী রামীর প্রেমই উক্ত কবিতার উৎস—এ কথা দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার বিখ্যাত ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ পুস্তকে লিখিয়াছেন। চণ্ডীদাসের উক্তি — “শত শত বাঙালী তাহাকে যে প্রেম শিখাইতে পারিতেন না, ব্রহ্মা স্বয়ং আসিয়া যে জ্ঞান দিতে পারিতেন না, রামী তাহাকে তাহা দিয়াছে।” সুতরাং যে মানুষের বন্দনা তিনি গাহিয়া গিয়াছেন সে মানুষ সাধারণ মানুষ নহে, সে মানুষ দেবদেবের স্তরে উন্নীত হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন কালের মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেব-দেবীদের দ্বন্দ্ব-কলহের যে চিত্র আমরা পাইয়া থাকি, সে চিত্রের কল্পনা কবিরা দেব-



দেবীদের মধ্যে ততটা পান নাই—যতটা পাইয়াছিলেন আদোলিত নিষ্পিষ্ট জনসাধারণের বিম্বন্ধ মানসের মধ্যে। এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, “চণ্ডী যেমন প্রচণ্ড উপদ্রবে আপনাদের পূজা প্রতিষ্ঠা করেন মনসা শীতলাও তেমনি তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। শৈব চাঁদ সনাগরের দূরবাহা সকলেই জানেন। বিঘবহি, দক্ষিণরায়, সতাপীর্ণ প্রভৃতি আরও অনেক ছোটখাটো দেবতা আপন আপন বিক্রম প্রকাশ করিতে ক্রটি করেন নাই। এমনি করিয়া সমাজের নিমন্তরণলি প্রবল ভূমিকম্পের সমাজের উপরে উত্তিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল।”

ইহার সরল অর্থ ইহাই দাঁড়ায় যে, নিমন্তরণের এক-একটি মানবযোগ্যতার এক-একটি দেব বা দেবীর প্রতীকস্বরূপ ছিল এবং সেকারের মঙ্গলকাবাওলি সেই প্রতীকগুলিরই প্রশস্তি-কাবা। আজ যে আসনে আমরা জাতীয় পতাকা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, পুরাকালে সেই আসনেই দেব-দেবীরা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। দেব-দেবীরা সাহিত্য বা কাবা ইহাতে এখনও নিবাসিত হন নাই, কেবল ভিন্ন নামে আমরা তাঁহাদের পূজা করিতেছি মাত্র। ভারতবর্ষের জনসাধারণের চিত্তে তাঁহারা সনামেই এখনও সগৌরবে বিরাজ করিতেছেন। ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মন্দিরে লক্ষ লক্ষ দেবতার সম্মুখে আজও লক্ষ লক্ষ নরনারী করজোড়ে সান্নিধ্যের প্রণাম করিতেছে। সাহিত্য লইয়া যাহারা ব্যবসায় করেন তাঁহারাও বলেন, রামায়ণ মহাভারত গীতা উপনিষদ পুরাণ ভাগবতের ক্রোড়ের অভাব নাই, যতই ছাপা যায় ততই বিক্রয় হয়। আধুনিক কোনও সাহিত্য-পুস্তক এতটা জনপ্রিয়তার দাবী করিতে পারে না। সিনেমার যুগেও যাত্রা উঠিয়া যায় নাই, পৌরাণিক দেব-দেবীদের গল্পই সে সব যাত্রাকে আজও টিকাইয়া রাখিয়াছে। আজকাল সিনেমার বিষয়বস্তুও পৌরাণিক গল্প হইলে তাহা বেশী জনপ্রিয় হয়। আমাদের সাহিত্য সম্পূর্ণরূপে দেবগুণবর্জিত হইলে সংবাদপত্রের মতো ক্ষণস্থায়ী হইত। নিত্যজন-মানবীয় বাস্তবধর্মী সাহিত্যে ক্ষুধিত চিত্তের জন্য চিরন্তন সুখ সঞ্চিত হইয়া থাকেনা। আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর লেখকদের কাবা ইহাতে এখন অনেক উদারচর্যের আহরণ করা যাইতে পারে, যাহারা নামেই মানুষ কিন্তু আসলে যাহারা দেব-দেবীরই সমাগোত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা, দেবীচাঁদুরাগী, শ্রী, ভ্রমর, জগৎ সিংহ, ভবানী পাঠক, সত্যানন্দ, নীতারণ্য; রবীন্দ্রনাথের পরেশ, আনন্দময়ী, গোরা, নিখিলেশ, সুচরিতা, হৈম; শরৎচন্দ্রের বিদ্যুৎ, সিদ্ধেশ্বরী, গিরীশ, নরেন, প্রিয়বাবু, লেন্স, সবাসীচাঁদ প্রভৃতি চরিত্রের অন্তরালে কি দেব-দেবীরা লুক্কায়ী নাই? নিশ্চয়ই আছেন। সাহিত্যে কাবো পুরাণে এই দেব-দেবীদের অলৌকিক মহিমাচ্ছটাই অন্ধকারে আমাদের পথ দেখাইতেছে। আমরা নিতান্তই অসহায়, দেব-দেবীরা আজও আমাদের ভরসা। সর্বদেশের কারোই যুগে যুগে তাঁহারা নানা মূর্তিতে প্রকাশিত। পৃথিবীর আধুনিকতম প্রথম শ্রেণীর কাবাওলিও মঙ্গলকাবা, কারম সমগ্র প্রথম শ্রেণীর কাবোবাই লক্ষ্য—মানবজাতির মঙ্গল, সত্য-শিব-সুন্দরের প্রকাশ।

আপনাদের এই সম্মেলন শুধু সাহিত্য-সম্মেলন নহে, সংস্কৃতি সম্মেলনও বাটে। তাই সংস্কৃতি বিষয়ে সামান্য কিছু আলোচনা করিব।

‘অনেকে সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আমার মনে হয়, কিছু পার্থক্য আছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির আধা-লম্বায়ে সম্মেলন। যদি ফুলের উপমা দিয়া বলা যায় তাহা হইলে বলিতে হয় যে, ফুলের পাপড়ি বৃত্ত বর্ণ, যে গোছে বা লতায় সে ফুলটি

ফুটিয়াছে তাহার স্বরূপ প্রভৃতি সভ্যতা, কিন্তু ফুলের রূপ এবং সৌরভটি সংস্কৃতি। যদি প্রদীপের উপমা দিই তাহা হইলে বলিতে হইবে, প্রদীপের আকৃতি গঠন-কৌশল উপাদান, প্রদীপের পিলসূত্র, ভেল, সলিতা, যে গৃহে যে পরিবেশে তাহা স্থাপিত হইয়াছে তাহার স্বরূপ প্রভৃতি সভ্যতা, কিন্তু প্রদীপের আলোটি সংস্কৃতি। মানবসমাজে সভ্যতার রূপ যুগে যুগে বদলাইয়াছে, আমরা পূর্বে গরুর গাড়ি চড়িতাম, এখন গ্লেনে চড়িতেছি। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকদের সহিত সংমিশ্রণের ফলে সভ্যতার বেশ নিত্য পরিবর্তিত হইতেছে। দশম বা একদশ শতাব্দীর সভা মানুষের সহিত যাবৎ শতাব্দীর সভা মানুষের বাহিরের চেহারা, বাহ্যিক সামাজিকতায় অনেক অমিল আছে। কিন্তু চরিত্রের, চিন্তার, আচরণের যে দীপ্তিকে যে মানুষকে যে সৌরভকে আমরা সংস্কৃতি বলি তাহা কি শুব বেশী বদলাইয়াছে? অতি প্রাচীন কালেও যে সকল মহৎ চারিত্রিক গুণাবলী সংস্কৃত মনুষ্যদ্বয়ের পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হইত, আজও সেই সকল গুণাবলীর দ্বারাই আমরা সংস্কৃতির বিচার করি। পুরাকালে আর্য-ঋষিরা যে চারিত্রিক সংস্কৃতিকে ব্রাহ্মণ্ড আখ্যা দিয়াছিলেন, আজও প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যের মধ্যে সেই চারিত্রিক সংস্কৃতি বিদ্যমান। অর্থাৎ সংস্কৃতির প্রকৃত উৎস আত্মজ্ঞানে, আত্মসংযমে এবং আত্মতাগে। সভ্যতার বাহিরের নানা পরিবর্তন যুগে যুগে ঘটিয়াছে, কিন্তু উৎকৃষ্ট সংস্কৃতির এই প্রাচীন আদর্শ আজও বদলায় নাই। তাই আজ সুসভ্য বিশ শতাব্দীর বিকারগ্রস্ত অহঙ্কার-ঈর্ষ্যাতিকে আসন্ন ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমাদের প্রধান মন্ত্রী নেহরু পঞ্চ-শীলের যে বাণী আজ ঘোষণা করিতেছেন তাহা প্রাচীন ভারতবর্ষের সনাতন সংস্কৃতিরই বাণী, তাহা ভগবান বুদ্ধের বাণী, তাহা আজও পুরাতন হইয়া যায় নাই, পৃথিবীর সন্তান-সমাজ সে বাণী আজ উৎকর্ষ হইয়া গুনিতোছে।

ব্রহ্মদেশের সহিত বাংলার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বহু প্রাচীন। ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখ পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া নিঃসংশয়ে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রকৃত ভগবান বুদ্ধের বাণীই আমাদের উক্ত দেশকে আত্মীয়তা-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সম্রাট আশোকের প্রেরিত আচার্য ব্রহ্মদেশে আসিয়া যে মিলন-সেতু নির্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন তাহা আজও অটুট আছে।

পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন, বাঙালী জাতি, বাঙালী সমাজ, বাঙালীর আহা-বাহারের অনেক বেশিষ্টা, এমন কি বাঙালী ভাষা ও সাহিত্য দ্রবীড়, নিগ্রোট্ট, অষ্ট্রিক, ভোট্টোন, মঙ্গোলীয়, আর্য, পাঠান, মোগল এবং ইয়োরোপীয় সভ্যতার নিকট ঋণী। ব্রহ্মদেশবাসীদের সম্বন্ধেও ইহা অনেকাংশে সত্য। সৌন্দর্য দিয়া বিচার করিলে ইহাদের সহিত আমাদের অনেক সাদৃশ্য আছে। সম্ভ্রুতি মার্কিন এবং সেভিয়েট সভ্যতার প্রভাবও আমাদের উভয় দেশের উপর পড়িয়াছে। এই যুগল প্রভাবকে আত্মসাৎ করিয়া আমরা কালক্রমে তাহাদের নবরূপ দান করিব তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সেই নবরূপের মধ্যেও মানবজাতির সনাতন সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে, যাহা মানব-পণ্ডকে মহামানব হইবার প্রেরণা দিয়াছে তাহা তাহার চিত্র-জ্যোতির্ময় রূপে সভ্যতার সেই নব-প্রকাশকেও শাশ্বত মহিমায় মণ্ডিত করিবে। বাহির হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া জাতির এই নিতানব অথচ শাশ্বত প্রকাশই সংস্কৃতি, ইহাই তাহার জীবন্ত অন্তরেই নিঃসন্দেহ প্রণাম। এই প্রকারে দেবতাই

বাণী, এবং কবিই সে বাণীর বাতাবহ। ইহা লইয়া বহুকাল পূর্বে একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম তাহা পাঠ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। —

প্রকাশের বেদনায় বিদীর্ণ হয়েছে হিমালয়  
প্রস্তর-গঞ্জর ভেদি' লক্ষধারা হয়েছে বাহির।  
প্রপাতের কলোন্মাসে  
নির্ব্বরের সঙ্গীত-ধারায়  
তরঙ্গিছে পাষাণের বিগলিত আত্ম-নিবেদন,  
'আমি আছি, আমি আছি  
শোন, শোন, আমি আছি আছি'  
উদ্বেলিত সমুদ্র-সঙ্গমে  
সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র তারবরে করিছে ঘোষণা,  
'হে সমুদ্র আমি আছি,  
অতিক্রমি' বহুদূর পথ  
আসিয়াছি অবশেষে  
বহি এই চিরন্তন বানী  
তুমি আমি ভিন্ন নহি,  
আমারে গ্রহণ কর, অবলুপ্ত নিমজ্জিত কর  
হে বিরাট, অন্তরে তোমার।'

২

প্রকাশের বেদনায় উন্মুখ অধীর হিমালয়;  
অনন্ত নিখিল শূন্যে সমুৎসুক চূড়ায় চূড়ায়  
অতি দূর তুঙ্গলোকে  
সন্ধানিছে নব ছন্দ, নবতর ভাষা  
আত্মপ্রকাশের।  
ভাব-মৌন শান্ত গুহ্যতায়,  
গম্ভীর গর্জনে কভু নক্সা-আলোড়নে,  
বাণী তার শূন্যে শূন্যে মাগিছে প্রকাশ,  
তদ্রাহীন নিত্য নবরূপে।  
সে-ও কহিতেছে,  
'আমি আছি, আমি আছি  
শোন, শোন, আমি আছি আছি'—  
রাধানাথে, গৌরীশূদ্রে, কাঞ্চনজঙ্ঘায়  
উর্ধ্বমুখী অসংখ্য চূড়ায়  
অবিরাম চলেছে ঘোষণা,

'হে আকাশ, আমি আছি,  
অতিক্রমি বহু বিঘ্ন বাধা  
আসিয়াছি এতদূর বহি এই চিরন্তন বানী  
তুমি আমি ভিন্ন নহি।  
যে বহি তোমার ওই লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের করেছে উজ্জ্বল  
সেই বহি মোরও শিরে পরায়েছে তুষার-মুকুট।  
যে পূর্ণতা শূন্যতায় হয়েছে অসীম তোমার অনন্ত বক্ষে,  
সেই পূর্ণতাই আমারে দিয়াছে সীমা;  
তুমি আমি ভিন্ন নহি  
আমারে গ্রহণ কর, অবলুপ্ত নিমজ্জিত কর  
হে বিরাট, অন্তরে তোমার।'

৩

কবির অন্তরলোকে ধ্বনিত হইল মহাবানী।  
অতি ক্ষুদ্র জড় হিমালয়  
প্রকাশের আবেগেতে  
সাগরের আকাশের সন্ধান পাইয়া থাকে যদি  
হে মানব,  
তোমার সন্ধান হবে নাকি মহত্তর আরও?  
তোমার কল্পনা  
অঙ্কিত করিবে নাকি মহাকাশ-ভালে  
নিম্নলব্ধ নব চন্দ্র-লেখা?  
নবীনা উমার ক্রোড়ে নবীন কুমার সম্ভব হইবে না কি!  
নব-প্রেরণায় করিবে না নব-সৃষ্টি তুমি  
দূর করি' সর্ব মলিনতা?  
নিখুঁত নবীন সৃষ্টি পরিকল্পনার  
তুমিই তো একমাত্র যোগ্য অধিকারী  
হে কবি, হে সৃষ্টিকর্তা  
জাগো, তুমি ওঠ —।

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

ভাগলপুর



## যে বনফুল বনস্পতি হয়ে ওঠে

ঝরা বসু

বিশ শতাব্দীর তিরিশের দশকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। বন্যা, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুর ক্ষয়ক্ষতিয়ানের মধ্যেও বাংলা সাহিত্যে বিষয়কর প্রাচুর্য এসেছিল। এই দশকে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র জীবিত। তাঁরা আধুনিকোক্ত সাহিত্য সৃষ্টি করে চলেছেন। প্রচুর প্রতিভার সম্ভাবনা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন বাংলা সাহিত্যের তিন বন্দোপাধ্যায় — তারাসংকব, মাণিক ও বিজিতভূষণ এবং সেই সঙ্গে এসেছেন আর এক প্রতিভাধর প্রতিভাধর লেখক—বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়—বনফুল নামে যিনি সুখ্যাত।

বিহারের মনিহারী গ্রামে ১৮৯৯ সালের ১৯ শে জুলাই বনফুলের জন্ম। এই চলতি বছরটিতে নানাদিকে নানা আয়োজনে তাঁর শতবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি চিকিৎসক ছিলেন—কিন্তু তাঁর দীর্ঘজীবন জড়িয়েছিল বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে। কুলে যখন তিনি খার্ড ক্লাসে পড়েন (১৯১৫) তখন কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্তের সম্পাদিত ‘মালঞ্চ’ পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতাটি ছাপা হয়। সেটি তাঁর ফনামেই ছাপা হয়েছিল। কিন্তু যখন ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় লিখতে শুরু করলেন তখন থেকেই তিনি ‘বনফুল’ ছরানামটি বেছে নিলেন। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় নামে তিনি ডাক্তারী করতেন আর বনফুল নামে রচনা করতেন সাহিত্য। বনফুল নামটি কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন তিনি—তার একটি ইতিবৃত্ত আছে। তিনি যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেটি গদা ও কোশী নদীর সমন্বয়ে অবস্থিত। তাঁদের গ্রামের বাড়িটি ছিল গ্রামের বাইরের দিকে একটি বুদো জায়গায়। সঙ্গে পারাবার পাহাড়, পাহাড়ের চারদিকে জঙ্গল, ফেঁটন, বাবলা গাছ, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আকাবাঁকা পথ, কৃষ্ণ-গৈরিক রং মিশ্রিত নদীজল তাঁকে হারছানি দিত বারবার। বাল্যকাল থেকেই তিনি খোলা আকাশের নীচে, খোলা মাঠে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। জমাবার পর বলাইচাঁদ মাদ্যদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। তাঁদের চাষের জমিতে কাজ করত একটি মুসলমান মজদুর—চামরু তার নাম। চামরুর বৌয়ের স্তন্য পান করে শিশু বলাইচাঁদ স্বাস্থ্য ও জীবন ফিরে পেয়েছিলেন। বাড়ির চাকররা তাঁকে ডাকত ‘ভংলিবাবু’ করে। এনে মানুষটি যে ছরানাম রূপে ‘বনফুল’ নামটি বেছে নেন সেটিই তো স্বাভাবিক। পুষ্প কুসুমিত হয় অপরের জন্যে। গাছে বসে মানুষকে আকৃষ্ট করে—রূপের সৌরভে মুগ্ধ করে। কিন্তু বনের কুসুম লোকচক্ষুর আড়ালে অবহেলায় প্রক্ষুণ্ণিত হয়, বারে পড়ে। এই নামের মধ্য দিয়ে বলাইচাঁদের স্বাভাবিক বিনয়ানুভূতি। যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমন প্রকৃতির সহজ সৌন্দর্যের প্রতি মনমগ্নবোধেরও পরিচয় আছে। সন্তর বছর ব্যাপী শাখাপ্রাণা বিস্তার করে সেই বনফুল আজ মইরাত সমান বিশাল। বাংলা সাহিত্যে বনস্পতির তুল্য মূল্যে বিরাজিত।

ঈশ্বরকল কলকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্র তখন থেকেই শুরু হল ছোটগল্প লেখা। মেডিকেল কলেজের খালি প্রাসারগুলির নির্জনতার মধ্যে বসে একসঙ্গে চার পাঁচটি ছোটগল্প লিখে ফেলতেন। ‘প্রবাসী’ পত্রিকাতেই তাঁর প্রথম গল্পগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর প্রথম গল্পগুলিতেই ছিল বেশ পরিণতির ছাপ। প্রবাসীর সম্পাদক যখন বনফুলকে দেখলেন (তখন

তিনি ডাকে প্রেরিত বনফুলের গল্পগুলি পড়ে ফেলেছেন) তখন বুঝি অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন ‘আপনার এত কম বয়সে ভাবতে পারিনি। আপনি কি করেন?’ বনফুল জানালেন—তিনি ছাত্র—ডাক্তারি পড়ছেন। ‘প্রবাসী’ পত্রিকার অফিসে বনফুলের দেখা হল সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে। অনুরোধ করলেন ‘শনিবারের চিঠি’ পত্রিকার জন্য লেখা দিতে। সেই অনুরোধে বনফুল দিলেন ‘কাঁচি’ নামে একটি কবিতা ও একটি গদ্য রচনা। সেই সময়ে সাহিত্য পত্রিকারও সুদিন ছিল। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, শনিবারের চিঠি, মানসী ও মর্মণালী, ভারতী, মাসিক বসুমতী, সচিত্রভারত এবং সবুজপত্র। সবুজপত্রের অভিনব বনফুল পছন্দ করলেও কখনও ঐ পত্রিকায় লেখা দেননি। ঐ পত্রিকাটি ছাড়া অন্যান্য পত্রিকাগুলিতে তিনি নিয়মিত লিখতেন। পরবর্তীকালে আনন্দবাজার, দেশ ও যুগান্তর পত্রিকায় বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প—বঙ্গসাহিত্যের এই চতুর্দশ বর্ষে সৃষ্ণের নিপুণতা দেখিয়েছেন বনফুল। মহাকাব্য লেখেন নি বলে—কিন্তু মহাকাব্যাকারে উপন্যাস রচনা করেছেন। আবার সংক্ষিপ্ততম কল্পে অনুগল্প রচনা করেছেন। কাবোর ক্ষেত্রে ব্যঙ্গ কবিতা বা প্যাণ্ডি লিখে, নাটকের ক্ষেত্রে ‘জীবনী নাটক’ লিখে বাংলা সাহিত্যে নতুনদের হৃদ এনে দিলেন। সমগ্র সাহিত্যকর্মে নুতন নুতন শিল্পরীতি ও আংশিক কৌশলের বৈচিত্র্যে পাঠকগণ বারবার বিম্বিত ও চমকিত হয়েছে। বনফুলের বিশাল শিল্পকীর্তির গুণগত মান অদ্যাপি যাচাই করা সম্ভব হয়নি। যা হয়েছে তা আংশিকভাবে। তাঁর সমকালের—তিন বন্দোপাধ্যায় এবং সতীনাথ ভাদুড়ীকে যে মর্যাদায় ও আদরে পাঠকরা গ্রহণ করেছে—সেরকমটি বনফুলের ভাণ্ডে ঘটেনি। তার কারণগুলি যথাস্থানে ব্যাখ্যা হবে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর জীবন ও সাহিত্যকর্মের উপরে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন।

বনফুলের সাহিত্যকর্মের সমীক্ষা করতে গেলে প্রতিটি পদক্ষেপে বিরাট, বিশাল, ব্যাপক, বিপুল বিশেষণব্যাক শব্দগুলি ব্যবহার করতে হবে বারবার। বহু বিচিত্র জীবন ও বহুল বিসর্পিত জীবনের জটিলতা তাঁর সাহিত্যের স্তম্ভিকা। বিহারের গ্রাম, মফঃস্বল শহর, কলকাতা মহানগরী এবং পাটনা ও আজিমগঞ্জ তিনি জীবনের নানাপর্যায় কাটছেন। মনিহারী গ্রামের ডাক্তার পিতার পুত্র বাল্যকাল থেকেই দুই চোখ মেলে মানুষ দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। অভিজাত যৌথ পরিবারের আত্মীয়গণ, গৃহের অধ্যন্তন কর্মচারীরা, চাষের জমির মজদুরমণ্ডলী, ডাক্তার পিতার রোগী ও বন্ধুবান্ধব, গ্রামের প্রতিবেশীরা, সাহেবগণের সহপাঠীরা, আদর্শবাদী আশ্রমনিবাসীরা, সবেপরি পিতা মাতার হেংছায়া কাটছেন যে পরিমণ্ডল দান করেছিল তা সম্বল করে বনফুল লিখতে শুরু করলেন। তিনি নিজে যখন ডাক্তার হলেন তখন অভিজাতের পর্বটি আরও প্রসারিত হল। ডাক্তারি প্রাকটিশ, রোগ, রোগী, আত্মীয় বন্ধুবর্গ মিলে তাঁর সামাজিক মনে বিজ্ঞানের নানা বিষয়, পশু পাখীর প্রতি অফুরন্ত কৌতূহল জন্মতে শুরু করল। অভিজাতের বিপুল সম্পদ নিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশ করেছিলেন। প্রথম থেকে শেষ লেখা পর্যন্ত বিষয় ও রচনারীতি নিয়ে তিনি যেমন পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন, তেমনি অবশীলাক্রমে কবিতা থেকে উপন্যাসে, উপন্যাস থেকে নাটকে, কখনও ছোটগল্পে, কখনও চিত্র শিল্পে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছেন।

মেডিকেল কলেজে ছাত্রাবস্থায় গল্প লেখা শুরু হয়েছিল—তারপর আমৃত্যু চলেছে স্বর্ণধারার মত অনবরত গল্পের প্রবাহ। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি চার খণ্ড গল্পগুচ্ছে প্রকাশিত



হয়েছে। চুরাশিটি গল্প সংকলিত হয়েছে তাতে। গল্প সংকলনে অপ্রকাশিত আরও কিছু গল্প নিয়ে রবীন্দ্রনাথ রচিত গল্পের সংখ্যা নব্বই এ দাঁড়াবে। তুলনায় বনফুলের গল্প সংখ্যা পঁচাত্তর আটগুণ। ঊত্রিশটি গল্প সংগ্রহে স্থান পেয়েছে। অবশ্যই সংখ্যা গণনা করে লেখকের গুণগত মান বিচার করা হয় না যে তা আমরা সকলেই জানি। তাছাড়া প্রথাগত রীতিতে লেখা গল্পগুলি যতটুকু পরিসর অধিকার করে সে স্থানে বনফুলের নিদেনপক্ষে পাঁচ ছটি গল্প চুকিয়ে দেওয়া যায়।। এটা অবশ্যই কৌশল — শুধু বাংলা সাহিত্যে কেন, পৃথিবীর যে কোন দেশের সাহিত্যে কোনও লেখক এত বেশি পরিমাণে গল্প লেখেন নি। ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁর মাস্টারমশাই মাঝে মাঝে ভৎসনা করে বনফুলকে চিঠি দিতেন — ‘তুমি এত বেশি লিখিতেছ কেন? ধীরে সূছে লেখ। তাড়াতাড়ি ফুরাইয়া যাইও না।’ কিন্তু আমি থামিতে পারিতাম না।’ বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডাল — তিনি থামেন নি — তাড়াতাড়ি ফুরিয়েও যান নি।

একবার সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন এত লেখার নিত্য নতুন প্রট তিনি কিভাবে পান — তিনি উত্তর দিয়েছিলেন — ‘নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লওয়ার মত লেখাটাও আমার পক্ষে একটা স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। বাল্যকাল হইতে ক্রমাগত লিখিতেছি তো। প্রট কি করিয়া মাথায় আসে তাহা জানিনি। ওটা বেধধর গবাসেনের লীলা বা অনুগ্রহ।’ আসলে আকাশে যেমন মেঘ ভেসে আসে, গাছে যেমন ফুল ফোটে তেমনি গল্পের প্রসঙ্গও হয় আস্ত আস্ত। ডাক্তার বনফুলের অন্দরের নেপথ্যে বাস করতেন লেখক বনফুল। গল্পের প্রসঙ্গটা হঠাৎ মাথায় আসে এবং সেই অন্তর্ভুক্তি সত্তা ঘাড় ধরে সেটা লিখিয়ে নেন। অপরের ফরমাসে তিনি কখনও লিখতে পারেন নি। কিংবা কৌশল করে প্রট ভাঙে ছক একে অংক কয়ে কখনও গল্প লেখেন নি। এত গল্প বনফুল লিখেছেন — কিন্তু প্রত্যেকটি গল্পই স্বতন্ত্র। যেন শত শত নিটোল মুক্ত ছড়ান। তবে বনফুলের ছোটগল্পে বিশেষ কয়েকটি বিশেষ লক্ষণীয় —

(১) জীবনের ভালবাসনে বলেই জীবনের নানা বৈচিত্র্য ও বিপর্যয় গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। মানবজীবনের তুচ্ছ বা বড় প্রসঙ্গ — কোনটিকেই তিনি অবহেলা করেন নি।

(২) অভিজ্ঞতা ও বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে যাচাই করেছেন।

(৩) তির্যক অথচ মমতাময় দৃষ্টিতে জীবনকে দেখেছেন।

(৪) বক্তাব্যয়ের চমক আছে। বিস্ময় আছে।

(৫) পল্লী জীবনের দুঃখময় নাকে কামা কোথাও ফুটে ওঠেনি।

(৬) অস্বাভাবিক লিরিকের প্রাধান্য। অনেকক্ষেত্রে গল্পগুলি নিছক কাব্যধর্মী।

(৭) ব্যঙ্গনার মধ্য দিয়ে গল্পগুলির সমাপ্তি টানা হয়। কোথাও বা রূপকের আড়ালে গল্প লুকিয়ে থাকে।

(৮) প্রচলিত ধারায় লেখা গল্পের চেয়ে বনফুলের গল্পগুলির আকার অনেক ছোট। কখনও বা তিন চার ছত্রে সমাপ্ত হয়। তাঁর ছোটগল্প কখনও বা অনুগ্রহ হয়ে ওঠে।

(৯) কাহিনী বা প্রসঙ্গটি আপাত লঘু মনে হলেও সমাপ্তিতে প্রগাঢ় দার্শনিকতা বা নীতি উপদেশ।

(১০) মানুষের মিথ্যাচরণ ও ভ্রষ্টামির প্রতি ক্রোধ।

(১১) আদর্শ ও বাস্তবের দ্বন্দ্ব।

(১২) প্রেমের গল্পে রোমাঞ্চিকতার প্যানপ্যাননি নেই, বরং রূপদ্রুপী সাহিত্যের সংযম ও

নিবিড়তা আছে।

(১৩) স্নেহের উদ্দামতা নেই। আছে স্নীলতা ও অস্নীলতার মধ্যে সূসম বিভাজন।

(১৪) কোনরূপ ‘ইজমে’-র দ্বারা প্রভাবিত নয় — বিদগ্ধ মানবিকতার ‘স্পর্শ’ সমৃদ্ধ।

(১৫) চরিত্র সৃষ্টি অপেক্ষা মানব অনুভূতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন বেশি।

(১৬) জীবনের অসঙ্গতিজাত কৌতুকের তাঁর প্রকাশ।

(১৭) বিজ্ঞান পরিশীলিত মননের পরিচয়।

(১৮) অনাবশ্যক বাগাড়ম্বর বর্জন করেছেন।

(১৯) গল্পগুলি পাঠে বিকৃত মানুষের মন পরিওদ্ধ হয়।

(২০) সর্বোপরি গল্পের আঙ্গিক ও শিল্প সূচনার উপর সুগভীর দৃষ্টি।

একদিকে বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অন্যদিকে কবিত্ব ও কল্পনাশক্তি তাঁর কথাসাহিত্যের মূলধন। বনফুলের প্রায় সাতশ গল্পের মধ্যে আলোচনার জন্য কয়েকটি প্রতিনিধি স্থানীয় গল্পের উল্লেখ করব। তাছাড়া সব গল্পই যে উত্তম রচনা হয়েছে তা কখনই বলা যাবে না।

বনফুলের ছোটগল্প রচনার বিশিষ্ট রীতিতে ‘অমলা’ গল্পটি লিখিত। সাধারণ চেহারা সাধারণ ঘরের মেয়ে অমলা। অমলাকে পাত্র পক্ষ দেখতে আসছে পৈতৃক বিয়ে হচ্ছে না। গল্পটির তিনটি পর্যায় — এক — অমলাকে পাত্রপক্ষের পছন্দ হল কিন্তু দরে বনল না। দুই — এবারে দরে বনল কিন্তু পাত্রী পছন্দ হল না। তিন — অবশেষে পাত্রীও পছন্দ হল, দরেও বনল। শান্ত নিরীহ স্বামী পেয়ে অমলা মুগ্ধ হল। সর্বশেষে একটি বাক্য লেখক সংযোজনা করেছেন — ‘অমলা সুখি আছে।’ তিনটি পর্যায়ে ফ্র্যাগটি শব্দে গল্পটি সমাপ্ত। বনফুলী গল্পিক ‘ফরম’ — এর সফল নিদর্শন এটি। গল্পটি লেখকের নিরপেক্ষতার সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের নিস্পৃহতা মিশে আপাত রুদ্ধ হয়ে উঠেছে বলে সাধারণ পাঠকদের গ্রহণ করতে অসুবিধে হয়। তারা মনে করেন — ‘কৈ গল্প তো জমল না, গুরু হতে না হতে শেষ হয়ে গেল, আবাহন হতে না হতেই বিসর্জন। ভূমিকাটি সেরেই একেবারে চরম মুহূর্তে পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু এই প্রাথমিক অসুবিধেকুসামলে নিয়ে আবার গল্পটি পড়ে পাঠক ব্যবহৃত পারবেন এর অন্তরে নিহিত আছে লেখকের —

(১) সামাজিক সমীক্ষা,

(২) তির্যক ভঙ্গীতে পণপ্রথা, পাত্রীদেবার বিরুদ্ধে কটাক্ষ,

(৩) সাধারণ মেয়ের জীবনের প্রতি মমত্ব,

(৪) বাক্য সংক্ষিপ্ত করণের জন্য আশ্রয় বাক্য সংযম,

(৫) অথচ শিল্পরস অক্ষুণ্ণ।

রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের যে আঙ্গিক রচনা করেছিলেন তাতে প্রথম অংশে ভূমিকা, দ্বিতীয় অংশে সম্প্রসারণ, তৃতীয় অংশে পুনরাবৃত্তি আর চতুর্থ অংশে বিবর্তি। গল্পের ক্রাইমাক্স আসে সর্বশেষে। বলা বাহুল্য প্রচলিত এই ধারায় বনফুল গল্প লেখেন নি। কাহিনী বিস্তার, ভাষা খেলাবার জন্য সময়ক্ষেপ করেন না। বাক্যের বৃথা ব্যয় না করে সরল সহজভাবে একেবারে চরিত্র বা ঘটনাকে প্রবেশ করেন। এইজন্য তাঁর ছোটগল্পগুলি পরিসরে আরও ছোট কিন্তু ব্যঙ্গ্যময় মহা। ‘বেটাক’ গল্পে গ্রীষ্মের নিদারুণ দিপ্রহরে রোদ উপেক্ষা করে উভয় মন্তক রাখব সরকার পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। একটা রিক্সাওয়ালা ঠুনঠুন করে রিক্সা বাজাতে



বাজারে তাঁর পিছু নিল। লোকটি রিক্সা লাগবে কিনা কয়েকবার জিজ্ঞেস করল। রাখব সরকার জানাল সে কখনও রিক্সা চড়ে না। কিন্তু শিবতলা পথও ভাড়া যে ছয় পয়সা তা জেনে নিল। হঠাতে হঠাতে উভয়ই শিবতলা পৌঁছে গেল। রাখব সরকার একটু থেমে গিয়ে রিক্সাওয়ালার দিকে ছয় পয়সা এগিয়ে দিয়ে বললেন 'এই নে'। রিক্সাওয়ালা নীরব অবজ্ঞায় জানাল 'আপনি রিক্সা চড়েন নি। আপনার কাছ থেকে কেন পয়সা নেব?' 'আমি কারও কাছ থেকে ভিক্ষে নিই না।' এখানেই গল্পটি শেষ। বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর গল্পের সঙ্গে এটির তুলনা করা চলে। আপাত দৃশ্যলব্ধ উদার চিত্রের বিবেকবান মানুষটি চিনা। রিক্সা চড়েন না মানুষটির কষ্ট হবে ভেবে। কিন্তু গরীব মানুষটির যে আত্মমর্যাদাবোধ থাকতে পারে সে চেতনা অনেক বড়লোকেরই নেই। বনফুল দক্ষ চিত্রকরের মত অসমান্য তুলির কয়েকটি টানে মানব অনুভূতির বিপর্যয়ের ছবি একেছেন। অসাধারণ বাক্যসংযমের দ্বারা রচনাতীতকে ব্যক্ত করেছেন। বনফুলের রচনশৈলীর এই 'মৌন-মুখরতা' দেখে রবীন্দ্রনাথও বিস্মিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে তাঁর জীবনের শেষ তিন চার বছর বনফুল খুব কাছের থেকে পেয়েছিলেন। বনফুল তাঁর অনেক গল্প রবীন্দ্রনাথকে পাঠাতেন। রবীন্দ্রনাথ গল্পগুলি পড়ে মত্তবা করেছিলেন—'তোমার গল্প পড়লে ওহেনরি ও চেকভের কথা মনে পড়ে।' কিন্তু বনফুল তখনও যে ওদের লেখা পড়েন নি জানতে পেরে কবি অবাক হয়েছিলেন। মানবজীবনের আপাত তুচ্ছ ঘটনার উপর মহত্ত্বের আরোপ করা ওহেনরি, চেকভ ও বনফুলের মত গল্পকারদের পক্ষেই সম্ভব। 'চুনো পুটি', 'চম্পা মিশির', 'বৃগলযাত্রী', 'দুধের দাম', 'পাঠকের মৃত্যু' গল্পগুলি মনে করা যেতে পারে। পুটি কালো বলে পাত্রী দেখতে এসে মেয়েকে ও ময়ের বাবাকে অপমান করে পাত্রপক্ষ চলে যায়। গ্রামের দুই ছেলেরের অত্যাচারের পুটির মা পুটিকে নিয়ে গ্রাম থেকে চলে যায়। পুটির মা ইতিমধ্যে মারা গেছে। পুটি জ্ঞাতিদের জানিয়ে পাঁচ বছর বাদে মাতৃশ্রাদ্ধ করতে গ্রামে ফিরে এল। সঙ্গে ঢাকার, বি. সালকারা পুটি অনিন্দ্যকান্দি সমীকে নিয়ে গ্রামে এল। ঐশ্বর্য যেন পুটিকে রূপমতী করেছে। সকলের দর্শনে ও প্রশংসা বুঝিয়ে ফিরে এল পুটি। আসলে পুটি অভিনেত্রী—অনেক অর্থ উপার্জন করছে—কিন্তু স্বামী পাঁচসার তার হামনি। দুশো টাকার বিনিময়ে চুনো দা ওরফে চুনীলালকে ভাড়া করেছিল স্বামীর অভিনয় করার জন্য। ছদ্ম স্বামী জীবন অভিনয় করে পুটি গ্রামের লোকদের দুর্বাবহারের যথার্থ প্রতিশোধ নিয়েছে।—এই পর্যন্ত গল্প কাঠামোয় অভিজ্ঞত পেরিণতি এসেছে। গল্পটিতে—

(১) বিষয় বৈচিত্র্য আছে,

(২) বাদ্যয়ক তির্যক ভঙ্গীতে সামাজিক মানুষের মুখোশ খুলে ফেলেছেন,

(৩) সহজবোধ্য ভাষায় বক্তব্যের তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতার প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু গল্পটির চরম সিদ্ধি কিন্তু শেষ বাক্যটিতে আছে "সহসা তাহার (পুটির) চোখ দিয়া কয়েক ঘোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।" পুটির অনেক আছে, শাড়ি, বাড়ি, গাড়ি অনেক মোসাহেব—কিন্তু পুটির চোখে জল। গল্পটির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে এইখানেই।

মর্মস্পর্শী ব্যঙ্গানু্য শেষ হয়েছে 'দুধের দাম' গল্পটি। প্রাচীনকালে যাত্রীদের খুব ভীড়। হোষ্ট-অলের স্থাপন পায়ের আটকে এক যাত্রী বুড়ীর ভান পাটা মুচকে গেল। হৃদয়ভূমিতে উন ঢুকে গেল—বুড়ীটি একা—কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল না। যৌথভাবে খোঁজতে ইন্টার প্রাশ—এখনকার দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠল—কিন্তু বসবার জায়গা পেল না। ট্রেনের মোহোতে

এক পাশে বসে রইল। যাত্রীরা তাকে ভিখারী মনে করে দূর দূর করতে লাগল কেউ বা পয়সা দিয়ে ভিখারীকে বিদায় করতে ব্যস্ত হল। বুড়ীর গন্তব্যস্থান এসে গেছে। এখানে নেবে তাকে ট্রেন বদলাতে হবে। এবারে নাগেতে হবে—কিন্তু দাঁড়াবার ও চলবার শক্তিহীন—কেনারকমে ঘসটাতে ঘসটাতে সে দরজার কাছে এসে বসল। কেউ তাকে পদাঘাত, কেউ তাকে গালি দিতে দিতে ট্রেন থেকে ওঠানামা করতে লাগল। বুড়ীর অসহায় অবস্থা দেখে একটি বর্ণিষ্ঠকায় কুর্মীর চিত্তে দয়া হল। কুসীটি তাকে কোলে করে নামাল, ওয়েটিং রুমে নিয়ে গিয়ে সাতাল আবার টিক সময়ে এসে বন্ধকে পূজাকোলা করে পাসেঞ্জার ট্রেনে তুলে দিল। বন্ধুর চোখে জল এল। কস্পিত কণ্ঠে সে জানাল "তুমি আমার ছেলে বাবা, ছেলের কাজই করছে। আমি তো তোমাকে দুধ খাওয়াই নি, সামান্য কিছু দিচ্ছি তা দুধের দাম মনে করেই নাও বাবা।" বলে দুটো টাকা বাড়িয়ে দিল। কিন্তু কুর্মী তাকে প্রণাম করে নেবে গেল।

অনেক বর্ণনা ও বিবরণে বনফুল মনুষ্য চরিত্র অংকন করেননি। পুরুষের পত্নী প্রেম ব্যক্তির প্রতি মেকি ভালবাসার স্বরূপটি উদ্ঘাটন করেছেন "অদ্বিতীয়া" গল্পে। বিবাহিত জীবনের পাঁচ বছরে সাতটি পুত্রকন্যার জনক কিভাবে দ্বিতীয়বার দ্বার পরিত্যাগ করতে গিয়ে অপমৃত্যু হয়েছিল বনফুল তাঁর সহজ বর্ণনামূলকভাবে সে গল্পটি লিখেছেন। প্রভাবতীর স্বামী অনেক আশা ও আশংকায় বাসরে প্রবেশ করে দেখল—হয়টি সন্তান ও কোলে নবজাতক শিশু নিয়ে স্বয়ং বর্ধবশে প্রভাবতী বসে আছে। প্রভাবতী পতির ভালবাসা যাচাই করবার জন্য বাজি রেখেছিল ওর মেজদির সঙ্গে। প্রভাবতী হেরে গেল। এই রঙ্গের আড়ালে যে গভীর অত্যাচিন্ম জীবন সত্য লুকিয়ে আছে সেটি আঘাত করাই স্যাটারিস্ট বনফুলের উদ্দেশ্য ছিল।

'মালাবদল' ও 'পাঠকের মৃত্যু' গল্পে রূপকের মাধ্যমে জীবনাত্তর ফুটে উঠেছে। তাঁর দার্শনিক চিন্তাও যুক্ত হয়েছে। বন্দনা খোল বছর সূরের সাধনা করেছে একাগ্রচিত্তে। সূরের বর্ণা তলায় দেখা হল তাঁর ভাবী স্বামীর সঙ্গে। কিন্তু স্বামী গলায় মালাবদলে পরই সঙ্গীতের সঙ্গে বন্দনার বিচ্ছেদ তৈরি হয়। সূর সাধনা ও সংসার বাসনা দুটি একসঙ্গে চলিতলক করা সম্ভব হয় না। রাগ রাগিণীর অধিশ্রীকে সমুদ্র রাখতে গেলে হৃদস্পর্শবাদের প্রযুক্তিই শব্দতালকে সম্পূর্ণ উৎপাটিত করে দেবার চরণে উৎসর্গ করতে হয়। বন্যাং করে শব্দে যেমন সেতারের তার কাটে—সূর সরস্বতীও বন্দনাকে ত্যাগ করে আকাশে বিলীন হয়ে গেলেন। রূপকটি নিঃসন্দেহে কাব্যময়। দশবছর আগে একটি বই গোপাল পাঠ করেছিল য়ে পাঠক দশ বছর বাদে সেই একই গ্রন্থ পাঠে সে তেমন ভূপ্তি পেল না। এইতো জীবনের ধর্ম। যৌবনে আশা থাকে, কৌতুহল থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তা অপসৃত হতে থাকে। যে সঙ্গীত একসা কর্তে মধু বর্ষণ করে শ্রৌত্রে সে সুর আর তেমন করে বাজে না। যে কাব্য যৌবনে অমৃতসম মনে হয়েছিল দশ বছর পর তা পাঠ করে পাঠকের মনে হয়—এ একেবারে বাজে। "এমন রাবিশ মানুষ লেখে।"

বনফুলের কিছু গল্প যেন কবিতা হয়ে উঠেছে। যেমন—প্রজাপতি, নিমগাছ, অধরা, রাতদুপুর গল্পগুলিতে গল্পের আকারে লিরিক পরিবেশিত হয়েছে। এ ধরনের গল্প সম্পর্কে বনফুল নিজেই বলেছেন—"সমাজে যখন ঘোরাকোরা করি তখন নানারকম নরনারী দেখতে পাই, তাদের ছাপ আমার মনের উপর পড়ে। শুধু পড়ে না, কল্পনারসে জারিত হয়ে সেগুলি চিত্ররূপে রাখা থাকে আমার মনের অবচেতনলাকে। এই দেখখা বাণী থেকে কবি যখন গল্প



সৃষ্টি করতে চান সেই চিত্রশালা থেকেই তিনি চিত্র সংগ্রহ করেন। তিনি খেয়ালী কবি।

‘নিমগাছ’ গল্পটি অতি উচ্চমানের গল্প। মাত্র আঠাল লাইনের গল্প। স্বল্প পরিসরে ও বাস্তবতার বিস্তারে গল্পটি এক অসাধারণ মাত্রা পেয়েছে। একটি নিমগাছ—কতরকম প্রয়োজনে মানুষ তাকে ব্যবহার করছে। কেউ ছালটা নিয়ে সেক্ক করছে, কেউ পাতা ছিড়ে নিচ্ছে, কেউ ডাল কেটে নিচ্ছে—বাড়ির পাশে গাছলে বিজ্ঞরা খুশি হন, বলেন—নিমের হাওয়া ভাল—কেটো না। হঠাৎ একদিন একজন কবি এল—পাতা ছিঁড়ল না, ডাল খাৎলে না—মুগ্ধ হয়ে নিমগাছটার দিকে চেয়ে রইল—সবুজ পাতা, থোকা থোকা ফুল—আ কি বাহার! কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে চলে গেল—নিমগাছটার ইচ্ছে করছিল লোকটার সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু মাটির ভিতরে শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে। তাই গাছটি আবজর্নার সুপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল।—এই পর্যন্ত মনে হচ্ছিল যেন একটি গলা কবিতা পড়ছি। কিন্তু সমাপ্তিতে একটি বাক্য সংযোজন করে বনফুল রচনাটিকে গল্পে রূপান্তরিত করলেন—“ওদের বাড়ির গৃহকর্মনিপুণা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এক দশা”—সামান্য আয়োজনে কি অসামান্য বাস্তবতা। কল্পনা পাখা মেলেতে চায় কবি বনফুল বলেন—“খাম!” আবেগের সমুদ্র আছড়ে পড়তে চায়। লেখক বনফুল বলেন—“শান্ত হও!” শিল্পী বনফুল বানানকে সংযত করে, আবেগকে সংহত করে কি আশ্চর্য নিপুণতায় গল্পগুলি লিখে গেছেন। ছক কাটা প্রট্ট নেই—অথচ প্রতীহীন নয়। গল্পের বিস্তার নেই, ভাষার খেলা নেই—অথচ প্রথম থেকেই পাঠকের টেনে ধরে—গল্পটির শেষ পর্যন্ত না পড়ে উপায় নেই। জাপানী চিত্রকরের মত তুলির একটানে জীবনকে ফুটিয়ে তোলেন।

বনফুলের কিছু গল্পে জীবজগতের প্রতি মায়ো ও ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে। ‘গণেশজননী’ গল্পে—গণেশ একটি হস্তী বিশেষ এবং সে অসুস্থ—ডাক্তার হিসেবে লেখক যখন গণেশকে পরীক্ষা করলেন কোন অসুখই ধরা পড়ল না। বাড়ির গিলির সঙ্গে হাতীটি অভিমান করে বাওয়া দাওয়া বন্ধ করেছে। হাতীটি ওদের কাছে সন্তান তুল্য। গরীব ওরা—হাতীর খোরাক জোগাড় করতে গিয়ে আরও গরীব হয়েছেন। কিন্তু হস্তী চিকিৎসকের ফিদের পরসে দেবার জন্য নিজের গয়না বন্ধক রেখে টাকা জোগাড় করেছে। ডাক্তার অবশ্য গণেশের প্রতি মাতৃমূলভ মমতা দেখে ফীস নিতে রাজী হলেন না। একটি অবলা জীরের মান অভিমানের সঙ্গে মহিলাটির পণ্ডটির প্রতি অসত্য দেহ মিলে যে বাৎসল্য-রস সৃষ্টি হয়েছে তা শরৎচন্দ্রের ‘মাহেশ’ কে মনে করিয়ে দেয়।

বাস্তবের সঙ্গে আদর্শের সংঘাতে তৈরি হয়েছে ‘অর্জুন মণ্ডল’ নামের গল্পটি। সাধারণতঃ বনফুল গল্পের জন্য যতটুকু পরিসর ব্যবহার করেন তার চেয়ে বেশ অনেক বড় গল্পটি ‘অর্জুন জাতে জেলে’। চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত নিরক্ষর। মাধ্যায় করে মাছের খুড়ি বয়ে নিয়ে এসে হাটে বেচত। এই মানুষটির হঠাৎ বোধোদয় হল—বিদ্যাই আসল জিনিস—অর্থ নয়, জমি জায়গা নয়। অসম্ভব আত্মবিশ্বাস নিয়ে চল্লিশোর্ধ্ব অর্জুন নানা কুচুসাধন করে লিখতে পড়তে শুরু করল। পরে উচ্চশিক্ষাও লাভ করেছিল। এতদা নিরক্ষর অর্জুন মণ্ডল সরকারী হাসপাতালের কম্পাউন্ডার হল। সহজ সরল মানুষটির চরিত্রের স্বচ্ছতা, আত্মবল, সহিষ্ণুতা, অধ্যাবসায় ও পাটের ইচ্ছা অর্জুন মণ্ডলকে এক আদর্শের প্রতীকরূপে বনফুল আংকন করেছেন।

অনুগঙ্গের ষষ্ঠ্যরূপে বাংলা সাহিত্যে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। শ্রুতম পরিসরে রচিত বনফুলের গল্পগুলির ঐতিহ্য আছে রবীন্দ্রনাথের ‘লিপিকা’র কথিকাগুলির মধ্যে।

লিপিকার কথিকাগুলিতে গল্পদ্বারা আছে বটে—কিন্তু কোন ক্রমেই সেগুলিকে ছোটগল্প নামে ডাকা যায় না। এ আভিনব পদ্ধতিকে কি নামে অভিহিত করবেন বুঝতে না পেরে কবি বলেছিলেন—“ছোট ছোট গল্পকে ‘কথনা’ না বলে ‘কথিকা’ বলা যেতে পারে। গল্পস্বরূপ বলতে ক্ষতি কি?”

রবীন্দ্রনাথের এই কথিকাগুলি ১৯১৭ সাল থেকে সবুজপরে ও ভারতীর পাতায় মাসে মাসে প্রকাশিত হয়েছিল—১৯২২ সালের গ্রন্থাকারে ‘লিপিকা’ প্রকাশিত হল। বহু পঠনশীল রবীন্দ্রভক্ত বনফুলের পক্ষে এই কথিকাগুলি পড়ে ফেলা খুবই স্বাভাবিক। বনফুলের অনুগঙ্গগুলি রচনা করার মূলে যে রবীন্দ্রপ্রেরণা ও ‘লিপিকা’র গল্পস্বরূপগুলির প্রভাব রয়েছে সেটা বিবেচনা করা যেতে পারে। ‘লিপিকা’র মীন, পুরোনোবাড়ি (সেড পাতা, দু পাতায় সমাপ্ত) প্রথম চিঠি, (তেরিঙ্গ লাইন) সংগত (২৯ লাইন)—ইত্যাদি কথিকাগুলি বাংলা অনুগঙ্গের পূর্বগামী। লিপিকার গদ্যরীতির অভিনবত্ব আছে। গদ্য কবিতার বাক্যগুলি খণ্ডিত না করে গদ্যের মত টানা বাক্যে রচিত হয়েছে। বনফুল কোন কোন অনুগঙ্গে গদ্যের এধেন রীতি গ্রহণ করেছেন। যেমন ‘নিমগাছ’ ও ‘মালাবদল’ গল্পতে।

এ ছাড়া বনফুল নানা বিচিত্র স্বাদের গল্পও রচনা করেছেন। লিখেছেন ভূতের গল্প, কৌতুকী গল্প। অলৌকিক, অশরীরী রহস্য মাথা গল্পও আছে—মদিও গল্পগুলির ভিত্তি বাস্তবের উপাদান। ‘অদৃশ্য লোক’, ‘অবতর্মান’, ‘ভূতের গল্প’, ‘ভূতের প্রেম’, ‘ভূত’ ইত্যাদি গল্পগুলির উল্লেখ করা যায়। কল্পনার মোচড়, ভাষার হৃদিতময়তার গল্পগুলিতে এক ভিন্নতার মাত্রা যুক্ত হয়। ‘মেয়েটি’, ‘তৃষ্ণা’—বনফুলের প্রতিভার অবিস্মরণীয় উদাহরণ—এগুলি নিছক ভূতের গল্প নয়, বরং ভিন্ন স্বাদের গল্প হিসেবে বাংলা ছোটগল্পে এ ধরনের গল্পের স্বতন্ত্র মূল্য আছে।

বাংলা সাহিত্যে বনফুলের মত বিপ্লবী বীর বোধহয় আর কেউ নেই। তাঁর বিদ্রোহ সাহিত্যের বাঁধাধরা নিয়মের বিরুদ্ধে, প্যানপেনে এক ঘেরে বিষয়বস্তুর বিরুদ্ধে। ফর্মকে ভেঙ্গেচুরে নতুন পথের সন্ধান করেছে। বনফুলের বারো বারো প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী ছোটগল্পের ব্যাপ্তি ছটিতে ছটিতে বহু ক্ষেত্রে গল্পের কাঠামোয় এসে পৌঁছেছেন। কখনও তা মেদ লাগগাইন গল্পের ছক মাত্র হয়ে ওঠে। কখনও মনে হয় তা সাহিত্যিকের ভাষার বিবৃতি। এ ধরনের বহু গল্প প্রায় সবগুটি ‘নতুন গল্প’ নামে গ্রন্থে পাওয়া যায়। বারো লাইনের ‘সূরমা’, চোদ্দ লাইনের ‘যাহা ঘটিল’, সতেরো লাইনের ‘আধো ঘুম’ গল্পগুলির সাংকেতিকতা ও সমাপ্তিতে ব্যঞ্জনার গভীরতা সাহিত্যের অন্যমাত্রা দান করেছে। ‘হরু নিরক্ষর’ গোয়াল—‘আধো ঘুম’ অশিক্ষিত রিক্সাওয়াল—বনফুল এই সব দরিদ্র, সমাজে অপাজুস্তেয় মানুষের মধ্যে জাগ্রত চেতনের, মমত্ববোধ ও উদারতা আবিষ্কার করেন—যা শিক্ষিত ধনীদের মধ্যে নিতান্ত বিরল। জীবন ও মনের নানা জটিল রন্ধ্রপথে তিনি ছোটগল্পের সাঁচ লাইট ফেলতে ফেলতে সারা জীবন মানুষকে ঝুঁজে বেড়িয়েছেন। শুধু আদর্শবাহী নয় যা পর্যবেক্ষণীয় তাই তাঁর গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে।

\*\*\*\*\*

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় নাট্যানুরাগী ছিলেন। তখন ‘সীতা’ নাটকে শিশির ভাদুড়ী নিয়মিতভাবে রামের অভিনয় করতেন। বনফুল শিশির ভাদুড়ীর অভিনয়ের পরম ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। ‘সীতা’ নাটকটি বনফুল উপর্যুপরি ছয় সাত বার দেখেছিলেন। এ সময়ে অর্থাৎ



মেডিকেল কলেজে ছাত্র থাকাকালীন 'রূপকথা' নামে একটি ছোট একাংক নাটক লিখে শিশির ভাদুড়ীকে পাঠে শুনিয়েছিলেন। তিনি নাটকটির জন্য বনফুলকে প্রশংসা করেছিলেন ও তাঁর রচিত নাটকে তিনি অভিনয়ও করতে পারেন বলে তাকে জানিয়েছিলেন। শিশির ভাদুড়ী বনফুলকে আরব্য উপন্যাসের গল্প থেকে কিংবা সামাজিক কাহিনী থেকে নাটক লিখবার জন্য উৎসাহিত করেন। কবিতা ও গল্প লেখার ফাঁকে ফাঁকে বনফুল প্রথমাবধি নাটকও অনেক কাটি রচনা করেছিলেন।

(১) 'মহুমুখ' (১৯৩৮), (২) রূপান্তর (১৯৩৮), (৩) শ্রীমধুসূদন (১৯৩৯) (৪) বিদ্যাসাগর (১৯৪১) (৫) মহাপ্রভু (১৯৪৩) (৬) কঞ্চি (১৯৪৫) (৭) সিনেমার গয় (১৯৪৬) (৮) বন্ধন মোচন (১৯৪৮) (৯) উজ্জ্বলা (১৯৫৭) (১০) শ্বশুর (১৯৬০) (১১) আসন্ন (১৯৭৩) পাঁচটি একাংক নাটক (১) শিককাবাব (২) কবয়ঃ, (৩) অন্তরীক্ষ (৪) কবিতা ব্রিহতি (৫) ক্রিপ্তো। 'মহুমুখ' বনফুলের প্রথম প্রকাশিত নাটক।— একটি কুকুর এই নাটকের প্রধান ভূমিকায় রয়েছে। বিদেশী নাটকে মনুষ্যতর জীবদের নানা ভূমিকায় রাখার রেওয়াজ আছে। কিন্তু বনফুলই প্রথম মনুষ্যতর প্রাণীর ভূমিকায় একটি কুকুরকে আনলেন। শনিবারের চিঠিতে নাটকটি প্রথমে ক্রমশ প্রকাশিত হয়েছিল। তখনই পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বনফুল 'মহুমুখ'র এক কপি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বেশ ভাল লেগেছিল। 'মহুমুখ' টিক লাইন ধরে চলেছে, derailed হবার আশঙ্কা নেই।... অতিকৃতি আছে— বাঙ্গালীকরণ অর্থাৎ ক্যারিকচারের দ্বারা বিকৃতিকে স্পষ্ট করার জন্যই তার দরকার।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মুক্তির উপায়' নামের গল্পটির একটি নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রহসনটি রূপান্তর করতে হয়েছিল বলে প্রহসনটির সাহিত্যিক সম্পর্কে কবির মনে দ্বিধা ছিল। ঠিক তখনই 'মহুমুখ' প্রহসনটি তাঁর হাতে এল। 'মহুমুখ' সম্পর্কে মুক্ততার প্রকাশ একটু বেশি পরিমাণেই হয়েছিল বলে মনে হয়। 'মহুমুখ'র সঙ্গে 'মুক্তির উপায়' নাটকটির তুলনা করে লিখেছেন— "... হসতে মায়ে মায়ে হাসিয়ে থাকব, কিন্তু চরিত্রগুলো সাড়ে, ভাষায় তাদের বসতির ছাপ নিয়ে আসে নি।"

বলা বাহুল্য কবির এই প্রশংসাবাহী তরঙ্গ নাট্যকারকে উৎসাহিত করেছিল। এরপর ১৯৪৮ পর্যন্ত প্রায় প্রতিবছরই একটি করে নাটক প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৭৩ সালে বনফুল তাঁর সর্বশেষ নাটকটি রচনা করেছিলেন— 'আসন্ন' নামে। ১৯৬৩ তে প্রকাশিত হয়েছে 'শ্বশুর'। স্বামীজির আদর্শ ও বাগীমূর্তিকে নাট্যরূপ দিয়েছেন।

'রূপান্তর' বনফুলের দ্বিতীয় নাটক— আরবারজনীর গল্প নিয়ে লেখা। ইতিপূর্বে কীরদার প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 'আলিবাবা' নামে হাস্যরসমূলক গীতিনাট্য রচনা করে সমুহ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। বনফুল তাই নাটকটিতে একটি ভিন্নরস পরিবেশন করেছেন।

বনফুলই প্রথম মহাপুরুষদের নিয়ে জীবনী নাটক লেখা শুরু করেন। শুধু ছোটগল্পের ক্ষেত্রে নয় জীবনী নাটকগুলোর ক্ষেত্রেও তিনি অভাবগ্রস্ত এনেছেন। মহাকাব্য মাইকেল মধুসূদনকে নিয়ে তিনি নাটক রচনা করেছেন— 'শ্রীমধুসূদন'। মুখবন্ধ তিনি 'স্পষ্টতই জানিয়ে দিয়েছেন— "এটি ইতিহাস নয়, জীবন চরিত্রও নয়। সমস্ত সূচনাও ও দৃশ্যগুলি কাল্পনিক।" মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত্র পাঠ করে বনফুল য়া ধারণা হয়েছিল— সেই

নির্যাসটুকু তিনি 'শ্রীমধুসূদন' নাটকটিতে ধরতে চেষ্টা করেছেন। 'কবিরে পাবে না তার জীবন চরিত্রে'— এটি বোধহয় মধুসূদনের প্রচলিত জীবনী সম্পর্কে বলা চলে। কারণ এসব জীবনী পাঠ করে আমরা মধুকবির জীবনের সৌধনে অমিত বাঘিতা, বিলাসিতা ও আর্থিক অনটনের ইতিবৃত্তকুই জানতে পারি। কিন্তু মধুসূদন যে কত বড় কবিপ্রাণের অধিকারী ছিলেন, কত বড় দরদী, স্বদেশপ্রেমিক, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন সেটি জানতে হলে বনফুলের 'শ্রীমধুসূদন' নাটকটি পড়তে হবে।

এই নাটকটি বেশ মঞ্চ সফল হয়েছিল। শিশির ভাদুড়ী নাটকটি পকেট নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি নাটকটি অভিনয় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইতিপূর্বে বনফুল সতু সেনাকে আমন্ত্রিত দিয়েছিলেন বলে শিশির ভাদুড়ী আর এই নাটকটি মঞ্চস্থ করতে পারলেন না। তিনি নিজেই 'মাইকেল' নামে অন্য একটি নাটক লিখে অভিনয় করতে লাগলেন। 'শ্রীমধুসূদন' নাটকটি কলেজের অনাঙ্গের পাঠ্যাতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল যাটের দশকে। সখের থিয়েটার গ্রুপ, কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ও পেশাদারী নাটকের দল 'শ্রীমধুসূদন' নাটকটি বহুবার মঞ্চস্থ করেছেন। নাটকটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। 'শ্রীমধুসূদন' নাটকটির অনুসরণে আরও জীবনী নাটক লেখা শুরু হল। বনফুল জানিয়েছেন— "আমার শ্রীমধুসূদন ও বিদ্যাসাগরের নকলে অনেকগুলি নাটক লেখা হয়েছিল। কিন্তু, সে সব নাটকে নকলানবিশি প্রতিভা ছাড়া অন্য প্রতিভা দেখা যায় নাই।... আরও অনেকের জীবনী লইয়া আমার নাটক লেখার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু, চোরদের ভয়ে আর লিখি নাই।" প্রথমে অবশ্য এই নাটকটিতে কিছু ত্রুটি ছিল। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় তা সংশোধিত হয়েছিল।

শ্রীমধুসূদন নাটকটি প্রকাশিত হবার আগে অন্তরালে কিছু ঘটনা ঘটেছিল। নাটকটি শেষ করে বনফুল নাটকের ফাইল কপিগুলো সবটাই রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়েছিলেন। বনফুল রবীন্দ্রনাথের মতামত জানবার জন্য উৎসুক ছিলেন। বাঙ্গা নাটকের ক্ষেত্রে এই যে নতুন একটি ধারা— জীবনী নাটক— সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত জানবার কৌতুহল থাকা খুবই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু 'শ্রীমধুসূদন' নাটকের তিনটি বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন। বাংলা নাটকে এত বেশি ইংরেজী শব্দের ব্যবহার, একটি স্বপ্ন দৃশ্য ও নাট্যকার সমাপ্তিতে মধুসূদনের ভূতের আবির্ভাব।

মাদ্রাজের প্রবাস জীবনী মধুসূদনের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বনফুল মনে করতেন। তিনি ওখানে ছিলেন দীর্ঘ সময়— বিবাহ করেছেন দুইবার মাদ্রাজে। মধুসূদনের মাদ্রাজের প্রবাস জীবন বনফুল গৌরদাস বসাকের স্বপ্নদর্শনের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমালোচনা করেছিলেন— "ভুলেচ এতো জীবন বৃত্তান্ত নয়, এ যে নাট্য। না হয় তথা কিছু বাদ পড়ল। আবাস্তবের সহায়তায় বাস্তবের উপর শমন জারি করো কেন ?".... "তোমার নাটক থেকে স্বপ্নটা বাদ দিতে হবে। ওটা বোমানান হয়েছে।" নাটকের প্রথম সংস্করণে স্বপ্নটা ছিল। পরবর্তী সংস্করণ থেকে স্বপ্ন দৃশ্যটি বাদ দেওয়া হয়েছিল। মাদ্রাজের জীবনটি অংশ অনাভাবে এসেছিল। শেষ দৃশ্যে মধুসূদনের ভূত আবির্ভূত হয়ে বন্ধিমুদ্রের হাতে নিজের সবকটি বই তুলে দিচ্ছেন— দেখান হয়েছে। যেন সাহিত্যের উত্তরাধিকার মধুসূদন থেকে বন্ধিমুদ্রের হাতে পৌঁছে গেল— এহরকম ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে নাটকটি সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— "শেষ দৃশ্যে মধুসূদনের ভূতকে এনে তুমি আর একটা ছেলেমানুষি

করেছ। ওটাও বাদ দাও। কিন্তু বনফুল একেবারেই রাজী হলেন না— দৃশ্যটি পরিবর্তন করতে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কিছু বাদানুবাদের পর স্থির হল দৃশ্যটি যেমন আছে তেমনই অপরিবর্তনীয় থাকবে।

উনিশ শতকের আর এক মহাপুরুষ বনফুলকে অনুপ্রাণিত করেছিল। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর যে নারীর দুঃখ দূর করার জন্য বিরাট কর্মযজ্ঞ হাতে নিয়েছিলেন সে মনীষীর প্রতি ‘বিদ্যাসাগর’ নামে পূর্ণাঙ্গ জীবনী নাটক রচনা করলেন। অপর একটি একাংক নাটিকা—‘১৩ই শ্রাবণ ১৩৪৮’ নাটকেও বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছে। ১৩ই শ্রাবণ বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ দিবস, কলেজের ছাত্রীরা এই দিবসটিকে স্মরণ করে কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে হোস্টেলে ফিরে এসেছে। ছবির ফ্রেমের ভেতর থেকে বিদ্যাসাগর বেরিয়ে এসে গায়িকা ছাত্রীটির সঙ্গে কথা বলছেন। বালা বিবাহ, বর্তমান বিবাহ ব্যবস্থা, পণপ্রথা ও প্রসঙ্গত প্রেমের বিবাহ নিয়ে কাল্পনিক আলোচনায় নাট্যরস বেশ জমে উঠেছে।

বিদ্যাসাগরের জীবন বন্ধা কর্মে ও প্রতিভায় বিকশিত হয়ে উঠেছে। বিদ্যাসাগরের কর্মযোগকে কেন্দ্রে রেখে সেই বিশাল ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছেন ‘বিদ্যাসাগর’ নাটকে। সেই জন্য হয়তো সব সময় ইতিহাসের ঘটনাগুলির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। আবার কেন কোন ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের চরিত্রগণের চরিত্রগুলি অংকনে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। এই স্বাধীনতা তো নাট্যকারের আছেই। তিনি তো আর ইতিহাস রচনা করছেন না— তাঁর উদ্দেশ্য বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভাকে স্পর্শ করা।

বনফুলের নাট্যপ্রীতি প্রসঙ্গে তাঁর ‘মৃগয়া’ উপন্যাসটির উল্লেখ করতে হয়। ‘মৃগয়া’ উপন্যাসটির তিনটি ভাগ। প্রথম অংশটি গদ্য কবিতা লেখা। দ্বিতীয় অংশটি গদ্য এবং তৃতীয় অংশটি রচিত হয়েছে নাটকে। উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে কাব্য থাকে, কবিতা থাকে— সংলাপ ইত্যাদিতে নাট্যক্রিয়া সৃষ্টি হয় তা বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকেই আমরা দেখে আসছি কিন্তু উপন্যাসের প্রথাগত আংগিক ভেঙে তিনি একতৃতীয়াংশকে নাট্যরীতিতে রচনা করে নাট্যশৈলীর অভিনব প্রয়োগ দেখালেন। এই অভিনব স্টাইলে বাংলা সাহিত্যে আর কেউ উপন্যাস লেখেন নি।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যেমন ছন্দের ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতিকে ভেঙ্গে নতুন নতুন ছন্দে বাংলা কবিতায় যাদু দেখিয়েছিলেন— বনফুল তেমনই প্রচলিত ফর্মের বাঁধ ছিঁড়ে সৃষ্টির খেলায় মেতে উঠেছেন বারবার।

‘শ্রীমধুসূদন’ নাটকটি পড়লে রবীন্দ্রনাথ যে মুগ্ধ হয়েছিলেন তা আমরা জেনেছি। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছে ছিল বনফুল তাঁকে নিয়ে একটা জীবনী নাটক লিখুন। “তোমার নাটকটা নতুন পথের সন্ধান এনেছে। আমাকে নিয়েও একটা লিখো।” কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কোন পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা বনফুলের আর হয়ে ওঠেনি। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ‘শনিবারের চিঠি’র রবীন্দ্রসংখ্যায় ‘অন্তরীক্ষে’ নামে বনফুল একটি একাংক নাটিকা লেখেন। নাট্যকাটিতে সবটাই ভুতুড়ে কল্পনা— অন্তরীক্ষে গ্রীকদেবী অ্যাথেনা দাঁড়িয়ে আছেন। চতুর্দিকে মহাশূন্য, ক্ষুদ্রবৃহৎ বহু জ্যোতিষ্ক জ্বলছে। এমনই একটি পরিবেশে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কবি সাহিত্যিকদের বিশ্বকবি সভায় উপস্থিত হয়েছেন। বেদব্যাস, রাধাক্রী, হোমার, ডার্বিন, দাণ্ডে, ওমর খৈয়াম, সেক্সপীয়র, হিউগো, গোট্টে, মিল্টন, প্রমুখের সমবেত হয়েছেন— এমন সময়ে চতুর্দিক ইন্দ্রবর্ষে উদ্ভাসিত

করে সপ্তাশ্ববাহিত হিরণ্য অরুণ রথে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটল। সব দেবদেবীরা ও বিশ্বকবিরা উঠে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা জানালেন। হীরাদেবী রবীন্দ্রনাথের মস্তকে শ্রেষ্ঠ লরেলের মুকুটখানি পরিয়ে সম্মানে ভূষিত করলেন। রবীন্দ্রনাথ যেমনটি চেয়েছিলেন এটা অবশ্য তেমনটি হল না।

‘সিনেমার গল্প’কে ঠিক নাটক বলা যায় না। বরং এটিকে বলা উচিত চিত্রনাট্য। বনফুলের ‘দ্বৈরথ’ উপন্যাসটি তখন খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। ‘দ্বৈরথ’ উপন্যাসটির কাহিনী নিয়ে ফিল্ম করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত বলা যায় বনফুলের উপন্যাসের কাহিনী নিয়ে বেশ কয়েকটি ফিল্ম তৈরি হয়েছিল। দ্বৈরথ, অগ্নীশ্বর, হাটেবাজারে, ভীমপলশ্রী, ভুবন সোম, কিছুক্ষণ। শেষের দুটি চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেছে। কিন্তু কোন উপন্যাসের চিত্রনাট্য বনফুল তৈরি করেন নি। চিত্রনাট্য রচনার দায়িত্ব অবশ্যই উপন্যাসিকের নয়। কিন্তু বনফুলের কৌতুহল ও বৈচিত্র্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা এতই তীব্র ছিল যে ‘দ্বৈরথ’ উপন্যাসটির চিত্রনাট্য রচনার দায়িত্ব নিজ হৃদয়ে টেনে নিয়েছিলেন। চিত্রনাট্য রচনা করতে গেলে উপন্যাসটির ভাবগত ও গঠনগত কি বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন আসতে পারে সেটুকু উপলব্ধি করার জন্যই তিনি দায়িত্বটি নিয়েছিলেন। চিত্রনাট্যটি রচনায় বনফুল দক্ষতা দেখিয়েছিলেন।

বনফুল সারা জীবনে নানারকম নরনারী দেখেছেন। তাদের বিচিত্র রূপ, বিচিত্র চং। বিজ্ঞান পরিশীলিত দৃষ্টি নিয়ে তাঁর মানব অয়েষা কখনও গল্পে, কখনও নাটকে বা উপন্যাসে রূপ পেয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে তাঁর ছোটগল্প ও নাটক সম্পর্কে আলোচনা করা হল। স্থানাভাবে উপন্যাস প্রসঙ্গ বাদ পড়ল। বারাস্তরে উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করার ইচ্ছে রইল।





হাস্যাত্মক লক্ষণাবলি  
শিগিনী তথাকথিত

বিভাগ : বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা

২৯৫

pen - numeric  
man's last - the well  
man's last  
man's last

man's last - the

Notes (S.P.)

Notes

Notes  
Notes  
Notes



19.10.30  
note - under - 19.10.30  
Branch - under -  
with - more typing - 19.10.30  
life insurance - applications -  
by post -

### Items

- The Great distress = In the lines of deep and night
- My = Pandora's box = for conscience's sake =
- Olivia's diary = I'dyll it might have been
- Imaginative woman = Indolence at the desk
- Pity (a hymn) = Some created characters =
- = Youth and old-childhood, begood, youth, but parent's presence
- = Arnold: Pastiche, Keats's Grave =
- = Mean Street =
- = Strong with Beauty (a poem)
- = Dangerous (young) castle =
- = Youth is deceiving =
- = Heaven for dogs.
- = My? =
- = So the King of old buried their dead
- = Finally -
- Slap: Grant's book -
- Lewis' and Christ's little history.
- Gesta -
- 1918 (1918) - Father: wide with a father
- There a la Bratole France: mother of Paul
- Revivitation (Monday)

- Vision of a Burial Place -
- Dreams we remember - (one or two)
- Absent after death -
- Vision of the dead (Wonderful)
- Small bits of an universal nature
- Where you might be -
- Death my near dead : an evil thought
- Because thy body once mingled with mine
- Lonesome : Bare soul : Alone -
- Mellow thoughts -
- A deathbed song - Beauty of Death
- Songs -
- A passing away -
- It'd die Othello (1879)
- He tells his tale -
- A song of desire (New Style)
- (1879) - Mr. Mr. (Misty)
- Old boys -
- A Branded Soul (A poem)
- Conventions (Story)
- Having no plan even of despair
- No love sure that of a dog and for a long  
possible on earth (Story)

- Two young birds had fallen out of their nests in  
the window (Gods were almost)
- The Great adventure (Poem)
- I have always known myself to be an  
adventurous soul (Poem)
- Rules : Break!
- Gods are A (Story)
- Girls of imagination
- Life after death (Rise : pictures and a old moral  
story - A Story)
- In an old hat -
- Modesty (Story)
- Songs & music : something sweet in soft poems in  
the autumn of life -
- Fish (Brooks)
- A Gypsy (Rumour, insect, Brother Paphumbray, P. Jones,  
It looks like that : I shall survive to see <sup>story</sup> me  
impotent and forgotten - My father had kind to see  
that I was wiser than him, and I have lived  
to see that he was wiser than me -





## Themes

- The great dullness = In the silence of days and nights =
- আজ = fantasie etc. = for conscience' sake = ✓
- Alicia's Diary = Idyll wh might have been =
- Imaginative woman = Interlopers at the knap = ✓
- Pity (a hymn) = some crusted characters = ✓
- youth and age, childhood, boyhood, youth, Past, Present, Future (A Nov)=
- Arnold : Rugby chapel, Heine's grave =
- Mean streets =
- Stung with Beauty (A poem)
- Dangerous (fairy) castle =
- Youth is dreaming =
- Heaven for da-go =
- My? =
- So the kings of old buried their dead =
- Finality—
- Sleep : Grantchester —
- Hiene's soul & church-bells lulling —
- Gestus —
- অহিবুডো মেয়েদের দল : Pathos : winter nights & pathos
- Stories a la Anatole France : mother of Pearl
- Revisitation (Hardy)
- Vision of Burial Place —
- Dreams we remember — (one or two) —
- Discontent after death —
- Vision of the dead (wonderful)
- Scented letter of an aristocrat mother ... Holling - ম - স etc.—
- Whoever you might be —
- I wish they were dead : an evil thought —
- Because thy body once mingled with mine —
- Lonesome : Bare soul : Alone —

## বিভাব : বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা

৩০৩

- Mellow thoughts —
- A deathland song — Beauty of Death —
- Songs —
- A passing away —
- If I die (মি ম'রে গেছে —)
- He tells his tale —
- A song of Desire (New style)
- পৌঁচা — হাঁস — হায়না (Nights)
- Old Aeols —
- A Branded Soul (A poem)
- Conventions (Story)
- Having no plan even of despair
- No love save that of a dog and for a dog possible on earth (Story)
- Two young birds had fallen out of their nest on the window (Gods are athirst)
- The great adventure (Poem)
- For I have always known myself to be an adventurour soul (Poem)
- Roles : Awake!
- Gods are A (Themes)
- Gorilla of Ubangui
- Life after death (River : fir trees : and a wild natural scenery — A story)
- To an old bat —
- Moderner (Story)
- সুন্দর মুখ — Music : Everything sweet or soft pains me : In the autumn of life —
- Fish (Brooke)
- N. Gupta (Remorse, wreck, Brother Paphuntius, A. France - story)
- It looks like that : I shall survive to see me impotent and forgotten — My father had lived to see that I was wiser than him and I have lived to see that he was wiser than me —
- /মোষ হামসে —
- Coupon বিক্রী হয় : Dog Hospital : Outram's horse : না ঠাকুর in Tram



- Traffic man & Europeans —
- Truth : I demanded from her — Scene changes — Dreams — Change —
- Truth (Story) —
- A new something — long : the spirit of man —
- A poem : Drowning in sea —
- With his own place prepared and ready, & he hears the hollow croaks of magpies rising upon the night air.
- Conclusion : A story —
- Letters from a dead man — ✓
- Clerk : A poem —
- A philosopher caught in meshes am I : what you say in volumes of novels & stories, I in a poem —
- Experiences of April 3, 1929; Strand Road office, Telegram, & all that ... A man, all things considered should not live in this scheme. But, why does he not die? A man like me thinks he may be misunderstood, and leave his message real unsaid by an early death...conclusion...And a poem —
- I thought of my brother when I saw him in E.B.R (the young man with specs : 4/4/29) — Poem —
- I reviewed the world & wanted to adjust it — a long poem from a privileged pedestal & the hollowness of it all —
- / My own students ...me — মশাই যখন চাকরী করবেন etc. — E.B.R. and all that low — mean — dull life — Story —
- জাহাজের ডাক্তার = Time table-এর ওপর =
- Scaffolding : nerves & all that —
- If I die — my ghost : an old guard (Humour, Pathos & Poetry of all that)
- Trees whispering (A line of trees by my homeway : Poem)
- নক্ষত্রেরা : stars —
- Leper-woman and years' revival & Lepers : A poem —
- A deserted house — no light, but the street gas-lamps reflected on the window-glass (A poem)

- Buffaloes in Strand — "
- Derelicts — "
- Feathers (in my room) — "
- I like a duck in water : bereft of all cares, anxieties, modernities, to-do's and not-to-do's : A poem.
- A wornout dying dog at depth of night & reminiscences
- High-court thoughts —
- In my wanderings (wanderings of asheen)?...
- Through the ages
- Lincoln
- A bid lapping in marshes at night —
- Soon it would be winter and there was no wood —
- An adieu
- Complex obstinate questionings (unconventional)
- Bitterness, jealousies, storms & stresses, all modernisms of love : no more — Hence smooth sailing : Poem
- On feeling Age coming — withering before youth.
- Old letters — I have been reading old letters
- Red-letter nights (Novel) —
- Dates (full of) and events
- সা (She)
- Jungle
- How widows live (A poem)
- The girl dreams ( I saw him extremely pale...I saw him ...!..)
- Island magic —
- Greek serenity —
- Pale horseman —
- Wonder Night —
- Nocturne —
- The minet's nest — early whistler —
- An old passion —
- To household —
- I shall not see her any more : (All that it means) —

- Scroll abjuring her Eternity —
- Lion or Leopard hunting in moonlight forest —
- The note of Hedonism to be corrected : Produce something Dantesque — Shakespearian or Goethe-like —
- Men wondered why I loved you, and none queried, How sweet your slow, divine stupidity,  
Your look of earth, your sense of rest —
- Oh, I shall fly —
- These pictures (Hardy)
- Anuradhapur : (Story for young : poem : fantasy)
- Outplayed —
- How they died — (Poem).
- How several loves died — (Poem).
- How he died (Poem).
- How she died (Poem).
- Black cat (Story poem).
- দস্তশোষা (A poem)
- How loves died (Poem) : — আর না — no more (Poem)
- Barabbas (Poem) : — To an imaginary king (father of lunatics) — Poem
- Geryon (poem) : — কদ্বাবতী (A single-woman poem)
- I am dying, but she will live : To end her : she has been this & this to me : Philosophy of life : finally ending her before another mood of renunciation etc. dawns.  
(This is a spider's web, a frog in a serpent's mouth)
- The pity is : these reflections, associations of ideas, images etc. etc. which are mine will never be hers.
- To child Milu (Poem)
- One gone to the dogs —
- আবার এক গাদি শনিবারের চিঠি (among other activities)
- Over the world's sick bed —
- What you mean to do —

- Twenty-five years after —
- To Ursula Bloom (Poem).
- San O'Casey's drama — Derilict (Story or poem?)
- Father's story : Girija's daughter, Usha's death, other rebukes & beneficial spirit etc. (Story)
- On somebody's (Dog's) death bed (Poem)
- General — (First Outlined on Papers)
- God as Prof of B. Coll - Dreary aspects in detail - Setters to Bay (after appt.) — Before appt. — To Barisal (father to Biswas etc.)  
From Barisal and steamer — sight Rly etc. — Everything — No sympathy — Predecessor & courage — Parents (own Hunts)
- More of ইন্দ্রা and days unfolding, ফেউ — Tiger — Talks of সুন্দরবন)  
— walks — Entertainments (Fowls at night etc.) — Past life an old w's tale — marooned. Special stress on some letters (Esp Bud-dha's) and entire lack of lit. spirit etc. — Death (all meditations) —
- Tea shops — students — Profs — Games — snobs — classes — Everything mere — exposure —
- Calcutta : Heaven & Haven — Days — Doubts — Home. Tragedy deepens on returns — Train when returning (2 boys especially & all about) — Sight of the college and actual landing — flight (thought of) and actual (Details) — Calcutta : Salvation at least — we makers — sorrow has no place — Letters — Schemes — Determinations —
- Khulna & steamers & Hours in Kh & Hotel & restaurant & Everything with the melodrama & pathos — the many efforts — Nibaran Chakra etc.
- Marriage (all about).
- Concrete sketches of girl & love (Past & Future when she won't be)
- Return : Resignation : Dismal parents with old age, the drawbacks & miseries of home — Blank future
- World again



**Addenda**

- Father drudging — Father (Ill:well) — Mother
- Indu — Doga — Bhupesh — Didima — Gadan — and Bhuban — Khuki — K.K. — ঠাকুমা — Kinkar
- Home people — Home atmosphere — The season — and seasons : All reminiscences — All possible contrasts — Meanings of particular places (Home).
- Magnates visited & written to — N. Gang & Nobel Prize etc.
- Society : man's place in the scheme — What it means to some to be in the world — Kitten thrown adrift in no man's lands — How I lamented (commented) the want of a navy & army: especially a navy — ferry steamer when first flying — the moonlit night —
- Nature in Bag & men (Painful contrast)
- Difference with me and continental heroes — A sharp criticism of cont. heroes (conventional) — I am what I am in weakness, strength, logic, sense, & imagin — I always think of future — of unwritten poems & lives & of unbidden death; and stand for the real underdogs (the real) or stand for none — I probe and expose — come & expose me —
- Holth & Paul langen —
- No eye to Nobel Prize : old কালিকলম days — How shocked by Premen's poems (no বিষ etc.): the whole school bitterly criticised : metrical exprn of pious wishes ( বেদে — a weak - kneed senti conti imitation of 8th water)
- Irresponsibilities (of critics of everybody)
- Moments when I was mean & weak — as I am rejecting these alls : if I would accept any of them, and the whole tragi-comedy & burlesque & yet the life-urge — How to solve that urge (really) —
- আমার ভাত : কুকুর — কাক — শালিখ —
- একটা শালিখ — (No more to find)
- Often thought of the mystery & wonder of jungle life — specially lives of birds — Is man an evol or birds one? — Illustrate —

- I greatest; In any way lesser? than Sh? How?
- Every man wants to indulge in luxury — the greatest luxury (were of a girl or ... I & the most undearling copulate & lecher lech & cop — But I nothing : I have no chance of having it in the exact way I wd have it and more — She leched & coped by others — No ha! ha! but just a sleep — No hermit, no all, but even the most thirsty wretched & defeated will go on : there is so much green & blue — blue and green — just test it — sin of ungit loin etc. no sin at all — Browning's life হুন্ট, হুয়া no life at all — "Living" & "Not living" (Browning's) extraneous — sense & understanding — Everything. I can't sacrifice the "sense of it all" for a Whole life lived like Solomon — Details — Heramba — visit —
- Weaving Dept. — Agriculture — Gandhi cult — Again (curiously).
- গুরু, নিকরগ, মোক্ষ etc. — Their religions —
- Sacrifices we offer to more Respectibility — The deadly tragedy of it. Life = one damned thing after another
- Goethe's love psychology (all about)
- Barisal riverside : Telephone talk মিস ও সাহেবদের কিন্তু fatherমো বোঝা যায় —
- Something redeeming; মুসলমানরা Govt. school ও Sub-Insp ছেড়ে ওকালতি করা ও হিন্দুরা Bar ছেড়ে ব্যবসা করা —
- 4 Telegrams of Putu for I — আজকালকার ছেলের হ'ল কি শওর-শাওড়া but আমিও তো আজকালকার ছেলে —
- বাদলকে বাদলবাবু ডাকতে হবে & বাবু etc. & ohter points about Benoy - Kalinkar : A full sketch.
- N.C.C.: Glaxo & other things —
- The many journeys from & to Bagerhat — all of them;

**General**

- Bhub's Pointটা বুঝলেন কিনা —
- Return to Barisal after বর্ষা in cal. — হেমন্ত & শরৎ in Assam Assam episodes : Elsewhere — শীত in Barisal (Nights specially)

- Dogs dead & dying — Puppies ? — Dogs & puppies haunted by a bear End of that bear
- From stoic : nervous guineafowl — H's not [faunat] children (Pragen & Loly) — Apoplectic — Pet abomination embodying all the complacent little headed mediocrity of the new generation. Sippers & tasters, without drive, capacity & even vices (He had done most when 28) — Looked a never to be unbuttoned — A calculated hygienic career for Joe & Bob caused no anxiety to them & now an uncomfortable choky feeling above his high round collar — Game old blighter cocking hat at Molly? (Send me Molly) — A general meeting! — A scent of havir, like hay, her lips bobbed against his nose : rolling the first sip of a special wine against his palate — young beggar — wish I were his age; they said a man as old as he felt : fool! — Independence — Philosophy of having a good time & never committing oneself — what did he object to? : why...the sumguess of his ring, no go, no devil in any of these fish — veined coddled up young bloods, nothing but playing for safety! — And himself who as a youth came on the town in 45... they said you changed your body every 2 years and the mind with it too (not a thought — not a feeling the same!)...when a man had nothing left in life except his dinner, his bottle, his cigar & the dreams they give him...No. No ! Cuspedian! While you lived get something out of it —

The only happy time when you had no passions, nothing to hope & live for : but really ever reach such a stage? —

What are you thinking of (says Pillin) sylvanujus, you look very funny. Old it. Seemed to rouse himself from a sort of coma —

Do you ever wake up? — I do & everything is black! Put a good stiff night cap —

As though for spiritual relief —

The last scene — read thoroughly —

দশহরা night — কালীকিরুর & his hat —

- মানুষ যখন অহিবৃদ্ধ থাকে (when a man is single) — A novel? —
- Life (Bojer — Reconstruction of my own life : childhood, boyhood, youth — In the world —
- Something like ভূতপতরীর দেশ — শিশু সাহিত্য — try
- Read J. K. J. — something like : Idle thoughts of an idle fellow : Anything intensely humorous —
- Some satires like "Little men"...
- Diff sorts of cats : রুটিখেকো and others
- No rest : it becomes a bed of thorns under circumstances and — er — always.

About 4 years for 3 pice :

Sir, Mr. C.P.'s article reg. the punishment of 4 years R.I. awarded on X, an old Bengali, for stealing 3 pice is none the less a revelation of a lack of knowledge of law & procedure. If it were a punishment for a 1st offence, certainly it wd have been rather excessive & unjust, when Sec 562 of the Code of Crime. Proc. provides the procedure for punishment to be meted out in case of 1st offenders. But on ref. to a copy of the ...S...referred to by Mr. C.P., it was disclosed that the said accused in question was said to have had 15 previous concretions & judging his unreformable character, the convicting magistrate was justified in awarding the said sentence. It may well be pointed out that Sec. 75 of the I.P.C. provides for enhancement of sentence on accused persons when previous convictions are proved against them. Generally magistrates take into consideration the previous char of an accused person before passing judgement, particularly on a sentence of imprisonment against him... A 1st class magistrate from —

[ জীবনানন্দের বহুবিস্তৃত দিনলিপিটির এটি একটি অংশ। পূর্বপ্রকাশিত দিনলিপিটির মতো আলাদাভাবে বিভিন্ন দিনের উল্লেখ নেই — সম্পাদক ]



## নামপঞ্জী রচনা

ভূমেন্দ্র গুহ

অনুবাধাপুর : উত্তর শ্রীলঙ্কার একটি ঐতিহাসিক ঐতিহাস্যসম্পন্ন নগরী। চতুর্থ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে অষ্টম খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে প্রাচীন শ্রীলঙ্কার রাজধানী ছিল। দশম খ্রিষ্টাব্দে চোল রাজাদের আক্রমণে পুরোপুরি বিনষ্ট হয় নগরীটি। প্রাসাদ চৈত্যা জগের ধ্বংসাবশেষে সমাকীর্ণ বৌদ্ধ সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র। বুদ্ধগয়া থেকে নিয়ে আসা যে বোধিবৃক্ষের চারাটি এখন মহিকুহে পবিত্রত হয়েছে, তা দর্শন করতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বিরা এখনও সেখানে ভিড় করেন। 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার আশ্বিন ব. ১৩৪৮ সংখ্যায় প্রকাশিত কবিতা 'অবরোধ'-এ জীবনানন্দ অনুবাধাপুর-এর উল্লেখ করেছিলেন; পরে তার 'বেলা অবেলা কালবেলা' কাব্যগ্রন্থে কবিতাটি গৃহীত হয়েছে।

আই.পি.সি : ইন্ডিয়ান পীন্সাল কোড। ভারতীয় দণ্ডবিধি।

আনাতোল ফ্রাঁস : জ্যাক আনাতোল টেবো-র ছদ্মনাম আনাতোল ফ্রাঁস। খ্রি. ১৮৪৪-১৯২৪। ফরাসি সাহিত্যিক। তাঁর প্রথম দিকের রচনা মনোহাসী শ্লেষে জারিত। খ্রি. ১৮৯৪-এর পরবর্তী সময়ে তিনি স্বদেশীয় রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে জড়িয়ে পড়েন, এবং রাজনৈতিক শ্লেষায়ক রচনায় মানানিবেশ করেন। তাঁর কয়েকটি উপন্যাস : *The Crime of Sylvestre Bonnard* (1881), *Penguin Island* (1908)। তিনি খ্রি. ১৯২১এ নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন।

আশ্বিন : আশ্বিন মাস।

আর.আই : রিগোরাস ইমপ্রুজনমেন্ট। সশ্রম কারাদণ্ড।

আরনলড : ম্যাথু আরনলড (খ্রি. ১৮২২-১৮৮৮)। ইংরেজ কবি ও কাব্যসমালোচক। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কবিতা-বিষয়ক অধ্যাপক ছিলেন। বিশ্বাস করতেন কবিতাকে অবজ্ঞাকৃত হতে হবে, কিন্তু তার নিজের কবিতা রোমান্টিক নিরাশাবাদে জারিত ছিল, যথা : *Dover Beach*, *Thyrsis*, *The Scholar Gypsy* : লিরিক লিখেছেন, দীর্ঘ কবিতা, যথা, *Sohrab and Rustum*। তাঁর সমালোচনা ধ্রুপদী মাত্রাবোধে বিশ্বাস করেছে, এবং বুর্জোয়া ও অভিজাত মনোভঙ্গীর বিপক্ষতা করেছে। তিনি তথাকথিত কালচার-মনস্কতার প্রবক্তা ছিলেন বলা চলে। তাঁর সমালোচনা গ্রন্থ : *On translating Homer* (খ্রি. ১৮৬১); *Culture & Anarchy* (খ্রি. ১৮৬৯); *Culture & Dogma* (খ্রি. ১৮৭৩); জীবনানন্দ তাঁর প্রবন্ধগুলিতে বার-বার আরনলড-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন।

ইন্দু : ইন্দুভূষণ গুপ্ত।

বিভান : বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা

৩৩৩

ইভল : ইভোলিউশন। বিবর্তন।

ঈ.বি.আর : ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়ে। বরিশাল থেকে খুলনা হয়ে রেলপথে কলকাতা আসতে এই রেলপথ ব্যবহার করতে হয়।

উবাঙ্গুই : উত্তর-এবং পশ্চিম-মধ্য আফ্রিকার ৬৬০ মাইল দীর্ঘ নদী; কঙ্গো নদীর প্রধান উপশাখা। গহন অরণ্যপ্রদেশের মধ্যে নদীটি প্রবাহিত হয়েছে।

উরগুলা ব্লুম : ইংরেজ উপন্যাসিক। তাঁর একটি উপন্যাস *The fourth cedar* (১৯৪০)।

উষা : বরিশালের বাবের সেকালকার উকিল ও জমিদার দেবীচরণ রায়চৌধুরী জ্যেষ্ঠা কন্যা ঊষাবালা। ব. ১৩৩৬-র কার্তিক মাসে বি.এম. কলেজের এই 'সুরূপা বহু গাণ্ধিতা ও প্রতিভাময়ী' মেয়েটির 'টাইফয়েড জ্বরে' মৃত্যু হয়েছিল।

এ নড : এ নডেল। একটি উপন্যাস।

এন. গ্যাঙ্ক : সঠিক জানা যায়নি। আন্দাজ করা যায়, রাজনীতির বা আনবিশ কোনো যোগাযোগের কারণে ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন; চরিত্রে ও মনুষ্য-সংযোগ ফজলুল হক সাহেবের অনেকটাই বিপরীত কাঠামোর বিবেচক, ঠান্ডা মস্তিষ্কের এবং সহানুভূতিশীল। আবার কেউ-কেউ বলেছেন, ইনি রবীন্দ্রনাথের জামাতা বরিশালবাসী ব্রাহ্মবাদী নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি হতেও পারেন; সন্দেহটা যে একেবারেই অমূলক, তা নাও হতে পারে, কেননা এই ডায়েরিতে তিনি ও নোবেল প্রাইজ এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয়েছে।

এইচ'স : হাজব্যান্ড'স। স্বামীর।

এক্সপ্রন : এক্সপ্রেশন। অভিব্যক্তি।

এন.সি.সি : হতে পারেন সেই সময়ের একজন লেখক, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। হতে পারেন সমকালের এক জন কবি, নিবারণচন্দ্র চক্রবর্তী, যার জন্ম হয়েছিল খ্রি. ১৯০১-এ, বিক্রমপুর, ঢাকার গাঁওগ্রামে; ভারতের ডাক ও তার বিভাগের কর্মী ছিলেন; তাঁর একখানি কাব্যগ্রন্থের নাম ছিল 'ফুলকল'।

কনট হিরোস : কন্টিনেন্টাল হিরোস। সেই সময়কালের মধ্যেও ইউরোপীয় বিশেষ ভাবে বিখ্যাত লেখকগণ, যাদের সাহিত্য সৃষ্টির শাাদ্যাপটো বাস্তবতা ও রোমান্টিকতার দ্বারা কল্পোনীয় তরুণ লেখকরা খোলাখুলি ভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন: যার অন্যতম ফলশ্রুতি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর 'বেদে' বা প্রবেশকুমার সান্যালের 'যাযাবর'।

কালিকলম প্রেস : 'কালিকলম এর দিনগুলি। মুরলীধর বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় মাসিক সাহিত্যপত্র 'কালিকলম'। স্বাস্থ্যপ্রকাশ

করে বৈশাখ, ব.১৩৩৩-এ (খ্রি. ১৯২৬)। কলেজস্টিট মার্কেটের 'বরদা এজেন্সি' থেকে কাগজটি বোয়ায়, প্রকাশক ছিলেন শিশিরকুমার নিয়োগী এম. এ. বি. এল। এই পত্রিকার সঙ্গে জীবনানন্দ প্রথম থেকেই লেখক হিসেবে যুক্ত হয়ে পড়েন, এবং জীবনানন্দের হ্যারিসন রোডের বাসাবাড়ি থেকে পত্রিকা-অফিসটি বেশ কাছে ছিল বলে সেই অফিসেও তিনি মাঝে-মাঝে গিয়েছেন। শৈলজানন্দ 'কয়লাকুঠি'র গল্পগুলি 'কালিকলম'-এ শুরুতে প্রকাশিত হয়ে সাহিত্যপাঠকদের নজর কেড়েছে। 'কালিকলম'-এর প্রথম বছরে জীবনানন্দের আটটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল; দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে প্রকাশিত 'আজ' (জ্যৈষ্ঠ, ব.১৩৩৬) কবিতার লেখক হিসেবে তিনি প্রথম জীবনানন্দ দাশগুপ্ত থেকে জীবনানন্দ দাশ হন; এর পরে তিনি আর তাঁর পদবীটি লিখতে গিয়ে 'দাশগুপ্ত'-তে ফেরেন নি। চতুর্থ বছরে কাগজটির চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল; তারপরে কাগজটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

কালীকিঙ্কর : ঠাকুরা প্রসন্নকুমারী দেবীর দূর সম্পর্কের ভাই, বয়সে জীবনানন্দের থেকে সামান্য বড়ো, এবং একরকম ভাবে তাঁর ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বাসভাজন। বরিশালে অনেকটা সময়েই 'সর্বানন্দ ভবন'-এ এসে ছিলেন এবং পারিবারিক হয়ে পড়েছিলেন।

কার : ক্যারেক্টার। চরিত্রগত স্ভাব প্রকৃতি।

ক্রিম প্রস : ক্রিমিনাল প্রসিডিয়ার। অপরাধের বিচারবিষয়ক প্রক্রিয়া।

খুকি : ছোটো বোন সুচরিতা দাশ। জীবনানন্দ তাঁকে 'খুকু' বলেও ডাকতেন।

খুলনা অ্যাণ্ড স্টিমারস : বরিশাল থেকে কলকাতা আসতে হলে খুলনা (খুলনা জেলাশহর) পর্যন্ত আসতে হত স্টিমারে, তারপরে জাহাজঘাটার হোটেল পেটুচুভি খাওয়া-দাওয়া করে নিয়ে ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়ের বরিশাল এক্সপ্রেসে চড়ে কলকাতার শিয়ালদহ স্টেশনে এসে নামতে হত।

গদন/গদন : কাকা ব্রহ্মানন্দ দাশ এবং প্রভাময়ী দাশের কন্যা সুপ্রিয়া দাশগুপ্তের (চিদানন্দ দাশগুপ্তের স্ত্রী এবং অর্পণা সেন-এর মা) ডাক নাম।

গান্ধি কাল্ট : মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি কর্তৃক যাপিত কর্মজীবন যে-বিশ্বাস ধ্যানধারণা ও ভক্তিমার্গের জনক, তা।

গিরিজা : উষাবালা রায়চৌধুরী (উপরে দেখুন।) মা।

গেরুঅন : গ্রিক পুরাণের চরিত্র। ক্রুসাওর বা সুবর্ণ তরবারির ছেলে। দানব, যার তিনটি মাথা বা তিনটি শরীর, গবাদি পশুসম্পদে ধনী, বাস পশ্চিম সমুদ্রের একটি দ্বীপে, সঙ্গী পশুপাল ইউরিট্যানন এবং তার ভয়ঙ্কর কুকুর অথরাস। গ্রিক পুরাণের সর্বাধিক বিখ্যাত যে নায়ক, হেরাক্লিস, তার শক্তিসাপেক্ষ

পালনীয় যে দ্বাদশ শ্রম, তার অন্যতম ছিল গেরুঅনের পশুসম্পদ জয় করে আনা; হেরাক্লিস তা করেছিল প্রথমে অরথ্রাসকে বধ করে, তারপরে বধ করে একে-একে ইউরিট্যানন এবং গেরুঅনকে।

গ্রিক সেরেনিটি : জীবনানন্দ তাঁর হ্যারিসন রোডের মেসবাড়ি থেকে, খ্রি. ১৯৩০-এ যে বিখ্যাত চিঠিটি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে, তাতে লেখেছিলেন : 'প্রাচীন গ্রীকরা serenity লিখিবার খুব পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের কাব্যের মধ্যেও এই সুব অনেক জায়গায় বেশ ফুটে উঠেছে। কিন্তু যে জায়গায় অন্য ধরণের সুর আছে সেখানে কাব্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হয় না। দান্তের Divine Comedy-র ভেতর কিবা শেলীর ভেতর serenity বিশেষ নেই। কিন্তু স্থায়ী কাব্যের অভাব এদের রচনার ভেতর এই যে সুরের আঙুন জলে ওঠে তাতে serenity অনেক সময়েই থাকে না — কিন্তু তাই বলেই তা সুন্দর ও স্থায়ী হয়ে উঠতে পারবে না কেন বুঝতে পারছি না।' রবীন্দ্রনাথ এই চিঠির কোনো উত্তর দেন নি।

গ্যোয়েটে : হোহান উলফগ্যাঙ্গ ভন গ্যোয়েটে খ্রি. ১৭৯৮-১৮৩২)। জার্মানি কবি সাংবাদিক উপন্যাসিক, নাট্যকার, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ প্রকৃতি-বৈজ্ঞানিক, চিত্রশিল্পী, রাজপুরুষ, এবং জার্মান রোমান্টিক চিন্তাপ্রবর্তকের সর্বোচ্চ নায়ক। বিরশী বছরের জীবনে এত বেশি লিখেছেন যে, উইমার প্রকাশনে তাঁর সমগ্র রচনা ১৩৩ খণ্ডে বিন্যস্ত হয়েছে। বিশ্বসাহিত্যের প্রধানতম পুরুষদের অন্যতম বলে স্বীকৃত গ্যোয়েটে ইয়োরোপীয় রেনেসাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল। শুধুমাত্র তাঁর বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাগুলি একত্র করতে ১৪টি খণ্ডের প্রয়োজন হয়েছে।

তাঁর লিриক-জাতীয় কবিতার বিষয় ও প্রকরণগত বৈচিত্র্য অসীম; গদ্য সাহিত্যে তিনি বিবরণ করেছেন রূপকথার মতো রচনার থেকে কাব্যসিদ্ধ 'মডেল' বা ছোটো উপন্যাস থেকে 'উইলহেম মিস্টার'-এর মতো মুক্ত প্রতীকী উপন্যাসে রূপকথাগুলি নিয়ে মনস্তত্ত্ববিদেরা মাথার চুল ছিড়েছেন; এবং নাটক লিখতে গিয়ে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক বা মনস্তাত্ত্বিক ভাবে জটিল নানারকম সৃষ্টিকর্মে ব্যাপৃত হয়েছেন, কখনও গদ্যে, কখনও মুক্ত ছন্দে; শেষ পর্যন্ত যাত্রা সমাপ্ত করেছেন তাঁর 'ফাউস্ট'-এ — যে গ্রন্থ আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম প্রধান সাহিত্যিকর্ম বলে নির্বিশেষ স্বীকৃতি পেয়েছে। তিনি বিশ্বস্থলার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে নিজেকে শৃঙ্খলায় শিক্ত করেছেন — তবু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মায়াময় লিриক কবিতা লিখতে তিনি তাঁর হাতে জড়তা বোধ করেন নি, যে-সব কবিতায় তাঁর বেঁচে থাকার ভালোবাসার, নির্জনতায় আক্রান্ত হবার রহস্যগুলি বাকবাক্যে কাচের ভিতর থেকে প্রক্ষিপ্ত আলোকেরমার মতো স্বচ্ছন্দে প্রতিভাসিত হয়েছে। তাঁর ৮২ বছরে জীবনের কর্মকাণ্ড প্রায় অবিশ্বাস্য, প্রায় অমানুষিক, তবু তিনি সাগ্রহ অভূষিতো সমাজাগ্রত থেকেছেন এই প্রার্থনায় যে কোনো-এক বিশাল দুঃখ



বা প্রেম এসে তাঁর এই সুদূত অবস্থানভূমি ধ্বংসিয়ে দেবে।  
মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস আগে শেষ করা 'ফাউন্ট'-এর অন্তিম পদটি ছিল এই বকম : "Eternal Womanhead/Leads us on high"। মানুষের অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দুটির আকর্ষণ-বিকর্ষণের ধারণাটি তাঁর এই ভাবনাই রূপায়িত করেছিল : নারী, তাঁর উপলব্ধিতে, একাধারে পুরুষের শক্তির নির্ধার, পুরুষকে সুসভা করে তোলার উপায় হিসেবে শিক্ষক, সৃষ্টিশীল জীবনযাপনের উপায় এবং সেই নিয়তির অনন্যোপায়ে মানুষের মনের ও আত্মার সর্বোত্তম সাধনাগুলির একত্রেবিক ফলস্বরূপ।

গ্যোয়েটে'স : গ্যোয়েটের প্রেমমনস্তত্ত্ব। নারীপ্রেমের অভিঘাত-প্রতিঘাতে গ্যোয়েটকে অমৃত্যু ব্যতিবাস্ত থাকতে হয়েছিল। তাঁর আত্মজীবনী, 'কবিতার সত্য' অনুসারে সেই কাঁচা বয়সের নায়িকা করনেলিয়া বা মদের দোকানের সেরিকা গ্রেচেন থেকে শুরু করে অমেতি, ফ্রিডেরাইক ব্রিয়ান ইত্যাদি পেরিয়ে তাকে শার্লট ভন স্টেইন-এর সঙ্গে পরিণত প্রেমে পৌঁছতে হয়েছিল; তার আগে পরে প্রেমে পড়েছেন নানাভাবে, বাগানদার হয়েছেন এবং তা ভেঙেও গিয়েছে। করনেলিয়া তাকে শিখিয়েছেন ও থাকখিত ভ্রাতা-ভগ্নী সম্পর্কের আধারে প্রেমের জটিল মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাগুলি, যা তাঁর সাহিত্যকর্মে ঘুরে-ফিরে এসেছে; গ্রেচেন-সঙ্গে বিচ্ছেদ তাঁর পরবর্তী অনেককালের প্রেমপাত্রীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের খসড়া ছকটি তৈরি করে দিয়েছে; এই সব প্রেম খুব যে একটা কল্পনাবাসনার জুরোতেও ছিল, তা হয়তো নয়, কিন্তু তিনি এঁদের প্রত্যেককে নিয়েই প্রচুর কবিতা লিখেছেন; এবং জার্মান সাহিত্যে লিরিকের ধরাকে আধুনিকতার দিকে প্রায় বদলে দিয়েছেন; এবং বলেছেন যে, তাঁর সমস্ত সাহিত্যকর্মই তাঁর আত্মানুগত জৈবনিকতার স্বীকারোক্তি। রাগোত্তম প্রেমে পড়েছেন শার্লট বাফ-এর সঙ্গে, যে-প্রেম বিষয় করে বই লিখেছেন *The sorrows of young werther* (খ্রি. ১৭৭৪); জনসমক্ষে বিষয়টি বইলেখার সুবাদে জানাজানি হয়ে যাওয়ার ভয়ে বাফ-এর হুব বর সম্পর্কটা কাটিয়ে দেন, প্রেমে পড়েন জার্মান উপন্যাসিকের মেয়ে ম্যাক্সিমিলিয়েন-এর সঙ্গে, তা ভেঙেও যায়, কিন্তু গ্যোয়েটের সাহিত্যের নায়িকায়াত্রীদের চোখের তারা যে সব সময় ঘনকুসুম, তা এই ক্ষণিক অতিথিটির দান; কুবেরকম্যা লিলি শোন মান-এর সঙ্গে এতটাই জমে উঠেছিল তাঁর সম্পর্ক যে কথা দেওয়া-নেওয়া হয়েই গিয়েছিল, তবু শেষ রক্ষা হয়নি, এবং ফলত গ্যোয়েটকে, অন্য অনেক বারের মতো, নিঃসঙ্গতার শরণে চ'লে যেতে হয়।

অবশ্য তাঁর সব চেয়ে পরিণত সৃষ্টিশীল ও উগ্রাল সম্পর্কটা হয়েছিল শার্লট ভন স্টেইন-এর সঙ্গে। এবং এই সম্পর্কটা তাঁর জীবনযাপন প্রক্রিয়াকে প্রায় আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছিল। তিনি তখন ছোটো রাজা উইমার-এ ভিক্টর চার্লস অগাস্টাসের এর মান্য সভাসদ, এবং শেষ পর্যন্ত, প্রধান মন্ত্রীও; সেই সময় তিনি সামার এক বিশিষ্ট সদস্যের স্ত্রী শার্লট-এর প্রতি

আকৃষ্ট হলেন, এবং তাকে আকৃষ্ট করা এই মহিলাটি বোধ ও মেধার বিচারে তাঁর উপযুক্ত ছিলেন বলা যায়; তাঁর সংস্পর্শে গ্যোয়েটের জীবনচর্যর ছাঁচ নির্ধারিত হয়ে গেল, সামাজিক সুশীলান প্রকৃতি আবিষ্কৃত হল তাঁর কাছে, বস্তুতপক্ষে দিনগত জীবনযাপনের খৃষ্টানটিগুলিও তাঁর দ্বারা প্রভাবান্বিত হতে লাগল, তাঁর প্রেম কাম কল্পনাপ্রতিভার রূপটিকেও মহিলাটি আদ্যন্ত অধিকার করলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে এ-ও নিশ্চিত করলেন যে, তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কটি যেন সামুদ্রা সৌন্দর্যবোধ ও প্রচলিত সৌজন্যের থেকে বহিঃমুখী হয়ে না পড়ে; তিনি গ্যোয়েটের 'বান' হয়ে থাকতে চাইলেন, তাঁর চেয়ে একটুও বেশি কিছু নয়, এবং এই ব্যবস্থাপনায় সার্বলিমেসন-ব্যাপারটা তিনি গ্যোয়েটের প্রেম কল্পনায় উত্ত করে দিলেন, তা সরলভাবে প্রকৃতিশাসিত নয় ব'লে গ্যোয়েটকে যে-ব্যস্ততার মধ্যে বসবাস করতে হয়েছিল, তা থেকে এই মনস্তাত্ত্বিক অন্দকার প্রশ্রীত তাকে করতে হয়েছিল *why did you give us the deep glances?* এবং তাঁর একান্ত নাটক *Brother and sister* (খ্রি. ১৭৭৬)-এ মানসিক ভাবে ক্ষতবিক্ষত ও ব্যস্তগাতিই ওয়েস্টেসকে সাহুনা ও উপশমের জন্য শরণ নিতে হয়েছিল ইফিজেনির। উল্লেখযোগ্য যে, শার্লট ভন স্টেইনকে তিনি ১৭৭০ এর বেশি চিঠি লিখেছিলেন।

জীবনানন্দের ডায়েরিগুলি যখন পুরোপুরি প্রকাশিত হয়ে যাবে, এবং এক সঙ্গে পাওয়া যাবে, তখন দেখা যাবে হয়তো যে, গ্যোয়েটের এই প্রেমমনস্তাত্ত্বিকতার দৃষ্টান্ত ছাড়া তাঁর জীবনেরও নারী সান্নিধ্যের প্রসঙ্গে ভাগগুণে প্রলম্বিত হয়ে থাকেছে।

জে.কে.জে. :

জেরোম কে (লাপকা) জেরোম (খ্রি. ১৮৫৯-১৯২৭)। থেয়াল কৌতুকের লোক ও উপন্যাসিক। নট ও সাংবাদিক। হালকা প্রবন্ধের বই *On stage on off* (খ্রি. ১৮৮৫) এবং *Idle Thoughts of an Idle Fellow* (১৮৮৬)। অনান্য খ্যাতিনামা গ্রন্থ *Three Men in a Boat* (খ্রি. ১৮৮৯), *Three Men on the Bummel* (খ্রি. ১৯০০)। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস *Paul Kelter* (খ্রি. ১৯০২), *My life and Times* (খ্রি. ১৯২৬)। নাটক *The Passing of the Third Floor Back* (খ্রি. ১৯০৭), সে-সময়ে যথেষ্ট সার্থকতা পেয়েছিল।

ঠাকুনা :

জীবনানন্দের পিতামহী প্রসন্নকুমারী দাশ। এই দিনলিপি লেখার কালে তিনি বেশ অসুস্থ ছিলেন। জীবনানন্দের বিবাহ হয় প্রায় সমসময়ে, মে খ্রি. ১৯৩০ 'ব্রজবাণী' পত্রিকার ভাদ্র ও আশ্বিন ব. ১৩৩৭-এ 'স্বর্ণগতা জননী প্রসন্নকুমারী দেবী' শীর্ষক একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়; তাতে লেখা হয়েছিল, "সৌভ্র জীবনানন্দের বিবাহ দেখিবার সাধ তাঁর বৎ পূর্ব হইতেই ছিল। কিন্তু, সুস্থতার দিনে তাহা আর সম্ভাবিত হয় নাই। এই রোগের দিনে এই জননীর ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্যই দ্রুত ব্যবস্থায় ২৬শে বৈশাখ (সে ৩ ভাদ্র) নান



সম্পন্ন হইয়া গেল, সূত্রাণ লক্ষ্মীশ্রী পৌত্রবধু-বরণ-অনুষ্ঠানও সম্পন্ন হইল। নববধুর কণ্ঠসঙ্গীতও কর্ণে গেল, কিন্তু তখন আনন্দ প্রকাশের আর তেমন শক্তি রইল না।”

ঠাকুরা অনতিবিলম্বে পরলোকগত হয়েছিলেন। এই দিনলিপিতে এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে জীবনানন্দ লজ্জিত বোধ করেছিলেন, মনে হয়।

ডগা : ব্রহ্মানন্দ দাশ (খ্রি. ১৮৮৩-১৯৬৭)। জীবনানন্দের চতুর্থ কাকা। ‘ডগা’ তাঁর ডাকনাম। ভাইপো-ভাইনিরা বলতেন ‘ডগাকাকা’। ব্রহ্মানন্দ কলকাতার ‘জলযোগ’ মিস্ট্র-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ছিলেন। তিনি নানা সময়ে আসামেও নানা রকম ব্যবসা বাণিজ্য করেছেন। তিনি তাঁর ভাইপো-ভাইনীদের খুবই ভালোবাসতেন, এবং তাঁর নিজের ধারণা মতে তাঁদের যথার্থ ঐহিক সুখসমৃদ্ধি হোক চাইতেন; আর সুশৃঙ্খলাবোধ ছাড়া তা সম্ভব নয় বলে চাইতেন তাঁরা শৃঙ্খলাপরায়ণ হোক; তাতে কড়া শাসনের ব্যাপারটা এসে পড়ত। এই শাসনপ্রক্রিয়া উদ্ভিষ্টদের মধ্যে ঐরা বয়স্ক, কখন কখনও তাঁদের বিরূপ প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করত। তা হলেও একথা স্মরণ্য যে তিনি বেশ বেশি বয়সে বিবাহিত হয়েছিলেন, এবং অন্য বয়সে ভাইপো-ভাইনীদের প্রতি এতটাই নিবেদিত ছিলেন যে, তাঁর বহিঃপ্রকৃতির কঠোরতা বিষয়ে তিনি নিজেই মুগ্ধ ছিলেন। পরিণত বয়সে তাঁর কলকাতাবাস কালে তিনি বেকার জীবনানন্দের জন্য অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিলেন : তাঁর হয়ে তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান পুরুষদের ও ব্রাহ্ম শিক্ষা সোসাইটির চাইদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন বা রাখতেন; হয়তো অন্যান্য তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানও উদ্যোগী হতেন।

ডা-গো : ডেগো। স্পেনীয় নাম ডিয়েগো-র অপভ্রংশ। হীনতাব্যাক্ত সন্মোহন বা মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত শব্দ। স্পেনীয়-বা পর্তুগীজদের কারও-কারও উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে শব্দটি প্রচলিত আছে।

দা ঠাকুর : দাস্তুদশ। দাস্তে : দাস্তে আলিঘিয়েরি (খ্রি. ১২৬৫-১৩২১)। ইতালির মহত্তম ধ্রুপদী কবি, গদ্যকার, সাহিত্যতাত্ত্বিক, নৈতিক দার্শনিক, এবং রাজনীতিবিদ ও তাত্ত্বিক। তাঁর খ্রিস্টীয় মহাকাব্য The Divine Comedy বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম আলোকসুপ্ত হয়ে আছে।

ফোরেসে প্রথিতযশ পরিবারে জন্মেছিলেন, নগরের দ্বিধাবিশ্রান্ত রাজনৈতিক চারটিগের অন্যতর অংশের প্রতিভূ হিসেবে নগরপাল্যন করেছেন বহু বছর ছয়ক তারপরে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে নিবাসিত জীবন নানা শহরে গ্রামে ব্যয়িত হতে-হতে শেষ পর্যন্ত অভিবাসন পেয়েছিল র্যাভেনাতে, যেখানে পরিণত বয়সে

পরলোক গমন করেন।

বিয়ে করেছিলেন খ্রি. ১২৮৫-তে; কিন্তু তাঁর জীবন, সাহিত্য, ভাষাচর্চা, প্রেম, আধ্যাত্মিক দার্শনিকতা, আত্মতা আবর্তিত হয়েছে বিয়ারিচে পরটনারি-কে (মৃত্যু: খ্রি. ১২৯০) ঘিরে। বিয়ারিচেতে তিনি প্রথম দেখেছিলেন যখন তাঁদের দু’জনেরই বয়স মাত্র ন’ বছর। যখন তাঁদের আঠারো বছর বয়স, তখন বিয়ারিচে তাঁকে সম্ভাষিত করলেন, পরিবর্তে বিয়ারিচের প্রতি তাঁর অনুরাগ অনুচ্চারিত রাখাই উচিত বলে বিবেচনা করলেন দাস্তে; এবং যখন শেষ পর্যন্ত বিয়ারিচে তাঁর সর্মগণ তুলে নিলেন তখনই দাস্তের অন্তরাগ্নিতে কতবিশেষতার প্রক্রিয়া উদ্বেগিত হল : যন্ত্রণা এই জন্য যে, বিয়ারিচে তাঁকে নিগুণ বলে প্রতিপন্ন করেছেন, তাঁর হয়তো এই অস্বীকৃতি প্রাপ্য ছিল না, কিন্তু, প্রতিদিন দেওয়ার প্রক্রিয়াটা হল এই ধনুস্ত পণ যে, তিনি মহিলাটির গুণগণাই ক’রে যাবেন শুধু, তাঁর মৃত্যু কামনা করতে-করতে তাঁকে ম’রে যেতেও দেখবেন তিনি, তাঁর মৃত্যুতে খুবই শোকসন্তপ্ত হবেন, এতটাই যে সাময়িক ভাবে কোনো এক তরুণীর কাছে সান্ত্বনা কামনা করবেন, যিনি বিয়ারিচের পরিবর্ত হবেন তাঁর কাছে এবং শেষ পর্যন্ত বিয়ারিচেতে দেবীদের পাদনিতে দাঁড় করিয়ে দিয়ে সর্বশেষ জিতিয়ে দেবেন। এবং তাঁকে নিয়ে এমন কিছু লিখবেন কোনো এক দিন, “যা কোনো এক রমণীকে কেন্দ্র করে কোনো দিন আর লেখা হয় নি”।

বিয়ারিচে তাঁর কাছে নারীদের আদর্শ হিসেবে র’য়ে গেলেন, তাঁর কবিতার মুখ্য চেতনা হিসেবে, তাঁর খ্রিস্টীয় জীবন পরিক্রমার কেন্দ্র হিসেবে। দাস্তের অন্যতম প্রধান সাহিত্যকীর্তি ‘দা ভিটা নোভা’ বা নবজীবন (খ্রি. ১২৯৩) বিয়ারিচের প্রতি তাঁর প্রেমের তর্পণ — গদ্যে ও পদ্যে; এবং তাঁর সর্বকোম গ্রন্থ লা ভিটা কমেডিয়া বা দ্য ডিভাইন কমেডি, যার রচনাকালের ব্যাপ্তি খ্রি. চতুর্দশ শতকের প্রথম দশক থেকে তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বকাল পর্যন্ত, সংগ্রহিত করেছে তাঁর স্বসন্ত, তাঁর নিজ কাল, এবং সেই স্বয়ত্ত্ব, বিশ্বজাগতিক কালের পদধর্ম। গুরু ভার্জিলের সাক্ষাৎ পথনির্দেশে, এবং সূচ্যেতনার নারী বিয়ারিচের হাত ধরে, তিনি পেরিয়ে যাচ্ছেন নরক, শুদ্ধিকৃত হয়ে যাবার জন্য যে-সব যন্ত্রণা দরকার পড়ে, তা, যতক্ষণ না পৌঁছেছেন স্বর্গে।

জীবনানন্দ তাঁর ‘কি হিসেবে শাস্ত’ প্রবন্ধে লিখেছেন, “আমার মনে হয় দাস্তের কাব্যের শাস্ত পদার্থে এরকম চিহ্ন ধরেছে — আজ নয় — কিছুকাল আগের থেকেই”।

দিদিমা : শ্রীমতী ধনমণি দাশ; চন্দ্রনাথ দাশ-এর স্ত্রী; জীবনানন্দের মা। শ্রীমতী কুমুমকুমারী দাশ এঁদের প্রথমা কন্যা।

নিবারণ চক্র : উপরে এন.সি.সি. দেখুন।



পট্ট : করুণাকুমার দাশগুপ্ত (খ্রি. ১৮৯৬-১৯৭৯) ডাকনাম। করুণাকুমার জীবনানন্দর তৃতীয় কাকা অতুলানন্দ দাশ-এর কন্যা শ্রীমতী জ্যোৎস্না দাশগুপ্তর স্বামী।

প্রজেন/ প্রণেয় : জানা যায় নি।

প্রণেয় : প্রেমেন্দ্র মিত্র (খ্রি. ১৯০৪-১৯৮৮)। প্রখ্যাত কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, অনুবাদক, প্রাবন্ধিক, গীতিকার ও চলচ্চিত্রকার। কল্লোল-কালিকলম-এর যুগের অন্যতম প্রধান সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব। সঞ্জয় ভট্টাচার্যসহ সঙ্গী 'নিরুক্ত' পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন, যে সমসাময়িকনামী নিমন্ত্রিত কবি ছিলেন জীবনানন্দ; জীবনানন্দর কাব্যভাষা সম্বন্ধে একসময় (সঞ্জয়কে) বলেছিলেন যে, বাংলা দেশ এরকম কাব্যভাষা সে-সময় হওয়ায় ছিল, জীবনানন্দ ধরে নিতে পেরেছিলেন, আমরা পারি নি। পরে অবশ্য কোনো সময়ে জীবনানন্দর কাব্যভাষাকে অস্পষ্ট দুর্ভাষাও বলেছেন। রচিত গ্রন্থের সংখ্যা দেড় শতাধিক। 'সাগর থেকে ফেরা' আকারে ও রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন, এবং 'পদ্মশ্রী', 'দেশীকোত্তম' ইত্যাদি বহুবিধ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। জীবনানন্দ তাঁর 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেছিলেন এইভাবে : 'প্রেমেন্দ্র মিত্র সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রিয়বরেণ্য।' মৃত্যু পরবর্তী সংস্করণে উৎসর্গপত্র পালটে গিয়েছিল। জীবনানন্দ আমতা প্রেমেন্দ্র মিত্রকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে জ্ঞান করেছেন, শুধুই নিজের তাগিদে।

ফানার : সত্যানন্দ দাশ (খ্রি. ১৮৬৩-১৯২৪)। জীবনানন্দর পিতা। জীবনানন্দর জীবন-গঠনে তাঁর পিতার প্রখর ব্যক্তিত্বের প্রভাব অপরিসীম; পিতা-মাতার বিষয়ে জীবনানন্দ মূল্যবান একাধিক প্রবন্ধ লিখে রেখে গেছেন, সে-সব লেখা এখনও পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে; সহজেই উদ্ধারযোগ্য।

বাগ, বাগেরহাট : অধুনা বাংলাদেশের, পূর্বতন অখণ্ড বাংলার, মেঘনা নদীর পশ্চিম তীরের বঙ্গোপসাগরের প্রান্তবর্তী খুলনা জেলার অন্যতম প্রধান শহর। এই শহরের প্রফুল্লভঙ্গ কলেজে জীবনানন্দ খ্রি. ১৯২৯-এ, খ্রি. ১৯২৮-এ কলকাতার সিটি কলেজের চাকরিটি চলে যাওয়ার পরে, মাত্র মাস তিনেক চাকরি করেছিলেন; চাকরিটি পেয়েছিলেন খবরের কাগজে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের উত্তরে যথারীতি দরখাস্ত করে। কলেজটি খুব ছোটো ছিল না, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত ছিল। কিন্তু চাকরিটি তাঁর কপালে নয় নি; কলেজের অ্যাকাডেমিক পরিবেশটি খুব সুপ্রশস্ত ছিল বলে মনে হয় না।

[ নামপঞ্জীতে অল্প কয়েকটি নামের পরিচিতি বাকি রইল। সংগ্রহ করা সম্ভব হলে আগামী সংখ্যায় তা দেওয়া হবে — সম্পাদক]

আপনার  
অবসর জীবনের বন্ধু

# ডোকঘর মাসিক আঁয় প্রেকল্প



সুদের হার ১২%

মাসে মাসে দেওয়া হয়

৬ বছরের মেয়াদ শেষে

১০% বোনাস

প্রয়োজনে ১ বছরের পর থেকে টাকা তোলা যায় \*

যদি ৩ বছর বা তার পরে টাকার দরকার হয় তবে

তোলার দিন পর্যন্ত ১২% সুদসমেত সমস্ত টাকা ফেরৎ।



স্বল্পসঞ্চয় অধিকার ◆ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

যে কোন লিঙ্গীণ জাতকধরে  
পাসবই খোলা যায়

## পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ পরিস্থিতির অগ্রগতি আমাদের এই সাফল্যের চাবিকাঠিটি কি ?

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ পরিস্থিতির কথা অনেকেই বলেছেন। কিন্তু এই উন্নতি সম্ভব হলো কিভাবে? পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (ডব্লিউ বি পি ডি সি এল) এর যারা কর্মী, তাঁরা ভালোভাবেই জানেন এর উত্তর। সৃষ্টিভাবে দায়িত্ব পালনের উদাহরণ এটা। ১৯৮৫ সালে নিগমের যাত্রা শুরু করার পর থেকে কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে (কে টি পি এস) বসানো হয়েছে প্রতিটি ২১০ মেগাওয়াটের পাঁচটি বৃহৎ নতুন ইউনিট। ২১০ মেগাওয়াটের আরও একটি ইউনিট ইতিমধ্যেই বসানো হয়েছে। অর্থাৎ কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে এখন মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১২৬০ মেগাওয়াট। এই সাফল্য রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন চিত্র বদলে দিয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। রাজ্য সরকারের অধীন এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটির উৎপাদন ক্ষমতা শুধু যে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে তাই নয়, কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত লক্ষ লক্ষ ইউনিট বিদ্যুৎ আজ গোটা রাজ্যে বিদ্যুৎ চাহিদার এক বিপুল অংশ পূরণ করেছে।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে দেশের বিদ্যুৎ মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড নিজের আলাদা একটা স্থান করে নিয়েছে। 'প্লান্ট লোড ফ্যাক্টর' 'টাইম এভেইলেবিলিটি ফ্যাক্টর', 'অয়েল কনসামশন', এবং 'অ্যাপ্লিকারি কনসামশন' ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে পুরস্কার দিয়ে থাকে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম এখন তার নিয়মিত প্রাপক। নিগমের দক্ষতা এখন দেশের সেরা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাথে তুলনীয়। পরিবেশকে রক্ষার ব্যাপারেও অগ্রাধিকার দেয় নিগম। ছাইয়ের পরিমাণ যতটা সম্ভব কম রাখার জন্য বসানো হয়েছে আধুনিক প্রযুক্তির ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটোর। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিতরে ও চারিদিকে সবুজায়ন সহায়তা করছে পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায়। বর্জ্য যাতে সম্পদে পরিণত হয়, সেই লক্ষ্যে ছাইয়ের সদ্যবহারে একটি 'পাইলট প্রজেক্ট' হাতে নেওয়া হয়েছে।

বিদ্যুৎ চাহিদা দিনের পর দিন যেভাবে বাড়ছে, তাতে বর্তমান সময়ের ভালো পরিস্থিতি আগামী যে কোন দিন ঘাটতির মুখোমুখি হতে পারে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প হিসাবে ৫x২১০ মেগাওয়াট ইউনিট ক্ষমতাসম্পন্ন বক্সের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র রূপায়ণের দায়িত্ব পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম। জাপানের ও ই সি এফ সংস্থা প্রয়োজনীয় অর্থ দিচ্ছে। ১৯৯৯ সাল এবং তারপর থেকে এই প্রকল্পের তিনটি ইউনিট চালু করা সম্ভব হবে। যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে বাকি ইউনিটগুলির রূপায়ণের কাজও হবে। বক্সের তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের পর হবে ৪x৫০০ মেগাওয়াট মুর্শিদাবাদ (সাগরদীঘি) তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ।

ভবিষ্যতে রাজ্যের সব অংশের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের চাহিদা পূরণে এই নতুন প্রকল্পগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। সরবরাহ লাইনে বিদ্যুতের জোয়ার রাখার দায়িত্ব নেবে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম।

## পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড

নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং (৭ম তল), বি ব্লক, ১ কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১